মিসির আলি অমনিবাস

হুমায়ূন আহমেদ

২

মিসির আলি অমনিবাস

হুমায়ূন আহমেদ

◆ আমি এবং আমরা ◆ তন্দ্রাবিলাস ◆ হিমুর দ্বিতীয় প্রহর ◆ আমিই মিসির আলি ◆ বাঘবন্দি মিসির আলি ◆ কহেন কবি কালিদাস

বাংলাদেশে কথাসাহিত্যিকদের ভিতরে হুমায়ূন আহমেদ বর্তমানে কিংবদন্তি পুরুষ। একইসঙ্গে তিনি সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বরপুত্র, সকলেই নির্দ্বিধায় মানবেন। এই ঘটনা বিরল। পারস্পরিক ঈর্ষাতাড়িত দুই ভাগ্যদেবীর মধ্যে প্রেমালিঙ্গন ঘটানোর মতো অসাধ্যসাধন এমনকি রবীন্দ্রনাথের দ্বারাও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কোনো সমাজেই কিংবদন্তি হাওয়ার ফানুসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না, তার ভিত্তিমূল থাকে একনিষ্ঠ সাধনার বাস্তবতায়। হুমায়ূন আহমেদের সাফল্য তর্কাতীত।

তার একটি কারণ এই যে, রচনার ক্ষেত্রে তিনি ক্লান্তিহীন; তাঁর অস্তিত্ব তিনি পাঠককে ভুলতে দেন না। সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস কিংবা মিসির আলির তদন্তকাহিনীর রোমাঞ্চকর সৃষ্টিশীলতা অথবা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পাবলি কিংবা প্রাকৃতপ্রাণ হিমুর জীবনদৃষ্টিতে স্নাত কাহিনীমালার সৃজনশীলতা এখন সম্প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে গেছে চলচ্চিত্রায়ণে পর্যন্ত। কিন্তু অতিপ্রজ হলেই কেউ জনপ্রিয় হয় না; অতিপ্রজতা ও জনপ্রিয়তা অন্যোন্যনির্ভর দু'টি গুণ তো নয়ই, বরং সাধারণত তারা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থাকে। এ দুই বিরোধীপক্ষের সন্ধি ঘটানোই তাঁর আসল কৃতিত্ব এবং হুমায়ূন আহমেদের সাফল্যরহস্যের চাবিকাঠি।

সেই চাবিকাঠি হল তাঁর কাহিনীবুনোট ও সংলাপ নির্মাণের অতুলনীয় স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা। এবং যে-প্রেক্ষাপটে তাঁর কাহিনীনির্মাণ তা আমাদের পরিচিত মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ। এই সমাজের মানুষজনের ঐতিহ্যপরম্পরাগত মনের গড়ন, তার স্বাভাবিকত্ব ও অস্বাভাবিকত্ব কিংবা তার নানা ভাঙচুর ও নতুন বিন্যাস কোনো-না-কোনোভাবে তাঁর গল্পকথনে প্রতিবিম্বিত হয়। হুমায়ূনের বিশ্ব একান্তই সমকালীন ও বর্তমানসাক্ষিক, এমনকি তাঁর ফ্যান্টাসিও।

মিসির আলি সিরিজের কাহিনীসম্ভার কেন আমাদের মুগ্ধ করে? এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য চরিত্রটি ফ্যান্টাসির জগৎ থেকে উঠে আসা। সে-জগৎ এমন অচেনা নয় যে অজ্ঞাত জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা আমাদের টানে, আসলে তা আমাদের আধচেনা—পরিচয়-অপরিচয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ময়মোহিত ও প্রলুব্ধ করে। এখানে আমাদের মনোবিশ্ব নিয়ে তাঁর জল্পনা। মিসির আলি ডিটেকটিভ নন, তাঁকে ঘিরে যে-গল্প বটের ঝুরি নামায় সেগুলো 'ক্রাইম' গোত্রের নয়, চোর-পুলিশের খেলা সে-সবে নেই; ওগুলো ক্রাইম ফিকশন বা থ্রিলার নয়, বরং হররস্টোরি রোমহর্ষক গল্পের বুড়ি-ছুঁয়ে-যাওয়া তদন্তগল্প! আমাদের চেনা ইংরেজি গল্পে আগাথা ক্রিস্টিকে দোসর বলা চলে। বুদ্ধির খেলা ও তদন্ত। বাংলায় 'রহস্যগল্প' নামে একটি সাহিত্যশাখা (genre) চালু ছিল, এখন শব্দটিই

বাংলা কথাসাহিত্যে জীবিত কিংবদন্তি হুমায়ূন আহমেদের [জ. ১৯৪৮] 'নন্দিত নরকে' উপন্যাস দিয়ে লেখালেখির জগতে যাত্রা শুরু, যা মূলত ছিল তাঁর জয়যাত্রা।

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিমার কেমিস্ট্রিতে গবেষণা করে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। কিন্তু সবই ছেড়েছেন সৃজনশীলতায় অধিকতর মনোনিবেশের জন্য।

তাঁর সৃজনশীলতার ভাণ্ডার এখন বহুমুখী। লেখালেখির সঙ্গে চলছে টিভি নাটক ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ, গান লেখা এবং সবশেষে যোগ হয়েছে ছবি আঁকা।

দেশে ও বিদেশে তিনি সমানভাবে সমাদৃত ও সম্মানিত। পেয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'একুশে পদক'। বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটে অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সে। ইতোমধ্যে জাপান টেলিভিশন NHK তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মভিত্তিক ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র একাধিক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত, মুক্তিযুদ্ধ-উপজীব্য চলচ্চিত্র 'শ্যামল ছায়া' অস্কার চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত।

কখনো হিমু, কখনো মিসির আলি এই মানুষটি অনন্য সমাজসচেতন। মুক্তবুদ্ধির সপক্ষে অনশন করেছেন, জাতীয় প্রয়োজনে ও সংকটে এখনো কলম ধরেন, উদ্বুদ্ধ করেন জনগণকে।

যেন লুপ্ত হতে বসেছে। মিসির আলির গল্পকে 'রহস্যগল্প' শিরোনামে সম্ভবত চিহ্নিত করা চলে, বিশেষত্ব একটাই—তা হল, সবটুকুই মনোজগৎ নিয়ে।

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা তাঁদের বাৎসরিক কর্তব্য হিসেবে 'মিসির আলি অমনিবাস' যে প্রকাশ করে চলেছেন তাঁর কারণ সমাজবদ্ধ জীব সামাজিক মানুষের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের পানে পাঠক-পাঠিকাকে কৌতূহলী করে তোলা। এই মনস্তত্ত্বের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই বর্তমান অমনিবাসে গ্রন্থিত ছ'টি কাহিনীতে মিলবে।

মিসির আলি

অমনিবাস

২

হুমায়ূন আহমেদ

প্রতীক

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০০৬

প্রচ্ছদ
প্রতীক ডট ডিজাইন

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৩২৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 – 446 – 096 – 4

MISHIR ALI OMNIBUS (Vol-II) by Humayun Ahmed
Published by PROTIK. 46/2 Hemendra Das Road Sutrapur, Dhaka-1100
First Edition : Book Fair 2006 Price : Taka 325.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

মিসির আলির কথা

আমি একবার এক বিয়ের দাওয়াতে গেছি। বিয়ের দাওয়াত মানে খাসির রেজালা, রোস্ট-পোলাও নিয়ে হৈচৈ। এতবড় একটা অনুষ্ঠান কী করে শুধুমাত্র খাওয়া-নির্ভর হয় আমি জানি না। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। যাই হোক আমি বসে আছি এক কোনায়; নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসছেন, দ্রুত টেবিলের দিকে ছুটে যাচ্ছেন। সে এক দৃশ্য। এক পর্যায়ে আমিও ছুটে গেলাম। 'যস্মিন দেশে যদাচার'। খেতে বসে মেজাজ খুব খারাপ হল। পোলাও ঠাণ্ডা, রোস্ট ঠাণ্ডা, খাসির রেজালায় সরের মতো চর্বি জমে আছে। ঠাণ্ডা খাবার দেখে নিমন্ত্রিতরা কেউ বিচলিত হলেন না। প্লেটের পর প্লেট নেমে যেতে লাগল। এর মধ্যে শুরু হল আরেক ঝামেলা; নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে দু'জন মিসির আলিকে নিয়ে বিরাট তর্কযুদ্ধে নেমে গেলেন। (তাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আমাকে শুনানো তবে তারা কেউই আমাকে চিনেছেন এমন ভাব দেখালেন না)। একজন বলছেন মিসির আলিকে যতটা বুদ্ধিমান মনে হয় ততটা বুদ্ধিমান তিনি না। অন্য জন বলছেন তিনি যথেষ্টই বুদ্ধিমান তবে তিনি আবেগ-নির্ভর মানুষ বলেই বুদ্ধিটা স্পষ্ট হয় না। আমি অপেক্ষা করছি কখন তাঁরা আমাকে সালিশ মানবেন তার জন্যে। উত্তরে কী বলব ভেবে রাখা দরকার। মাথায় কিছু আসছে না। তখন একটা ঘটনা ঘটল, নতুন রেজালার বাটি নিয়ে উর্দি পরা বয় এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আলোচনা শুনল এবং আমাকে বিস্মিত করে ঘোষণা করল, মিসির আলি সাহেবের বুদ্ধির কোনো তুলনা নাই।

মুহূর্তের মধ্যে আমার মন ভালো হয়ে গেল। বিয়ে বাড়ির কোলাহল সংগীতের মতো মনে হল। ঠাণ্ডা খাবার যথেষ্ট আনন্দ নিয়ে খেলাম। মিসির আলি নামের মানুষটার প্রতি খানিকটা ঈর্ষাও বোধ করলাম।

মিসির আলি অমনিবাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। অভিনন্দন মিসির আলিকে, অভিনন্দন প্রতীক প্রকাশনীকে।

হুমায়ূন আহমেদ
দখিন হাওয়া, ধানমন্ডি

১৮-১২-২০০৫

সূচিপত্র

আমি এবং আমরা ১
তন্দ্রাবিলাস ৭১
হিমুর দ্বিতীয় প্রহর ১৩৯
আমিই মিসির আলি ২৪৫
বাঘবন্দি মিসির আলি ৩১৫
কহেন কবি কালিদাস ৩৭৯

আমি এবং আমরা

১

মিসির আলি দু শ গ্রাম পাইজং চাল কিনে এনেছেন। চাল রাখা হয়েছে একটা হরলিক্সের কৌটায়। গত চারদিন ধরে তিনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন। চায়ের চামচে তিন চামচ চাল তিনি জানালার পাশে ছড়িয়ে দেন। তারপর একটু আড়াল থেকে লক্ষ করেন—কী ঘটে। যা ঘটে তা বিচিত্র। অন্তত তাঁর কাছে বিচিত্র বলেই মনে হয়। দুটা চড়ুই পাখি চাল খেতে আসে। একটি খায়, অন্যটি জানালার রেলিঙে গম্ভীর ভঙ্গিতে বসে থাকে। ব্যাপারটা রোজই ঘটছে। পক্ষী সমাজে পুরুষ স্ত্রী পাখির চেয়ে সুন্দর হয়, কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে পাখিটি চাল খাচ্ছে সেটা পুরুষ পাখি। গম্ভীর ভঙ্গিতে যে বসে আছে, সে তার স্ত্রী কিংবা বান্ধবী। পক্ষী সমাজে বিবাহ্ প্রথা চালু আছে কিনা মিসির আলি জানেন না। একটি পুরুষ পাখি একজন সঙ্গিনী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, না সঙ্গিনী বদল করে—এই ব্যাপারটা মিসির আলির জানতে ইচ্ছা করছে। জানেন না। পক্ষী বিষয়ক প্রচুর বই তিনি যোগাড় করেছেন। বইগুলোতে অনেক কিছুই আছে, কিন্তু এই জরুরি বিষয়টা নেই।

পাবলিক লাইব্রেরিতে পুরোনো একটি বই পাওয়া গেল—ইরভিং ল্যাংস্টোনের 'The Realm of Birds'. সেখানে পাখিদের বিচিত্র স্বভাবের অনেক কিছুই লেখা, কিন্তু কোথাও নেই একটি পাখি খাবে, অন্যটি দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে। রহস্যটা কী? এই পাখিটির কি খিদে নেই? নাকি সে এক ধরনের উপবাসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে? পক্ষী বিশারদরা কী বলেন? বিশারদদের ব্যাপারে মিসির আলির এক ধরনের এ্যালার্জি আছে। বিশেষজ্ঞদের কিছু জিজ্ঞেস করলেই তাঁরা এমন ভঙ্গিতে তাকান যেন প্রশ্নকর্তার অজ্ঞতায় খুব বিরক্ত হচ্ছেন। প্রশ্ন পুরোপুরি না শুনেই জবাব দিতে শুরু করেন। সেই জবাব বেদবাক্যের মতো গ্রহণ করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের জবাবের ওপর প্রশ্ন করা যাবে না। বিনয় নামক সদ্‌গুণটি বিশেষজ্ঞদের নেই। দীর্ঘদিন পড়াশোনা করে তাঁরা যা শেখেন তার চেয়ে অনেক বেশি শেখেন—অহংকার প্রকাশের কায়দাকানুন। পাখির ব্যাপারটাই ধরা যাক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের একজন অধ্যাপকের কাছে গিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক সমস্যা পুরোপুরি না শুনেই বললেন, এটা কোনো ব্যাঁপার না। খিদে নেই তাই খাচ্ছে না, পশু ও প্রাণিজগতের নিয়ম হল খিদেয় খাদ্য গ্রহণ করা। একমাত্র মানুষই খিদে না থাকলেও লোভে পড়ে খায়।

মিসির আলি বললেন, প্রতিদিন একটা পাখির খিদে থাকবে না, অন্য একটার থাকবে—এটা কি যুক্তিযুক্ত?

'একটা বিশেষ পাখিই যে খাচ্ছে না তাইবা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন? সব পাখি দেখতে এক রকম। একদিন একটা খাচ্ছে, অন্যদিন আরেকটা খাচ্ছে।'

'আমি পাখি দুটাকে চিনি। খুব ভালো করে চিনি। অসংখ্য চড়ুই পাখির মধ্যেও আমি এদের আলাদা করতে পারব।'

অধ্যাপক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ গা দুলিয়ে হাসলেন। তারপর ছোট শিশুকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বললেন—একটা মশা আপনার গায়ে কামড় দিল, তারপর সেটা উড়ে গিয়ে অন্য মশাদের সঙ্গে মিশল। আপনি কি সেই মশাটা আলাদা করতে পারবেন?

'না।'

'যদি না পারেন তা হলে চড়ুই পাখিও আলাদা করতে পারবেন না। পুরুষ চড়ুই এবং মেয়ে চড়ুই দেখতে এক রকম। ভাই, এখন আপনি যান। এগারোটার সময় আমার ক্লাস, আমি কিছুক্ষণ পড়াশোনা করব।'

ভদ্রলোক মিসির আলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডিকশনারি সাইজের এক বই খুলে পড়তে শুরু করলেন। ভাবটা এরকম যে আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় তাঁর নেই। দেখা যাচ্ছে, সবাই ব্যস্ত। সবারই সময়ের টানাটানি। একমাত্র তাঁরই অফুরন্ত সময়। সময় কাটানোই তার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুই করার নেই। মিসির আলির ডাক্তার তাঁকে বলেছেন—একজন মানুষের শরীরে যত ধরনের সমস্যা থাকা সম্ভব তার সবই আপনার আছে। লিভারের প্রায় পুরোটাই নষ্ট করে ফেলেছেন। অগ্ন্যাশয় থেকে সিক্রেশন হচ্ছে না। রক্তে ডাবলিউ বিসি-র পরিমাণ খুব বেশি। আপনার হার্টেরও সমস্যা আছে, ড্রপ বিট হচ্ছে। আপনাকে যা করতে হবে তা হল—দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে থাকা। বুঝতে পারছেন?

'পারছি।'

'সিগারেট ছেড়েছেন?'

'এখনো ছাড়ি নি তবে শিগগিরই ছাড়ব।'

'উপদেশ দিতে হয় বলে দিচ্ছি। মনে হয় না আপনি আমার উপদেশের প্রতি কোনো রকম গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারপরেও বলি—মন থেকে সমস্ত সমস্যা ঝেঁটিয়ে দূর করুন। যা করবেন তা হল বিশ্রাম। গান শুনবেন, পার্কে বেড়াবেন, হালকা বইপত্র পড়তে পারেন। রাত জাগা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মনে থাকবে?'

'জি থাকবে।'

'আমি জানি আপনি এর কোনোটাই করবেন না।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, আমি আপনার উপদেশ মেনে চলব। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্যে যে উপদেশ মানব তা না। শরীরটা সত্যি সত্যি সারাতে চাচ্ছি। অসুস্থতা অসহ্য বোধ হচ্ছে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনি মুখে বলছেন কিন্তু আসলে কিছুই করবেন না। কিছু কিছু মানুষ আছে অন্যের উপদেশ সহ্য করতে পারে না। আপনি সেই দলের।

ডাক্তারের কথা ভুল প্রমাণিত করে মিসির আলি ডাক্তারের উপদেশ মতোই চলছেন। রাত নটার মধ্যেই ভাত খান, দশটা বাজতেই শুয়ে পড়েন। সমস্যা হল—ঘুম আসে না। মানুষ কম্পিউটার না। নির্দিষ্ট সময়ে তাকে ঘুম পাড়ানো সম্ভব না। মিসির আলি গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন। এক এক রাতে এক এক ধরনের বিষয় নিয়ে ভাবেন। ইচ্ছে করে যে ভাবেন তা না। ভাবনাগুলোর যেন প্রাণ আছে, তারা নিজেরাই আসে। মিসির আলিকে বিরক্ত করে তারা যেন এক ধরনের আনন্দ পায়। ইদানীং তিনি চড়ুই পাখি নিয়ে ভাবেন। পাখি মানুষ চিনতে পারে কি পারে না এই তাঁর রাতের চিন্তার বিষয়। কোনো মানুষ যদি রোজ রোজ পাখিকে খাবার দেয় তা হলে সেই পাখিগুলো কি ঐ মানুষটিকে চিনে রাখবে?

রাতে ঘুমের ঠিক না থাকলেও তাঁর ঘুম ভাঙে খুব ভোরে। ঘুম ভেঙে পার্কে বেড়াতে যান। দুপুরে খাওয়ার পর দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। বিকেলে পার্কে গিয়ে বসেন। তার বসার নির্দিষ্ট বেঞ্চ আছে। পা তুলে বেঞ্চিতে বসে তিনি গাছপালার সৌন্দর্য দেখতে চেষ্টা করেন, যদিও গাছপালা তাকে কখনোই আকৃষ্ট করে না। ডাক্তার হালকা বই পড়তে বলেছে। তিনি 'হাসি হাসি হাসি' এই নামে একটা তিন শ পৃষ্ঠার বই কিনে এনেছেন। বইটিতে দু হাজার একটি 'জোক' আছে। তিনি প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পড়ে পড়ে এখন তেত্রিশ পৃষ্ঠায় এসেছেন—এখনো তাঁর হাসি আসে নি। এই বইটির দাম পড়েছে এক শ টাকা। মনে হচ্ছে এক শ টাকাই পানিতে গেছে।

আরেকটি বই ফুটপাত থেকে কিনেছেন দু টাকা দিয়ে। বইটির নাম বেহুলার বাসরঘরের ইতিহাস। এই বইটি বরং ভালো। অনেক চিন্তাভাবনা করার ব্যাপার আছে। যেমন লখিন্দরের বাবার নাম চাঁদ সদাগর। চাঁদ সদাগর সম্পর্কে বলা হচ্ছে—

কালীদহে পড়ে চাঁদ পান করে জল
ক্ষণকাল যায় ভেসে ক্ষণে হয় তল।
সপ্তদিন নবম রাত্রি ভাসিল সাগরে
ইচামাছ বাসা বাঁধে দাড়ির ভিতরে...।

অর্থাৎ চাঁদ সদাগরের দাড়িতে ইচামাছ বাসা বেঁধেছে। সাগরের ইচামাছ হচ্ছে গলদা চিংড়ি। এরা কী করে দাড়ির ভেতর বাসা বাঁধবে? রূপক অর্থে বলা হচ্ছে? রূপকের চিত্রকল্প তো বাস্তব হওয়া উচিত। অবাস্তব চিত্রকল্প দিয়ে রূপক তৈরি করার মানে কী? তা ছাড়া "সপ্তদিন নবম রাত্রি ভাসিল সাগরে" বাক্যটির মানেই বা কী? সপ্তদিন সাগরে ভাসলে সপ্তরাতও ভাসতে হবে। অবিশ্যি শুরুতে এক রাত ভেসেছে এবং শেষে এক রাত ভেসেছে এই ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তাতেও শেষ রক্ষা হয় না, কারণ চাঁদ সদাগরের নৌকাডুবি রাতে হয় নি। হয়েছে দিনে।

মিসির আলি পার্কে তাঁর নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে বসে আছেন। তাঁর পাশে দুটি বই। একটি হল বেহুলার বাসরঘরের ইতিহাস, অন্যটি—The Birds, Their habits. তিনি বই পড়ছেন না। বেশ আগ্রহ নিয়ে খেলা দেখছেন। বাচ্চারা ফুটবল খেলছে। ফুটবল খেলার মতো ফাঁকা জায়গা এই পার্কে নেই। চারদিকে গাছগাছালি। এর মধ্যেই বাচ্চারা

খেলছে। কে কোন দলে খেলছে এটা বের করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলেরাও যার যেদিকে ইচ্ছা বলে কিক বসাচ্ছে। নির্ধারিত কোনো গোলপোস্ট আছে বলেও মনে হচ্ছে না। গোলকিপার যে দুটি গোলপোস্টের মাঝখানে দাঁড়াচ্ছে সেটাই গোলপোস্ট। বলের সঙ্গে সঙ্গে গোলপোস্টের স্থান বদল হচ্ছে।

'স্লামালিকুম স্যার।'

মিসির আলি না তাকিয়েই বললেন,ওয়ালাইকুম সালাম।

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি স্যার?'

'এখন বলতে পারেন না। এখন আমি খেলা দেখছি।'

'স্যার, আমি বসি না হয়।'

'বসুন।'

অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলল। কে জিতল কে হারল কিছু বোঝা গেল না। মনে হচ্ছে দু দলই জিতেছে। এও এক অসাধারণ ঘটনা। একসঙ্গে দুটি দলকে জিততে প্রায় কখনোই দেখা যায় না।

'স্যার, আমি অনেকক্ষণ বসে আছি।'

মিসির আলি তাকালেন। তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হল। মানুষের সঙ্গ তাঁর কাছে কখনোই বিরক্তিকর ছিল না। অতি সাধারণ যে মানুষ তার চরিত্রেও অবাক হয়ে লক্ষ করার মতো কিছু ব্যাপার থাকে। কিন্তু ইদানীং মানুষ তাঁর কাছে অসহ্য বোধ হচ্ছে। বরং চড়ুই পাখির ব্যাপার তাকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করছে। তাঁর পাশে বসে থাকা চশমা পরা মানুষটি মাঝে মাঝেই তাঁকে বিরক্ত করছে। তাকে এই পার্কেই দেখা যায়। সবদিন না, কয়েকদিন পরপর। এই লোক তাঁকে একটা গল্প বলতে চায়। তাও প্রেমের গল্প। পার্কে বসে প্রেমের গল্প শোনার মতো ধৈর্য এবং ইচ্ছা কোনোটাই তাঁর নেই। এ লোককে সে কথা অনেকবারই বলা হয়েছে। মিসির আলি ঠিক করলেন, আজ আরেক বার বলবেন। প্রথমে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবেন—তারপর কঠিন এবং রূঢ়ভাবে বলবেন।

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ, এখন বলুন কেমন আছেন?

কঠিন কথা বলার আগে সহজভাবে শুরু করা। বুদ্ধিমান লোক হলে বুঝে ফেলা উচিত যে প্রস্তাবনা মূল বইয়ের মতো নয়।

'জি স্যার, ভালো আছি।'

'গল্প শোনাতে চাচ্ছেন তো? কিছু মনে করবেন না। গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না।'

'আপনার চড়ুই পাখি দুটি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম।'

'চড়ুই পাখি?'

'জি স্যার, পরশুদিন আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি বলেছিলেন, আপনি আমার কোনো কথা শুনতে পারবেন না। চড়ুই পাখি নিয়ে ব্যস্ত। পাখি দুটি কি ভালো আছে?'

'হ্যাঁ, ভালো আছে।'

'এখনো কি পুরুষ পাখিটা খাচ্ছে এবং মেয়ে পাখি দূরে বসে দেখছে?'

'হ্যাঁ।'

'স্যার, আমি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেছি। আমার মনে হয় পাখি দুটাকে যদি আমরা খাঁচায় আটকে ফেলতে পারি তা হলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা কী? খাঁচায় চাল

দেওয়া থাকবে—ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা মনিটর করা হবে। যদি দেখা যায় খাঁচার ভেতরও মেয়ে পাখিটা কিছুই খাচ্ছে না—তখন বুঝতে হবে...'

মিসির আলি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'খাঁচায় এদের ঢোকাব কী করে?'

'খাঁচায় ঢোকানো সমস্যা হবে না, স্যার। চাল খাইয়ে খাইয়ে আপনি এদের অভ্যস্ত করে রেখেছেন— খাঁচার দরজা খুলে আপনি যদি এর ভেতর চাল দিয়ে দেন—পাখি দুটা খাঁচায় ঢুকবে।'

মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে বললেন, খাঁচা কোথায় পাওয়া যায়?

'নীলক্ষেতে ইউনিভার্সিটি মার্কেট নামে একটা নতুন মার্কেট হয়েছে। রঙিন মাছ, পাখি, পাখির খাঁচার অসংখ্য দোকান।'

'খাঁচার কী রকম দাম?'

'আপনি যদি বেয়াদবি না নেন—আমি আপনার জন্যে বড় একটা খাঁচা কিনেছি। আপনার বাসায় যে কাজের ছেলেটি আছে তাকে দিয়ে এসেছি।'

'কেন করলেন?'

'আপনার ভেতর কৌতূহল জাগানোর জন্যে করেছি। আমি বেশ কিছুদিন ধরে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি। আপনি কোনোরকম আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এমনকি আমার নাম পর্যন্ত জানতে চাচ্ছেন না। আমার ধারণা হয়েছে খাঁচাটা পেলে হয়তোবা আপনি কৌতূহলী হবেন। আমার নাম জানতে চাইবেন।'

'আপনার নাম কী?'

'আমার ডাকনাম তন্ময়। ভালো নাম মুশফেকুর রহমান।'

'আপনি আমার কাছে কী চান?'

'আমি আপনাকে একটা গল্প বলতে চাই।'

'প্রেমের গল্প?'

'প্রেমের গল্প বলা যেতে পারে।'

মিসির আলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয়—আমি প্রেমের গল্প শোনার ব্যাপারে খুব আগ্রহী?

'হ্যাঁ, মনে হয়। আমার মনে হয় গল্প শুরু করলে আপনি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতে শুরু করবেন। আমার দরকার অসম্ভব মনোযোগী একজন শ্রোতা। যে গল্প শুনে যাবে। একটি প্রশ্নও করবে না। গল্প শুনে হাসবে না, ব্যথিত হবে না।'

'এমন শ্রোতা তো প্রচুর আছে। এই পার্কেই আছে।'

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি। আপনি বলতে চাচ্ছেন—এই পার্কে প্রচুর গাছ আছে। গাছগুলো আমার গল্পের মনোযোগী শ্রোতা হতে পারে। আপনি কি তাই বোঝাতে চাচ্ছেন না?'

'হ্যাঁ।'

'গাছকে আমি আমার গল্প শুনিয়েছি। গাছরা আমার গল্প মন দিয়ে শুনেছে এবং গল্পের মাঝখানে প্রশ্ন করে আমাকে বিরক্ত করে নি। কিন্তু ওরা আমার গল্প বুঝতে পেরেছে কি না তা আমি জানতে পারছি না।'

'আপনার গল্প বোঝা কি গাছদের জন্যে জরুরি?'

'গাছের জন্যে জরুরি নয়। আমার জন্যে জরুরি। খুবই জরুরি।'

'প্রেমের গল্পটি কি দীর্ঘ?'

'গল্প বেশ দীর্ঘ। তবে গল্পের মূল লাইনটি যাকে বটম লাইন বলা হয় তা ছোট। স্যার, বটম লাইনটি বলব?'

'বলুন।'

'আমি আপনাদের মনোবিদ্যার ভাষায় একজন সাইকোপ্যাথ। আমি এ পর্যন্ত দুটি খুন করেছি। খুব ঠাণ্ডা মাথায় করেছি। খুব ভেবেচিন্তে করা। এই খুন দুটি করার জন্যে আমার মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। আমি তৃতীয় খুনটির প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছি। প্রস্তুতিপর্ব আপনাকে বলতে চাচ্ছি। প্রস্তুতিপর্বে প্রেমের ব্যাপার আছে। এই জন্যেই বলছি প্রেমের গল্প।'

'দুটি খুন করেছেন। তৃতীয়টি করবেন। করে ফেলুন। আমাকে বলার দরকার কী? আমার অনুমতি নেওয়ার ব্যাপার তো নেই।'

'স্যার, আপনি কি আমার গল্প বিশ্বাস করেছেন?'

'হ্যাঁ করেছি।'

'আমি তো আপনাকে একটা ভয়াবহ কথা বললাম। আপনি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করলেন?'

'হ্যাঁ করলাম।'

'কেন করেছেন?'

'আমি মানুষকে কখনোই অবিশ্বাস করি না। তা ছাড়া একজন মানুষ অকারণে কেন আমাকে এসে বলবে আমি দুটা খুন করেছি, তৃতীয়টি করব? এখন বলুন কেমন লাগে মানুষ খুন করতে?'

'ভালো লাগে স্যার।'

লোকটি হেসে ফেলল। সুন্দর হাসি। কিন্তু মিসির আলি শিউরে উঠলেন। লোকটির জিহ্বা কুচকুচে কালো। সে যখন হেসে উঠল মিসির আলি ব্যাপারটা তখনই লক্ষ্য করলেন।

লোকটি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি আপনার ভেতর কৌতূহল জাগ্রত করতে পেরেছি। কাজেই আমি জানি আপনি এখন আমার কথা শুনবেন। আর স্যার, আপনি আমার জিহ্বা দেখে যেভাবে চমকে উঠেছেন সেভাবে চমকে ওঠার কিছু নেই। খুব ছোটবেলায় আমার অসুখ হয়েছিল। কালাজ্বর। ব্রহ্মচারী ইনজেকশন নিতে হয়েছে। সেইসঙ্গে আয়ুর্বেদি এক ওষুধ খেয়ে জিহ্বা পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। স্যার যাই। খুব শিগগিরই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। ও ভালো কথা, স্যার এই বইটিও আমি আপনার জন্যে এনেছি। অস্ট্রেলিয়ান পাখিদের ওপর একটা বই। পাখিদের সম্পর্কে কিছু তথ্য এই বইটিতে পেতে পারেন।

'আপনার ভালো নাম কী যেন বললেন? মুশফেকুর রহমান?'

'জি।'

'আপনার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হবে? আপনার ঠিকানা কী?'

'আমাকে আপনার খুঁজে বের করতে হবে না, স্যার। আমিই আপনাকে খুঁজে বের করব।'

২

মিসির আলির কাজের ছেলেটির নাম বদু। বয়স পনের–ষোল। বামন ধাঁচ আছে, লম্বা হচ্ছে না। ছেলেটা বোকা ধরনের, তবে অত্যন্ত অনুগত। রাতে মিসির আলির বাড়ি ফিরতে দেরি হলে চিন্তিত মুখে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুদিন পরপর 'এত কম বেতনে কাম করমু না' বলে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। মিসির আলি তাকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করছেন। গত তিন মাসে সে 'অ' 'আ' এবং 'ই' পর্যন্ত শিখেছে। তাও ভালোমতো শিখতে পারে নি। অ এবং আ-তে গণ্ডগোল হচ্ছে। কোনটা অ, কোনটা আ, এখনো ধরতে পারে না। তার পরেও পড়ালেখার কাজটি সে খুব আগ্রহ নিয়ে করে।

মিসির আলি ঘরে ঢুকে দেখলেন বদু পড়ছে। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়ছে। বই স্লেট পেনসিল চারদিকে ছড়ানো। মিসির আলি বললেন, কেউ কি পাখির খাঁচা দিয়ে গেছে?

বদু বলল, হ। সুন্দরমতো একটা লোক আইছিল।

'লোকটা কী বলল?'

বলছে, "বদু, খাঁচাটা রাখো। স্যার এলে তাঁর হাতে দিও। আর এই নাও একটা চিঠি।"

বদু কথাগুলো হুবহু বলে গেল। মিসির আলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বদু মুশফেকুর রহমানের কথাগুলো যন্ত্রের মতো বলে যাচ্ছে। স্মৃতিশক্তির কোনো সমস্যা এখানে হচ্ছে না অথচ সামান্য আ অ, তার মনে থাকছে না। এর কারণটা কী?

'তোকে বলল, বদু ! খাঁচাটা রাখো?'

'জে বলছে।'

'তোর নাম জানল কীভাবে?'

'তা ক্যামনে কব। হে তো আমারে বলে নাই।'

'তুই অবাক হোস নি। অপরিচিত একটা লোক তোর নাম ধরে ডাকছে।'

'জে না, অবাক হব ক্যান? তার ইচ্ছা হইছে ডাকছে। নাম ধইরা ডাকলে দোষের কিছু নাই।'

মিসির আলি ঘরে ঢুকে খাঁচা দেখলেন। বেশ বড় লোহার খাঁচা। সাদা রঙ করা হয়েছে। রঙ এখনো শুকায় নি। হাতে লেগে যাচ্ছে। খামে ভরা নোটটাও তিনি পড়লেন—আপনার পক্ষীবিষয়ক গবেষণার সাফল্য কামনা করছি। বল পয়েন্টের লেখা নয়—কলমের লেখা। দামি কলম নিশ্চয়ই। মসৃণ লেখা। যে কাগজে লেখা হয়েছে সে কাগজও দামি, কোনো প্যাড থেকে ছেঁড়া হয়েছে। ক্রিম কালারের প্যাড। প্যাডের পাতা থেকে হালকা গন্ধ আসছে। মিসির আলিকে সবচেয়ে মুগ্ধ করল হাতের লেখা। অনেকদিন তিনি এত সুন্দর হাতের লেখা দেখেন নি। অক্ষরগুলো আলাদা আলাদাভাবে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

'বদু!'

'জে।'

'লোকটা কি খাঁচা দিয়েই চলে গেল, না কিছুক্ষণ ছিল?'

'কিছুক্ষণ ছেল—গল্পসল্প করল।'

'কী গল্প করল?'

'আমার বড়ি কই, কতদিন আপনের সঙ্গে আছি এই হাবিজাবি। আমিও দুই-চাইরটা হাবিজাবি কথা বললাম।'

'হাবিজাবি কথা কী বললে?'

'যেমন ধরেন লেহাপড়া কিছু মনে থাকে না। কোনটা স্বরে অ কোনটা স্বরে আ খালি গোলমাল হয়। তখন লোকটা একটা নিয়ম শিখাইয়া দিল। বলছে, এই নিয়মে পড়লে মনে থাকবে।'

'নিয়মটা কী?'

'স্বরে অ হইল হাতের মুঠি বন্ধ। স্বরে অ বলনের সময় হাতের মুঠি বন্ধ করণ লাগব। স্বরে আ হইল মুঠি খোলা। নিয়মটা ভালো—অখন আর ভুল হয় না।'

'লোকটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু দেখেছিস বদু?'

'জে না।'

'ভালো করে মনে করে দেখ। লোকটা কথা বলার সময় হেসেছে?'

'জে হাসছে।'

'হাসি দেখে অদ্ভুত কিছু মনে হয়েছে?'

'জে না।'

মিসির আলি হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় উঠলেন। মুশফেকুর রহমানের দেওয়া পাখিবিষয়ক বইটির পাতা উল্টালেন। নতুন বই। খুব সম্ভব আজই কেনা হয়েছে। বইয়ের দাম পঁচাত্তর পাউন্ড। বইটির প্রথম পাতায় ঠিক আগের মতো লেখা—"আপনার পক্ষীবিষয়ক গবেষণার সাফল্য কামনা করছি।" মিসির আলি আবারো মনে মনে বললেন, কী সুন্দর হাতের লেখা! তিনি সত্যি সত্যি লেখাগুলোর ওপর দিয়ে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে গেলেন।

লোকটি সম্পর্কে মিসির আলি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করলেন। বিত্তবান মানুষ—তা ধরে নেওয়া যায়। পঁচাত্তর পাউন্ড দামের বই উপহার দেওয়া, খাঁচা কিনে আনার কাজগুলো একজন বিত্তমান মানুষই করবে।

মুশফেকুর রহমান তাঁকে কৌতূহলী করবার জন্যে খাঁচা উপহার দিয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল না। একবার হাঁ করলেই মিসির আলি তার সম্পর্কে কৌতূহলী হতেন। তা করে নি। মিসির আলি যখন কৌতূহলী হয়েছেন, তখনই সে তার ভয়ংকর জিহ্বা দেখিয়েছে, তার আগে না। সে তার শরীরের এই অস্বাভাবিকতা গোপন রাখতে পারে। এই ক্ষমতা তার আছে। সে বদুর সঙ্গে অনেক গল্প করেছে। বদু তার কালো জিহ্বা দেখতে পায় নি। ইচ্ছা করলে মিসির আলির কাছেও গোপন রাখতে পারত। তা রাখে নি। তার মনে কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা কী? সে কি ভয় দেখাতে চেয়েছে, না চমকে দিতে চেয়েছে?

চমকে দেওয়ার একটা প্রবণতা লোকটির মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। পাখির খাঁচা কিনে আনায় তাই প্রমাণিত হয়। বদুকেও সে চমকে দিতে চেয়েছে তার নাম ধরে ডেকে। বদুর চমকাবার মতো বুদ্ধি নেই বলে চমকায় নি। মুশফেকুর রহমান যে অসম্ভব বুদ্ধিমান

এই ব্যাপারটিও সে জানাতে চায়। মনে রাখার একটি কৌশল সে বদুকে শিখিয়েছে। তার মূল লক্ষ্য বদু নয়, মূল লক্ষ্য মিসির আলি। যেন সে বলার চেষ্টা করছে বুদ্ধির খেলায় তুমি আমাকে হারাতে পারবে না। অসম্ভব বুদ্ধিমান মানুষ সব সময় এই ছেলেমানুষিটা করে। তাদের বুদ্ধির ছটায় অন্যকে চমকে দিতে চায়। মিসির আলি নিজেও এই কাজটি করেন—খুব সূক্ষ্মভাবে করেন। এই লোকটিও সূক্ষ্মভাবেই করছে।

সে বলল, আমি একজন সাইকোপ্যাথ। সাইকোপ্যাথ শব্দের মানে সে কি জানে? পত্রপত্রিকা এবং সিনেমার কল্যাণে শব্দটি প্রচলিত, যদিও এই শব্দের ব্যাপকতা সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানে।

সে দুটি খুনের কথা বলছে—একজন সাইকোপ্যাথ তা করবে না। উপন্যাসের সাইকোপ্যাথরা বড় গলায় সবাইকে খুনের কথা বলে। বাস্তবের চরিত্র হবে নিভৃতচারী।

লোকটির মধ্যে অনুসন্ধিৎসাও প্রবল। পাখির চাল না খাওয়ার ব্যাপারটা তাকেও বিস্মিত করেছে। সে রহস্য নিয়ে ভাবছে। কারণ পাখির বইটি সে শুধু কেনে নি, পড়েছেও। বইয়ের বিভিন্ন পাতায় পেজ মার্ক দেওয়া। বইটি পড়তে হলে তাকে অনেকখানি সময় দিতে হবে। আচ্ছা, পাখির কথা তিনি তাকে কবে বললেন? পরশু না তার আগের দিন? আচ্ছা, এই বইটিতে কি লোকটির হাতের ছাপ আছে?

মিসির আলি চিন্তিত বোধ করছেন। তাঁকে আরো ভালোভাবে ভাবতে হবে। আরো ঠাণ্ডা মাথায়। মোটেই উত্তেজিত হওয়া চলবে না। প্রথম লোকটির সঙ্গে কোথায় দেখা হল—পার্কে না রাস্তায়? প্রথম দিন কী কথা হয়েছিল? আচ্ছা, প্রথমদিন তার গায়ে কি কাপড় ছিল? মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। আজ কী কাপড় ছিল। কোট না স্যুয়েটার? কী রঙের কোট কিংবা কী রঙের স্যুয়েটার? অনেক চিন্তা করেও মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। তিনি খুবই বিস্মিত হলেন। এরকম কখনো হয় না। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ভালো। সারা জীবন তিনি তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখিয়ে অন্যদের চমৎকৃত করেছেন। নিজেও চমৎকৃত হয়েছেন। আজ পারছেন না কেন?

'বদু!'

'জি স্যার।'

'যে লোকটা এসেছিল, তার গায়ে কী ছিল? কোট?'

'খিয়াল নাই।'

'লোকটার গায়ের রঙ কী ছিল? ফর্সা না কালো?'

'খিয়াল নাই।'

মিসির আলি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন—শুধু যে বদুর খেয়াল নেই তা নয়, তাঁর নিজেরও খেয়াল নেই। এর কোনো মানে হয়? তিনি নিজের ওপর নিজে বিরক্ত হচ্ছেন।

রাতের খাবার খেলেন নিঃশব্দে। খাওয়া শেষে সিগারেট ধরালেন। সারা দিনে তিনি এখন একটাই সিগারেট খান। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে বদু এসে তার পড়া বলল। এই প্রথমবার সে স্বরে অ স্বরে আ-তে কোনো ভুল করল না। হাত মুঠিবন্ধ করে বলল, স্বরে 'অ'। মুঠি খুলে বলল স্বরে 'আ'। বদু নিজের সাফল্যের আনন্দে হেসে ফেলল। ঠিক দশটায় মিসির আলি দশ মিলিগ্রাম ফ্রিজিয়াম খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে আছে। স্নায়ুকে ঠাণ্ডা করার প্রয়োজন বোধ করলেন। ঘুম এল না। মাথার মধ্যে ঘুরতে

লাগল মুশফেকুর রহমান। লোকটার গায়ের রঙ মনে নেই কেন? কী কাপড় পরে এসেছিল তাও মনে নেই। এর কারণ কী? যুক্তি দিয়ে এই সমস্যার কাছে কি পৌঁছা যায় না? নিশ্চয়ই যায়। সেই চেষ্টাই করা যাক। একজন মানুষের দিকে যখন আমরা তাকাই তখন তার চোখের দিকেই প্রথম তাকাই। তারপর তার মুখ দেখি, মাথার চুল দেখি। এক ফাঁকে সে কী কাপড় পরে এসেছে তা দেখি। যদি আমরা তার চোখ থেকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেই তা হলে চোখ ছাড়া লোকটির আর কিছুই দেখা হয় না। চোখ থেকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার ব্যাপার কখন ঘটবে? তখনই ঘটবে যখন লোকটির চোখের তীব্র বিকর্ষণী ক্ষমতা থাকবে। চোখ কখন বিকর্ষণ করে? যখন চোখে কোনো সূক্ষ্ম অস্বাভাবিকতা থাকে।

মিসির আলি মনে মনে বললেন, মুশফেকুর রহমান নামের লোকটির চোখের অস্বাভাবিক বিকর্ষণী ক্ষমতার জন্যেই তাকে কখনো ভালোভাবে লক্ষ করা হয় নি। তাকে ভালোভাবে দেখার আগেই আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমি তার কুৎসিত কালো 'জিব' দেখেছি—কারণ সে আমাকে ইচ্ছে করে তা দেখিয়েছে।

মিসির আলি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। সম্ভবত এখন তাঁর ঘুম আসবে। হাই উঠছে। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতে তাঁর সুনিদ্রা হল। শেষরাতের দিকে পাখি নিয়ে কিছু ছাড়া ছাড়া স্বপ্ন দেখলেন। একটি স্বপ্নে চড়ুই পাখি দুটি তাঁর সঙ্গে কথা বলল। মিষ্টি রিনরিনে গলায় বলল, মিসির আলি সাহেব, শরীরের হাল অবস্থা ভালো?

তিনি বললেন, জি-না, ভালো না।

'রোজ খানিকটা পাইজং চাল খাবেন। চা চামচে এক চামচ। খালি পেটে।'

'জি আচ্ছা, খাব।'

স্বপ্নের মধ্যেই মিসির আলি নিজেকে বোঝালেন—এ জাতীয় স্বপ্ন দেখার পেছনে যুক্তি আছে। তিনি ক্রমাগত পাখি নিয়ে ভাবছেন বলেই এরকম দেখছেন। এ জগতে যুক্তিহীন কিছু ঘটে না। অযুক্তি হল অবিদ্যা। এ পৃথিবীতে অবিদ্যার স্থান নেই।

৩

তাঁর পাখিবিষয়ক গবেষণা বেশিদূর এগুচ্ছে না। চড়ুই পাখি দুটি খাঁচায় ঢুকছে না। মিসির আলি খাঁচাটা জানালার পাশে রেখেছেন। খাঁচার ভেতরে পিরিচ ভর্তি চাল। পাখি দুটি মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাল দেখছে তবে সাহস করে এগুচ্ছে না। তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাদের সাবধান করে দিচ্ছে। বলে দিচ্ছে এই খাঁচার ভেতর না ঢুকতে। একটি চড়ুই পাখির মস্তিষ্কের পরিমাণ কত? খুব বেশি হলে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম। মাত্র পঞ্চাশ মিলিগ্রাম মস্তিষ্ক নিয়েও সে বিপদ আঁচ করতে পারে। মানুষ কিন্তু পারে না। সিক্সথ সেন্স মানুষের ক্ষেত্রে তেমন প্রবল নয়।

সারাটা দিন মিসির আলি পাখির পেছনেই কাটালেন। পাখি দুটির আজ হয়তো কোনো কাজকর্ম নেই। এরা খাঁচার আশপাশেই রইল, অন্যদিনের মতো চলে গেল না। মিসির আলিও সময় কাটাতে লাগলেন বিছানায় আধশোয়া হয়ে। তিনি এমনভাবে

শুয়েছেন যেন প্রয়োজনে চট করে উঠে খাঁচার দরজা বন্ধ করতে পারেন। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ার ভানও করলেন। পাখি দুটি তাতে প্রতারিত হল না।

সন্ধ্যাবেলা তিনি গেলেন পার্কে। শীতের সময় সন্ধ্যাবেলা পার্কে লোকজন হাওয়া খেতে যায় না। পার্ক থাকে খালি। এই সময় হাঁটতে ভালো লাগে। সন্দেহজনক কিছু লোকজনকে অবিশ্যি দেখা যায়। তারা কুটিল চোখে বারবার তাকায়। একবার চাদর গায়ে একজন মধ্যবয়স্ক লোক তাঁর খুব কাছাকাছি এসে গম্ভীর গলায় বলেছিল—সব খবর ভালো? তিনি তৎক্ষণাৎ বলেছেন, জি ভালো। লোকটি এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গিয়েছিল। মিসির আলি পার্কে সেজেগুজে থাকা কিছু মেয়েকেও দেখেন। সাজ খুবই সামান্য—কড়া লিপস্টিক, গালে পাউডার এবং রোজ, চোখে কাজল। তারা ঘোরাফেরা করে অন্ধকারে। অন্ধকারে তাদের সাজসজ্জা কারোর চোখে পড়ার কথা না। এরা কখনো মিসির আলির কাছে আসে না। তবে তিনি এদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে এক ধরনের আগ্রহ অনুভব করেন। তিনি ঠিক করে রেখেছেন এদের কেউ যদি কখনো তাঁর কাছে আসে তিনি তাকে নিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসবেন, তার তীব্র দুঃখ ও বেদনার কথা মন দিয়ে শুনবেন। তাঁর খুব জানতে ইচ্ছা করে—এই মেয়েগুলো জীবনের চরমতম গ্লানির মুহূর্তগুলো কীভাবে গ্রহণ করেছে? এ সুযোগ এখনো তাঁর হয় নি।

পার্কে তিনি ঘণ্টাখানেক হাঁটলেন। কুড়ি মিনিটের মতো তাঁর পরিচিত প্রিয় জায়গায় পা তুলে বসে রইলেন। পার্কটার একটা বড় সমস্যা হল—গাছগাছালি খুব বেশি, আকাশ দেখা যায় না। তাঁর আজকাল খুব ঘন ঘন আকাশ দেখতে ইচ্ছা করে। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর সবারই বোধহয় এরকম হয়—বারবার আকাশের দিকে দৃষ্টি যায়।

প্রকৃতি মানুষের জিনে অনেক তথ্য ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারে না, কিংবা চায় না। তার যা বলার তা সে বলে দিয়েছে, লিখিতভাবেই বলেছে। সেই লেখা আছে 'জিনে'—ডিএনএ এবং আরএনএ অণুতে। মানুষ সেই লেখার রহস্যময়তা জানে কিন্তু লেখাটা পড়তে পারছে না। একদিন অবশ্যই পারবে।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মিসির আলির উঠতে ইচ্ছা করছে না। তিনি অপেক্ষা করছেন মুশফেকুর রহমান নামের লোকটির জন্যে। যদিও তিনি জানেন সে আজ আসবে না। কারণ মুশফেকুর রহমান জানে, মিসির আলি গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। রহস্যপ্রিয় মানুষ, নিজের রহস্য কখনো ভাঙবে না। আরো রহস্য তৈরি করবে। এই লোকটি তখনই তার কাছে আসবে—যখন মিসির আলি তার জন্যে অপেক্ষা করা বন্ধ করে দেবেন।

লোকটিকে খুঁজে বের করা কি কঠিন? মিসির আলির কাছে এই মুহূর্তে কাজটা কঠিন বলে মনে হচ্ছে না। বিত্তবান লোক হলে তার একটা টেলিফোন থাকার কথা। গাড়ি থাকার কথা। গাড়ি রেজিস্ট্রেশন কী নামে হয়েছে তা বের করা কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। গাড়ি না থাকলেও তার টিভি কিংবা রেডিও আছে। এদের জন্যেও লাইসেন্স করতে হয়। ঠিকানা আছে এমন মানুষকে খুঁজে পাওয়া কোনো সমস্যাই নয়। বের করা যায় না শুধু ঠিকানাহীন মানুষদের।

'স্লামালিকুম স্যার।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'স্যার, আমি মুশফেকুর রহমান। আপনি আজ পার্কে আসবেন ভাবি নি। আমি ভেবেছিলাম আজ আপনি পাখিদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন।'

মিসির আলি স্বাভাবিক গলায় বললেন, পাখি দুটা ধরা পড়ে নি।

'ধরা না পড়ারই কথা। খাঁচায় কাঁচা পেইন্টের গন্ধ। এই গন্ধ পাখি সহ্য করতে পারে না। আপনি কয়েকদিন খাঁচাটাকে বাইরে ফেলে রাখুন। রঙের গন্ধ দূর হোক।'

মুশফেকুর রহমান মিসির আলির পাশে বসল। মিসির আলি তাকালেন কিন্তু কিছু দেখতে পেলেন না। জায়গাটা ঘন অন্ধকার। মিসির আলি বললেন, আমি আপনার কথা শোনার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হয়ে এসেছি। শুরু করুন।

'গল্প শোনার সময় আপনি কি আমার মুখ দেখতে চান না? অনেকে আবার মুখের দিকে না তাকিয়ে গল্প শুনতে পারে না, আবার বলতেও পারে না।'

'আপনি কি বলতে পারেন?'

'তা পারি। আমি আমার গল্প অন্ধকারেই বলতে চাই। আমার গল্প অন্ধকারের গল্প। কিন্তু স্যার, আপনার কি ঠাণ্ডা লাগছে না?'

'লাগছে।'

'আমি একটা চাদর নিয়ে এসেছি। চাদর গাড়িতে রাখা আছে। আমার চাদর ব্যবহার করতে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তি নেই।'

মুশফেকুর রহমান বেঞ্চ ছেড়ে উঠে গেল। মিসির আলি লক্ষ করলেন সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। তার গায়ে চাদর। গায়ে চাদর থাকতেও সে আরেকটি চাদর নিয়ে এল কী জন্যে? তাঁর জন্যে কি এনেছে? সে কি নিশ্চিত ছিল, মিসির আলি এসে বসে থাকবেন? গল্প শুনতে চাইবেন, এবং সে গল্প শুনাবে শীতের রাতে?

তাই যদি হয় তা হলে সে শুধু চাদর আনে নি, ফ্লাস্কে করে চা এনেছে। কিছু খাবার এনেছে। মিসির আলি ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট খান। সেই সিগারেটও এক প্যাকেট এনেছে। চাদর যদি তাঁর জন্যে আনা হয় তা হলে চাদরটি হবে অব্যবহৃত, নতুন।

মুশফেকুর রহমান ফিরে এল। তার সঙ্গে ফ্লাস্ক। একটা প্যাকেটে পূর্বাণী কনফেকশনারির কিছু স্যান্ডউইচ। সে বসতে বসতে বলল, চাদরটা আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে গায়ে দিন। এটি যদিও অনেক আগে কেনা, কখনো ব্যবহার করা হয় নি। দু বছর আগে জয়পুর গিয়েছিলাম, তখন কেনা। রাত বলেই দেখতে পাচ্ছেন না, চাদরের গায়ে রেশমি সুতার কাজ করা আছে। এরা বলে জয়পুরী কাজ। চাদরটা আপনার জন্যে আমার সামান্য উপহার।

'থ্যাংক ইউ। আমার ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট কোথায়?'

মুশফেকুর রহমান হাসল। হাসতে হাসতে বলল, সিগারেটও এনেছি। দেব?

'দিন এবং গল্প শুরু করুন।'

'কোথেকে শুরু করব? প্রথম খুন কীভাবে করলাম সেখান থেকে?'

'না, নিজের কথা বলুন। আপনার ছেলেবেলার কথা।'

মুশফেকুর রহমান ফ্লাস্কে চা ঢালতে ঢালতে গল্প শুরু করল—

আমার ছেলেবেলা মোটেই মজার নয়। গল্প করে বেড়াবার কিছু নেই। সব মনেও নেই—তবু বলছি।

আমি বড় হয়েছি পুরোনো ঢাকায়। অনেকের ধারণা নেই যে, পুরোনো ঢাকায় অসম্ভব বিত্তবান বেশকিছু মানুষ থাকেন। বাইরে থেকে তাঁদের অর্থ ও বিত্তের পরিমাণ বোঝা যায় না। আমাদের একেবারেই বোঝা যেত না। জেলখানার মতো উঁচু দেয়াল দেওয়া বাড়ি। গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকলে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। ফুলের বাগানটাগান নেই। এলোমেলোভাবে কয়েকটা বড় বড় দেশী ফুলের গাছ। চাঁপা গাছ, শিউলি গাছ, বাড়ির দক্ষিণ দিকে হাসনাহেনার প্রায় জঙ্গলের মতো ঝাড়। এই গাছগুলোতে কখনো ফুল ফোটে না। মাঝে মাঝে কেটে দেওয়া হয়। আবার আপনাতেই গজায়। বাড়ির পেছনে বেশকিছু ফলের গাছ। একটা আছে কামরাঙা গাছ। এই গাছে কিছু কামরাঙা হয়। অন্যগুলোতে ফল হয় না।। একটা পাতকুয়া আছে। মেঝে বাঁধানো। কুয়ার পানি খুব পরিষ্কার তবে বিশ্রী গন্ধ বলে সেই পানি ব্যবহার করা হয় না। বাড়িটা একতলা অনেক বড়। মূল বাড়ির উত্তরে কামরাঙা গাছের কাছে চার কামরার আলাদা একটা দোতলা বাড়ি। নিচে তিন কামরা, উপরে এক কামরা। দোতলাটাকে আমরা বলতাম—উত্তর বাড়ি। দোতলার পুরোটাই বলতে গেলে বারান্দা। ছেলেবেলায় আমার উত্তর বাড়িতে যাওয়া পুরোপুরি নিষেধ ছিল। কারণ উত্তর বাড়িতে থাকতেন বাবা। তিনি বাচ্চাকাচ্চা পছন্দ করতেন না। আমার বাবা পৃথিবীর বেশিরভাগ জিনিসই অপছন্দ করতেন। হইচই অপছন্দ করতেন, বাচ্চাকাচ্চা অপছন্দ করতেন, গান অপছন্দ করতেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল গাড়ি অপছন্দ করতেন। কারণ গাড়ি স্টার্ট করলে ভটভট শব্দ হয়। যে কারণে আমাদের কোনো গাড়ি ছিল না। আমি স্কুলে যেতাম রিকশায়। আমাকে মাথা কামানো গাট্টাগোট্টা একটা লোক স্কুলে নিয়ে যেত। তার নাম ছিল সর্দার। আমি ডাকতাম সর্দার চাচা। তিনি কথায় কথায় বলতেন—এক টান দিয়া কইলজা ছিড়্যা বাইর কইরা ফেলামু। এমনভাবে বলতেন যেন তিনি কাজটা এক্ষুনি করবেন।

ধরুন, আমরা রিকশা করে যাচ্ছি। অন্য একটা রিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। আমার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তিনি চলন্ত রিকশায় উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন—এক টান দিয়া কইলজা ছিড়্যা ফেলামু।

সর্দার চাচাকে আমি খুবই পছন্দ করতাম। কিন্তু উনি আমাকে পছন্দ করতেন কি করতেন না কোনোদিন জানতে পারি নি। সর্দার চাচাকে আমার অপছন্দ করার কোনো কারণ ছিল না। পছন্দ করতাম, কারণ আমার আর কেউ ছিল না। বাবার সঙ্গে আমার কোনো রকম যোগাযোগ নেই। মা'র সঙ্গেও নেই। বাবা মাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। মা'র এই বাড়িতে আসা নিষেধ ছিল।

আমাকে লালনপালন, স্কুলে নিয়ে যাওয়া, স্কুল থেকে আনা সবই সর্দার চাচা করতেন। আমার জগৎ ছিল স্কুল এবং স্কুলের চার দেয়ালঘেরা আমাদের বাড়ি। স্কুল আমার ভালো লাগত না। বাড়িও ভালো লাগত না। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন স্কুলে যাওয়া আমার বন্ধ হয়ে গেল। কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। শুধু শুনলাম—বাবা বলে দিয়েছেন, স্কুলে যেতে হবে না। মাস্টার এসে আমাকে বাড়িতে পড়াবে। আমার স্কুলে যেতে না দেওয়ার কারণ আমি তখন যা অনুমান করেছি তা হচ্ছে—কোনো একদিন হয়তো স্কুল থেকে আমার মা আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

মিসির আলি বললেন, এখন আপনার অনুমান কী?

'আমি স্যার আমার অনুমানের কথা আপনাকে বলব না। আমি আমার অনুমানের কথা বলে আপনাকে প্রভাবিত করব না।'

'বেশ, আপনি বলতে থাকুন।'

আমার জীবন কাটতে লাগল বাড়ির পেছনে কুয়োতলায়। বাঁধানো কুয়োতলা আমি চক দিয়ে ছবি এঁকে ভরিয়ে ফেলতাম। সন্ধ্যাবেলা সর্দার চাচা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতেন—'ভালো হইছে। সৌন্দর্য হইছে।' তারপর কুয়ো থেকে বালতি বালতি পানি তুলে কুয়োতলা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতেন, যাতে পরদিন আমি ছবি আঁকতে পারি।

যে মাস্টার সাহেব আমাকে পড়াতে এলেন তাঁকে আমার পছন্দ হল। খুবই পছন্দ হল। হাসিখুশি। পড়াতেন খুব ভালো। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে গল্প করতেন।

মানুষটা খুব রোগা। অনেকখানি লম্বা। অতিরিক্ত লম্বার কারণেই বোধহয় কুঁজো হয়ে থাকতেন। চাইনিজদের মতো তাঁর থুতনিতে দাড়ি ছিল। প্রচুর সিগারেট খেতেন। সস্তা দামের সিগারেট। সিগারেটের কড়া গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে যেত। বমি আসত। যখন গল্প শুরু করতেন তখন আর কিছু মনে থাকত না। তামাকের গন্ধও পেতাম না।

'কী গল্প করতেন?'

'নানান ধরনের গল্প। চার্লস ডিকেন্সের অলিভার টুইস্টের পুরো গল্পটা তিনি আমাকে বলেন, কাঁদতে কাঁদতে আমি এই গল্প শুনি। আজ পর্যন্ত আমি কাউকে এত সুন্দর গল্প বলতে শুনি নি।

অল্প কিছুদিন স্যার আমাকে পড়ালেন। তারপর তাঁর চাকরি চলে গেল।'

'কেন?'

'আপনাকে পরে বলব। ব্যাখ্যা করে বলব। স্যারের প্রসঙ্গ এখন থাক। যে কথা বলছিলাম—উনার চাকরি চলে গেলেও উনি কিন্তু প্রায়ই আসতেন। চুপিচুপি আসতেন, বেছে বেছে এমন সময় আসতেন যখন বাবা থাকতেন না। গলা নিচু করে বলতেন, তোমাকে দেখতে আসলাম। ভালো আছ? তোমার বাবা বাসায় নাই তো? আমি যদি বলতাম, না। তিনি অসম্ভব আনন্দিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সিগারেট ধরাতেন।

একদিন ঠিক দুপুর বেলায় এসে গলা নিচু করে বললেন, তন্ময়, বাবা একটা কথা শোন—তোমার মা তোমাকে একটু দেখতে চায়। শুধু একপলক দেখবে। তোমার মা'র খুব শরীর খারাপ। হয়তো বাঁচবে না। তোমাকে খুব দেখার ইচ্ছা। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে? দুপুর বেলা তো তোমার বাবা বাসায় বেশিক্ষণ থাকেন না। তখন নিয়ে যাব। দেখা করিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। যাবে? এই দেখ, তোমার মা একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন। চিঠিটা পড়।

আমি চিঠিটা না পড়েই তৎক্ষণাৎ বললাম, হ্যাঁ।

তিনি চিন্তিত গলায় বললেন, কাউকে কিছু বলবে না। কাউকে কিছু বললে তোমাকে নিতে দেবে না।

'আমি কাউকে কিছু বলব না।'

'আমি তোমাকে নিতে আসব না—বুঝলে? তুমি করবে কি—দুপুর বেলায় সুযোগ বুঝে গেট দিয়ে বাইরে চলে আসবে। এক দৌড়ে সদর রাস্তায় চলে আসবে। একটা

বেবিট্যাক্সি স্ট্যান্ড আছে না—ঐখানে আমি থাকব। তুমি আসামাত্র তোমাকে নিয়ে চলে যাব। আসতে পারবে না?'

'পারব।'

'দেখো, কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। জানতে পারলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তোমার বাবা আমাকে ক্ষমা করবেন না। উনি সেই মানুষই না। আমি একজন দরিদ্র মানুষ...।'

'আমি যাব।'

'কবে আসবে?'

'আপনি বলুন।'

'আগামীকাল পারবে?'

'হুঁ পারব।'

উনাকে খুব চিন্তিত মনে হলেও আমি মোটেই চিন্তিত হলাম না। আমার মনে হল—কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই আমি চলে আসব। তা ছাড়া শীতের দুপুরে সর্দার চাচা পাকা বারান্দায় পাটি পেতে রোদে ঘুমায়। বাবা বাসায় থাকেন না। তিনি ফেরেন সন্ধ্যায়। গেটে যে থাকে সেও ঝিমুতে থাকে। এক ফাঁকে ঘর থেকে চলে গেলেই হল।

তাই করলাম। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি বেবিট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে মাস্টার সাহেব শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে সিগারেট। তাঁকে দেখে দারুণ চিন্তিত মনে হল। ভীত চোখে চারদিকে তাকাচ্ছেন। আমাকে দেখে তাঁর উৎকণ্ঠা আরো বাড়ল। তিনি বললেন, কেউ দেখে নি তো?

আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, চল একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে নি।

উনি যখন বেবিট্যাক্সি দরদাম করছেন তখনই সর্দার চাচা উপস্থিত হলেন। আমাদের দুজনকেই বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাবা আসলেন সন্ধ্যাবেলা। তিনি আমাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু স্যারের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। সেই শাস্তি ভয়াবহ শাস্তি। একতলার দারোয়ানের ঘরে দরজা বন্ধ করে মার। সেই ঘরের ভেতর আমিও আছি। বাবা চাচ্ছিলেন যেন শাস্তির ব্যাপারটা আমিও দেখি।

স্যারকে মারছিল সর্দার চাচা। আমি একটা খাটের উপর দাঁড়িয়ে সেই ভয়ংকর দৃশ্য থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দেখছি। স্যার একসময় রক্তবমি করতে লাগলেন এবং একসময় কাতর গলায় বললেন, আমারে জানে মারবেন না। আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে।

সর্দার চাচা হিসহিস করে বললেন,—চুপ। শব্দ করলে কইলজা টান দিয়া বাইর কইরা ফেলামু। চুপ।

এরপর কী হল আমার মনে নেই। কারণ, আমার জ্ঞান ছিল না। আমি অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে যাই। জ্ঞান হলে দেখি আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। সর্দার চাচা আমার মাথায় পানি ঢালছেন।

আমি বললাম, উনি কি মারা গেছেন?

সর্দার চাচা বললেন, আরে দূর বোকা! মানুষ অত সহজে মরে না। মানুষ মারা বড়ই কঠিন। তারে রিকশায় তুল্যা বাসায় পাঠায়ে দিছি।

'রক্তবমি করছিল?'

'পেটে আলসার থাকলে অল্প মাইর দিলেই নাকে–মুখে রক্ত ছোটে। ও কিছু না।'

'উনি তা হলে মরেন নাই?

'না না। আইচ্ছা ঠিক আছে—তোমারে একদিন তাঁর বাসায় নিয়া যাব নে।'

'আমি উনার বাসায় যাব না।'

'এইটাই ভালো। কী দরকার?'

সর্দার চাচা আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিল। স্যারকে ঐরাতে ভয়ংকরভাবে মারা হয়েছিল। অচেতন অবস্থায় তাঁকে গভীর রাতে বাহাদুর শাহ পার্কে ফেলে আসা হয়। সেখান থেকে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যু হয় হাসপাতালে। মৃত্যুর আগে তাঁর জ্ঞান ফেরে নি। কাজেই তিনি মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলে যেতে পারেন নি।

মুশফেকুর রহমান চুপ করল। হাই তুলতে তুলতে বলল, আজ এই পর্যন্ত থাক। ঠাণ্ডা বেশি লাগছে। মিসির আলি বললেন, আপনার স্যারের নাম কী?

'উনার নাম জানি না। খুব অল্পদিন পড়িয়েছিলেন। নাম জানা হয় নি। উনি ছিলেন একজন পেশাদার প্রাইভেট টিউটর। ছাত্র পড়ানো ছাড়া আর কিছু করতেন না।'

'উনি আপনাকে কতদিন পড়িয়েছিলেন?'

'সপ্তাহ দুই। কিংবা তার চেয়েও কম। আমার শৈশবের ঘটনা আপনার কাছে কেমন লাগল?'

'মোটামুটি লেগেছে। সাজানো গল্প। যত সুন্দরই হোক সাজানো গল্প ভালো লাগে না।'

মুশফেকুর রহমান তীক্ষ্ণ গলায় বলল, সাজানো বলছেন কেন?

'গল্পটা সাজানো মনে করার পেছনে আমার অনেকগুলো কারণ মনে আসছে। যে ভদ্রলোক মাত্র দু সপ্তাহ আপনাকে পড়িয়েছেন তিনি এই সময়ের ভেতর আপনাকে গোপনে নিয়ে আপনার মা'র সঙ্গে দেখা করিয়ে আনার মতো দুঃসাহসিক পরিকল্পনা হাতে নেবেন তা বিশ্বাস্য নয়। আমার মনে হয়, ঘটনাটা এরকম—আপনি বাড়ি থেকে পালাচ্ছিলেন। যখন আপনার সর্দার চাচা আপনাকে ধরল তখন শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্যে মাস্টার সাহেবকে জড়িয়ে গল্পটা তৈরি করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় হয়তো মাস্টার সাহেব সামনে পড়ে গেছেন। যে কারণে আপনাকে আপনার বাবা কোনো শাস্তি দেন নি। আপনার সর্দার চাচা ঐ নিরীহ মানুষটিকে এমন ভয়ংকর শাস্তি কেন দিল তাও পরিষ্কার হচ্ছে না। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত একটি শিশুকে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া কোনো অপরাধ নয়। আর অপরাধ ধরা হলেও মৃত্যুদণ্ড তার শাস্তি হতে পারে না।

মুশফেকুর রহমান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আমার গল্প আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না?

'না। কারণ গল্পে ফাঁক আছে।'

'সুদূর শৈশবের গল্প বলছি। ফাঁক থাকাই তো স্বাভাবিক।'

'ফাঁকগুলো অনেক বড়।'

মুশফেকুর রহমান বলল, 'স্যার, শুরুতেই আপনি আমাকে একজন ভয়ংকর মানুষ ধরে নিয়েছেন। আমার কারণেই তা করেছেন। আমি নিজেকে ভয়ংকর মানুষ হিসেবেই আপনার সামনে উপস্থিত করেছি। যে কারণে অতি সামান্য অসামঞ্জস্যও আপনার কাছে অনেক বড় লাগছে। গল্পে ফাঁক আছে বলে যে দাবি আপনি করছেন, আমি সেই ফাঁক ঠিক ধরতে পারছি না। আমি শুধু বলছি যে—যা ঘটেছে তা আপনাকে আমি বলার চেষ্টা করেছি। স্যার, আপনি একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন। আপনাকে মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন আমার নেই।'

মিসির আলি বললেন, 'আমাকে সত্য বলারও তো প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন আছে। সব ঘটনা আপনাকে ঠিকঠাকমতো জানানো দরকার।'

'আপনি ঠিকঠাকমতো বলছেন না। কী করে আপনি জানলেন যে মাস্টার সাহেবকে মেরে বাহাদুর শাহ পার্কে ফেলে আসা হয়? যদি ফেলেও আসে আপনাকে কেউ সেই তথ্য দেবে না। ক্লাস ফোরে যে ছেলেটি উঠেছে সে পরদিন খবরের কাগজ পড়ে এই তথ্য উদ্ধার করবে তা বিশ্বাস্য নয়। মাস্টার যে মারা গেছে এটিও আপনার জানার কথা না। আপনার সর্দার চাচা কি আপনার কাছে স্বীকার করেছিলেন?'

'না স্বীকার করেন নি। তবে পরদিন খুব ভীত ভঙ্গিতে আমাকে বলেছিলেন—বাড়িতে পুলিশ আসতে পারে। পুলিশ এলে আমি যেন বলি—আমি এই মাস্টারকে চিনি না।'

'পুলিশ কি এসেছিল?'

'জি এসেছিল, তবে আমার সঙ্গে পুলিশের কোনো কথা হয় নি। বাবার সঙ্গে কথা বলে তারা খুব খুশি মনে চলে যায়।'

'মাস্টার সাহেব যে বাহাদুর শাহ পার্কে পড়েছিলেন এই তথ্য কোথায় পেলেন?'

মুশফেকুর রহমান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মনে হল কথাটা বলবেন কি বলবেন না তা ঠিক করতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত বলে ফেললেন—

'এই তথ্য আমি মাস্টার সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছি।'

'তার মানে?'

'যে মাস্টার সাহেবের কথা আপনাকে বললাম, উনি তাঁর মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে বাস করছেন।'

'কী বললেন?'

'ঐ মৃত ব্যক্তি গত একুশ বছর ধরে আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাদের বাড়িতে বাস করেন। আমি জানি ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য। হাস্যকর। এটা যে বিংশ শতাব্দী তাও আমি জানি। মানুষ চাঁদে নেমেছে, চাঁদের মাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ আছে এটি যেমন সত্যি—আমার স্যার আমাদের বাড়িতে বাস করছেন এটিও তেমনি সত্য। আমি চাই আমার ঐ স্যারের সঙ্গে আপনার দেখা হোক, কথা হোক। তিনি আপনার মতোই বুদ্ধিমান। কিংবা কে জানে আপনার চেয়েও হয়তো বুদ্ধিমান। তাঁকে আপনার পছন্দ হবে।'

'উনি আমাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ চেনেন। আমি যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি তা তিনি জানেন। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী।'

'যে দুজন খুন হয়েছে, তারা কারা?'

'একজন সর্দার চাচা। অন্যজন আমার বাবা।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। মুশফেকুর রহমান বলল, আপনি কি আমার স্যারের সঙ্গে কথা বলবেন?

'না।'

'না কেন?'

একজন এসে আমাকে বলবে—তার বাড়িতে একটি প্রেতাত্মা বাস করছে, সেই প্রেতাত্মা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়—আর ওমনি আমি কথা বলার জন্যে রওনা হব—তা হয় না। আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ, মানসিকভাবে অসুস্থ নই।'

'আপনি কি কোনো কৌতূহল বোধ করছেন না?'

'প্রেতাত্মা বিষয়ে কোনো কৌতূহল বোধ করছি না। তবে আপনার ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করছি। আমার মনে হচ্ছে আপনি খুবই অসুস্থ একজন মানুষ। আপনার মার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। উনি কি জীবিত আছেন?'

'জি, জীবিত আছেন। আমি জানতাম আপনি আমার মার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। আমি উনার ঠিকানা লিখে এনেছি। এই কাগজে লেখা আছে।'

মিসির আলি যন্ত্রের মতো ঠিকানা লেখা কাগজ হাতে নিলেন।

৪

ভদ্রমহিলার নাম মোমেনা খাতুন।

১৮/২ তল্লাবাগে তাঁর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে থাকেন। টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে। মিসির আলি অনেকবার টেলিফোন করলেন। রিং হয় কিন্তু কেউ ধরে না। সেট হয়তো নষ্ট হয়ে আছে। নম্বর খুঁজে বাড়ি বের করার কাজটা তিনি একেবারেই পারেন না। তিনি জানেন তল্লাবাগে উপস্থিত হয়ে যদি বলেন, ১৮/২ বাড়িটা কোথায়, তা হলেও কোনো লাভ হবে না। যাকে জিজ্ঞেস করা হবে সে এমনভাবে তাকাবে যে এই নাম্বার শুনে সে বড়ই চমৎকৃত বোধ করছে। এমন অদ্ভুত নাম্বার কোত্থেকে এসেছে বুঝতে পারছে না। আরেক দল আছে যারা নাম্বার শুনে বলবে—ও আচ্ছা, আঠার বাই দুই। নাক বরাবর যান, তারপর লেফটে যাবেন। কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলবে। এরা সবজান্তার কাজটা করে কিছু না জেনে। অন্যকে বোকা বানিয়ে আনন্দ পেতে চায়।

এলাকার বাড়িঘরের নম্বর সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। যারা থ্রি-ফোরে পড়ে। মানুষের মতো বাড়ির নাম্বার আছে—এই বিষয়টি তাদের হয়তো আলোড়িত করে। তারা মনে রাখার চেষ্টা করে। বাড়ির নাম্বার নিয়ে বিব্রত মানুষকে সত্যিকার অর্থেই এরা সাহায্য করতে চায়।

এদের একজনের সাহায্য নিয়েই মিসির আলি ১৮/২ তল্লাবাগ খুঁজে বের করলেন। সরু রাস্তার উপর বিরাট বাড়ি। বাড়ির বিশেষত্ব হচ্ছে সবই বড় বড়। ড্রয়িংরুমে বিশাল আকৃতির সোফা। দেয়ালে কাবা শরিফের প্রকাণ্ড বাঁধাই ছবি। একটি টিভি আছে—একে কত ইঞ্চি টিভি বলে কে জানে। সিনেমার পর্দার মতো বড় স্ক্রিন। শুধু বাড়ির দরজা-

জানালা ছোট ছোট। প্রথম দর্শনেই মিসির আলির মনে হল—সোফা, টিভি এগুলো এ বাড়িতে ঢোকাল কীভাবে?

ড্রয়িংরুমে বেশকিছু লোক। গাদাগাদি করে সোফায় বসে আছে। বাড়িতে কোনো উৎসব হয়তো। সবাই সেজেগুজে আছে। অল্পবয়সী বালিকারাও ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে গালে রোজ মেখে সেজেছে। সবাইকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

মিসির আলির মনে হল মোমেনা খাতুন নামের এই বৃদ্ধা মহিলার প্রতি কারো কোনো কৌতূহল নেই। আগ্রহও নেই। একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শুনেও কেউ কোনো গা করছে না। মধ্যবয়স্ক এক লোক বিরস মুখে বললেন, বসুন দেখছি।

বলেই তিনি কর্ডলেস টেলিফোনে কাকে যেন ধমকাতে লাগলেন। লোকটার পরনে হালকা কমলা রঙের স্যুট। গলায় ছোট ছোট ফুল আঁকা টাই—তবে তাঁর প্যান্টের জিপার খোলা। সবাই তা দেখছে, কেউ কিছু বলছে না। মনে হয় বলার সাহস পাচ্ছে না।

মিসির আলি সোফায় বসে রইলেন একা একা। আঠার–উনিশ বছরের একটা মেয়ে ঝড়ের গতিতে বসার ঘরে ঢুকে মিসির আলিকে বলল—আপনি কি কার রেন্টাল থেকে এসেছেন? এত দেরি যে? বলেই জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে ভেতরে চলে গেল। উঁচু গলায় বলল, বাস চলে এসেছে মা।

বোঝা যাচ্ছে এরা দল বেঁধে কোথাও যাচ্ছে। পিকনিক হবার সম্ভাবনা। শীতকালের শুক্রবারে পিকনিক লেগেই থাকে। পিকনিক হলে মোমেনা খাতুনের দলটির সঙ্গে যাবার কথা। ইচ্ছা না থাকলেও বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের পিকনিকে নিয়ে যেতে হয়। বৃদ্ধ–বৃদ্ধারাও জীবনের শেষ দিকে এসে পিকনিক জাতীয় ব্যাপারে খুব আগ্রহী হয়ে পড়েন।

টেলিফোন হাতে ভদ্রলোক কথা বলেই যাচ্ছেন, বলেই যাচ্ছেন এবং একটি কথাই ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে কিছুক্ষণ পরপর বলছেন। একসময় লাইন কেটে গেল কিংবা ওপাশের ভদ্রলোক লাইন ছেড়ে দিলেন। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে টেলিফোন সেটটার দিকে তাকাচ্ছেন। এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। মিসির আলি আবার বললেন, আমি একটু মোমেনা খাতুনের সঙ্গে কথা বলব।

'আপনাকে অপেক্ষা করতে বললাম না। ব্যস্ততাটা তো দেখতে পাচ্ছেন? নাকি পাচ্ছেন না। সবাই গায়ে–হলুদে যাচ্ছে।'

'কিছু মনে করবেন না। আপনার প্যান্টের জিপার খোলা।'

ভদ্রলোক এমনভাবে মিসির আলির দিকে তাকালেন যেন মিসির আলি নিজেই জিপার খুলেছেন। মিসির আলি বললেন, উনি আছেন তো?

'হ্যাঁ, আছেন। কিছুক্ষণ ওয়েট করুন। ভিড় কমুক, তারপর আপনাকে আন্টির কাছে নিয়ে যাব। জাস্ট দেখা দিয়ে চলে যাবেন। বেশিক্ষণ বিরক্ত করবেন না। কথা বলা পুরোপুরি নিষেধ। আন্টির আবার বেশি কথা বলার অভ্যাস। কথা বলে বলে রোগ বাড়াচ্ছেন।'

বোঝা যাচ্ছে ভদ্রমহিলা অসুস্থ। সম্ভবত হাসপাতালে ছিলেন। সম্পতি বাসায় আনা হয়েছে। অনেকেই তাঁকে দেখতে আসছে বলেই মিসির আলিকে এ বাড়ির সবাই স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে।

ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর একজন কাজের মেয়ে এসে বলল, ভিতরে আসেন, জুতা খুইল্যা আসেন।

লম্বা বারান্দা পার হয়ে মিসির আলি ছোট একটা ঘরে ঢুকলেন। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। মেঝে মনে হয় ডেটল দিয়ে ধুয়েছে। ঘরময় ডেটলের গন্ধ। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে খাট পাতা। মিসির আলি ভেবেছিলেন বৃদ্ধা এক মহিলাকে শুয়ে থাকতে দেখবেন। তা দেখলেন না। মোমেনা খাতুন একদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। তাঁর চোখে চশমা। গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। গায়ের কাপড়টিও সাদা, মাথার চুল সাদা। যে বিছানায় বসেছেন সেই বিছানার চাদরটাও সাদা। সব মিলে সুন্দর একটি ছবি।

মিসির আলি বললেন, আপনি কেমন আছেন?

ভদ্রমহিলা স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, জি ভালো।

ভদ্রমহিলার কান ঠিক আছে। কথাও জড়ানো হয়, তবে চোখের দৃষ্টির সম্ভবত কিছু সমস্যা আছে। তিনি তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে।

'আপনি অসুস্থ জানতাম না। অসুস্থ জানলে আসতাম না।'

'আমি ভালো আছি। বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তাররা বলল, কিছু হয় নাই।'

'আমি খানিকক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলব—যদি আপনার আপত্তি না থাকে। আমার পরিচয় আপনাকে দেওয়া দরকার। আমার নাম মিসির আলি। আমি...'

'আপনার পরিচয় দিতে হবে না। আমার ছেলে তার ম্যানেজারকে পাঠিয়েছিল, সে বলেছে আপনি আসবেন।'

'আপনার ছেলে আপনাকে দেখতে আসে নি।'

'না, আসে না। এর আগে একবার জরায়ুর টিউমার অপারেশন হয়েছিল—তিন মাস ছিলাম হাসপাতালে। খবর পেয়েও দেখতে এল না। মরেও যেতে পারতাম। আমি তো তার মা। বলুন আপনি—আমি তার মা না?'

'অবশ্যই আপনি মা? বেশি কথা বলা বোধহয় আপনার নিষেধ। আমি বরং এক কাজ করি—এমনভাবে প্রশ্ন করি যেন হ্যাঁ-না বলে জবাব দেওয়া যায়।'

'কথা বলা নিষেধ—এটা আপনাকে কে বলল? কোনো নিষেধ না। ডাক্তার এমন কিছু বলে নাই। এইসব কথা এই বাড়ির লোকজন বানিয়েছে—। যেই আসে তাকে বলে—কথা বলা নিষেধ। যাক, বাদ দিন। কী যেন বলছিলাম—'

'আপনি বলছিলেন—আগে একবার আপনার জরায়ুর টিউমার অপারেশন হয়েছিল—তিন মাস হাসপাতালে ছিলেন। আপনার ছেলে খবর পেয়েও আপনাকে দেখতে আসে নি। আপনি আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলেন—আপনি তার মা কিনা।'

মোমেনা খাতুন মিসির আলির কথায় হৃষ্টচিত্তে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমি তো তার মা। সন্তান পেটে ধরেছি। সেই আমাকে আমার স্বামী বাড়ি থেকে বের করে দিল। সন্ধ্যারাত্রিতে আমাকে এসে বলল—মোমেনা, বাইরে রিকশা আছে। যাও, রিকশায় ওঠ। তার রাগ বেশি। ভয়ে কিছু জিজ্ঞাস করলাম না। সেই যে রিকশায় উঠলাম—উঠলামই। ঐ বাড়িতে আর ঢুকতে পারলাম না। এখন আমি পড়ে আছি আমার ভাইয়ের বাড়িতে। আমি তো থাকতে পারতাম আমার ছেলের সঙ্গে। পারতাম না?'

'জি পারতেন।'

'তার উচিত ছিল না আমাকে তার বাড়িতে রাখা? আমি তার মা। আমি কেন অন্যের বাড়িতে থাকব?'

'জি তা তো বটেই। তন্ময়ের বাবার মৃত্যুর পর আপনি ঐ বাড়িতে গিয়ে উঠলেন না কেন?'

'কেমন করে উঠব! তখন আমার ভাইয়া জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে। লোকটা রেলে চাকরি করত। ছোট চাকরি। তবে মানুষ খারাপ ছিল না। সে মারা গেছে কাঁকড়া বিছার কামড়ে। কাঁকড়া বিছার কামড়ে মানুষ মারা যায় এমন কথা আগে কখনো শুনেছেন? শুনেন নাই। এটা হল আমার কপাল—। লোকটা রেলের গুদামঘরে ঢুকেছে। টিন না কী যেন সরাচ্ছে—এমন সময় হাতে কামড় দিল। চিৎকার দিয়ে উঠল, সাপ সাপ। সে ভেবেছিল সাপ। লোকজন দৌড়ে এসে দেখে কাঁকড়া বিছা। কেউ কোনো গুরুত্ব দিল না। কামড়ের জায়গায় চুন মাখিয়ে দিল। রাতে লোকটার জ্বর আসল। খুব জ্বর। আমাকে ডেকে তুলে বলল, মোমেনা, বড় পানির পিয়াস লেগেছে। পানি দাও। আমি বাতি জ্বালিয়ে দেখি—হাত ফুলে ঢোল হয়েছে। গা আগুনের মতো গরম। আমি বললাম, ডাক্তার ডাকি। সে বলল, ভোর হোক। এত রাতে ডাক্তার কোথায় পাবে? সেই ভোর আর তার দেখা হল না।'

মিসির আলি ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন। ভদ্রমহিলা কথা বলেই যাচ্ছেন। মৃত্যুর বর্ণনা। মৃত্যুর পরের অবস্থার বর্ণনা। কোনো কিছুই বাদ দিলেন না। একবার কিছুক্ষণের জন্যে থামতেই মিসির আলি বললেন, আপনার ঐ পক্ষের কোনো ছেলেমেয়ে নেই?

'থাকবে না কেন, আছে। দুই মেয়ে। একজনকে মেট্রিক পাসের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম। ও এখন আছে কুমিল্লায়। আমার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছিল। একা এসেছিল, জামাই আসতে পারে নি। ছুটি পায় নি। ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে গত বৎসর। নানান কাণ্ড করে মেয়ে নিজেই বিয়ে করল। ভদ্র সমাজে তা বলা যায় না। বড়ই লজ্জার ব্যাপার। অথচ এই মেয়েটাই ভালো ছিল। খুব নরম স্বভাবের মেয়ে। রাতে একা ঘুমাতে পারত না।...

ভদ্রমহিলা ছোট মেয়ের ঘটনাও পুরোটা বর্ণনা করলেন। দাঁড়ি কমা কিছুই বাদ দিলেন না। মিসির আলি বললেন, আপনার ছেলে তন্ময় সম্পর্কে বলুন। আপনার কাছে ওর কথাই শুনতে এসেছি।

'ওর কথা আমি কী বলব? ওকে কি আমি দেখেছি? শুধু পেটেই ধরেছি। ও যখন কথা বলা শিখল তখন তার বাবা আমাকে দূর করে দিল। সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে এসে বলল, মোমেনা, রিকশায় ওঠ—'

'রিকশায় ওঠার ব্যাপারটা আপনি আগে একবার বলেছেন।'

'একবার বললে আবারো বলা যায়। দুঃখের কথা বারবার বললে দুঃখ কমে। সুখের কথা বারবার বললে সুখ বাড়ে। এই জন্যে দুঃখের কথা, সুখের কথা দুটাই বারবার বলতে হয়।'

'আপনার স্বামী আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন কেন?'

' সেটা আমি আপনাকে বলব না। সেটা লজ্জার ইতিহাস। আপনি অনুমানে বুঝে নেন। লোকটা পাগল ধরনের ছিল। ছেলেও হয়েছে বাপের মতো। বাপ যদি হয় ছয় আনা, ছেলে হয়েছে দশ আনা।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

'কেন বলব না? একশ বার বলব। আমার ছেলের মুখের উপর বলব। অবস্থা বিবেচনা করেন। অবস্থা বিবেচনা করলে আপনেও বলবেন—তন্ময়ের তখন বাবা মারা গেছে। সে বলতে গেলে দুধের শিশু। আমার বিবাহ হয়েছে। আমি চলে গেছি জামালপুর। এই অবস্থায় তন্ময়কে মানুষ করেছে তাদের ম্যানেজার। নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছে। তার সঙ্গে আমার ছেলে কী ব্যবহারটাই করল! সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমাকে যেমন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বের করে দিল—তাদেরকেও বের করে দিল। ম্যানেজার, আর তার মেয়ে। মেয়েটা বি.এ. পড়ে। কী সুন্দর পরীর মতো মেয়ে।'

'ঐ মেয়েকে আপনি দেখেছেন?'

জিনা দেখি নি। লোকমুখে শোনা। আমার সবই লোকমুখে শোনা।

'উনারা কি আপনার ছেলের বাড়িতে থাকতেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন বের করে দিলেন কিছু জানেন?'

'কিছুই জানি না। ছেলে শুধু বলেছে—সে এখন থেকে একা থাকতে চায়। মানুষ তার ভালো লাগে না। কয়েকটা কুকুর নাকি পুষেছে। কুকুর নিয়ে থাকে।'

'ম্যানেজার সাহেব এখন কোথায় থাকেন?'

'জানি না কোথায় থাকেন। তবে চাকরি করেন না। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

'আপনার ছেলে এখন ঐ বাড়িতে একাই থাকে?'

'কিছুক্ষণ আগে কী বললাম—কতগুলো কুকুর পালে। আগে দারোয়ান ছিল। কাজের লোক ছিল। একে একে সবাই চলে গেছে। এখন শুনি—একলাই থাকে।'

'চাকরি ছেড়ে চলে গেছে কেন?'

'জানি না কেন। সম্ভবত কুকুরের ভয়ে। দৈত্যের মতো একেকটা কুকুর। এখন আপনি বলেন—জীবন বড়, না চাকরি বড়?'

'আপনার স্বামী কীভাবে মারা গিয়েছিলেন?'

'একটু আগে তো বলেছি—কাঁকড়া বিছার কামড়ে মারা গেছে। রেলের গুদামে ঢুকেছে...'

'আপনার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'অপঘাতে মৃত্যু। দোতলার সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে মরে গেল। সিঁড়ি থেকে পড়ে কেউ মরে? আপনি বলেন। হাত-পা ভাঙে—কিন্তু মরবে কেন?'

মিসির আলির মনে হল ইনাকে কিছু জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। অসুখবিসুখ, দুঃখকষ্ট এই মহিলাকে পর্যুদস্ত করেছে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত হতাশার কথাই বলবেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা নিজেকে নিয়েই। ইনি কথা বলতে পছন্দ করেন। যারা কথা বলতে পছন্দ করে তারা অধিকাংশ সময়ই অর্থহীন কথা বলে। কথা বলে আরাম পায় বলেই কথা

বলা। সেসব কথার অধিকাংশই হয় বানানো। মিসির আলি যা জানতে চান তা ইনি হয়তো বলতে পারবেন না। তবু চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া—

'আপনার ছেলের অসুখের কথা কি মনে আছে? ছোটবেলায় অসুখ হয়ে গেল?'

'কেন মনে থাকবে না। মনে আছে। কালাজ্বর হয়েছিল। এখন আপনি বলুন—আপনি কি শুনেছেন কারো কালাজ্বর হয়? শুনেন নি। কারণ কারোর হয় না। এটা হল আমার কপাল—যে জিনিস কারোর হবে না—আমার কপালে সেটা থাকবে। কালাজ্বরে ব্রহ্মচারী ইনজেকশন দিতে হয়। সেই ইনজেকশন পাওয়া যায় না। উল্টাপাল্টা চিকিৎসা। সেই চিকিৎসায় কী হল দেখেন। জিহ্বা কালো হয়ে গেল। দেখলে ভয় লাগে। তন্ময় যে কারো সঙ্গে মেশে না, কারো সঙ্গে কথা বলে না—এই জন্যেই বলে না। একা একা থাকে। আপনাকে বলে রাখলাম, সে বিয়েও করতে পারবে না। কে বিয়ে করবে এই ছেলেকে? একবার হাঁ করলে মেয়ে দৌড়ে পালাবে। আমি হলাম মা। আমিই ভয় পেতাম। মুখের দিকে তাকাতাম না। এই বার তার ম্যানেজারকে আমি বলেছি—তোমার সাহেবকে বল কত নতুন নতুন চিকিৎসা বের হয়েছে, এই রোগের চিকিৎসকও আছে। তোমার সাহেবের তো টাকাপয়সা আছে। বিলাত ও আমেরিকা গিয়ে চিকিৎসা যেন করে।'

'উনার কি অনেক টাকাপয়সা?'

'একসময় ছিল। এখন নাই। তার বাবার টাকাপয়সা ছিল। নানান ব্যবসাপাতি ছিল। টঙ্গীতে চামড়ার কারখানা ছিল। নারায়ণগঞ্জে ছিল সুতার মিল। শেষে মতিভ্রমও হল। সব বিক্রি করে দিল। তন্ময়ের কিছুই নাই। কারখানা সব বিক্রি করে দিয়েছে। ওয়ারীতে একটা দোতলা বাড়ি আছে। বাড়িটার ভাড়া পায়। এখন শুনছি সেই বাড়িও বিক্রি করে দেবে।'

'কোথায় শুনলেন? সে বলেছে?'

'না, সে বলে নাই। এইসব কথা সে বলে না। লোকমুখে শুনি।'

'তন্ময় কি আপনাকে হাতখরচের টাকা দেয়?'

'তা দেয়। মাসের প্রথমে, এক-দুই তারিখে ওর নতুন ম্যানেজার টাকা নিয়ে আসে। ম্যানেজারের নাম রশিদ মোল্লা। আমার হাতে দিয়ে বলে—আম্মা, এই কাগজটায় সই করে টাকা গুনে রাখেন। আমি বলি, বাবা, সই করার দরকার কী? সে বলে দরকার আছে, আম্মা, সই করেন। ম্যানেজার আমাকে খুব সম্মান করে। আম্মা ডাকে।'

'রশিদ মোল্লার কাছ থেকেই কি শুনেছেন যে ওয়ারীর বাড়ি বিক্রি হচ্ছে?'

'জি।'

'উনি কোথায় থাকেন? আপনার ছেলের সঙ্গে?'

'না না। কী বললাম আপনাকে? তন্ময় তার বাড়িতে কাউকে রাখে না। সে থাকে, দুইটা দারোয়ান থাকে আর বাড়িভর্তি কুকুর। আমি তাকে বললাম, বাবা, এত কুকুর কেন? কুকুর প্রাণীটা ভালো না। তুমি বিড়াল পোষ। বিড়াল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখতেও সুন্দর। আমাদের নবীজীও বিড়াল পছন্দ করতেন। তা সে আমার কথা শুনে না। কেন শুনবে? আমি কে? কুকুরগুলো সারা রাত বাড়ির চারদিকে ছোটাছুটি করে। মাঝে মাঝে একসঙ্গে ডাকে। বড়ই ভয়ংকর।'

'ভয়ংকর কী করে বলছেন? আপনি তো ঐ বাড়িতে যানও নি। কুকুরের ডাকও শুনেন নি।'

'রশিদের কাছে শুনলাম। প্রতি মাসে আসে। গল্পটল্প করে। যাবার সময় পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। ম্যানেজার বলল, আম্মা, বড় ভয়ংকর অবস্থা। নয়টা কুকুর। সারা রাত বাড়ির চারদিকে ঘুরে। ভয়ংকর স্বরে একসঙ্গে ডাকে। গায়ের রক্ত পানি হয়ে যায়।'

'রশিদ সাহেব কোথায় থাকেন, আপনি ঠিকানা জানেন?'

'কাগজে লেখা আছে। টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে। সে আমাকে বলল, দরকারে-অদরকারে ডাকবেন। আমি চলে আসব। যত রাতই হোক, খবর পেলে চলে আসব। পরের ছেলে এই কথা বলে কিন্তু নিজের ছেলে কিছু বলে না। খোঁজও নেয় না। এই ছেলে দিনের বেলা ঘর থেকে বের হয় না। সে ঘর থেকে বের হয় সন্ধ্যার পর।'

মিসির আলি ম্যানেজারের ঠিকানা নিলেন। উঠবার সময় বললেন, আমি যে আপনাকে এত কথা জিজ্ঞেস করছি—কেন করছি জানতে চান না?

'না। জেনে কী হবে? তার উপর তন্ময় খবর দিয়েছে—আপনার কাছে একজন ভদ্রলোক আসবেন। তাঁর নাম মিসির আলি। উনি আপনাকে অনেক প্রশ্ন করবেন। সব প্রশ্নের জবাব দেবেন। কোনো কিছুই গোপন করবেন না। যা আপনি জানেন তাই শুধু বলবেন। যা জানেন না তা বলবেন না। নিজে অনুমান করে যদি কিছু বলেন তা হলে সেটাও উনাকে জানাবেন। বলবেন—এটা আমার অনুমান।'

'আপনাকে ধন্যবাদ। আজ তা হলে উঠি?'

'আপনি কি আবার আসবেন?'

'জি না। আর আসব না।'

'আপনাকে চা পানি কিছুই দিতে পারলাম না। ঘরে অবিশ্যি লোক আছে। থাকলে কী হবে—এদের কিছু বললে বিরক্ত হয়। সেদিন জইতরীর মাকে বললাম—পিয়াস লাগছে, লেবু দিয়ে একগ্লাস শরবত দাও। জইতরীর মা বলল, পারব না। চুলা বন্ধ। দেখেন অবস্থা। শরবত বানাতে চুলা লাগে? আরেকদিন কী হয়েছে শুনেন—'

'আজ যাই। আমার একটা কাজ ছিল।'

'একটু বসেন না। কথা বলার লোক পাই না। কাউকে যে সুখ-দুঃখের একটা কথা বলব সে উপায় নাই। নিজের ভাইয়ের বাসা, এরা এমন ভাব করে যেন আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে। অথচ নগদ পয়সা দিয়ে থাকি। মাসের প্রথমে গুনে গুনে দুই হাজার টাকা দেই। আমার পিছনে কি দুই হাজার টাকা খরচ হয়—আপনিই বলেন? কী খাই আমি? দুই বেলায় এক পোয়া চালের ভাতও খাই না। মাসে সাত সের চালের ভাতও খাই না। সাত সের চালের দাম কত? ধরেন নব্বুই। মাছ তরকারি ধরেন তিন শ—বেশিই ধরলাম। এত খাই না। রাতে এক কাপ দুধ খাই। দুধের দাম কত ধরবেন? এক শ ধরেন। এখন পনের টাকা লিটার। তা হলে কত হল? চার শ। আচ্ছা পাঁচশই ধরলাম। ঘরটার ভাড়া ধরলাম পাঁচ শ। হল এক হাজার। তারপরেও বাড়তি দেই এক হাজার। দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।'

মিসির আলি বসলেন। ভদ্রমহিলা গলা নিচু করে বললেন, তন্ময় আমাকে মাসে পাঁচ হাজার দেয়। ওরা সেটা জানে না। জানলে উপায় আছে? ওরা জানে মাসে দুই হাজার

পাই—সবটাই ওদের দিয়ে দেই। তবে আমার ভাইয়ের বউ সন্দেহ করে। আমি যখন হাসপাতালে ছিলাম তখন আমার ট্রাংকের তালা খুলে দেখেছে। অতি খারাপ মেয়েছেলে। মুখে মধু। হাসি ছাড়া কথা বলে না।

'আজ উঠি?'

'আহা বসেন না। একটু বসেন।'

মিসির আলি আরো এক ঘণ্টা বসলেন। বের হয়ে এলেন প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে।

ঘর থেকে বেরুবার পর মনে পড়ল একটি জরুরি কথা জিজ্ঞেস করা হয় নি। উনি কি মাস্টার সাহেবকে দিয়ে কোনো চিঠি পাঠিয়েছিলেন? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে না। কারণ জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। ভদ্রমহিলা বলবেন না। তিনি কিছু গোপন জিনিস জানেন। এগুলো আড়াল করবার জন্যেই এত অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছেন। এত দীর্ঘ সময় কথা বলে একটি মাত্র জিনিস জানা গেল—নিজের ছেলে প্রসঙ্গে ভদ্রমহিলার কোনো আগ্রহ নেই।

তার চেয়ে বরং রশিদ মোল্লার কাছে যাওয়া যাক।

৫

রশিদ মোল্লার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

মোটাসোটা মানুষ। শরীরের তুলনায় মাথা ছোট। ধূর্ত চোখ। চোখ দেখেই মনে হয়—পৃথিবীর কাউকে তিনি বিশ্বাস করেন না। সম্ভবত নিজেকেও করেন না। কলিংবেল টেপার পর ভদ্রলোক নিজেই দরজা খুলে দিলেন। তবে হাত দিয়ে দরজা ধরে থাকলেন। মনে হচ্ছে তিনি চান না ঘরে কেউ ঢুকুক।

মিসির আলি বললেন, আপনি কি রশিদ মোল্লা?

'জি।'

'একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।'

'বলুন।'

'দরজায় দাঁড়িয়ে তো কথা বলা যাবে না। বসতে হবে। মিনিট দশেক সময় আমি নেব।'

'এখন আমি নাতনিকে পড়াচ্ছি। ওর এস.এস.সি পরীক্ষা।'

'আমি না হয় অপেক্ষা করি। নাতনির পড়া শেষ করে আসুন।'

রশিদ মোল্লা বিরস মুখে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। বসার ঘর ছোট হলেও সুন্দর করে সাজানো। সবচেয়ে যা আশ্চর্যের ব্যাপার তা হচ্ছে—ফুলদানি ভর্তি টাটকা গোলাপ। মনে হচ্ছে এইমাত্র গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে।

রশিদ মোল্লা বিরক্ত গলায় বললেন, কী বলবেন বলুন। আপনার নাম কী? কোত্থেকে এসেছেন?

'আমার নাম মিসির আলি।'

রশিদ মোল্লা চমকাল না। এই নাম আগে শুনেছে তেমন কোনো লক্ষণও দেখাল না। অথচ তাঁর নাম এই লোক শুনেছে। তাঁর খবর দিয়ে এসেছে মুশফেকুর রহমানের মার কাছে।

রশিদ মোল্লা কঠিন গলায় বলল, আমার কাছে কী ব্যাপার?

'কয়েকটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছিলাম। ইচ্ছা হলে জবাব দেবেন। ইচ্ছা না হলে জবাব দেবেন না।'

'আপনি কে, কেন প্রশ্ন করছেন তা তো বলবেন! আপনি কি পুলিশের লোক?'

'জি না।'

'প্রশ্নটা কী?

'মুশফেকুর রহমানের ম্যানেজার হিসেবে আপনি কতদিন ধরে কাজ করছেন?'

'তা দিয়ে আপনার দরকার কী?'

'আমার জানা দরকার।'

'আপনার দরকার কেন?'

'আমি একটা বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করছি।'

'কী বিষয়?'

'মুশফেকুর রহমান প্রতি মাসে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেন তাঁর মাকে দেওয়ার জন্যে। তাঁর মা দু হাজার টাকা রাখেন। আমার ধারণা—বাকি তিন হাজার টাকা তিনি জমা রাখেন আপনার কাছে। বছরে হয় ছয়ত্রিশ হাজার টাকা। দশ বছরে হবে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা। আপনি কতদিন ধরে টাকা দিচ্ছেন?'

'আপনাকে কে পাঠিয়েছে?'

'কেউ পাঠায় নি। নিজেই এসেছি। আমি যে আপনার কাছে একেবারেই অপরিচিত, তাও কিন্তু না। আপনার স্যার নিশ্চয়ই আমার কথা আপনাকে বলেছেন। কতদিন ধরে আপনি টাকা দিচ্ছেন?'

'আমার মনে নাই।'

'আপনি তো রসিদ রাখেন। পুরোনো রসিদ কি আপনার কাছে আছে, নাকি অফিসে জমা দিয়েছেন।?'

রশিদ মোল্লা ক্লান্ত গলায় বললেন, স্যার, আপনি বসুন।

মিসির আলি বসলেন। রশিদ মোল্লা বললেন, 'চায়ের কথা বলে আসি। আপনি চা খান তো?'

'খাই।'

ভদ্রলোক চায়ের কথা বলে মিসির আলির সামনে বসলেন। তাঁর চোখে ভীত ভাব। মনে হচ্ছে অসম্ভব ভয় পেয়েছেন। এতটা ভয় পাবার কারণও মিসির আলির কাছে স্পষ্ট নয়।

'রশিদ সাহেব!'

'জি।'

'ঐ মহিলার কত টাকা আপনার কাছে আছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি অন্য কিছু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। যা জানতে চাই দয়া করে বলবেন। মিথ্যা বলার চেষ্টা করবেন না। কারণ...থাক, কারণটা এখন আপনাকে না বললেও চলবে।'

‘কী জানতে চান, স্যার?’

‘মুশফেকুর রহমান সাহেব সম্পর্কে বলুন।’

‘কী বলব?’

‘যা জানেন বলুন। উনি লোক কেমন?’

‘খুবই ভালো লোক। এটা আমার একার কথা না—যাকে ইচ্ছা আপনি জিজ্ঞেস করুন। যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে। উনার জিহ্বার একটা সমস্যা আছে। তাঁকে নিয়ে এই জন্যে লোকজন নানা আজেবাজে কথা ছড়ায়।’

‘কী ধরনের আজেবাজে কথা?’

‘ যেমন ধরেন উনার মাথা খারাপ—এইসব আর কি?’

‘আপনার ধারণা উনার মাথা ঠিক আছে?’

‘অবশ্যই ঠিক আছে।’

‘আমি তো শুনেছি—উনি বিরাট এক বাড়িতে একা থাকেন।’

‘একা থাকলেই তো মানুষ পাগল হয়ে যায় না, স্যার। বিয়ের আগে আমিও একা থাকতাম।’

‘উনি শুধু যে একা থাকেন তাই না, নটা ভয়ংকর কুকুর পোষেন। এটা কি ঠিক?’

‘জি ঠিক। উনার বাবা পুষতেন, এইজন্যে উনিও পুষেন। কুকুর পোষা তো স্যার অপরাধ না।’

‘বাড়িতে দারোয়ান, মালি, কাজের লোক কেউই নেই?’

‘জি না।’

‘উনি কি নিজেই রেঁধে খান?’

‘জানি না, স্যার। কখনো জিজ্ঞেস করি নি।’

‘আপনি কি ঐ বাড়িতে কোনো মহিলা দেখেছেন?’

‘আমি ঐ বাড়িতে কখনো যাই নি।’

মিসির আলি খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আন্দাজে ঢিল ছুড়লেন, স্বাভাবিক গলায় বললেন—রূপবতী একটি মেয়ে যে মুশফেকুর রহমান সাহেবের কাছে মাঝে মধ্যে আসে তার নাম কী?

রশিদ মোল্লা দৃঢ় গলায় বলল, উনার কাছে কোনো মহিলা কখনো আসে না, স্যার।

‘আপনি কি নিশ্চিত?’

‘জি স্যার।’

মিসির আলি বললেন, আগের ম্যানেজার সাহেবের মেয়ের নাম কী?

‘স্যার আমি জানি না।’

‘মেয়েটি দেখতে কেমন?’

‘উনাকে আমি কোনোদিন দেখি নাই। কী করে বলব দেখতে কেমন?’

‘কোনোদিন দেখেন নি, তা হলে মুশফেকুর রহমানের মাকে কী করে বললেন খুব সুন্দর মেয়ে?’

রশিদ মোল্লা হতভম্ব গলায় বলল, স্যার, আপনি কি আই.বি.-র লোক?

মিসির আলি হাসলেন। হ্যাঁ–না কিছু বললেন না। লক্ষ করলেন রশিদ মোল্লা তীব্র ভয়ে অস্থির হয়ে গেছে। চা এসেছে। সে চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেলেছে। কিছুটা চা ছলকে তার শার্টে পড়েছে।

'আগের ম্যানেজার সাহেব কোথায় থাকেন আপনি জানেন?'

'জি না, স্যার, জানি না। বিশ্বাস করুন জানি না। আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমি কোরান শরিফে হাত দিয়ে বলতে পারি।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করছি। আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'ভয় পাচ্ছি না তো। কেন শুধু শুধু ভয় পাব! আমি কোনো পাপ করলে ভয় পেতাম। আমি কোনো পাপ করি নি।'

'কোনো পাপ করেন নি?'

'ছোটখাটো পাপ করেছি। সে তো স্যার সবাই করে। মানুষ মাত্রই পাপ করে।'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, মেয়েটার সঙ্গে শেষ কবে আপনার কথা হয়?

রশিদ মোল্লা ভয়ংকর চমকে উঠে বলল, আমার সঙ্গে কোনো কথা হয় নি।

মিসির আলি কিছু বললেন না। নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলেন। রশিদ মোল্লা রীতিমতো ঘামতে শুরু করল।

'রশিদ সাহেব!'

'জি স্যার।'

'আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনি সত্য গোপন করে ভয়ের কারণ ঘটাতে পারেন। কী কথা হল তার সঙ্গে?'

'আমার সঙ্গে স্যার কোনো কথা হয় নি। একবারই আমি উনাকে দেখেছি। তাও বছরখানেক আগে। অফিসে আসলেন। পরিচয় দিলেন। আমি খাতির করে বসালাম। তখন লক্ষ করলাম খুবই সুন্দর মেয়ে। উনি বললেন, স্যারের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।'

আমি বললাম, স্যারের সঙ্গে কথা হবে না। উনি কারোর সঙ্গে কথা বলেন না। যা বলার আমাকে বলতে হবে। উনি তখন স্যারের একটা চিঠি দেখালেন। স্যার চিঠি লিখে উনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমি এই কথা স্যারকে বললাম। স্যার খুবই অবাক হলেন। স্যার বললেন, চিঠিটা নিয়ে এস, মেয়েটাকে বল চলে যেতে।

'আপনি তাই করলেন?'

'তাই করলাম। তবে মেয়ে স্যার চিঠি দিল না। চিঠি নিয়েই চলে গেল। খুব কাঁদছিল। আমার স্যার এমন মায়া লাগল!

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। হালকা গলায় বললেন, উঠি। রশিদ মোল্লা তাঁকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। মিসির আলি বললেন, আমি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করব না। আপনি নিজ থেকে যদি কিছু বলতে চান—বলতে পারেন।

রশিদ মোল্লা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি আপনাকে যা বললাম, এর বেশি আমি কিছুই জানি না। বিশ্বাস করুন। কোরান শরিফে হাত দিয়ে বলতে বললে আমি কোরান শরিফে হাত দিয়ে বলব।

'আপনি তা হলে আর কিছু বলতে চান না?'

'জি না।'

'আর একটিমাত্র প্রশ্ন—আপনার বসার ঘরে টাটকা গোলাপ ফুল দেখলাম—আপনার গাছের গোলাপ?'

'জি স্যার। আমার মেয়ের টবে হয়েছে। এই গোলাপগুলোর নাম তাজমহল। স্যার দাঁড়ান, আপনার জন্যে কয়েকটা ফুল নিয়ে আসি।'

মিসির আলি গোলাপের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

৬

বাড়ি ফিরে মিসির আলি দেখলেন খাঁচায় দুটি চড়ুই পাখি। বদু পাখির খাঁচার সামনে বসে মুগ্ধ হয়ে পাখি দেখছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এর আগে সে চড়ুই পাখি দেখে নি। এই প্রথম দেখছে। এবং পাখির সৌন্দর্যে সে অভিভূত। মিসির আলি গায়ের কোট খুলতে খুলতে বললেন, কেউ এসেছিল?

'জে না।'

মিসির আলি আশাহত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন, মুশফেকুর রহমান হয়তো এসেছিল। চড়ুই পাখি দুটিকে সে-ই খাঁচায় ঢোকার ব্যবস্থা করেছে। এখন বুঝা যাচ্ছে এই জটিল কাণ্ডটি করেছে বদু। খাঁচা এবং চড়ুই পাখির প্রতি বদুর এই অতি আগ্রহের কারণ এখন পরিষ্কার হল।

'পাখি দুইটা আপনে আপনে হান্দাইছে।'

'তাই নাকি?'

'হ। আমি ঘর ঝাঁট দিতেছিলাম দেখি ভিতরে বইয়া কুটুর কুটুর চায়। আমি দৌড় দিয়া ঝপাং কইরা খাঁচার দরজা বন্ধ করলাম।'

'গুড।'

'বাটিত কইরা পানি দিলাম। পানি খাইছে। চুমুক দিয়া খাইছে।'

'আচ্ছা।'

মিসির আলি পাখি দুটির প্রতি তেমন আগ্রহ বোধ করছেন না। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় গেলেন। কয়েকটা জরুরি বিষয় লিখে ফেলা দরকার। বদু বলল, ভাত দিমু স্যার?

'দাও।'

বদু ভাত বাড়তে গেল না। উবু হয়ে খাঁচার সামনে বসে রইল। মিসির আলি নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, পাখি দুটি যদি বদু নিজে খাঁচায় না ঢোকাত তা হলে কি সে এতটা আগ্রহ বোধ করত? মুরগি ডিম পেড়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তোলে। যেসব মুরগি ডিম পাড়ার দৃশ্য দেখে তারা চুপ করে থাকে। সম্ভবত বিরক্তই হয়।

মিসির আলি খাতায় বড় বড় করে লিখলেন—মুশফেকুর রহমান। এটি হচ্ছে শিরোনাম। শিরোনাম বড় করেই লিখতে হয়। মূল অংশ থাকে ছোট হরফে লেখা। তিনি

দ্রুত লিখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে অবাক হয়ে দেখলেন তিনি যা লিখেছেন তা হচ্ছে—

মুশফেকুর রহমান

মুশফেকুর রহমান। মুশফেকুর রহমান। মুশফেকুর রহমান।
মুশফেকুর রহমান মুশফেকুর রহমান। মুশফেকুর রহমান।
মুশফেকুর রহমান মুশফেকুর রহমান...

মিসির আলি নিজের লেখার দিকে খুবই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ব্যাপার বুঝতে পারছেন না। তাঁর নিজের চিন্তাভাবনা কি এলোমেলো হয়ে গেছে? এরকম কাণ্ড তো আগে কখনো ঘটে নি। তিনি বড় ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তবে এ জাতীয় সমস্যার মুখোমুখি তো তিনি আগেও হয়েছেন, কখনো এমন বিচলিত বোধ করেন নি। এবার করছেন কেন?

মুশফেকুর রহমান নামের মানুষটি তাঁকে কি ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে? মানুষটি কি একজন মানসিক রোগী? নাকি সে ভান করছে? সে মানসিক রোগী হলে সমস্যা সহজ, সে যদি ভান করে তা হলে সমস্যা মোটেই সহজ নয়।

লোকটি তার কাছে কী চাচ্ছে তাও স্পষ্ট নয়। শুরুতে সে বলেছে—সে একটি প্রেমের গল্প শোনাতে চায়। এখনো প্রেমের গল্পের অংশে আসা হয় নি। প্রেমের গল্পটি ভালোভাবে শোনা দরকার।

আগের ম্যানেজার সাহেবের মেয়ে ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলেছে। তৃতীয় যে খুনটির কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে কি এই মেয়েটি যুক্ত? হবার সম্ভাবনাই বেশি। মুশফেকুর রহমানের পরিচিত লোকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। এই মেয়ে তার পরিচিতদের একজন। তবে যাকে হত্যা করা হবে তাকে কি কেউ চিঠি দিয়ে ডেকে আনবে? তাও অফিসে? এত বড় ভুল কি মুশফেকুর রহমান করবে? করার কথা নয়।

তবে ভয়ংকর বুদ্ধিমান কিছু মানুষও মাঝে মাঝে হাস্যকর বোকামি করে বসে। নিউ ইংল্যান্ডে জনি ম্যান নামের এক সাইকোপ্যাথের গল্প—ক্রিমিনোলজির বিখ্যাত গল্পের একটি। সে অসম্ভব ধূর্ততার সঙ্গে এগারটি খুন করল। নিখুঁত পরিকল্পনা, নিখুঁত কাজ। পুলিশের মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। কিন্তু বারো নম্বর খুনটি সে করল নিতান্ত বোকার মতো। যে মেয়েটিকে খুন করবে তাকে এক পার্টি থেকে বের করে আনল। বের করে আনার আগে মেয়েটির সঙ্গে নাচল। ছবি তুলল। রাস্তায় এসে আইসক্রিমের দোকানে আইসক্রিম খেল। খুনের আধঘণ্টার মধ্যে সে ধরা পড়ল। পুলিশ যখন তাকে জিজ্ঞেস করল, এত বড় বোকামি তুমি কী করে করলে? সে হাই তুলতে তুলতে বলল, আমার ধারণা ছিল শেষ খুনটি আমি খুব বুদ্ধি খাটিয়ে করেছি। আগের কাজগুলো ছিল বোকার মতো।

এরকম কোনো ব্যাপার তো মুশফেকুর রহমানের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।

আচ্ছা, তিনি নিজেও কি খুব বোকার মতো একটা কাজ করেন নি? তাঁর কি উচিত ছিল না ম্যানেজারের কাছ থেকে রানুর ঠিকানা নিয়ে আসা? ম্যানেজার নিশ্চয়ই জানে।

রানুর ঠিকানা ছাড়াও মুশফেকুর রহমানের টেলিফোন নাম্বার আনা দরকার ছিল। এখন চলে গেলে কেমন হয়? রশিদ মোল্লাকে হকচকিয়ে দেওয়ার জন্যেও গভীর রাতে তার বাসায় উপস্থিত হওয়া দরকার।

'স্যার ভাত দিছি।'

মিসির আলি বিছানা থেকে নামতে নামতে বললেন, ভাত পরে খাব রে বদু। আমি একটা কাজ সেরে আসি।

'কই যাইবেন?'

'একটা কাজ সেরে আসি। খুব জরুরি।'

'ভাত খাইয়া যান। ভাত খাইতে কয় মিনিট লাগব।'

'এসে খাব।'

মিসির আলি রশিদ মোল্লার বাসায় রাত সাড়ে এগারোটায় উপস্থিত হলেন। এত দেরি হবার কারণ তিনি বাসা ভুলে গেছেন। দু ঘণ্টা আগে যে বাড়িতে এসেছেন সেই বাড়ির ঠিকানা ভুলে যাওয়া একটা বিস্ময়কর ঘটনা। এই বিস্ময়কর ঘটনাই তাঁর জীবনে ঘটল।

রশিদ মোল্লা বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। কলিংবেল শুনে দরজা খুললেন। আঁতকে উঠে শুকনো গলায় বললেন, কী ব্যাপার স্যার?

মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, ভালো আছেন?

রশিদ মোল্লা এই সামাজিক সৌজন্যমূলক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, আপনার বাসায় কি টেলিফোন আছে?

'জি আছে।'

'একটা টেলিফোন করব।'

'আসুন, ভেতরে আসুন। বসুন আপনি। টেলিফোন সেটটা শোবার ঘরে। আমি নিয়ে আসছি।'

রশিদ মোল্লার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারের অন্য সবাইও জেগে উঠেছে। অল্পবয়সী একটি মেয়ে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে গেল। মনে হচ্ছে—এই মেয়েটিই গোলাপের চাষ করে। তিনি রশিদ মোল্লাকে হকচকিয়ে দিতে এসে পরিবারের সবাইকে হকচকিয়ে দিয়েছেন।

'নিন স্যার, টেলিফোন করুন। কত নাম্বারে করবেন?'

মিসির আলি বললেন, আপনি নাম্বারটা বলুন?

রশিদ মোল্লা বললেন, কী নাম্বারের কথা বলছেন?

'মুশফেকুর রহমানের টেলিফোন নাম্বারটা বলুন। নিশ্চয়ই তাঁর বাড়িতে টেলিফোন আছে। আপনি তার নাম্বারও জানেন।'

'এখন টেলিফোন করে লাভ হবে না স্যার। উনি এখন টেলিফোন ধরবেন না। সন্ধ্যার পর উনি টেলিফোন ধরেন না।'

'তবু চেষ্টা করে দেখি। নাম্বারটা বলুন।'

'উনি যদি জানেন আমি নাম্বার দিয়েছি তা হলে খুব রাগ করবেন।'

'উনি জানবেন না।'

রশিদ মোল্লা শুকনো গলায় নাম্বার বললেন, দু বার রিং হতেই ওপাশ থেকে টেলিফোন উঠানো হল। কেউ কোনো কথা বলছে না। মিসির আলি কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পাচ্ছেন। কেউ একজন খুব হালকাভাবে টেলিফোন সেটের উপর নিশ্বাস ফেলল। মিসির আলি বললেন, হ্যালো!

ওপাশ থেকে ভারী গম্ভীর গলায় বলল, মিসির আলি সাহেব?

'জি।'

'আপনার টেলিফোন কলের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

গলার স্বর সম্পূর্ণ অচেনা। শুদ্ধ ভাষায় কেউ কথা বলছে—কিন্তু এর মধ্যেই গ্রাম্য টান আছে। পুরুষকণ্ঠ, তবে এই কণ্ঠের সঙ্গে মুশফেকুর রহমানের কণ্ঠস্বরের কোনো মিল নেই। গলার স্বর মানুষ বদলাতে পারে, কিন্তু এতটা পারে না। মিসির আলি বললেন, আপনি কে বলছেন?

'আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় নি। আমি তন্ময়ের টিচার ছিলাম। ওকে অঙ্ক শেখাতাম। তন্ময় সম্ভবত আমার কথা বলেছে আপনাকে?'

'হ্যাঁ বলেছে।'

'শুনুন মিসির আলি সাহেব, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। কবে আসবেন?'

'বুঝতে পারছি না কবে আসব। প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ভালোও লাগে না।'

'ভালো লাগে না কী করে বললেন? আগে কি কখনো প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'আপনার সঙ্গে বলছি।'

'বাহ্, আপনি মানুষ হিসেবেও তো রসিক। একবার আসুন। আসবেন?

'আসতেও পারি।'

'দেরি না করে চলে আসুন। আজ রাতেই চলে আসুন।'

'আপনার বাড়ির ঠিকানা কী?'

'রশিদ মোল্লাকে জিজ্ঞেস করুন। ও আপনাকে ঠিকানা বলে দেবে। আপনি ওর বাসা থেকেই তো টেলিফোন করছেন। তাই না?'

'জি।'

'কিংবা এক কাজ করতে পারেন। ওকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসতে পারেন। ও দারুণ ভীতু। ওকে একটা ধমক দিলেই ও আপনার সঙ্গে আসবে এবং দূর থেকে বাসা দেখিয়ে দেবে। কাছে আসবে না। সন্ধ্যার পর বাসার কাছে আসতে সে ভয় পায়?'

'আজ আসতে পারছি না। তবে হয়তো শিগগিরই আসব।'

'শুনুন মিসির আলি সাহেব, আজ আসাই ভালো। জোছনা রাত আছে। জোছনা আপনার ভালো লাগে নিশ্চয়ই।'

'ভালো লাগে না। জোছনা অনেক রহস্য তৈরি করে। রহস্য আমি পছন্দ করি না বলেই দিনের আলো জোছনার চেয়ে বেশি ভালো লাগে।'

'রহস্য আপনি পছন্দ করেন না?'

'জি না।'

'এই জন্যেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি। চলে আসুন।'

'আসব আসব, এত ব্যস্ত হবেন না।'

'আমি মোটেই ব্যস্ত নই। আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এই জন্যেই বলছি। ও আরেকটা কথা—আগের ম্যানেজারের মেয়েটির ঠিকানা রশিদ মোল্লা জানে না। বের করার চেষ্টা করেছে। পারে নি। তবে আমি আপনাকে ঠিকানা দিতে পারি। ওরা নারায়ণগঞ্জে থাকে। আপনার কাছে কি কাগজ-কলম আছে? থাকলে লিখে নিন...'

মিসির আলি বললেন, থাক, ঠিকানার প্রয়োজন নেই।

'আমি যে এতকিছু জানি আপনি কি এতে অবাক হচ্ছেন না।'

'আমি এত সহজে অবাক হই না। আপনার নাম তো জানা হল না।'

'দেখা হলেই নাম বলব। এত তাড়া কিসের?'

মিসির আলি টেলিফোন নামিয়ে রেখে রশিদ মোল্লাকে বললেন, চলি রশিদ সাহেব। অনেক রাতে আপনাকে বিরক্ত করেছি। কিছু মনে করবেন না।

রশিদ মোল্লা কিছু বলল না। জবুথবু হয়ে বসে রইল। এই শীতের রাতেও তার কপালে ঘাম। সে খুব ভয় পেয়েছে।

আগের বার রশিদ মোল্লা গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল। এবার এল না। দরজা বন্ধ করতেও উঠল না। রশিদ মোল্লার মেয়েটি দরজা বন্ধ করার জন্যে উঠে এসেছে। সে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে মিসির আলির দিকে। তার বাবার মতো মেয়েটিও ভয় পেয়েছে।

অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে। বুদ্ধি করে মাফলার এনেছেন বলে রক্ষা। মাফলার ভেদ করে শীতল হাওয়া ঢুকছে। নাক জ্বালা করা শুরু হয়েছে। ঠাণ্ডা মনে হয় লেগে যাবে। নিউমোনিয়ায় না ধরলে হয়। শরীর দুর্বল। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরোপুরি গেছে। ছোট অসুখই দেখতে দেখতে ভয়াবহ হয়ে যায়।

আজকের রাতের ঘটনায় তিনি তেমন বিস্মিত বোধ করছেন না। বড় ধরনের রহস্যময় ঘটনায় তিনি তেমন বিস্মিত হন না। ছোটখাটো ঘটনাগুলো বরং তাঁকে অনেক বেশি অভিভূত করে। একবার এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে ছ'টাকা ভাড়া ঠিক করে রিকশায় উঠলেন। নামার সময় তাকে একটা পাঁচ টাকা এবং একটা দু টাকার নোট দিলেন। দু টাকার নোটটা ছিল পাঁচ টাকার নোটের ভেতর। রিকশাওয়ালার তা দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। সে টাকাটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল এবং লুঙ্গির খুঁট থেকে একটা এক টাকার নোট ফেরত দিল। মিসির আলি বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। একবার ভাবলেন, রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেন, সে কী করে বুঝল পাঁচ টাকার নোটের ভাঁজে একটা দু টাকার নোট আছে? তিনি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেন নি। থাক না কিছু রহস্য। সব রহস্য ভেঙে দেওয়ার দরকার কি?

পৃথিবীতে কিছু কিছু রহস্য আছে যা ভাঙতে ইচ্ছে করে, আবার কিছু রহস্য আছে ভাঙতে ইচ্ছা করে না। তন্ময় নামের ছেলেটির রহস্য ভেদ করার ইচ্ছা তাঁর আছে। ব্যাপারটা খুব সহজ হবে কিনা তা তিনি এখনো জানেন না।

রশিদ মোল্লার বাসা থেকে তিনি টেলিফোন করলেন। অন্য একজন ধরল। তা ধরতেই পারে। হয়তো তন্ময়ের বাড়িতে আরো একজন থাকে। যে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছে মাস্টার সাহেব হিসেবে। সে চট করে বলে দিল, আপনি রশিদ মোল্লার বাড়ি থেকে টেলিফোন করছেন? আপাতদৃষ্টিতে খুব আশ্চর্যজনক ঘটনা মনে হলেও হয়তো তেমন আশ্চর্যজনক নয়। রশিদ মোল্লাই আগেভাগে জানিয়েছে। মিসির আলি অপেক্ষা করছিলেন—রশিদ মোল্লা টেলিফোন সেট আনতে গেল। চট করে আনল না। দেরি হল। এই ফাঁকে রশিদ মোল্লা হয়তো জানিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া ঐ লোকটি প্রাণপণ চেষ্টা করছিল মিসির আলিকে বিস্মিত করতে। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, "আমি যে এতকিছু জানি আপনি এতে অবাক হচ্ছেন না?" একজন প্রেতাত্মা মানুষকে বিস্মিত করার এত চেষ্টা করবে না। মানুষই করবে। তন্ময়ের মৃত শিক্ষক টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে এই হাস্যকর ধারণা নিয়ে মাথা ঘামাবার মানুষ মিসির আলি নন। তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। তবে চিন্তিত বোধ করছেন। কেন চিন্তিত বোধ করছেন তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়।

তিনি বিপদ আঁচ করছেন। তাঁর মনের একটি অংশ ভয় পাচ্ছে। ভয় পাবার পেছনের কারণটি তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। শুধু যে ভয় পাচ্ছেন তা না—পুরো ব্যাপারটা তাঁর মনের ওপর এক ধরনের চাপও সৃষ্টি করছে। কে যেন খুব অস্পষ্টভাবে তাঁকে বলছে—তুমি সরে এস। তুমি দূরে সরে এস।

টুং টুং ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশা আসছে। ভিড়ের সময় রিকশাওয়ালারা কখনো ঘণ্টা বাজায় না। ফাঁকা রাস্তা বলেই হয়তো ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে আসছে। এই রিকশা ভাড়া যাবে বলে মনে হয় না। যাচ্ছে উল্টো দিকে। তবু মিসির আলি বললেন, ভাড়া যাবে?

মিসির আলিকে বিস্মিত করে দিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, যামু। এই শীতের রাইতে খামাখা রিকশা বাইর করছি? টাইট হইয়া বহেন। পঙ্ক্ষীরাজের মতো লইয়া যামু।

মিসির আলি টাইট হয়ে বসলেন। এই রিকশায় বসাই তাঁর কাল হল। রিকশাওয়ালা ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল ঠিকই কিন্তু ক্ষতি যা করার করে ফেলল। ভয়াবহ ঠাণ্ডা লেগে গেল। মিসির আলি ঘরে ঢুকেই বিছানায় পড়লেন। প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। বুক পাথরের মতো ভারী, শ্বাস নিতে পারেন না। আচ্ছন্নের মতো মাঝে মাঝে তাকান, তখন মনে হয় মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা তাঁর কাছে নেমে আসছে। একসময় মনে হল, ফ্যানের ব্লেড ঘুরতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগছে। হেলুসিনেশন। তাঁর হেলুসিনেশন হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারেন বদু তাঁর মাথায় পানি ঢালছে। সেই পানি তাঁর কাছে উষ্ণ মনে হয়। বদু কি তাঁর মাথায় ফুটন্ত পানি ঢালছে? বিছানার এক পাশে চড়ুই পাখির খাঁচা। খাঁচার ভেতর পাখি দুটিকে ঘুঘু পাখির মতো বড় দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তারাও এক দৃষ্টিতে মিসির আলিকে দেখছে। শেষ রাতের দিকে তিনি অচেতনের মতো হয়ে গেলেন। জ্বরের প্রচণ্ড ঘোর, আধো-চেতন-আধো-জাগ্রত অবস্থায় তিনি নীলুকে দেখলেন।

নীলু যেন এসেছে তাঁর কাছে। বসেছে বিছানার পাশে। কি স্পষ্টই না তাকে দেখাচ্ছে। কানের দু পাশের চুল যে বাতাসে কাঁপছে তাও দেখা যাচ্ছে। নীলু বলল, আবার অসুখ বাঁধিয়েছেন? মিসির আলি হাসার চেষ্টা করলেন।

'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

'হুঁ।'

'বলুন আমি কে?'

'নীলু।'

'কতদিন পর আপনাকে দেখতে এলাম বলুন তো?'

'তুমি আমাকে দেখতে আস নি। সবই আমার কল্পনা। প্রচণ্ড জ্বরের জন্যে আমি এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আছি। ঘোরের কারণে মস্তিষ্কের নিউরনে সঞ্চিত স্মৃতি উলটপালট হয়েছে। সে তোমাকে তৈরি করেছে। বাস্তবে তোমার অস্তিত্ব নেই। আমি হাত বাড়ালে তোমাকে ছুঁয়ে দেখতে পারব না।'

'এখনো লজিক?'

'হ্যাঁ, এখনো লজিক।'

'দেখুন না একটু হাত বাড়িয়ে আমাকে ছুঁতে পারেন কিনা।'

'পারছি না, নীলু। আমার হাত-পা পাথরের মতো ভারী হয়ে এসেছে।'

'আমি কেন এসেছি বলুন তো?'

'আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে এসেছ। কেউ যখন ভয়ংকর অসুস্থ হয় তখন তার চারপাশের জগৎও শূন্য হয়ে পড়ে। তার মস্তিষ্ক তখন তার জন্যে একজন সঙ্গী তৈরি করে।'

'আপনার লজিক ঠিক আছে। আপনি অসুস্থ নন।'

'তুমি চলে যাও, নীলু। আমি কথা বলতে পারছি না। আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

'আমি চলে যেতে পারছি না। আমি তো নিজ থেকে আসি নি—আপনি আমাকে এনেছেন।'

ঘোরের মধ্যে মিসির আলি ছটফট করতে লাগলেন। নীলু তাঁর দিকে ঝুঁকে এল। মিসির আলি অস্বস্তি বোধ করছেন। মেয়েটা এত কাছে এগিয়ে আসছে কেন? এটা ঠিক হচ্ছে না। নীলু এখন ফিসফিস করে বলল, আমি আপনাকে সাবধান করতে এসেছি। আপনি ভয়াবহ বিপদের দিকে যাচ্ছেন। পুরোনো ঢাকার ঐ বাড়িতে আপনি কখনো যাবেন না। মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আপনার দেখা না করলেও চলবে। প্লিজ, আপনি আমার কথা শুনুন।

মিসির আলির জ্বর আরো বাড়ল। মনে হচ্ছে মাথার ভেতরে একটা রেলগাড়ি চলছে। চাকার ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দ বারবার বলছে—আপনি আমার কথা শুনুন। আপনি আমার কথা শুনুন।

৭

মিসির আলির জ্ঞান কতদিন পর ফিরল তা তিনি জানেন না। চোখ মেলে দেখলেন প্রশস্ত একটি ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। বিছানা অপরিচিত। চারপাশের পরিবেশ অপরিচিত। পায়ের কাছে মস্ত কাচের জানালা। জানালা বন্ধ। কাচের ভেতর দিয়ে রোদ এসে তাঁর

পায়ে পড়েছে। খুব আরাম লাগছে। তাঁর গায়ে সুন্দর একটা কম্বল। কম্বল থেকে ওষুধের গন্ধ আসছে। তিনি প্রচণ্ড ক্ষুধাও বোধ করছেন। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন কিছু খাচ্ছেন না। মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। ঘরে প্রচুর আলো। এত কড়া আলোতে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

'কেমন আছেন মিসির আলি সাহেব?'

'জি ভালো।'

'আপনার জ্বর পুরোপুরি রেমিশন হয়েছে। আপনি আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

মিসির আলি চোখ খুললেন। আলো এখন আর আগের মতো চোখে লাগছে না। তাঁর বিছানার পাশে যে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একজন ডাক্তার। গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলানো দেখে তাই মনে হয়। নার্সরাও স্টেথিসকোপ ব্যবহার করে, তবে তারা কখনো গলায় পরে না।

মিসির আলি বললেন, আমি প্রচণ্ড খিদে বোধ করছি।

'আপনি খিদে বোধ করছেন। এটা খুবই সুলক্ষণ। হালকা কিছু খাবার দিতে বলছি।'

'এটা কি হাসপাতাল?'

'হাসপাতাল তো বটেই। তবে প্রাইভেট হাসপাতাল।'

'আমি কতদিন ধরে আছি?'

"আজ হচ্ছে ফিফথ ডে। আপনার অবস্থা এমন ছিল যে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আপনি 'কমা'য় চলে যাচ্ছেন।"

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, কমা–সেমিকোলনে আমি যাব না। যদি যেতে হয় সরাসরি ফুলস্টপে চলে যাব।

ডাক্তার হাসলেন। মিসির আলির মনে হল বেশিরভাগ ডাক্তার হাসেন না। তবে যাঁরা হাসেন তাঁরা খুব সুন্দর করে হাসেন।

'মিসির আলি সাহেব!'

'জি।'

'আপনি বিশ্রাম করুন। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আমি আপনার খাবারের ব্যবস্থা করছি।'

'আজকের একটা খবরের কাগজ কি পেতে পারি?'

'অবশ্যই পেতে পারেন। তবে আমার মনে হয় খবরের কাগজ পড়ার চেয়ে বিশ্রাম আপনার জন্যে অনেক জরুরি। নাশতা খেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিন। চোখ বন্ধ করে ফেলুন।'

মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর অনেক কিছু জানার ছিল। কে তাঁকে এমন এক আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিল? ঘরের যা সাজসজ্জা তাতে মনে হয় হাজারখানেক টাকা হবে দৈনিক ভাড়া। দেয়ালে ছোট্ট বারো ইঞ্চি টিভি দেখা যাচ্ছে। রোগীর বিনোদনের ব্যবস্থা। ঘরের দেয়াল, মেঝে সবই ঝকঝক করছে। কোথাও কোনো ঘড়ি নেই। টিভির চেয়েও ঘড়ির প্রয়োজন ছিল বেশি। কোন এক বিচিত্র কারণে অসুস্থ হলেই ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করে।

নার্স নাশতা নিয়ে এল। এক স্লাইস রুটি। ডিম পোচ, একটা কমলা। গরম এক কাপ চা।

মিসির আলি বললেন, সিগারেট কি খাওয়া যাবে সিস্টার?

'না, সিগারেট খাওয়া যাবে না। এটা হাসপাতাল, ধূমপানমুক্ত এলাকা।'

'গরম চায়ের সঙ্গে একটা সিগারেট খেতে পারলে আমার অসুখ পুরোপুরি সেরে যেত বলে আমার ধারণা।'

'এখানকার ডাক্তারদের সে রকম ধারণা না। কাজেই সিগারেট খেতে পারবেন না। নাশতা খেয়ে নিন। আপনার গা আমি স্পঞ্জ করে দেব।'

'এই রুমটার ভাড়া কত?'

'প্রতিদিন পনের শ টাকা।'

মিসির আলির মুখ শুকিয়ে গেল। তিন হাজার টাকায় তিনি এবং বদু সারা মাস চালান। তার মধ্যে বাড়িভাড়া ধরা আছে।

নার্স কঠিন মুখ করে বলল, বড়লোকদের চিকিৎসার খুব ভালো ব্যবস্থা বাংলাদেশে আছে। মিসির আলি বললেন, অবশ্যই আছে। তবে মজার ব্যাপার কি জানেন সিস্টার—এত করেও বড়লোকরা কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান না। গরিবরা যেভাবে মরে তাদেরও ঠিক একইভাবে মরতে হয়।

'এখন হয়, একদিন হয়তো হবে না। দেখা যাবে অমর হবার ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। ত্রিশ লক্ষ চল্লিশ লক্ষ টাকা দাম। শুধু বড়লোকরা সেই ওষুধ কিনতে পারছে।'

মিসির আলি তার গোছানো কথায় চমৎকৃত হলেন। অধিকাংশ মানুষই আজকাল গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। চিন্তা এলোমেলো থাকে বলে কথাবার্তাও থাকে এলোমেলো।

'সিস্টার, আপনার সঙ্গে খুব জরুরি কিছু কথা আছে। আমি আপনার পরামর্শ ও সাহায্য চাচ্ছি। আমার পক্ষে প্রতিদিন পনের শ টাকা ভাড়া দিয়ে এখানে থাকা সম্ভব নয়। আমি দরিদ্র মানুষ। এ কদিনের ভাড়া কী করে দেব তাই বুঝতে পারছি না। আমি আজই এখান থেকে বিদেয় হতে চাই। সেটা কী করে সম্ভব তা আপনি দয়া করে বলে দেবেন। যে টাকা আপনারা পান তাও একসঙ্গে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। আমাকে ভাগে ভাগে দিতে হবে। তার একটা এ্যারেঞ্জমেন্টও করতে হবে।'

'স্যার, আপনাকে এসব নিয়ে মোটেই ভাবতে হবে না। আমাদের হাসপাতালের নিয়ম হচ্ছে—ভর্তি হবার সময়ই পুরো টাকা দিতে হয়। আপনার বেলাতেও তাই হয়েছে। কেউ-একজন নিশ্চয়ই পুরো টাকা দিয়েছেন।'

'সেই কেউ-একজনটা কে?'

'আমি তো স্যার বলতে পারব না। আপনি চাইলে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।'

'দয়া করে খোঁজ নিয়ে দেখুন।'

নার্স কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। তার হাতে একটি বই, একটি মুখ বন্ধ খাম।

'স্যার, যিনি আপনাকে এখানে ভর্তি করিয়ে গেছেন, তাঁর নাম মুশফেকুর রহমান। তিনি আপনার জন্যে বইটা রেখে গেছেন। চিঠিও রেখে গেছেন। আর স্যার আমি খোঁজ নিয়েছি—আপনার জন্যে পনের দিনের রুম পেমেন্ট করা আছে। তার আগেই যদি আপনি চলে যান তা হলে টাকাটা রিফান্ড করা হবে।'

মিসির আলি চিঠি পড়লেন। সুন্দর হাতের লেখা। এই লেখা দেখে আগেও একবার মুগ্ধ হয়েছিলেন, আজো হলেন।

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আপনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমি আপনাকে এই প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে এসেছি। আপনার বিনা অনুমতিতেই এটা করতে হল। কারণ অনুমতি দেওয়ার মতো অবস্থা আপনার ছিল না।

আপনার পাখি দুটি আমি আমার নিজের কাছে নিয়ে রেখেছি। আপনার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আমি চালিয়ে নিতে চেষ্টা করছি। ফলাফল এখন পর্যন্ত শূন্য। দুটি পাখিই খাচ্ছে। আমি আরো কয়েকদিন দেখব।

আপনি অসুস্থ অবস্থায় নীলু নীলু বলে ডাকছিলেন। ভদ্রমহিলার ঠিকানা জানার জন্যে আমি আপনার কিছু কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আপনার অবস্থা দেখে আমি খুবই শঙ্কিত বোধ করছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল ঐ মহিলাকে যেভাবেই হোক খুঁজে বের করা দরকার।

আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি। তবে এখনো আপনার কোনো খবর তাঁকে দেওয়া হয় নি। আপনি চাইলেই দেওয়া হবে। পাখিবিষয়ক আরেকটি গ্রন্থ আপনাকে পাঠালাম—Mysteries of Migratory Birds. আমি বইটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি—আপনিও পাবেন বলেই আমার ধারণা।

বিনীত

ম. রহমান

মিসির আলি পরপর তিনবার চিঠি পড়লেন। সব দীর্ঘ চিঠিতেই অপ্রকাশ্য কিছু কথা থাকে। যে কথা পত্রলেখকের মনে আছে, কিন্তু তা তিনি জানাতে চান না। সেই অপ্রকাশ্য কথা পত্রলেখকের অজান্তে ধরা পড়ে। এখানেও কি ধরা পড়েছে? না, পড়ে নি। এই চিঠি খুব সাবধানে লেখা হয়েছে।

পাখির ওপর লেখা বইটিতে মিসির আলিকে উদ্দেশ্য করে দুটা লাইন লেখা :

দ্রুত সেরে উঠুন। এই শুভ কামনা।

তন্ময়।

একটি বিষয় লক্ষণীয়—সে দুটি নাম ব্যবহার করেছে। এর থেকে কি কিছু দাঁড় করানো যায়? না, যায় না। এত সহজে কিছু দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তথ্যের পাহাড় যোগাড় করতে হয়। সেই অসংখ্য তথ্যের ভেতর থেকে বেছে বেছে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো নিয়ে ঘর বানাতে হয়। একটা নয়—বেশ কয়েকটা। তার থেকে বেছে নিতে হয় মূল প্রাসাদ...কঠিন কাজ।

নার্স মেয়েটি গামলা ভর্তি গরম পানি এবং একটা তোয়ালে নিয়ে এসেছে। গা স্পঞ্জ করবে। মিসির আলি বললেন, আমি কি আরেক পেয়ালা চা খেতে পারি?

'জি না স্যার। চা একটা উত্তেজক পানীয়। ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস না করে আপনাকে দেওয়া যাবে না।'

'আপনার নাম কী?'

'আমার নাম জাহেদা।'

'শুনুন জাহেদা, আপনি যদি আমাকে খুব গরম এক কাপ চা না খাওয়ান তা হলে আমি আপনাকে গা স্পঞ্জ করতে দেব না।'

জাহেদা চলে গেল। মিসির আলি খুশি মনে অপেক্ষা করছেন। মেয়েটির মোরালিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যখন ফিরে আসবে তখন তাকে বলা হবে—শুনুন জাহেদা, আপনি আমাকে একটা সিগারেট এনে দিন। আমাকে একটা সিগারেট না খাওয়ালে আমি ওষুধ খাব না। গোপনে এনে দিন। আমি বাথরুমে বসে খেয়ে নেব। কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না।

জাহেদা ফিরে এল। কঠিন গলায় বলল, ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি নিষেধ করেছেন। কাজেই চা হবে না। আপনি শার্ট খুলুন।

মিসির আলি লক্ষ করলেন, তাঁর নিজের মোরালিটিই ভেঙে যাচ্ছে। শার্ট খুলে ফেলাই ভালো।

মিসির আলি ভেবেছিলেন তিনি পুরোপুরি সেরে গেছেন। দুপুরে শুয়ে শুয়ে পাখিবিষয়ক বইটি পড়তে পড়তেই তাঁর মাথা ধরল। সন্ধ্যাবেলা আবার জ্বর এল। দেখতে দেখতে জ্বর বেড়ে গেল। পুরো রাত কাটল জ্বরের ঘোরে। সকালে আবার ভালো। ডাক্তার যখন দেখতে এলেন তখন গায়ে জ্বর নেই। শরীর ঝরঝরে লাগছে। পরপর তিনদিন একই ব্যাপার। মিসির আলি ডাক্তারকে বললেন, কী ব্যাপার ডাক্তার সাহেব? আমার হয়েছে কী?

ডাক্তার সাহেব বললেন, এখনো বলতে পারছি না। টেস্ট করা হচ্ছে।

'কদিন থাকতে হবে?'

'তাও বলা যাচ্ছে না।'

মিসির আলি শঙ্কিত বোধ করছেন। হাসপাতালের আকাশছোঁয়া বিল অন্য একজন দিয়ে দেবে তা হয় না। পুরো বিল তিনিই দেবেন। কিছু টাকা তিনি আলাদা করে রেখেছিলেন—ভয়াবহ দুঃসময়ের জন্যে। সেই টাকায় হাত দিতে হবে। রাজকীয় চিকিৎসা তাঁর জন্যে না। সরকারি হাসপাতালে যাওয়া দরকার। এই হাসপাতাল ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। প্রতিদিন ভোরবেলা অনেকখানি রোদ এসে তাঁর পায়ে পড়ে। এই দৃশ্যটি তাঁর অসাধারণ লাগে। অন্য কোনো হাসপাতালে এরকম হবে না। রোদে পা মেলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকার এই আনন্দ থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না। একজন মানুষের জীবন হচ্ছে ক্ষুদ্র আনন্দের সঞ্চয়। একেক জন মানুষের আনন্দ একেক রকম। তাঁরটা হয়তোবা কিছুটা অদ্ভুত।

তিনি আজো রোদে পা মেলে শুয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। হাসপাতালের নার্স তাঁকে জানিয়েছে—আজ তাঁকে বাড়তি এক কাপ চা দেওয়া হবে। শুধু তাই না, সিগারেটও দেওয়া হবে। তবে সিগারেট খেতে পারবেন না। হাতে নিয়ে বসে থাকবেন। তাই-বা কম কী। তামাকের গন্ধ নেওয়া হবে।

'কেমন আছেন স্যার?'

মিসির আলি চোখ না মেলেই বললেন, ভালো।

'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। আপনি মুশফেকুর রহমান। বসুন।'

চেয়ার টানার শব্দ হল। মিসির আলি ফুলের গন্ধ পেলেন। মুশফেকুর রহমান তাঁর জন্যে ফুল নিয়ে এসেছে। টেবিলে ভারী কিছু রাখার শব্দ হল। ফুল নয়—অন্যকিছু। ফল হতে পারে। কী ফল?

কমলা হবে না। কমলার ঘ্রাণ তীব্র। তিনি গন্ধ পাচ্ছেন না। সম্ভবত আপেল এবং কলা। না, কলা হবে না। আপেল এবং কলা এক ঠোঙায় আনা হবে না। তিনি একটি ঠোঙা রাখার শব্দ শুনেছেন। হয়তো আপেল। না, আপেলও হবে না। তিনি যে শব্দ শুনেছেন তাতে মনে হয়েছে শক্ত কিছু রাখা হয়েছে, যেমন ডাব। তবে ডাব হবে না। ডাব কেউ টেবিলে রাখবে না। মেঝেতে রাখবে—তা হলে কী?

মিসির আলি চোখ মেললেন, তবে টেবিলের দিকে তাকালেন না। তাকালেন মুশফেকুর রহমানের দিকে। তিনি এক ধরনের বিস্ময়বোধে আক্রান্ত হলেন। কোলের উপর হাত রেখে শান্ত, ভদ্র ও বিনয়ী একটা ছেলে বসে আছে।

তিনি মুশফেকুর রহমানকে দিনের আলোয় কখনো দেখেন নি। একজন মানুষকে দিনের আলোয় এক রকম দেখাবে, রাতে অন্য রকম তা তো হয় না। ছেলেটির মধ্যে মেয়েলি ভাব অত্যন্ত প্রবল। এ ব্যাপারটি তিনি আগে কেন লক্ষ করেন নি? ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। লাল ঠোঁট, বেশ লাল, চোখের মণি ঘন কালো এবং ছলোছলো। ইংরেজি উপন্যাসে চোখের বর্ণনায় পাওয়া যায়—Liquid eyes. এরও তাই। চোখের পল্লবও মেয়েদের চোখের মতো দীর্ঘ। বয়সও খুব বেশি নয়। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মতো হবে। তাঁর ধারণা ছিল মুশফেকুর রহমানের বয়স চল্লিশের বেশি।

মিসির আলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ছেলেটি কথা বলছে এমনভাবে যে জিহ্বা দেখা যাচ্ছে না। তবু মিসির আলি লক্ষ করলেন ছেলেটির জিহ্বা কালো নয়। অন্য দশজনের মতোই।

মুশফেকুর রহমান বলল, স্যার, আপনি হেডমাস্টারদের মতো আমাকে দেখছেন। কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন।

'আপনার জিহ্বার রঙ কালো না।'

'দিনের বেলা রঙ ঠিক থাকে।'

'কেন?'

'আপনি বলুন কেন?'

'আপনি কি কোনো রঙ মাখেন?'

"জি স্যার, মাখি। এক ধরনের 'এজো ডাই'—নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব রঙ। দিনের বেলা লোকজনের সামনে কালো জিব নিয়ে বেরুতে ইচ্ছা করে না।"

'আপনার বয়স কত?'

'তেত্রিশ। স্যার, আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।'

'বেশ বলব।'

'আপনাকে আজ আর বিরক্ত করব না। শরীর সারুক। আমি সব সময় খোঁজ রাখছি।'

'থ্যাংক ইউ।'

'পাখিবিষয়ক বইটি কি নেড়েচেড়ে দেখেছেন?'

'আমি গোড়া থেকেই পড়ছি—পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মতো পড়া হয়েছে।'

'বই পড়তে কষ্ট হয় না?'

'না। তবে সন্ধ্যার পর কিছু পড়তে পারি না। তখন চোখ জ্বালা করে, মাথায় যন্ত্রণা হয়।'

মুশফেকুর রহমান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, স্যার, আমি আমার কিছু ঘটনা লিখে এনেছি। পড়তে যাতে আপনার কষ্ট না হয় সে জন্যে ভাগ ভাগ করে লিখেছি। প্রতিটি চ্যাপ্টারের শেষে আমি আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টাও করেছি। আপনার ইচ্ছা না হলে ব্যাখ্যাগুলো পড়ার দরকার নেই।

মিসির আলি বললেন, কী ধরনের ব্যাখ্যা?

'একজন মনোবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা।'

'মনোবিজ্ঞানে তোমার কী কিছু পড়াশোনা আছে?'

মুশফেকুর রহমান বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, সামান্য আছে। আমি মনোবিজ্ঞানের ছাত্র। এই বিষয়ে এম. এ. করেছি।

'কোন সনের ছাত্র?'

'বলতে চাচ্ছি না, স্যার।'

মিসির আলি বললেন, তুমি কি কখনো আমার ছাত্র ছিলে?

'জি ছিলাম। গোড়া থেকে এই কারণেই আপনাকে স্যার ডাকছি। আপনার কাছে আসার আমার কারণও এইটিই। স্যার, আজ আমি উঠি?'

'তোমার ঐ ঠোঙায় কী আছে?'

'কিছু বেদানা নিয়ে এসেছি। টাইম পত্রিকায় পড়েছিলাম—বেদানায় আছে ভিটামিন K, রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরিতে ভিটামিন 'কে' খুব কাজ করে। নার্সকে বলে দিয়েছি, ও বেদানার রস তৈরি করে আপনাকে দেবে। স্যার যাই।'

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন। হালকা নীল শার্ট পরা, মাথাভর্তি কুচকুচে কালো চুলের এই যুবকটিকে কী সুন্দর লাগছে! কিন্তু সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে! আগেও একবার খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখেছেন। সেবার বাঁদিকে ঝুঁকে হাঁটছিল। এখন হাঁটছে ডানদিকে ঝুঁকে।

৮

শ্রদ্ধেয় স্যার,

স্যারদের নামের আগে শ্রদ্ধেয় ব্যবহার করা আমাদের প্রাচীন রীতি। যদিও এই সমাজের বেশিরভাগ শিক্ষকরাই শ্রদ্ধেয় বিশেষণ দাবি করেন না। স্কুলে আমাদের একজন অঙ্ক স্যার ছিলেন। তিনি খুব ভালো অঙ্ক জানতেন। ছাত্রদের বুঝাতেনও খুব সুন্দর করে। তিনি আমাকে ডাকতেন—। সর্প-শিশু! মাঝে মাঝেই মজা করার জন্যে আমাকে বলতেন, এই কর তো। হাঁ করে তোর কুচকুচে কালো জিহ্বাটা নড়াচড়া কর। দেখি কেমন লাগে।

আমি তাই করতাম। তিনি মজা পেয়ে হো হো করে হাসতেন। এই শিক্ষককে কি শ্রদ্ধেয় বলা ঠিক হবে?

আমি আপনার নামের আগে বহুল-ব্যবহৃত বিশেষণ ব্যবহার করেছি। এর চেয়ে সুন্দর কিছু ব্যবহার করতে পারলে আমার ভালো লাগত। আপনি অল্প কিছুদিন আমাদের ক্লাস নিয়েছেন। পড়াতেন এবনরমাল বিহেভিয়ার। প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকেই বললেন, আমি তোমাদের এবনরমাল বিহেভিয়ার পড়াতে এসেছি। পড়ানোর সময় কী করলে আমার আচরণকে তোমরা এবনরমাল বলবে?

আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। ছাত্র হিসেবে আমরা আপনাকে যাচাই করে নিতে চাচ্ছিলাম। আপনি বললেন, আচ্ছা, আমি যদি এই টেবিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেই—তা হলে কি তোমরা আমার আচরণকে এবনরমাল বলবে?

একজন ছাত্র বলল, হ্যাঁ।

আপনি বললেন, প্রাচীন গ্রিসে কিন্তু ক্লাসরুমে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার প্রচলন ছিল। তাঁরা মনে করত শিক্ষক সবচেয়ে সম্মানিত। তাঁকে দিতে হবে সবচেয়ে সম্মানের স্থান। তাদের কাছে টেবিলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়াটাকে অস্বাভাবিক আচরণ মনে হত না। কোনো শিক্ষক যদি মেঝেতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন সেইটা হতো অস্বাভাবিক। কাজেই অস্বাভাবিকের সংজ্ঞা কী? সংজ্ঞা হল—আমরা যা দেখে অভ্যস্ত তার বাইরে কিছু করাটাই অস্বাভাবিক।

মজার ব্যাপার হল মানুষ খুব অস্বাভাবিক একটি প্রাণী, অথচ আমরা মানুষের কাছে স্বাভাবিক আচরণ আশা করি। আচ্ছা, তোমরা একজন কেউ বল তো, মানুষ অস্বাভাবিক প্রাণী কেন?

ক্লাসের কেউ কথা বলল না। আপনি হাসিমুখে বললেন, মানুষ অস্বাভাবিক তার কারণ মানুষের মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ক একই সঙ্গে লজিক এবং এন্টি-লজিক নিয়ে কাজ করে। প্রতিটি প্রশ্নের দুটি উত্তর সে সমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে—একটি হ্যাঁ, অন্যটি না। সে মনে করে দুটি উত্তরই সত্য। তা হয় না।

প্রশ্ন : ঈশ্বর বলে কি কিছু আছেন? উদাহরণ দেই।
উত্তর : হ্যাঁ এবং না।
প্রশ্ন : আমরা কি শূন্য থেকে এসেছি?
উত্তর : হ্যাঁ এবং না।
প্রশ্ন : আমরা কি শূন্যতে মিশে যাব?
উত্তর : হ্যাঁ এবং না।

স্যার, আপনি ঝড়ের গতিতে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন এবং নিজেই উত্তর দিচ্ছেন—'হ্যাঁ এবং না।' আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত। ক্লাসের শেষে আপনার নাম হয়ে গেল 'হ্যাঁ-না' স্যার। বিশ্বাস করুন স্যার, এই নাম আমরা কখনো ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করি নি। এই নাম উচ্চারণ করেছি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায়।

লজিক ব্যবহার করার আপনার অস্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্গে আমাদের অল্প সময়ের ভেতর পরিচয় হল। শার্লক হোমস-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে কোনান ডায়ালের উপন্যাসের মাধ্যমে। শার্লক হোমস কল্পনার চরিত্র। আমরা বাস্তবের

একজন সাধারণ মানুষকে দেখলাম যার চিন্তাশক্তি এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা অতিমানব পর্যায়ের।

আপনার নিশ্চয়ই মনে নেই ক্লাসে আপনি একটি এ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন। আমরা সবাই এ্যাসাইনমেন্ট জমা দিলাম। আপনি আমার খাতা দেখে খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, তুমি ক্লাসের পরে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি দেখা করতে গেলাম। আপনি বললেন, এত সুন্দর হাতের লেখা কেন? আপনার প্রশ্নের ভঙ্গি এমন যেন সুন্দর হাতের লেখা হওয়া দূষণীয়। আমি বললাম, স্যার, সুন্দর হাতের লেখা কি অপরাধ?

আপনি হাসতে হাসতে বললেন, না, অপরাধ হবে কেন? তবে হাতের লেখার দিকে তুমি অস্বাভাবিক নজর দিচ্ছ। এটাই আমাকে বিস্মিত করছে। যাদের মনের ভেতরের অবস্থাটা থাকে বিশৃঙ্খল, এবং হয়তো বা অসুন্দর তারা বাইরের পৃথিবীটাকে সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল দেখতে চায়, যে কারণে হাতের লেখার মতো তুচ্ছ একটি বিষয়েও তাদের অপরিসীম মনোযোগী হাতে দেখা যায়। তোমার কি কোনো সমস্যা আছে?'

আমি বললাম, না।

আমি যে মিথ্যা বলছি আপনি তা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললেন। সেটা আমি আপনার হাসি দেখেই বুঝলাম। তবে আপনি আমাকে মিথ্যা বলার জন্যে অভিযুক্ত করলেন না। শান্ত গলায় বললেন, তোমার রিপোর্টটি পড়ে আমি আনন্দ পেয়েছি। সবাই বইপত্র ঘেঁটে রিপোর্ট তৈরি করার চেষ্টা করেছে। একমাত্র তুমিই—নিজে যা ভেবেছ তাই লিখেছ।

রিপোর্টের বিষয়বস্তু ছিল—'Strange dreams' বা অদ্ভুত স্বপ্ন। আমি আমার নিজের দেখা একটি অদ্ভুত স্বপ্ন লিখে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

আমি বললাম, স্যার, আমার ব্যাখ্যা কেমন হয়েছে?

আপনি বললেন, বায়াস্‌ড্‌ ব্যাখ্যা হয়েছে। যেহেতু তুমি স্বপ্নটি দেখেছ সেহেতু তুমি তা ব্যাখ্যা করেছ নিজের দিকে পক্ষপাতিত্ব করে। আমি অন্য ব্যাখ্যা করব।

'আপনার ব্যাখ্যা কী স্যার?'

আপনি বললেন, আমার ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে আমাকে জানতে হবে তুমি আসলেই এ জাতীয় স্বপ্ন দেখেছ কি না। মানুষ কখনো তার অভিজ্ঞতার বাইরে স্বপ্ন দেখে না, মানুষের কল্পনা অভিজ্ঞতার ভেতর সীমাবদ্ধ। একজন শিল্পীকে তুমি যদি দৈত্যের ছবি আঁকতে দাও—সে এক চোখ এক দৈত্যের ছবি আঁকবে—যার দুটি শিং আছে। তুমি খুব মন দিয়ে লক্ষ করলে দেখবে—দৈত্যের হাত-পা দেখাচ্ছে মানুষের মতো। কপালে চোখটা বিড়ালের মতো, মাথার শিং দুটি গরুর মতো। অর্থাৎ শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতাই কল্পনায় ব্যবহার করেছেন। দৈত্যের ছবিতে তুমি এক শিঙের দৈত্য পাবে কিন্তু তিন শিঙের দৈত্য সচরাচর পাবে না। কারণ মানুষ একশিঙের প্রাণী দেখেছে—যেমন গণ্ডার, দু শিঙের প্রাণী দেখেছ গরু, ছাগল কিন্তু তিন শিঙের প্রাণী দেখে নি। বুঝতে পারছ কী বলছি?

'পারছি স্যার।'

'কিন্তু তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ বলে লিখেছ এই স্বপ্ন তুমি দেখতে পার না। এই স্বপ্ন মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।'

আমি বললাম, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি স্যার।

আপনি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আচ্ছা তুমি যাও। যদি কখনো বড় ধরনের সমস্যায় পড় আমার কাছে এস।

আপনার কি মনে পড়ে আপনি এ জাতীয় একটি আশ্বাসবাণী আপনার একজন ছাত্রকে দিয়েছিলেন? হয়তো আপনার মনে নেই। আমি কিন্তু মনে করে রেখেছি। এবং সব সময় আপনার খোঁজ রেখেছি। গত সাত বছরে আপনি কোন কোন বাসায় ছিলেন, কতদিন ছিলেন—সব আমি একের পর এক বলে দিতে পারব। এর পরেও আমাকে আপনার অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

স্যার, সমস্যায় আমি এখন পড়ি নি। সমস্যায় পড়েছিলাম ছেলেবেলাতেই। সেই সমস্যা আমি আমার নিজের মতো করে সমাধান করার চেষ্টা করেছি। আমাকে সাহায্য করেছেন আমার একজন গৃহশিক্ষক। যিনি জীবিত নন। মৃত। মৃত মানুষটি এখনো আমাকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। আপনার মতো যুক্তিবাদী মানুষের কাছে নিতান্তই অযৌক্তিক একটি বিষয় উত্থাপন করলাম। করলাম, কারণ, আপনি বলেছেন মানুষ যে কোনো প্রশ্নের উত্তর হিসেবে হ্যাঁ এবং না দুটিই গ্রহণ করে। আমি আমার গৃহশিক্ষকের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। তার আগে আমার কিছু কথা জেনে নিতে হবে।

আমি নিজে আমার কথা ছাড়া ছাড়া ভাবে আপনাকে কিছু বলেছি। আপনি নিজেও অনুসন্ধান করে কিছু কিছু বের করার চেষ্টা করেছেন। এতে লাভ তেমন হয় নি। আপনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। আপনি আমার মার সঙ্গে কথা বলেছেন—তাঁকে আপনার নিশ্চয়ই সরল সাদাসিধে মহিলা মনে হয়েছে। তিনি মোটেই সে রকম নন। আমার বাবা মাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, কারণ তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন—আমার মা গলাটিপে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন। এতে আমার শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘদিন হাসপাতালে রেখে আমার চিকিৎসা করাতে হয়। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমার বয়স চার। চার বছরের স্মৃতি শিশুর মনে থাকে। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

স্যার, আপনি অনেকক্ষণ একনাগাড়ে আমার লেখা পড়লেন। এখন আপনি বিশ্রাম করুন। বাকিটা কাল পড়বেন।

৯

মিসির আলি মুশফেকুর রহমানের খাতা নিয়ে বসেছেন। এখন পড়ছেন শৈশব স্মৃতি। খুবই গোছানো লেখা। একটিও বানান ভুল নেই। কাটাকুটি নেই। বোঝাই যাচ্ছে এই অংশ অনেকদিন আগে লেখা। কাগজ পুরোনো হয়ে গেছে। লেখার কালি বিবর্ণ। তবে তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা।

কিছু কিছু জায়গা নতুন লেখা হয়েছে। সেগুলো পেনসিলে লেখা এবং তারিখ দেওয়া।

"মানুষের অনেক বৈচিত্র্যময় ছেলেবেলা থাকে। ম্যাক্সিম গোর্কির ছেলেবেলা কেটেছে তাঁর দাদিমার সঙ্গে পথে পথে ভিক্ষা করে। আমার ছেলেবেলার শুরুটা ছিল সরল ঘটনাবিহীন।

আমি ছিলাম সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন। বিরাট কম্পাউন্ডের বাড়ি। জেলখানার দেয়ালের মতো উঁচু দেয়াল। খেলার জন্যে অনেক জায়গা, তবুও আমাকে বন্দি থাকতে হত আমার নিজের ঘরে। বারান্দায় বা উঠোনে কিংবা বাড়ির পেছনে খেলতে গেলেই দোতলা থেকে আমার বাবা দেখে ফেলতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, ভেতরে যাও, ভেতরে যাও। আমি দৌড়ে নিজের ঘরে চলে যেতাম।

নিঃসঙ্গ শিশু নিজের খেলার সঙ্গী নিজেই তৈরি করে নেয়। আমার অনেক কাল্পনিক সঙ্গী-সাথী ছিল। এদের সঙ্গেই খেলতাম। গল্প করতাম। আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল খাটের নিচের অন্ধকার কোণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি খাটের নিচে বসে কাটিয়েছি। মাঝে মাঝে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তাম।

আমাকে দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল সর্দার চাচার। আপনাকে আগেই তাঁর কথা বলেছি। তিনি সারাক্ষণ আমাকে চোখে চোখে রাখতেন। বাড়িতে সর্দার চাচা ছাড়াও আরো কিছু মানুষজন ছিল, মালি ছিল। দারোয়ান ছিল। রান্নার লোক ছিল। তাদের কেউ আমার কাছে আসতে পারত না। সর্দার চাচা বাঘের মতো লাফিয়ে উঠতেন।

বাবা সর্দার চাচাকে খানিকটা সমীহ করতেন। মাঝে মাঝে সর্দার চাচা আমাকে বাগানে খেলার জন্যে নিয়ে যেতেন। কুয়োতলায় নিয়ে যেতেন ছবি আঁকার জন্যে। দোতলা থেকে বাবা আমাকে দেখতে পেতেন, কিন্তু ভেতরে যাও ভেতরে যাও বলে চেঁচাতেন না।

যে জন্ম থেকেই নিঃসঙ্গ সে নিঃসঙ্গতার কষ্ট জানে না। আমিও জানতাম না। মার জন্যে আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি আমার ভেতর কোনো সুখস্মৃতি তৈরি করে যেতে পারেন নি। মার কথা মনে হলেই ভয়ংকর এক স্মৃতি ধক করে মনে হত। পরিষ্কার দেখতে পেতাম মা আমার গলা চেপে ধরে আছেন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ছোট্ট বুক ধক করে ফেটে যাবে। এই অবস্থা থেকে আমার বাবা উদ্ধার করেন। তিনিই আমাকে কোলে নিয়ে দৌড়ে ডাক্তারের কাছে যান।

আমি যে কদিন হাসপাতালে ছিলাম, সে কদিন আমার বাবা আমার পাশেই ছিলেন। যতবার আমি চোখ মেলেছি ততবারই আমি দেখেছি বাবা ব্যথিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হাসপাতালের ঐ কটি দিনই ছিল আমার শৈশবের শ্রেষ্ঠতম সময়।

পারিবারিক অবস্থার কথা বলি—আমরা কয়েক পুরুষের বনেদি ধনী। মুসলমানরা তিন পুরুষের বেশি তাঁদের ধন ধরে রাখতে পারে না। আমার বাবা হলেন তৃতীয় পুরুষ। যৌবনে তিনি ব্যবসাপাতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। বেশিরভাগ ব্যবসাই বিক্রি করে নগদ টাকা করলেন। টাকা ব্যাংকে জমা করলেন। কয়েকটা বড় বড় বাড়ি কিনলেন। শহরে জমি কিনলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এইসব জমি হীরের দামে বিক্রি হবে।

আমার বাবাও আমার মতোই নিঃসঙ্গ ছিলেন। তিনি কারো সঙ্গে মিশতেন না। আমি আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজনকে এ বাড়িতে আসতে দেখি নি। আত্মীয়দের

বাড়িতে বাবার যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। বাবা খানিকটা অসুস্থও ছিলেন। আপনাকে হয়তো ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে—উনি শব্দ সহ্য করতে পারতেন না। শব্দ শুনলেই তাঁর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হত। তা ছাড়া তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল সবাই তাকে খুন করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। চার দেয়ালের বাইরে বের হলেই তাঁকে খুন করা হবে। তিনি ঘরের বাইরে বের হওয়া পুরোপুরি ছেড়ে দিলেন। কাউকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। দুদিন পরপর দারোয়ান বদলাতেন, মালি বদলাতেন। একসময় কুকুর পুষতে শুরু করলেন। প্রথমে এল সরাইলের দুটি কুকুর। গ্রে হাউন্ড জাতীয় কুকুর—ভয়ংকর রাগী। মালি এবং দারোয়ানের সংখ্যা কমতে লাগল, কুকুরের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

বাবার সঙ্গে আমার কোনো রকম যোগাযোগ ছিল না তবে কালেভদ্রে তিনি আমাকে তাঁর দোতলার ঘরে ডেকে নিয়ে যেতেন। সর্দার চাচা আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। বাবা আমার সঙ্গে কথা বলতেন নিচু গলায় এবং কিছুটা আদুরে স্বরে; তবে কখনো আমার দিকে তাকাতেন না। কথাবার্তার একটা নমুনা দিচ্ছি :

বাবা বললেন, কেমন আছিস?

আমি বললাম, ভালো।

'বোস।'

আমি কোথায় বসব বুঝতে পারছি না। ঘরে একটা মাত্র খাট। সেখানে বসার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ বাবা বসে আছেন। তা ছাড়া খাটের এক মাথায় দোনলা বন্দুক। বাবা সব সময় গুলিভরা বন্দুক মাথার কাছে রাখতেন। আমি ইতস্তত করছি—বাবা খাটের এক অংশ দেখিয়ে বসার জন্যে ইশারা করলেন। আমি বসলাম।

'পড়াশোনা হচ্ছে?'

'জি।'

'বাড়িতে মাস্টার আসে?'

'জি।'

(সেই সময় আমার জন্যে প্রাইভেট মাস্টার রাখা হয়েছে। তিনি বাসায় এসে আমাকে পড়িয়ে যান। তাঁর কথা আপনাকে বলেছি। এবং টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে।)

'মাস্টারটা কেমন?'

'ভালো।'

'মোটেই ভালো না। অতি বদলোক। সাবধানে থাকবি। বদ মতলবে ঢুকেছে। খুনখারাবি করবে।'

এটা হচ্ছে বাবার সাধারণ কথার একটি। পৃথিবীর সব মানুষই তাঁর কাছে বদমানুষ। পৃথিবীর সবাই খুনখারাবির মতলব নিয়ে ঘুরছে। আমি বাবার কথার কোনো জবাব দিলাম না। মাথা নিচু করে শুনে গেলাম।

বাবা বললেন, তোকে সাবধান করার জন্যেই ডেকেছি। খুব সাবধান থাকবি। খুব সাবধান।

'জ্বি আচ্ছা।'

'তোর মাস্টারের দরকারই বা কী? নিজে নিজে পড়তে পারবি না?'

'আপনি বললে পারব।'

'এই ভালো। নিজে নিজে পড়। আর তোর যদি পড়াশোনা না হয় তা হলেও ক্ষতি নেই। টাকাপয়সা আমি যা রেখে যাব দুহাতে খরচ করেও শেষ করতে পারবি না। আমার মৃত্যুর পর দুহাতে খরচ করবি। জায়গাজমি সব বিক্রি করে দিবি। তোর কোনো টাকাপয়সা জমিয়ে রাখার দরকার নাই। বুঝতে পারছিস?'

'পারছি।'

'আচ্ছা যা। আমি সর্দারকে বলে দেব সে যেন মাস্টারকে আসতে নিষেধ করে।'

'আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা—রাতে-বিরাতে দরজা খুলে বের হবি না। কুকুরগুলো ভয়ংকর—এরা তোকে খেয়ে ফেলবে।'

কুকুরগুলো ছিল সত্যি ভয়ংকর। রাতে যতবার ঘুম ভাঙত, শুনতাম, এরা চাপা গর্জন করছে। একটা কুকুর রোজ রাতে আমার দরজা আঁচড়াত। রাতে একবার ঘুম ভাঙলে আর ঘুমুতে পারতাম না।

'আমি কি এখন চলে যাব?'

'আচ্ছা যা।'

বাবা বালিশ উঁচু করে বালিশের নিচ থেকে চকচকে একটা দশ টাকার নোট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—বাদাম কিনে খাস।

যতবার বাবার কাছে গিয়েছি ততবারই বাদাম কিনে খাবার জন্যে একটা করে চকচকে দশ টাকার নোট পেয়েছি। বাদাম অবিশ্যি খাওয়া হয় নি। আমাকে দোকানে নিয়ে যাওয়া নিষেধ ছিল। টাকাগুলো আমি একটা কৌটায় জমা করে রেখেছি। যতবার টাকাগুলো দেখি ততবারই ভালো লাগে।

বাবার হুকুমে সর্দার চাচা মাস্টার সাহেবকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেন। তারপরও তিনি মাঝে মধ্যে আসতেন। অনেকক্ষণ থাকতেন। এর মধ্যে একদিন এসে আমার হাতে একটি চিঠি দিলেন। সেই চিঠি আমার মার লেখা। মা আমার সঙ্গে দুটা কথা বলতে চান। আমি কি তাঁর কাছে যেতে পারব?

আমি মাস্টার সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে পরদিন বাড়ি থেকে বের হলাম। ধরা পড়লাম সর্দার চাচার হাতে। বাকি ঘটনা আপনি জানেন। ঐ অংশটি দ্বিতীয়বার বলতে চাই না। যে কথাটা আপনাকে আগে বলা হয় নি তা হচ্ছে—ঐ চিঠি আমার মার লেখা ছিল না। ঐ চিঠি মাস্টার সাহেবের লেখা।

মিসির আলি লক্ষ করলেন শেষ পাতাটি দুদিন আগে লেখা হয়েছে। এবং প্রচুর কাটাকুটি করা হয়েছে। যেন মুশফেকুর রহমান বুঝতে পারছে না—কী লিখবে। বাংলা ভাষাটাও মনে হচ্ছে ভাব প্রকাশের জন্যে সে উপযুক্ত মনে করছে না। কারণ শেষ পাতাটা ইংরেজিতে লেখা। শেষ পাতার বক্তব্য হল—আমি ভয় পাচ্ছি, বাবা সম্পর্কে আমি আমার মনের ভাব ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারি নি। আমি তাঁকে অসম্ভব ভালবাসি।

১০

মিসির আলি তৃতীয় চ্যাপ্টার পড়ছেন। এই অংশটি নতুন লেখা হয়েছে। তারিখ দেখে মিসির আলি বুঝতে পারছেন—পার্কে তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর—এই লেখা শেষ করা হয়েছে। পুরা লেখাটা ইংরেজিতে লেখা। শিরোনাম—I and We. বাংলা করলে হয়তো হবে—আমি এবং আমরা।

আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয়েছে আমি ভীতু? একজন মানুষকে দেখেই বলে দেওয়া সম্ভব না—সে সাহসী না ভীতু। তা ছাড়া একজন ভীতু মানুষকেও ক্ষেত্রবিশেষে খুব সাহসী হতে দেখা যায়।

আমি ভীতু না। কখনোই ছিলাম না। বাবাকে ভয় করতাম, বাবার কুকুরগুলোকে ভয় করতাম। বাবা যে বন্দুক নিয়ে মাঝে মাঝে দোতলায় বের হতেন সেই বন্দুকটাকে ভয় করতাম। আমার ভয় এই তিনটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ও না, আরেকটি ভয়ের ব্যাপার আমার মধ্যে ছিল। আমাদের পুরো বাড়ি মাঝে মধ্যে এক ধরনের বিচিত্র শব্দ করে নড়ে উঠত। সর্দার চাচা বলতেন, বাড়ি মাঝে মধ্যে কাঁদে, হাসে। এতে ভয়ের কিছু নাই।

অন্ধকারকে ভয় পাওয়া আমার মধ্যে ছিল না। পুরোনো ঢাকায় প্রায়ই ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। হয়তো রাতে একা ঘরে বসে আছি—হঠাৎ পুরো অঞ্চলের কারেন্ট চলে গেল। গাঢ় অন্ধকারে আমি একা বসে আছি। নিজের হাতও দেখা যাচ্ছে না—এই অবস্থাতেও আমি কখনো ভয় পাই নি।

ভূতপ্রেতে ভয় পাওয়ার ব্যাপারও আমার মধ্যে ছিল না। কারণ ভয়ের গল্প আমাকে কেউ শোনায় নি। কেউ আমাকে বলে নি ঘরের কোনায় বাস করে কোণী ভূত। খাটের নিচে উবু হয়ে বসে থাকে কন্দকাটা। গভীর রাতে সে তার সরু বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত খাটের নিচ থেকে বের করে শুয়ে থাকা মানুষটাকে ছুঁয়ে দেখতে চেষ্টা করে। শিশুরা সচরাচর যেসব কারণে ভয়ে কাতর হয়ে থাকে সেসব আমার ছিল না। তা ছাড়া অল্পবয়সেই যুক্তি ব্যবহার করতে শিখি। ভয়কে পরাজিত করতে যুক্তির মতো বড় অস্ত্র আর কী হতে পারে? ধরুন—গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল।

আমি শুনলাম, বাথরুমে খটখট শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন হাঁটছে। আতঙ্কে অস্থির না হয়ে আমি যুক্তি দাঁড় করলাম নিশ্চয় নিশ্চয়ই ইঁদুর। কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম। ইঁদুরের কিচকিচ শব্দ শোনা গেল। যুক্তির ওপর নির্ভর করার ফল হাতে হাতে পেলাম। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে গেলাম। ভয়ে অস্থির হয়ে চেঁচামেচি করলাম না। চেঁচামেচি করে অবিশ্যি কোনো লাভও হত না। দশ বছর বয়স হবার পরই আমি থাকতাম একা। সর্দার চাচা থাকতেন গেটের কাছে। দারোয়ান এবং মালিদের জন্যে যে ঘরগুলো আছে—তার একটিতে।

মাস্টার সাহেবের মৃত্যুর প্রায় মাস দুই পরের ঘটনা। খাওয়াদাওয়া করে ঘুমুতে গেছি। সর্দার চাচা বললেন, ছিটকিনি লাগাও।

আমি ছিটকিনি লাগালাম। সর্দার চাচা তাঁর অভ্যাসমতো বললেন, ভালো কইরা দেখ ঠিকমতো লাগছে কি না।

আমি আরেকবার দেখলাম। ঠিকমতোই লেগেছে।

'এখন বাতি নিভাও। বাতি নিভাইয়া ঘুমাও।'

আমি বাতি নিভিয়ে চারদিক অন্ধকার করে ঘুমুতে গেলাম। আপনাকে বলা হয় নি, আমার বাবা শব্দ যেমন সহ্য করতে পারতেন না, তেমনি আলোও সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর ধারণা, আলোতে কুকুর ভালো দেখতে পায় না। অন্ধকারে ভালো দেখে। কাজেই রাত এগারোটার পর এ বাড়ির সব বাতি নেভানো থাকতে হবে। একটি বাতিও জ্বলবে না।

রাত এগারোটা হয়েছে। সব বাতি নিভে গেছে। আমি মশারির ভেতর শুয়ে আছি। আমার বালিশের কাছে দু ব্যাটারির একটা টর্চ লাইট। অন্য সময় বিছানায় যাওয়ামাত্র ঘুম এসে যায়। আজ ঘুম আসছে না। জেগে আছি। হঠাৎ পুরো বাড়ি কেঁপে উঠল। বিচিত্র শব্দ হল। বাড়ি কেঁদে উঠল কিংবা হেসে উঠল। বুকের ভেতর ধক করে উঠল। আর তখন লক্ষ করলাম কুকুরগুলো একে একে আমার ঘরের দরজার বাইরে জড়ো হচ্ছে। এরা চাপা গর্জন করছে। দরজা আঁচড়াচ্ছে। এরা এরকম করছে কেন?

আমার মনে হল খাটের নিচে কী যেন নড়ে উঠল। কেউ যেন নিশ্বাস ফেলল। আমি টর্চ লাইট জ্বালিয়ে খাট থেকে নেমে এলাম। বসলাম খাটের পাশে—টর্চ লাইট ধরলাম।

প্রথমে দেখলাম দুটা চকচকে চোখ। পশুদের চোখে হঠাৎ আলো ফেললে যেমন চকচক করতে থাকে। এই চোখ দুটিও ঠিক সেরকমই চকচক করছে। তারপর মানুষটাকে দেখলাম। নগ্ন একজন মানুষ। খাটের নিচে কুঁজো হয়ে বসে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। যেন টর্চ ফেলে তাকে দেখায় সে আনন্দিত।

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, কে?

লোকটা জবাব দিল না। নিঃশব্দে হাসল। তখনই আমি তাকে চিনলাম। আমার প্রাইভেট স্যার।

তখনো আমার এই বোধ হয় নি যে আমি ভয়ংকর একটি দৃশ্য দেখছি। যাকে দেখছি সে মানুষটি জীবিত নয়—মৃত। একজন মৃত মানুষ খাটের নিচে কুঁজো হয়ে বসে থাকতে পারে না। আমি একটি ভয়াবহ অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখছি।

আমি শান্ত ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে পড়লাম। যেন কিছুই হয় নি। বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। টর্চের আলো নিভিয়ে দিলাম। আর তখনই সীমাহীন ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করল। এই ভয়ের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় ছিল না। এ ভয়ের জন্ম পৃথিবীতে নয়—অন্য কোথাও।

তীব্র ভয়ের পরপরই একধরনের অবসাদ আছে। ভয়ংকর সত্যকে সহজভাবে নিতে ইচ্ছা করে। ফাঁসির আসামি মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাবার পর আতঙ্কে অস্থির হয়। সেই আতঙ্ক দ্রুত কমে যায়। মৃত্যুর ক্ষণ যখন উপস্থিত হয় তখন সে সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে যায় ফাঁসির মঞ্চের দিকে। এমন কোনো ফাঁসির আসামির কথা জানা নেই—যাকে কোলে করে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যেতে হয়েছে।

আমি মাস্টার সাহেবকে গ্রহণ করলাম সহজ সত্য হিসেবে। এ ছাড়া আমার উপায়ও ছিল না। মাস্টার সাহেব বাস করতে শুরু করলেন আমার খাটের নিচে। দিনের বেলা

কখনো তাঁকে দেখা যায় না। সন্ধ্যাবেলা না। রাতে শোবার সময় খাটের নিচে তাকাই। তখনো কেউ নেই। শুধু গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলেই তীব্র তামাকের গন্ধ পাই। বুঝতে পারি খাটের নিচে তিনি আছেন। কুকুরগুলো দরজা আঁচড়াতে থাকে। তিনি কিছু কিছু কথাও বলেন। এবং আশ্চর্যের কথা—আমি জবাব দেই। যেমন—

'তুমি জেগেছ?'

'হুঁ।'

'কটা বাজে?'

'জানি না।'

'ভয় লাগছে?'

'না।'

'পড়াশোনা হচ্ছে ঠিকমতো?'

'হচ্ছে।'

'তোমার সর্দার চাচাকে আমার কথা বলেছ?'

'না।'

'কাউকেই বল নি?'

'না।'

'ইচ্ছে করলে বলতে পার। অসুবিধা নেই।'

'ইচ্ছে করে না।'

'আমি কেন তোমার খাটের নিচে থাকি জান?'

'না।'

'জানতে চাও?'

'না।'

'জানতে না চাইলে জানতে হবে না। সবকিছু জানতে চাওয়া ভালো না। না জানার মধ্যেও আনন্দ আছে। আছে না?'

'জি আছে।'

'ইংরেজি একটা প্রবাদ আছে। তোমাকে একবার পড়িয়েছিলাম। মনে আছে?'

'আছে।'

'বল তো দেখি।'

'মনে পড়ছে না।'

'মনে করার চেষ্টা কর। ইংরেজি বেশি বেশি করে পড়বে। অর্থের মানে বুঝতে না পারলে ডিকশনারি দেখবে।'

'আচ্ছা।'

'তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছ—কাজেই আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। আমি তোমাকে সাহায্য করব। পরামর্শ দেব।'

'আচ্ছা।'

'আমার সম্বন্ধে তোমার কি কিছু জানতে ইচ্ছে করে?'

'না।'

'জানতে ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস কর। আমি বলব। আমি এমন সব বিষয় জানি যা জীবিত মানুষ জানে না।'

'আমি কিছু জানতে চাই না।'

'ঘুম পাচ্ছে?'

'হুঁ।'

'ঘুমিয়ে পড়। মশারি ঠিকমতো গোঁজা হয়েছে?'

'হুঁ।'

'বড্ড মশা। তুমি ঘুমাও। টর্চ লাইটটা কি হাতের কাছে আছে?'

'আছে।'

'একবার জ্বালিয়ে দেখে নাও ব্যাটারি ঠিক আছে কিনা।'

'ঠিক আছে।'

'তোমার সর্দার চাচাকে বলে আরেক জোড়া ব্যাটারি এনে রাখবে।'

'জি আচ্ছা।'

'ঘুমিয়ে পড়।'

'জি আচ্ছা।'

'গায়ে চাদর দিয়েছ কেন? চাদর সরিয়ে ফেল। গরমে চাদর–গায়ে ঘুমুলে গায়ে ঘামাচি হবে।'

আমি চাদর সরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি। আবার ঘুম ভাঙে। তীব্র তামাকের গন্ধ পাই। আমার ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারেন। ভরাট গলায় বলেন, ঘুম ভেঙেছে?

'হুঁ।'

'অসহ্য গরম পড়েছে। ঘন ঘন ঘুম ভাঙারই কথা। পানির পিপাসা হয়েছে?'

'না।'

'বাথরুমে যাবে?'

'না।'

'গল্প শুনতে চাও?'

'না।'

'আমি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তা করছি। এই সংসারে তুমি খুব শিগগিরই একা হয়ে যাবে। তোমার বাবা বেশিদিন বাঁচবেন না। সর্দার চাচাও থাকবেন না। তুমি হবে একা। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'তোমরা বাবা যে মারা যাবেন এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?'

'হচ্ছে।'

'কষ্ট হওয়ারই কথা। তবে মৃত্যু তাঁর জন্যে মঙ্গলজনক হবে। কিছু মানুষের জন্যে মৃত্যু মঙ্গলময়। উনি অসুস্থ। অসুস্থতা ক্রমেই বাড়ছে। উনার যে অসুখ সেটা আরো বেড়ে গেলে—চারদিকে বিকট সব জিনিস দেখতে পান। সেই সব ভয়ংকর জিনিস দেখার কষ্ট মৃত্যু–যন্ত্রণার চেয়েও শতগুণে বেশি। মৃত্যু–যন্ত্রণা একবার হয়। কিন্তু এই

যন্ত্রণা হতেই থাকে। শেষ হয় না। ধাপে ধাপে বাড়ে। তোমার মনে হয় না মৃত্যু তাঁর জন্যে ভালো?'

'জি মনে হয়।'

'তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের সামান্য হলেও সাহায্য করা উচিত বলে আমি মনে করি। সাহায্য করা উচিত না?'

'জি উচিত।'

'কীভাবে সাহায্য করা যায় তুমি বল তো?'

'আমি জানি না।'

'আমার তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। আমি ছায়া মাত্র। আমি শুধু বুদ্ধি দিতে পারি। কিছু করতে পারি না। তবে আমার ক্ষমতা বাড়ছে। ছায়া জগতের ছায়াদের ক্ষমতা বাড়ে এবং কমে। যতই তুমি আমার ওপর বিশ্বাস করবে ততই আমার ক্ষমতা বাড়বে। তোমার সর্দার চাচা যদি আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে তা হলে আমার ক্ষমতা অনেকগুণে বেড়ে যাবে। তখন আমি ছোটখাটো কাজ করতে পারব। তুমি কি মনে কর না আমার ক্ষমতা বাড়া উচিত?'

'মনে করি।'

'বুঝেছ তন্ময়, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার ক্ষতির চেষ্টা কখনো করব না। প্রচুর ক্ষমতা হবার পরও করব না। এখন ঘুমাও।'

'আচ্ছা।'

'ঘুম কি আসছে না?'

'না।'

'তা হলে এস আরো কিছুক্ষণ গল্প করি। তোমার বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে কী করা যায় তা নিয়ে ভাবি।'

'ভাবতে ইচ্ছা করছে না।'

'ভাবলে কোনো দোষ নেই। ভাবলেই যে করতে হবে তা তো না। আমরা কত কিছু ভাবি। ভাবলেই যে করতে হবে তা তো না। আমরা সব সময় যা ভাবি তা কি করি?'

'না।'

'বেশ এস, তা হলে ভাবি। তুমি কি কলা খাও তন্ময়?'

'খাই।'

'রাতে শোবার আগে এই কলার খোসাগুলো তুমি নিশ্চয়ই দোতলার সিঁড়ির মাথায় রেখে আসতে পার। পার না?'

'হুঁ।'

'এটা তো তেমন কোনো অন্যায় না। ঝুড়িতে না ফেলে সিঁড়ির মাথায় ফেলেছ। মনের ভুলেও তো ফেলতে পারতে। পারতে না?'

'হুঁ।'

'তোমার বাবা তো রাতে বারান্দায় হাঁটেন। অন্ধকার বারান্দা। মনের ভুলে তিনি কলার খোসায় পা ফেলতে পারেন। পারেন না?'

'হুঁ, পারেন।'

'কলার খোসায় পা পড়লে অনেক কিছুই হতে পারে। তিনি সামান্য হোঁচট খেতে পারেন। বারান্দায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে পারেন। আবার সিঁড়ির একেবারে নিচে পড়ে যেতে পারেন। পারেন না?'

'হুঁ, পারেন।'

'কোনটা ঘটবে আমরা জানি না। কবে ঘটবে তাও জানি না। প্রথম দিনেই যে ঘটবে তা তো না। প্রথম দিনে কিছু নাও ঘটতে পারে। দিনের পর দিন হয়তো আমাদের কলার খোসা রাখতে হবে। পারবে না? কথা বলছ না কেন? পারবে না?'

'পারব।'

'বাহ্ ভালো। ভেরি গুড। এখন ঘুমাও। আরাম করে ঘুমাও। ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। ঘুম ভালো হবে।'

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার বাবা মারা গেলেন কলার খোসায় পা হড়কে। তিনি সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যান। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা পান। দুদিন হাসপাতালে অচেতন অবস্থায় থেকে তৃতীয় দিনের দিন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর জ্ঞান ফেরে। তিনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন—আমার ছোট্ট বাচ্চাটাকে কে দেখবে?

বাবার মৃত্যুর পর অনেকদিন আমার খাটের নিচে কেউ ছিল না। কতদিন তা বলতে পারব না। আমি এক ধরনের আচ্ছন্ন অবস্থার ভেতর ছিলাম। সময়ের হিসাব ছিল না। সারা দিন কুয়াতলায় ছবি আঁকতাম। সর্দার চাচা কুয়ার উপর বসে বিষণ্ন চোখে আমার ছবি আঁকা দেখতেন। একসময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, সৌন্দর্য হইছে। এখন ধুইয়া ফেলি।

আমার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য দীর্ঘদিন পর আমার মা উপস্থিত হলেন। সর্দার চাচা কঠিন গলায় তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি শুনলাম তিনি আমার মাকে বলছেন—খবরদার, এই দিকে পাও বাড়াইবেন না। পাও বাড়াইলে কুত্তা দিয়া খাওয়াইয়া দিমু।

বাবা কাগজপত্রে আমার জন্যে অভিভাবক নিযুক্ত করে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি হলেন বাবার ম্যানেজার—ইসমাইল চাচা। পৃথিবীতে কঠিন মানুষ যে কজনকে আমি চিনি তিনি তাঁর একজন। তিনি কাজ ছাড়া অন্য কিছু কখনো ভালবেসেছেন বলে আমি জানি না। বাবার মৃত্যুর পর একদিন আমাদের এ বাড়িতে তিনি এলেন। আমাকে একটিও সান্ত্বনার কথা বললেন না। যন্ত্রের মতো গলায় বললেন, তুমি কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবে না। স্কুলে যাওয়া শুরু কর। পড়াশোনা কর। অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তার কিছু নাই। সেই চিন্তা আমি করব। তোমার মা, তোমার অভিভাবকত্বের জন্যে কোর্টে মামলা করেছেন। মামলায় লাভ হবে না। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে ছোটবেলায় তিনি তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তার পরেও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি—তুমি কি চাও তোমার মা তোমার অভিভাবক হোক?

আমি বললাম, না।

'বেশ। আমি তা হলে যাই। কোর্টে তোমাকে যেতে হতে পারে। তবে আমার ধারণা, তোমার মা মামলা তুলে নিবেন। উনাকে মোটা টাকার লোভ দেখানো

হয়েছে। সেই লোভ তিনি সামলাতে পারবেন না। তুমি কি টাকার পরিমাণ জানতে চাও?'

আমি বললাম, না।

'সেই ভালো। টাকাপয়সা থেকে দূরে থাকাই ভালো। তোমার বাবা আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দায়িত্ব আমি পালন করব। বাকি আল্লাহ্র ইচ্ছা।'

যখন সব মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, যখন আমি ভাবতে শুরু করেছি খাটের নিচে আর কখনোই কাউকে দেখব না। আমার ভেতর এক ধরনের অসুখ তৈরি হয়েছিল, অসুখ সেরে গেছে তখনই এক রাতে খাটের নিচ থেকে তীব্র তামাকের গন্ধ পেলাম। আমি ফিসফিস করে বললাম, কে?

মাস্টার সাহেবের শ্লেষ্মাজড়িত ভারী গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—আমি তন্ময়, আমি। তুমি কেমন আছ?

'ভালো।'

'আমি বুঝতে পারছি—ভালো আছ। ভালো আছ বলেই তোমাকে বিরক্ত করছি না। আমি কেমন আছি তা তো জিজ্ঞেস করলে না। জিজ্ঞেস কর।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'আনন্দে আছি। আমার ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। ছায়াজগতের এই এক মজা। ক্ষমতা যখন বাড়ে দ্রুত বাড়ে। আমি এখন তোমার বাবার দোতলার ঘরটায় থাকি। আরামে থাকি। নির্জনতা ভালো লাগে। একা থাকার মজাই অন্য রকম। মাঝে মাঝে তোমার বাবার টেলিফোন বেজে ওঠে। টেলিফোন রিসিভার তুলে কথা বলতে ইচ্ছে করে। বলতে পারি না। এত ক্ষমতা আমার এখনো হয় নি। তবে দেরি নেই, হবে। খুব শিগগিরই হবে। তন্ময়!'

'জি।'

'তুমি একবার আমাকে সাহায্য করেছ—আরেকবার একটু সাহায্য করবে না? সামান্য সাহায্য। তা হলে তোমার সঙ্গে আমি একটা চুক্তিতে যাব। আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। তুমি তোমার মতো থাকবে। আমি থাকব আমার মতো। আর সাহায্য যদি না কর তা হলে বাধ্য হয়ে তোমাকে বিরক্ত করতে হবে। তুমি কি চাও আমি তোমাকে বিরক্ত করি?'

'না।'

'তা হলে তুমি সাহায্য কর। কাজটা খুব সহজ। তুমি যখন কুয়োতলায় ছবি আঁক, তখন তোমার সর্দার চাচা কুয়ার পাড়ে বসে থাকেন। থাকেন না?'

'হুঁ।'

'বসে বসে ঝিমাতে থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁর চোখও বন্ধ হয়ে যায়। যায় না?'

'হ্যাঁ যায়।'

'এই সময় সামান্য ধাক্কা দিলেই কিন্তু উনি কুয়ার ভেতর পড়ে যাবেন। অনেক দিনের পুরোনো কুয়া। বিষাক্ত গ্যাস জমে আছে—একবার কুয়ার ভেতর পড়ে গেলে বাঁচার কোনো উপায় নেই। পারবে না?'

'না।'

'দেখ তন্ময়, এটা না পারলে কী করে হবে? না পারলে আমি তোমাকে ক্রমাগত বিরক্ত করতে থাকব। রাতে ঘুম ভাঙলে দেখবে আমি তোমার পাশেই নগ্ন হয়ে শুয়ে আছি। সেটা কি তোমার ভালো লাগবে?'

'না।'

'তা হলে আমি যা বলছি তাই তুমি করবে। ঠিক না তন্ময়?'

'হ্যাঁ।'

'গুড বয়। ভেরি গুড বয়।'

তার দুদিন পরই কুয়ার ভেতর পড়ে সর্দার চাচা মারা যান। বাবার ম্যানেজার ইসমাইল চাচা তখন থাকতে আসেন আমার সঙ্গে। তিনি তাঁর মেয়েটিকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন।

ইসমাইল চাচা বিপত্নীক ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে—মেয়েটির নাম রানু। তিনি রানুকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে উঠে এলেন। দুটা ঠেলাগাড়িতে করে তাঁদের মালপত্র চলে এল। বাড়ির এক অংশের পরপর তিনটি ঘর তিনি বেছে নিলেন। একটি তাঁর শোবার ঘর। একটি বসার। একটিতে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। যে ব্যবস্থাগুলো তিনি করছেন সে সম্পর্কে আমাকে কিছুই বললেন না। তিনি বাড়িতে এসে উঠলেন, সকাল দশটার দিকে, দুপুরের মধ্যে বড় ধরনের কিছু পরিবর্তন হল। যেমন তিনি সব কটি কুকুর বিদেয় করে দিলেন। তিনি বললেন, কুকুরের দরকার নেই। কুকুর দেখলে ভয় লাগে। বাড়ির পেছনের কুয়া বন্ধ করে দিলেন। কয়েক ট্রাক মাটি চলে এল। সন্ধ্যার মধ্যে কুয়া বুজিয়ে দেওয়া হল। সন্ধ্যার পর এই বাড়ির বাইরের বাতিগুলো আবার জ্বলল। তিনি অনেকক্ষণ একা একা মোড়া পেতে বাগানে রইলেন।

আমার সঙ্গে কথা হল রাতে ভাত খাবার সময়। আমাকে বললেন, তোমার নাবালক অবস্থায় আমি তোমার অভিভাবক। কাজেই তোমার আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি তোমার জন্যে যা ভালো মনে করি তা করব। তোমার যেদিন আঠারো বছর বয়স হবে সেদিন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। নারায়ণগঞ্জে আমার একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। ঐ বাড়িতে গিয়ে উঠব। আমি বললাম, জি আচ্ছা।

তিনি বললেন, রানুকে আমি নিয়ে এসেছি, তোমার একজন কথা বলার লোক হল। তোমার কোনো কথা যদি আমাকে সরাসরি বলতে ইচ্ছা না করে—রানুকে বললেই আমি শুনব।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

'শীত এসে যাচ্ছে—বাড়ির চারদিকে এত খালি জায়গা আমি চাই তুমি ফুলের বাগান কর। কীভাবে মাটি তৈরি করতে হয়। কীভাবে বীজ পুঁততে হয়—রানু তোমাকে দেখিয়ে দেবে। ও জানে। নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে আমাদের খুব সুন্দর ফুলের বাগান ছিল।'

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

রানু হেসে ফেলে বলল, বাবা এই ছেলেটা জি আচ্ছা ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না। তুমি যাই বলবে, সে বলবে—জি আচ্ছা। তুমি যদি তাকে বল, তুমি সকালে উঠে

তোমার মাথাটা কামিয়ে ফেলবে, তা হলে সে বলবে, জি আচ্ছা। ইসমাইল সাহেব বললেন, মা রানু এই ছেলে এখন থেকে তোমার ভাই। বোনরা ভাইকে যেভাবে আগলে রাখে তুমি তাকে সেইভাবে আগলে রাখবে।

রানু অবিকল আমার গলার স্বর নকল করে বলল, "জি আচ্ছা।" ইসমাইল চাচা হাসতে গিয়েও হাসলেন না। কিন্তু আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। এমন প্রাণ খুলে আমি অনেকদিন হাসি নি।

আমার নতুন জীবন শুরু হল। আনন্দময় জীবন। সেই শীতে আমি এবং রানু মিলে সুন্দর বাগান করলাম। কসমস, ডালিয়া, গাঁদা ফুলের গাছ। ইসমাইল চাচা নিজে শুরু করলেন গোলাপের চাষ। তিনি একজন মালি রাখলেন। খুব নাকি এক্সপার্ট মালি, নাম রওশন মিয়া। সেই এক্সপার্ট মালিকে দেখা গেল খুরপি হাতে ঘুরে বেড়ায়। কাছে গেলেই ফুল বিষয়ে একটি গল্প বলে—বুঝলেন ভাইডি আল্লাহতালা তো বেহেশত বানাইলেন—সেই বেহেশতে কিন্তু কোনো ফুল গাছ নাই। তিনি বললেন, আমার বেহেশতে আমি ফুল দেব না। ফুল দিলে ফুল হবে মানুষের চেয়ে সুন্দর। এটা ঠিক না। মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু আমি বেহেশতে রাখব না। বুঝলেন ভাইডি এই জন্যে বেহেশতে ফুল গাছ নাই, ফুল নাই।

রানু বলল, চুপ কর মিথ্যুক।

রওশন কিছু বলতে গেলেই রানু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলত, চুপ কর মিথ্যুক। আমি হো হো করে হাসতাম।

আমি হাসি ভুলে গিয়েছিলাম। হাসি পেলেও কখনো হাসতাম না। সব সময় মনের ভেতর থাকত হাসলেই ওরা আমার কালো জিব দেখে ফেলবে।

রানু নামের এই অদ্ভুত মেয়েটি কখনো আমাকে আমার কালো জিব নিয়ে কিছু বলে নি। ভালবাসা কী আমি আমার জীবনে কখনো বুঝি না। এই কিশোরী ভালবাসার গভীর সমুদ্রে আমাকে ছুড়ে ফেলে দিল। রোজ রাতে ঘুমুতে যাবার সময় আমি কাঁদতাম। কাঁদতে কাঁদতে বলতাম—আমি এত সুখী কেন? জীবনের প্রথম অংশ দুঃখে-দুঃখে কেটেছে বলেই কি এই অংশে এত সুখ?

মাস্টার সাহেব নামে একটি বিভীষিকা আমার জীবনে আছে, তা মনে রইল না। শুধু মাঝে মাঝে বাবার দোতলা ঘরের দিকে তাকালে গা কাঁটা দিয়ে উঠত। কখনো ঐ ঘরের কাছে যেতাম না। আমি একা না, অন্য কেউও যেত না। কারণ ইসমাইল চাচা কী জন্যে যেন একবার দোতলায় উঠেছিলেন—ফিরে এসে আমাকে এবং রানুকে বললেন, তোমরা কেউ ওদিকে যাবে না। কখনো না, ভুলেও না।

রানু বিস্মিত হয়ে বলল, কেন বাবা?

তিনি কঠিন গলায় বললেন—আমি নিষেধ করেছি এই জন্যে। তিনি কাঠের মিস্ত্রি ডাকিয়ে দোতলা ঘরের দুটি দরজাতেই আড়াআড়ি পাল্লা লাগিয়ে দিলেন। দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে কাঁটাতারের গেট করে দিলেন। আমার জীবনের একটি অন্ধকার অংশকে তিনি পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেন। পুরোপুরি বোধহয় পারলেন না। মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো খাট থেকে নেমে আসি।

খাটের নিচে টর্চের আলো ফেলি। না কেউ সেখানে নেই। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে আবার ঘুমুতে যাই।

আমি মেট্রিক পাস করলাম।

খুব ভালোভাবে পাস করলাম। পত্রিকায় আমার নাম ছাপা হল। আইএসসি পরীক্ষায় আরো ভালো ফল করলাম। এবার পত্রিকায় ছবি ছাপা হল। আমার কৌতূহল ছিল মনোবিজ্ঞানে, সায়েন্স ছেড়ে আর্টস নিলাম। ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

রানুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সহজ। এই সম্পর্কে কোনো রকম জটিলতা ছিল না। মেয়েদের সঙ্গে মেশার আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কারো সঙ্গেই আমি কখনো মিশি নি। কাছ থেকে দেখিও নি। এই প্রথম একজনকে দেখলাম। অন্য মেয়েরা কেমন জানি না—এই মেয়েটিকেই জানি। সহজ একটা মেয়ে কিন্তু রহস্যময়।

আমি রাত জেগে পড়ি সে রাত জাগতে পারে না। ঘুম ঘুম চোখে পাশে বসে থাকে। আমি বলি তুমি ঘুমিয়ে পড়। তুমি জেগে আছ কেন?

সে বিস্মিত হয়ে বলে, তাই তো আমি কেন জেগে আছি। আমি ঘুমাতে গেলাম। তুমি কতক্ষণ পড়বে?

'অনেকক্ষণ।'

'রাত একটা, না রাত দুটা?'

'দুটা।'

'আজ একটা, পর্যন্ত পড়লে কেমন হয়?'

'একটা পর্যন্ত পড়লে তোমার কী লাভ?'

'তুমি রাত জেগে পড়। আমার দেখতে কষ্ট হয়।'

'কষ্ট হয় কেন?'

'জানি না কেন হয়। তবে হয়।'

আমি রানুর ভেতর অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করতে লাগলাম। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার প্রবণতা। যতক্ষণ বাড়িতে থাকব ততক্ষণই সে আমার পাশে থাকবে।

বাড়ির রান্নাবান্না তাকে করতে হয়। রান্না করতে যাবে, কিছুক্ষণ পরপর উঠে আসবে। আমি যদি বলি—কী? সে তৎক্ষণাৎ বলবে, কিছু না।

মাঝে মাঝে সে ভয়াবহ অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যায়। দেখেই মনে হয় তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যে ঝড়ের কারণ সে জানে না। আমিও জানি না।

ইসমাইল চাচা তাঁর নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে চলে যাওয়া ঠিক করলেন। রানু বলল, অসম্ভব, আমি যাব না। ও বেচারা একা থাকবে? এত বড় বাড়িতে একা থাকলে ভয় পাবে না? এমনিতেই সে ঘুমের মধ্যে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে কাঁদে। যদি যেতে হয় তাকে নিয়ে যেতে হবে। বাবার সঙ্গে সে চাপা গলায় ঝগড়া করে এবং একসময় আমাকে এসে বলে, তুমি কি চাও আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?

আমি বলি, না না। কখনো চাই না।

'তুমি চাইলেও আমি যাব না। তুমি কখনো, কোনোভাবেই এ বাড়ি থেকে আমাকে তাড়াতে পারবে না।'

'কী আশ্চর্য! তাড়ানোর প্রশ্ন আসছে কেন?'

'আমি জানি না কেন আসছে। মাঝে মাঝে আমার মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। আমি কী করি না করি নিজেই বুঝি না। সরি। কী সব অদ্ভুত ব্যাপার যে আমার হচ্ছে। তুমি যখন রাত জেগে পড়, আমিও রাত জাগতে চেষ্টা করি। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। বাধ্য হয়ে ঘুমুতে যাই। তখন আর ঘুম আসে না। রাতের পর রাত আমি না ঘুমিয়ে কাটাই। তুমি কি সেটা জান?'

'না। এখন জানলাম।'

'আমার কী করা উচিত?'

'ঘুমের ওষুধ খাওয়া উচিত।'

'ঘুমের ওষুধ আমার আছে। কিন্তু আমি খাই না। রাত জেগে আমি নানান কথা ভাবি। আমার ভালোই লাগে।'

আমাদের দিনগুলো এই ভাবেই কাটছিল। তারপর একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

তখন আমি এম.এ. ক্লাসের ছাত্র। বর্ষাকাল। কদিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। সেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ক্লাস থেকে ফিরেছি বিকেলে। গেট দিয়ে বাড়িতে ঢোকার সময় দেখি, রানু এই বৃষ্টির মধ্যে বাগানে দাঁড়িয়ে ভিজছে। কী যে সুন্দর তাকে লাগছে! আমি চেঁচিয়ে বললাম—এই রানু এই!

রানু ছুটে এল। হাসতে হাসতে বলল, এই যে ভাই ভালো ছাত্র—তুমি কি আমার সঙ্গে একটু বৃষ্টিতে ভিজবে? নাকি খারাপ ছাত্রীর সঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজা নিষেধ?

আমি বললাম, না নিষেধ না—চল বৃষ্টিতে ভিজি।

'অসুখে পড়লে আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।'

'না, দোষ দেব না। দাঁড়াও খাতাটা রেখে আসি।'

রানু বলল, না না। খাতা রাখতে যেতে পারবে না। খাতা ছুড়ে ফেলে দাও।

আমি খাতা ছুড়ে ফেললাম। রানু চেঁচিয়ে বলল, স্যান্ডেল খুলে ফেল। আজ আমরা গায়ে কাঁদা মাখব। পানিতে গড়াগড়ি খাব। দেখো বাগানে পানি জমেছে।

আমি স্যান্ডেল ছুড়ে ফেললাম। রানু বলল—আজ বাসায় কেউ নেই। পুরো বাড়িতে শুধু আমরা দু জন।

রানু কথাগুলো কি অন্যভাবে বলল? কেমন যেন শোনাল। যেন সে প্রবল জ্বরের ঘোরে কথা বলছে। কী বলছে সে নিজেও জানে না।

আমি বললাম, তোমার কী হয়েছে রানু?

রানু থেমে থেমে বলল, আমার কী হয়েছে আমি জানি না। আমার খুব অস্থির অস্থির লাগছে। আমি আজ ভয়ংকর একটা অন্যায় করব। তুমি রাগ করতে পারবে না। আমাকে খারাপ মেয়ে ভাবতে পারবে না।

রানু ঘোর লাগা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে অদ্ভুত গলায় বলল, তুমি

আমাকে খারাপ মেয়ে ভাব আর যাই ভাব—আমি এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটা অন্যায় করব। প্লিজ চোখ বন্ধ কর। তুমি তাকিয়ে থাকলে অন্যায়টা আমি করতে পারব না।

চোখ বন্ধ করতে গিয়েও চোখ বন্ধ করতে পারলাম না। আমি বুঝতে পারছি রানু কী করতে যাচ্ছে। আমি কেন যে কোনো মানুষই তা বুঝবে। আমার নিজেরও যেন কেমন লাগছে। হঠাৎ দোতলার দিকে তাকালাম, আমার সমস্ত শরীর বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি দেখলাম আমার উলঙ্গ মাস্টার সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তিনি কী চান আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম। তিনি আমার সব প্রিয়জনদের একে একে সরিয়ে দিচ্ছেন—প্রথমে বাবা, তারপর সর্দার চাচা। এখন রানু। তা সম্ভব না। কিছুতেই সম্ভব না।

আমি রানুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। সে মাটিতে পড়ে গেল।

সে অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে?

আমি কঠিন গলায় বললাম, তোমাকে এক্ষুনি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। এক্ষুনি। এই মুহূর্তে। যেভাবে আছ সেইভাবে।

রানু কোনো প্রশ্ন করল না। উঠে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। ইসমাইল চাচা ঢুকলেন তার কিছুক্ষণের মধ্যেই। তিনি বললেন—কী ব্যাপার?

আমি কঠিন গলায় বললাম, চাচা আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কী হয়েছে?

আমি তার জবাব দিলাম না। রানু মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে গেল। তার এক ঘণ্টার ভেতরই বাবা মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন।

অনেক অনেক দিন পর আমি আবার একা হয়ে গেলাম। সন্ধ্যার পর থেকে ঘন হয়ে বৃষ্টি নামল। রীতিমতো ঝড় শুরু হল। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আমি অন্ধকার বারান্দায় বসে রইলাম। আমার দৃষ্টি দোতলার বারান্দার দিকে। জায়গাটা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে—সেই আলোয় আমি উলঙ্গ মাস্টার সাহেবকে রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। বাতাসের এক একটা ঝাপটা আসছে। সেই ঝাপটায় ভেসে আসছে সিগারেটের কড়া গন্ধ। আবারো সেই গন্ধ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে হাসনাহেনার গন্ধে। সেবার আমাদের হাসনাহেনা গাছে প্রথমবারের মতো ফুল ফুটেছিল। মানুষের সঙ্গে গাছের হয়তো কোনো সম্পর্ক আছে। নয়তো কখনো যে গাছে ফুল ফোটে না—হঠাৎ সেখানে কেন ফুল ফুটল?

রাত বাড়তে লাগল। বৃষ্টি বাড়তে লাগল। কামরাঙা গাছের ডাল বাতাসে নড়তে লাগল। আমি এগিয়ে গেলাম দোতলার দিকে। সিঁড়ির মুখ কাঁটাতার দিয়ে বন্ধ। মাস্টার সাহেব বললেন, কাঁটাতারের বেড়া খুলে রেখেছি, তুমি উঠে এস।

আমি উঠে গেলাম। কঠিন গলায় বললাম, আপনি কী চান?

তিনি বললেন, আমি কিছু চাই না তন্ময়। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

'আপনার সাহায্যের আমার প্রয়োজন নেই।'

'তুমি তো ভুল কথা বলছ তন্ময়। এখনই আমার সাহায্যের তোমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাকে সাহায্য করব। আমি আমার কথা রাখি।'

'আপনি কেউ না। আপনি আমার অসুস্থ মনের কল্পনা।'

'কে বলল তোমাকে?'

'আমি মনোবিদ্যার ছাত্র। আমি জানি। আমি সিজোফ্রেনিয়ার রুগি। সিজোফ্রেনিয়ার রুগিদের হেলুসিনেশন হয়। তারা চোখের সামনে অনেক কিছু দেখতে পায়। আমি তাই দেখছি।'

'তোমাদের ইসমাইল সাহেব কি সিজোফ্রেনিয়ার রুগি?'

'না।'

'তিনি কিন্তু আমাকে দেখেছেন। কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছেন। এ ঘরে তোমাদের আসতে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেন নি?'

'হ্যাঁ করেছেন।'

'তোমার বান্ধবী। রানু মেয়েটিও কিন্তু আমাকে দেখেছে। ঘটনাটা তোমাকে বলি। এক দুপুর বেলায় সে হাঁটতে হাঁটতে আমার ঘরের দিকে চলে এল। তাকাল বারান্দার দিকে। আমি তখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। নগ্ন অবস্থায় দাঁড়ালাম বলাই বাহুল্য। মেয়েটা হতভম্ব হয়ে গেল। আমি তখন তাকে কুৎসিত একটা কথা বললাম...বললাম...'

'চুপ করুন।'

'রেগে যাচ্ছ কেন? রেগে যাবার কী আছে—তোমার কথা যদি ঠিক হয় তা হলে আমার অস্তিত্ব নেই। আমি তোমার মনের কল্পনা। কাজেই আমি মেয়েটিকে কী বলেছি তা শুনতে তোমার আপত্তি হবে কেন? আমি মেয়েটিকে,...

'Stop'.

'হা হা হা। মেয়েটি এতই ভয় পেয়েছিল যে নড়তে-চড়তে পারছিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল এই ফাঁকে আমি কিছু কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করলাম। কে জানে এগুলো হয়তো তার পছন্দ হয়েছে।'

'আমি আপনার পায়ে পড়ছি থামুন।'

'বেশ থামলাম। রানু তোমাকে এই ঘটনার কিছু বলে নি?'

'না।'

'আমার কথায় তোমার যদি সন্দেহ থাকে তুমি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।'

'জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি না। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করলাম।'

'ভেরি গুড। এখন মনোবিজ্ঞানীর ছাত্র; তুমি আমাকে বল, তোমার ইসমাইল চাচা কিংবা তোমার বান্ধবী ওরা সিজোফ্রেনিয়ার রুগি না হয়েও আমাকে দেখছে কী করে? এর ব্যাখ্যা কী?'

'আমি এর ব্যাখ্যা জানি না।'

'শুধু তুমি কেন। কেউই জানি না। এই পৃথিবীতে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন জিনিসের সংখ্যাই বেশি।'

'আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কিন্তু একজন পারবেন।'

'তাই নাকি! সেই একজনটা কে?'

'তিনি আমার স্যার। তাঁর নাম মিসির আলি।'

'নিয়ে এস তোমার স্যারকে।'

'তাঁকে আনার আমি কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আমার সমস্যা আমিই সমাধান করব।'

'এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবে আমার কোনো অস্তিত্ব নেই।'

'হ্যাঁ।'

'ভালো খুব ভালো। আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি।'

'আপনাকে একটা কথা দিতে হবে। আপনি রানুর কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না।'

'তুমি অদ্ভুত কথা বলছ তন্ময়। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না আবার তুমি বলছ— আমি রানুর কোনো ক্ষতি করতে পারব না। এরকম করছ কেন?'

'এরকম করছি কারণ মানুষ একই সঙ্গে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে না।'

'কে বলেছে, তোমার স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'ইন্টারেস্টিং মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। উনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবেন আমার অস্তিত্ব নেই। আমি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করব উনার অস্তিত্ব নেই। হা হা হা। কবে তুমি তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবে?'

'আনব। তাঁকে আমি আনব। আপনাকে কথা দিতে হবে আপনি রানুর কোনো ক্ষতি করবেন না।'

'দেখ তন্ময় আমি তোমার স্বার্থ দেখব। তোমার ভালো দেখব। যদি আমার কখনো মনে হয় এই মেয়ের কারণে তোমার ক্ষতি হচ্ছে তখনই আমি তাকে সরিয়ে দেব। এখন আমার অনেক ক্ষমতা। তবে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত যখন নেব, তোমাকে জানিয়েই নেব।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

'যাও ঘুমুতে যাও। সমস্ত দিনে তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গিয়েছে। তোমার ঘুম দরকার। রানুর টেবিলের ড্রয়ার ভরতি ঘুমের ওষুধ। তুমি দুটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। শুভ্র রাত্রি। ভালো কথা ঘুমুতে যাবার আগে ভেজা কাপড় বদলে নিও।'

১১

মিসির আলি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। জ্বর সারলেও শরীর খুব দুর্বল। রিকশায় বাসায় আসতে গিয়েই ক্লান্ত হয়েছেন। রীতিমতো হাঁপ ধরে গেছে। বিকেলে এসেছেন। এসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। খুব ক্লান্ত অবস্থায় ঘুম ভালো হয় না। ঘুমের তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তার ওপর বদু কিছুক্ষণ পরপর এসে মাথায় হাত দিয়ে জ্বর এল কিনা দেখে যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা সে ডেকে তুলে ফেলল। তার বিখ্যাত দার্শনিক উক্তির একটি শোনাল,

'সইন্ধ্যাকালে ঘুমাইলে আয়ু কমে। সইন্ধ্যাকালে মাইনষের বাড়িতে বাড়িতে আজরাইল উঁকি দেয়। এই জন্যে সইন্ধ্যাকালে জাগনা থাকা লাগে। উঠেন, চা পানি খান।'

আজরাইল এসে তাকে যেন ঘুমন্ত অবস্থায় না পায় সে জন্যেই মিসির আলি উঠে হাত–মুখ ধুলেন। চা খেলেন। সিগারেট খেতে এখন আর বাধা নেই। ডাক্তার-নার্স ছুটে আসবে এই আশঙ্কা থেকে তিনি মুক্ত, তবু সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে না। পার্কের দিকে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করছে। শরীরে বোধ হয় কুলাবে না।

'বদু।'

'জে স্যার।'

'আমি হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে কেউ আমার খোঁজ করেছিল?'

'জে না। আপনেরে কে খুঁজব?'

'মিসির আলি ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেললেন। তাই তো, কে তাঁকে খুঁজবে? তিনি হালকা গলায় বললেন, I have no friends, nor a toy.

'স্যার রাইতে কী খাইবেন?'

'যা খাওয়াবি তাই খাব।'

'শিং মাছ আনছি। অসুখ অবস্থায় স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো।'

'আচ্ছা।'

অতি অখাদ্য শিং মাছের ঝোল দিয়ে মিসির আলিকে রাতের খাবার শেষ করতে হল। রোগীর খাদ্য, এ জন্যেই কোনো রকম মশলা ছাড়া বদু শিং মাছ রান্না করেছে। মিসির আলি বললেন, মুখে দিতে পারছিনাতোরে বদু।

'অসুখ অবস্থায় মুখে রুচি থাকে না।'

'রুচি আসবে কোত্থেকে? তুই তো মাছগুলো শুধু লবণ পানিতে সেদ্ধ করেছিস।'

'এই খাওয়া লাগব স্যার। অসুখ অবস্থায় মশলা হইল বিষ।'

খাওয়ার পর বদু তার পড়া নিয়ে এল। মিসির আলি বললেন, আজ থাক বদু। খুব টায়ার্ড লাগছে। আজ শুয়ে পড়ি।

বদু বলল, দুই মিনিটের মামলা।

বদু মিসির আলিকে চমৎকৃত করল—বাংলা বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর নির্ভুল বলে গেল। মিসির আলি বললেন, ব্যাপার কী?

'শিখলাম।'

'তাই তো দেখছি। শিখলি কীভাবে?'

তন্ময় ভাইজান একবার আইস্যা বলল, "শোন বদি তুমি যদি অক্ষরগুলো শিখে ফেলতে পার তা হলে তোমার স্যার হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে তোমার কাণ্ড দেখে খুব খুশি হবেন।"

বদু তন্ময়ের কথাগুলো শুধু যে শুদ্ধ ভাষায় বলল তাই না, তন্ময়ের মতো করেই বলল।

মিসির আলি বললেন, আমি খুশি হয়েছি। শিখলি কীভাবে। কে দেখিয়ে দিয়েছে?

'তন্ময় ভাইজান দেখাইয়া দিছে। রোজ রাইত কইরা একবার আসত। বুঝছেন স্যার, ভালো লোক। আপনার মতোই ভালো। ভালো লোকের কপালে দুঃখু থাকে। এই জন্যেই আফসোস।'

'তন্ময় কি রোজই আসত?'
'জি রোজই একবার আসছেন।'
'আজ আসবে?'
'জি আসব। বইল্যা গেছে আসব।'
মিসির আলি তন্ময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সে এল ঠিক দশটায়। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, স্যার আপনার শরীর এখন কেমন?
মিসির আলি বললেন, খুব খারাপ। শুধু ঘুম পায়। কিন্তু ঠিকমতো ঘুম আসে না।
'আমি আজ বরং উঠি।'
'না না। তুমি বস। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'
'আপনি কি আমার লেখাগুলো পড়ে শেষ করেছেন?'
'হ্যাঁ শেষ করেছি। এই নিয়েই তোমার সঙ্গে কথা বলব।'
'আজ না হয় থাক স্যার। আপনাকে দেখাচ্ছেও খুব ক্লান্ত।'
ক্লান্ত দেখালেও আমার যা বলার আজই বলতে চাই। এবং তোমার আমাকে যা বলার তা আজই বলা শেষ করবে। ব্যাপারটা তোমার ওপর যেমন চাপ ফেলছে। আমার ওপরও চাপ ফেলছে। তোমার সঙ্গে কি গাড়ি আছে?'
'আছে।'
'চল তা হলে পার্কে চলে যাই। যেখানে গল্পের শুরু হয়েছে, সেখানেই শেষ হোক।'
'এই ঠাণ্ডায় পার্কে যাবেন?'
'হুঁ।'
মিসির আলি চাদর গায়ে দিলেন। বদুকে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তে বললেন। মিসির আলিকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলেন।

পার্কের বাইরে রাস্তায় আলো আছে। পার্কের ভেতর আলো নেই। মিসির আলি এবং তন্ময় বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে আছেন। আজ শীত কম। তারপরেও চাদরে সারা শরীর ঢেকে মিসির আলি জবুথবু হয়ে বসে আছেন। মিসির আলির শীত লাগছে। পার্ক পুরোপুরি ফাঁকা। আকাশে চাঁদ আছে তবে গাছপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসতে পারছে না। জোছনা খেলছে গাছের পাতায়। মিসির আলি জোছনা দেখছেন।
'তন্ময়।'
'জি।'
'তোমার লেখা আমি মন দিয়ে পড়েছি। খুব মন দিয়ে পড়েছি। আমার মনে হয় না, আমার সাহায্যের তোমার প্রয়োজন আছে। তুমি ঠিক পথেই এগুচ্ছ। একজন মনোবিজ্ঞানীর যেভাবে এগুনো উচিত তুমি সেইভাবেই এগুচ্ছ!'
'স্যার আমি পারছি না।'
'আমার তো মনে হয় পারছ। খুব ভালোভাবেই পারছ।'

'না, পারছি না। রানু খুব শিগগিরই বিপদে পড়বে। মাস্টার সাহেব তাঁকে সরিয়ে দেবেন। রানু একটি চিঠি পেয়েছে। তাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলা হয়েছে। কিন্তু আমি তাঁকে কোনো চিঠি লিখি নি, চিঠি পাঠিয়েছেন মাস্টার সাহেব।'

মিসির আলি বললেন, মাস্টার সাহেব বলে কেউ নেই। তুমি তা খুব ভালো করে জান। জান না?

তন্ময় চুপ করে রইল।

'তোমার মনে কি সন্দেহ আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আপনি একসময় বলেছেন সব প্রশ্নের দুটি উত্তর—হ্যাঁ এবং না। মাস্টার সাহেব বলে কি কিছু আছে? এই প্রশ্নেরও দুটি উত্তর হবে—হ্যাঁ এবং না।'

'তুমি সামান্য ভুল করেছ তন্ময়। আমি যা বলেছিলাম তা হল প্রশ্নের একটিই উত্তর। হয় হ্যাঁ কিংবা না। কিন্তু মানুষ যেহেতু অস্বাভাবিক একটি প্রাণী সে দুটি উত্তরই একই সঙ্গে গ্রহণ করে; যদিও সে জানে উত্তর হবে একটি।'

তন্ময় নিশ্বাস ফেলল। মিসির আলি বললেন, এস এক কাজ করা যাক। তোমার সমস্যাটা আমরা একসঙ্গে সমাধান করার চেষ্টা করি। আমরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হব। আমরা ব্যবহার করব লজিক। লজিক হচ্ছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। লজিকের বাইরে কিছু থাকতে পারে না।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। একটু ঝুঁকে এলেন তন্ময়ের দিকে—

'তন্ময়, তোমার মা খুব ছোটবেলায় তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। তোমার বাবা তোমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তোমাকে বাইরের কারো সঙ্গে মিশতে দেওয়া হত না। সর্দার নামের একজন লোক রাখা হয়েছিল শুধুমাত্র তোমাকে অন্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে। এমনকি স্কুল থেকেও তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হল। একজন মাস্টার দেওয়া হয়েছিল, সেও রইল না। তোমাকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণটা কী তন্ময়? এমন কী তোমার আছে যে তোমাকে সবার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে?'

'আমি জানি না স্যার।'

মিসির আলি শীতল গলায় বললেন, তন্ময়, তুমি জান।

'না, আমি জানি না।'

'তুমি জান কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। প্রস্তুত নও বলেই তোমার মস্তিষ্কের একটি অংশ ব্যাপারটা জানে না। তোমার অবচেতন মন কারণটা জানে—কিন্তু তোমাকে জানাতে চাচ্ছে না। সমস্যাটা এখানেই। তোমার মস্তিষ্ক ধরে নিয়েছে, কারণ জানলে তোমার প্রচুর ক্ষতি হবে। সে ক্ষতি হতে দেবে না। কাজেই সে তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা শুরু করল। সে ঠিক করল, কোনোদিনই তোমাকে কিছু জানাবে না। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'পারার কথা, মনোবিজ্ঞানের সহজ কিছু প্রিন্সিপালই বলা হচ্ছে। জটিল কিছু নয়। তাই না?'

'হ্যাঁ তাই। Conflict between conscious and sub-conscious.'

'এখন আস দ্বিতীয় ধাপে। এখানে আমরা কী দেখছি? এখানে দেখছি তোমাকে ঘিরে যারা আছেন তাঁরা সরে যাচ্ছেন। প্রথম সরলেন তোমার মা। তিনি দূরে চলে গেলেন। তারপর গেলেন তোমার বাবা, তারপর সর্দার চাচা। এরা কারা? এরা তোমার খুব কাছাকাছির মানুষ। তোমার ভেতরে যে অস্বাভাবিকতা আছে, যে অস্বাভাবিকতার জন্যে তোমাকে আলাদা রাখা হচ্ছে—এঁরা তা জানেন। তোমার মস্তিষ্ক ঠিক করল এদেরও সরিয়ে দেওয়া দরকার। এঁদের সে সরিয়ে দিল। সরিয়ে দেবার জন্যে একটি ভয়াবহ ব্যাপারের অবতারণা করতে হল—সেই ভয়াবহ ব্যাপার হল মাস্টার সাহেব। তোমার মস্তিষ্ক সেই মাস্টার তৈরি করল। যে কারণে মাস্টার বারবার বলছে—আমি তোমাকে রক্ষা করব, তোমাকে সাহায্য করব। তোমার মঙ্গল দেখব।'

তন্ময় শীতল গলায় বলল, আমার অস্বাভাবিকতাটা কী?

মিসির আলি বললেন, সেই অস্বাভাবিকতাটা কী আমি নিজে তা ধরতে পারছিলাম না। যখন রানু প্রসঙ্গ এল তখন ধরতে পারলাম—তুমি হচ্ছ একজন অপূর্ণ মানুষ। তুমি পুরুষ নও, নারীও নও। তুমি হলে—Hermaphrodite, বৃহন্নলা। কথ্য বাংলায় আমরা বলি হিজড়া। দেখ তন্ময়! কঠিন সত্য তুমি প্রথম জানলে তোমার বয়ঃসন্ধিকালে। নিজে নিজেই জানলে, কেউ তোমাকে জানায় নি। এই সত্য তুমি গ্রহণ করলে না। তোমার মস্তিষ্ক এই কঠিন সত্য পাঠিয়ে দিল অবচেতন মনে। সেই অবচেতন মনই তৈরি করল মাস্টার। যে মাস্টারের প্রধান কাজ এই সত্য গোপন রাখা। গোপন রাখার জন্যেই সে এই সত্য যারা জানে তাদের একে একে সরিয়ে দিতে শুরু করল। যখন তারা সরে গেল—তোমার অবচেতন মন নিশ্চিন্ত হল। মাস্টার সাহেবের তখন আর প্রয়োজন হল না। দীর্ঘদিন তুমি আর তার দেখা পেলে না। বুঝতে পারছ?

তন্ময় জবাব দিল না।

'আমার লজিকে কি কোনো ভুল আছে?'

তন্ময় তারও জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, আবার সেই মাস্টারের প্রয়োজন পড়ল যখন রানু নামের অসাধারণ একটি মেয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল। সে তোমাকে কামনা করছে পুরুষ হিসেবে। তুমি পুরুষ হিসেবে তার কাছে যেতে পারছ না। তুমি কঠিন সত্য তাকে বলতে পারছ না, অন্য একজন পুরুষ এই মেয়েটির কাছে যাক তাও তুমি হতে দিতে পার না, কারণ তুমি এই মেয়েটিকে অসম্ভব ভালবাস। কাজেই আবার মাস্টার জেগে উঠল। তুমিই তাকে জাগালে। তুমিই ঠিক করলে মেয়েটিকে সরে যেতে হবে। তন্ময়!

'জি।'

'তুমি কি এই দৈত্যটাকে বাঁচিয়ে রাখবে না নষ্ট করে দেবে? খুব সহজেই তাকে তুমি ধ্বংস করতে পার। যেই মুহূর্তে তুমি রানুকে গিয়ে তোমার জীবনের গল্প বলবে—সেই মুহূর্ত থেকে মাস্টারের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। রানুর সঙ্গে কি তোমার যোগাযোগ আছে?'

'না। তবে মাঝে মাঝে দূর থেকে আমি তাকে দেখি।'

'সে কি বিয়ে করেছে?'

'না।'

'শোন তন্ময়, গভীর ভালবাসায় এক বর্ষার দিনে সে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল—তখন তুমি তাকে কঠিন অপমান করেছিলে। এই অপমান তার প্রাপ্য নয়। তোমার কি উচিত না সেই দিনের ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করা?'

'হ্যাঁ উচিত।'

'প্রকৃতি তোমার ওপর কঠিন অবিচার করেছে। তোমাকে অপূর্ণ মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সেই প্রতিশোধ তো তুমি মেয়েটির ওপর নিতে পার না! আমি কি ঠিক বলছি?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলছেন। আমি রানুকে সব বলব।'

তন্ময় কাঁদছে। মিসির আলি কান্নার শব্দ শুনছেন না, কিন্তু বুঝতে পারছেন। তিনি নিজে অসহায় বোধ করতে শুরু করেছেন।

তন্ময় বলল, স্যার চলুন, আপনাকে বাসায় দিয়ে আসি।

মিসির আলি বললেন, তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চল। তোমার মাস্টার সাহেব যে দোতলায় থাকেন তোমাকে নিয়ে আমি সেখানে যাব। তুমি দেখবে সেখানে কেউ নেই।

'স্যার, আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি না।'

'কেন চাচ্ছ না?'

'আমার জীবনের কঠিন এবং ঘৃণ্য সত্য যারা জানে—তারা কেউ বেঁচে নেই। এই সত্য আপনি জানেন। মাস্টার আপনার ক্ষতি করতে পারে।'

মিসির আলি বললেন, মাস্টার বলে যে কিছু নেই তা-ই আমি তোমাকে দেখাব। তুমি আমাকে নিয়ে চল।

১২

গেটের ভেতর পা দিয়ে মিসির আলি চমকে উঠলেন। তাঁর মন বলতে লাগল—কিছু একটা আছে এখানে, কিছু একটা আছে। এখানকার পরিবেশ অন্য রকম। বাতাস পর্যন্ত যেন অন্য রকম। বাগানের জোছনাও এক ধরনের ভয় তৈরি করছে। ন'টা বিরাটাকার কুকুর চেন দিয়ে বাঁধা। তারা একসঙ্গে চাপা গর্জন করছে। সেই গর্জনও কেমন অন্য রকম শোনাচ্ছে।

তন্ময় বলল, মাস্টার সাহেব এখনো আছেন। তিনি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, আমি বুঝতে পারছি।

'তোমার মাস্টারের নাম কি তন্ময়?'

'নাম জানি না।'

'নাম জান না তার কারণ তার কোনো নাম নেই—কারণ সে নিজেই নেই। তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি একা যাব। তারপরে ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

'স্যার আপনি যাবেন না।'

'আমাকে যেতেই হবে।'

'স্যার, মাস্টার সাহেবের অনেক ক্ষমতা।'

'এই ক্ষমতা তুমি তাঁকে দিয়েছ। ক্ষমতা কেড়ে নেবার সময় হয়েছে। তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।'

মিসির আলি এগিয়ে গেলেন। চাঁদের আলোয় দোতলা বারান্দা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মিসির আলি রেলিঙে হেলান দিয়ে একজন নগ্ন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তামাকের কটু গন্ধও পেলেন। মিসির আলি দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছায়ামূর্তি শীতল গলায় বলল, কেমন আছেন মিসির আলি সাহেব?

'ভালো।'

'আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি।'

'আমি আছি না নেই?'

'আপনি নেই।'

'তা হলে দেখছেন কী করে?'

'আমার দৃষ্টি বিভ্রম হচ্ছে। শারীরিক দিক থেকে আমি খুবই অসুস্থ। তার ওপর তন্ময়ের গল্প আমার ওপর প্রভাব ফেলেছে বলেই হেলুসিনেশন হচ্ছে।'

'বাহ্, যুক্তি সাজিয়েই এসেছেন!'

'আমি খুবই যুক্তিবাদী মানুষ, মাস্টার সাহেব।'

'আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবার খুব শখ ছিল—আপনি আমার ছাত্রের সমস্যা এত দ্রুত এবং এত সহজে ধরবেন তা আমি বুঝতে পারি নি। আমি আপনার চিন্তাশক্তির প্রশংসা করছি।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

'একটি মজার জিনিস কি আপনি লক্ষ করেছেন মিসির আলি সাহেব? আপনি তন্ময়ের শিক্ষক। আমিও তার শিক্ষক। আমি তাকে তার সমস্যা থেকে রক্ষা করার জন্যে আছি। আপনারও একই ব্যাপার।'

'তাই তো দেখছি।'

'আমি প্রচুর সিগারেট খাই আপনিও খান। খান না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন? উঠে আসুন না। নাকি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?'

মিসির আলি বললেন, আমি যদি আপনাকে ভয় পাই, তা হলে লজিক বলছে—আপনিও আমাকে ভয় পাবেন।

'হ্যাঁ, লজিক অবিশ্যি তাই বলে। হ্যাঁ মিসির আলি সাহেব, আমি আপনাকে ভয় পাচ্ছি।'

মিসির আলি সিঁড়ির গোড়ার কাঁটাতারের গেটে হাত দিলেন এবং মনে মনে বললেন,

তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই। You do not exist. তিনি আবারো তাকালেন। বারান্দায় কেউ নেই। ফাঁকা বারান্দায় সুন্দর জোছনা হয়েছে। হাসনাহেনা ফুলের সুবাস আসছে। তিনি উঁচু গলায় ডাকলেন, তন্ময় এস!

তন্ময় আসছে। সে আগে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত। এখন আর হাঁটছে না। সে দোতলায় উঠে এল। সে দাঁড়িয়ে আছে মিসির আলির কাছে। দেব-শিশুর মতো কী সুন্দর মুখ! ঘন কালো চোখ, দীর্ঘ পল্লব।

মিসির আলি মনে মনে বললেন, প্রকৃতি অসুন্দর সহ্য করে না। তারপরেও অসুন্দর তৈরি করে, অসুন্দর লালন করে। কেন করে?

তন্ময় কাঁদছে। তার চোখ ভেজা। মিসির আলির ইচ্ছা করছে ছেলেটিকে বলেন, তুমি কাছে এস, আমি মাথায় হাত রেখে তোমাকে একটু আদর করি।

তিনি বলতে পারলেন না। গভীর আবেগের কথা তিনি কখনো বলতে পারেন না। মিসির আলি তাকালেন উঠোনের দিকে—কামরাঙা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জোছনা গলে গলে পড়ছে। কী অসহ্য সুন্দর!

তন্দ্রাবিলাস

ভোরবেলায় মানুষের মেজাজ মোটামুটি ভালো থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হতে থাকে, বিকালবেলায় মেজাজ সবচে বেশি খারাপ হয়, সন্ধ্যার পর আবার ভালো হতে থাকে। এটাই সাধারণ নিয়ম।

এখন সকাল এগারটা, মেজাজের সাধারণ সূত্র মতে মিসির আলির মেজাজ ভালো থাকার কথা। কিন্তু মিসির আলির মন এই মুহূর্তে যথেষ্টই খারাপ। তিনি বসার ঘরে বেতের চেয়ারে পা তুলে বসে আছেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে। তাঁর মেজাজ খারাপের দুটি কারণের প্রথমটা হল—একটা মাছি। অনেকক্ষণ থেকেই মাছিটা তাঁর গায়ে বসার চেষ্টা করছে। সাধারণ মাছি না—নীল রঙের স্বাস্থ্যবান ডুমো মাছি। আম–কাঁঠালের সময় এই মাছিগুলিকে দেখা যায়। এখন শীতকাল—এই মাছি এল কোত্থেকে? মাছিটা তার গায়েই বারবার বসতে চাচ্ছে কেন? তাঁর সামনে বসে থাকা মেয়েটির গায়ে কেন বসছে না?

মিসির আলির মেজাজ খারাপের দ্বিতীয় কারণ এই মেয়েটি। তাঁর ইচ্ছা করছে মেয়েটিকে একটা ধমক দেন। যদিও ধমক দেবার মতো কোনো কারণ ঘটে নি। মেয়েটি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দেখা করতে আসার অপরাধে কাউকে ধমক দেয়া যায় না। ধমক দেয়ার বদলে মিসির আলি শব্দ করে কাশলেন। প্রচণ্ড শব্দে কাশলে, কিংবা কুৎসিত শব্দে নাক ঝাড়লে মনের রাগ অনেকখানি কমে। মিসির আলির কমল না বরং আরো যেন বাড়ল। মাছিটাও মনে হচ্ছে এই শব্দে উৎসাহ পেয়েছে। এতক্ষণ গায়ে বসতে চাচ্ছিল এখন উড়ে ঠোঁটে বসতে চাচ্ছে। কী যন্ত্রণা!

স্যার, আমার নাম সায়রা বানু। সায়রা বানু নামটা কি আপনার মনে থাকবে?

মিসির আলি বললেন, মনে থাকার প্রয়োজন কি আছে?

অবশ্যই আছে। আমি এত আগ্রহ করে আমার নামটা আপনাকে কেন বলছি, যাতে মনে থাকে সেই জন্যেই তো বলছি।

মিসির আলি রোবটের গলায় বললেন, মানুষের নাম আমার মনে থাকে না।

মেয়েটি তাঁর রোবট গলা অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে বলল, আমারটা মনে থাকবে। কারণ একজন বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রীর নাম সায়রা বানু।

মিসির আলি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। এখন তাঁর মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। অর্থহীন কথা শুনতে ভালো লাগছে না। তা ছাড়া শীতও লাগছে। চেয়ারটা টেনে রোদে

নিয়ে গেলে হয়। তাতে কিছুক্ষণ আরাম লাগবে তারপর আবার রোদে গা চিড়বিড় করতে থাকবে। শীতকালের এই এক যন্ত্রণা। ছায়া বা রোদ কোনোটাই ভালো লাগে না। মিসির আলি মাছিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাছিটার কারণে নিজেকে এখন কাঁঠাল মনে হচ্ছে।

মেয়েটি খানিকটা মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, আপনি দিলীপ কুমার, সায়রা বানু এদের নাম শোনেন নি?

দিলীপ কুমারের নাম শুনেছি।

সায়রা বানু হচ্ছে দিলীপ কুমারের বউ। আমার বন্ধুরা অবিশ্যি আমাকে সায়রা বানু ডাকে না, তারা ডাকে এস বি। সায়রার এস, বানুর বি—এস বি। এস বি-তে আর কী হয় বলুন তো?

বলতে পারছি না।

এস বি হচ্ছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ। আমার বন্ধুদের ধারণা আমার চেহারায় একটা স্পাই স্পাই ভাব আছে। এই জন্যেই তারা আমাকে এস বি ডাকে। আচ্ছা আপনারও কি ধারণা আমার চেহারায় স্পাই স্পাই ভাব? ভালো করে একটু আমার দিকে তাকান না। আপনি সারাক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন কেন?

মিসির আলি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন না। মাছিটার দিকে তাকিয়ে আছেন। মাছিটা এদিক-ওদিক করছে বলেই এদিক-ওদিক তাকাতে হচ্ছে। আচ্ছা পৃথিবীতে মোট কত প্রজাতির মাছি আছে?

এই যে শুনুন। তাকান আমার দিকে।

মিসির আলি মেয়েটির দিকে তাকালেন। অতিরিক্ত ফর্সা একটি মেয়ে। বাঙালি মেয়েদের গায়ের রঙের একটা মাত্রা আছে। কোনো মেয়ে যদি সেই মাত্রা অতিক্রম করে যায় তখন আর ভালো লাগে না। তার মধ্যে বিদেশী বিদেশী ভাব চলে আসে। তাকে তখন আর আপন মনে হয় না। সায়রা বানুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাকে পর পর লাগছে। মেয়েটির মাথা ভরতি চুল। সেই চুলেও লালচে ভাব আছে। অতিরিক্ত ফর্সা মেয়েদের ক্ষেত্রে তাই হয়। তাদের গায়ের রঙের খানিকটা এসে চুলে লেগে যায়। চুল লালচে দেখায়—খানিকটা এসে লাগে চোখে। চোখ তখন আর কালো মনে হয় না। মেয়েটির মুখ লম্বাটে। একটু বোঁচা ধরনের নাক। বোঁচা নাক থাকায় রক্ষা—বোঁচা নাকের কারণেই মেয়েটিকে বাঙালি মনে হচ্ছে। খাড়া নাক হলে মেডিটেরিনিয়ান সমুদ্রের পাশের গ্রিককন্যা বলে মনে হত। বয়স কত হবে? উনিশ থেকে পঁচিশের ভেতর। মানুষের বয়স চট করে ধরতে পারার কোনো পদ্ধতি থাকলে ভালো হত। গাছের রিং গুনে বয়স বলা যায়। মানুষের তেমন কিছু নেই। মানুষের বয়স তার মনে বলেই বোধ হয়। আচ্ছা, একটা মাছি কতদিন বাঁচে?

স্যার কথা বলছেন না কেন? আমাকে কি স্পাই মেয়ে বলে মনে হচ্ছে?

স্পাই মেয়েদের চেহারা আলাদা হয় বলে আমি জানি না।

একটু আলাদা হয়। স্পাই মেয়েদের মুখ দেখে এদের মনের ভাব বোঝা যায় না। এদের মুখে এক রকম ভাব মনের ভেতর আরেক রকম।

তোমারও কি তাই?

জি। ও আপনাকে বলতে ভুলে গেছি এস বি ছাড়াও আমার আরেকটা নাম আছে। নাম ঠিক না খেতাব। নববর্ষে পাওয়া খেতাব। আমাদের কলেজে পহেলা বৈশাখে খেতাব দেয়া হয়। আমার খেতাবটা হচ্ছে সাদা বাঘিনী। এস বি-তে সাদা বাঘিনীও হয়। সাদা বাঘিনী টাইটেল কেন পেয়েছিলাম শুনতে চান? খুবই মজার গল্প।

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন। তাঁর কিছুই শুনতে ইচ্ছা করছে না। মাথার যন্ত্রণা এবং শীত ভাব দুইই বাড়ছে। গায়ে পাতলা একটা চাদর দিয়ে শীত ভাবটা কমানো যেত। চাদরটা ধুপিখানায় দিয়েছেন। ধোয়া নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, স্লিপের অভাবে আনতে পারছেন না। স্লিপটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। কড়া এক কাপ চা খেলেও শীতটা কমত। ঘরে চায়ের পাতা আছে, চিনি, দুধও আছে। গতকালই কিনে এনেছেন। কিন্তু গ্যাসের চুলায় কী একটা সমস্যা হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগুন জ্বলেই হুস করে নিভে যায়। মিস্ত্রি ডাকিয়ে চুলা ঠিক করা দরকার। গ্যাস মিস্ত্রিরা কোথায় থাকে কে জানে?

সায়রা বানু মেয়েটি হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে, তার কথা তিনি মন দিয়ে শুনছেন না। মাথায় দুশ্চিন্তা নিয়ে অন্য কিছুতে মন বসানো বেশ কঠিন। তবে মাছিটা এখন শান্ত হয়েছে। টেবিলের উপর চুপ করে বসে আছে। ডিম পাড়ছে না তো?

'আমার সাদা বাঘিনী টাইটেল পাওয়ার ঘটনাটা খুব ইন্টারেস্টিং। শুনলে আপনি খুব মজা পাবেন। বলব?'

মিসির আলি কিছুই বললেন না। তিনি খুব ভালো করেই জানেন মেয়েটি তার গল্প বলবেই। তিনি বলতে বললেও বলবে, বলতে না বললেও বলবে।

'হয়েছে কী শুনুন—সায়েন্স ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে আমি যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু, রাকা। রাকা হচ্ছে বোরকাওয়ালী। বোরকা পরে। সউদি বোরকা। বেশ কয়েক টাইপ বোরকা পাওয়া যায় তা কি আপনি জানেন? সউদি বোরকা, পাকিস্তানি বোরকা। সউদি বোরকা ভয়াবহ, শুধু চোখ দুটো বের হয়ে থাকে। এমনিতে সে অবিশ্যি খুব স্টাইলিস্ট। বোরকার নিচে স্লিভলেস ব্লাউজ পরে। যাই হোক বোরকাওয়ালী রাকা হঠাৎ বলল, সে একটা পেনসিল কিনবে। আমি তাকে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকলাম পেনসিল কিনতে। স্টেশনারির দোকান তবে তার সঙ্গে কনফেকশনারিও আছে। চা বিক্রি হচ্ছে। কেক বিক্রি হচ্ছে। দোকানটায় বেশ ভিড়। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে এক লোক করল কী বোরকাওয়ালীর গায়ে হাত দিল। গায়ে মানে কোথায় তা আপনাকে বলতে পারব না। আমার লজ্জা লাগবে। বোরকাওয়ালী এমন ভয় পেল যে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। আমি বোরকাওয়ালীকে ধরে ফেললাম। তারপর বদমাশ লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি ওর গায়ে হাত দিলেন কেন? ষণ্ডাগণ্ডা টাইপের লোক। লাল চোখ। গরিলাদের মতো লোম ভরতি হাত। সে এমন ভাব করল যে আমার কথাই শুনতে পায় নি। দোকানদারের দিকে তাকিয়ে হাই তুলতে তুলতে বলল—দেখি একটা লেবু চা। তখন আমি খপ করে তার হাত ধরে ফেললাম। সে ঝটকা দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল কিন্তু তার আগেই আমি তার হাত কামড়ে ধরলাম। যাকে বলে কচ্ছপের কামড়। কচ্ছপের কামড় কী তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। কচ্ছপ একবার কামড়ে ধরলে আর ছাড়ে না, আমিও ছাড়লাম না। আমার মুখ রক্তে ভরে গেল। লোকটা

বিকট চিৎকার শুরু করল। ব্যাপারস্যাপার দেখে বোরকাওয়ালী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এর পর থেকে আমার টাইটেল হয়েছে সাদা বাঘিনী।'

গল্প শেষ করে সায়রা বানু খিলখিল করে হাসছে। মিসির আলি মেয়েটির হাসির মাঝখানেই বললেন, তুমি আমার কাছে কেন এসেছ?

'গল্প করার জন্যে এসেছি। বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভালো লাগে।'

'আমি বিখ্যাত মানুষ?'

'অবশ্যই বিখ্যাত। আপনাকে নিয়ে কত বই লেখা হয়েছে। আমি অবিশ্যি একটা মাত্র বই পড়েছি। ওই যে সুধাকান্ত বাবুর গল্প। একটা মেয়ে খুন হল আর আপনি কেমন শার্লক হোমসের মতো বের করে ফেললেন—সুধাকান্ত বাবুই খুনটা করেছেন। বই পড়ে মনে হচ্ছিল আপনার খুব বুদ্ধি কিন্তু আপনাকে দেখে সেরকম মনে হচ্ছে না।'

'আমাকে দেখে কেমন মনে হচ্ছে?'

'খুব সাধারণ মনে হচ্ছে। আপনার মধ্যে একটা গৃহশিক্ষক গৃহশিক্ষক ব্যাপার আছে। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি নিয়মিত বেতন পান না এমন একজন অংকের স্যার। আপনি রোজ ভাবেন আজ বেতনের কথাটা বলবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করে বলতে পারেন না। আচ্ছা আপনি এমন গম্ভীর মুখে বসে আছেন কেন? মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা শুনে মজা তো পাচ্ছেনই না উল্টো বিরক্ত হচ্ছেন। সত্যি করে বলুন আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?'

'কিছুটা হচ্ছি।'

'মাছিটা তো এখন আর বিরক্ত করছে না। কেমন শান্ত হয়ে টেবিলে বসে আছে। তারপরেও আপনি এত বিরক্ত কেন বলুন তো?'

'তুমি অকারণে কথা বলছ এই জন্যে বিরক্ত হচ্ছি। অকারণ কথা আমি নিজেও বলতে পারি না অন্যের অকারণ কথা শুনতেও ভালো লাগে না।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে হলে সব সময় একটা কারণ লাগবে? তা হলে তো আপনি খুবই বোরিং একটা মানুষ। এত কারণ আমি পাব কোথায় যে আমি রোজ রোজ আপনার সঙ্গে কথা বলব?'

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুমি রোজ রোজ আমার সঙ্গে কথা বলবে?'

'হুঁ।'

'সে কী, কেন?'

সায়রা বানু খুব সহজ ভঙ্গিতে হাই তুলতে তুলতে বলল, 'এক বাড়িতে থাকতে হলে কথা বলতে হবে না?'

'এক বাড়িতে থাকবে মানে? আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি আপনার সঙ্গে কয়েকটা দিন থাকব। কদিন এখনো বলতে পারছি না। দু দিনও হতে পারে আবার দু মাসও হতে পারে। আবার দু বছরও হতে পারে। সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার উপর।'

মিসির আলি চেয়ার থেকে পা নামিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকালেন। হচ্ছেটা কী? এই যুগের টিনএজার মেয়েদের ভাবভঙ্গি, কাণ্ডকারখানা বোঝা মুশকিল। তারা যে কোনো উদ্ভট কিছু হাসিমুখে করে ফেলতে পারে। মেয়েটি হয়তো অতি তুচ্ছ

কারণে রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে। কিংবা তাকে ভড়কে দেবার জন্যে গল্প ফেঁদেছে। পরে কলেজে বন্ধুদের কাছে এই গল্প করবে। বন্ধুরা মজা পেয়ে একে অন্যের গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়বে।—ও মাগো বুড়োটাকে কী বোকা বানিয়েছি! সে বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে আমি থাকতে এসেছি।

মিসির আলি নিজের বিস্ময় গোপন করে সহজভাবে বললেন, 'তুমি এ বাড়িতে থাকবে?'

'জি।'

'বিছানা বালিশ নিয়ে এসেছ?'

'বিছানা বালিশ আনি নি। আজকাল তো আর বিছানা বালিশ নিয়ে কেউ অন্যের বাড়িতে থাকতে যায় না। শুধু একটা স্যুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ এনেছি। আর একটা পানির বোতল।'

'স্যুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ কোথায়?'

'বারান্দায় রেখে এসেছি। শুরুতেই আপনি আমার স্যুটকেস দেখে ফেললে ঢুকতে দিতেন না। যাই হোক আমি এখন আমার স্যুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে আসছি। আচ্ছা আপনি এমন ভাব করছেন যেন আকাশ থেকে পড়েছেন। আকাশ থেকে পড়ার মতো কিছু হয় নি। বিপদগ্রস্ত একজন তরুণীকে কয়েকদিনের জন্যে আশ্রয় দেয়া এমন কোনো বড় অন্যায় না। আমি নিশ্চিত এরচে অনেক বড় বড় অন্যায় আপনি করেছেন।'

'তুমি সত্যি সত্যি আমার এখানে থাকার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছ?'

'জি।'

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন। এই মুহূর্তে তাঁর ঠিক কী করা উচিত তা মাথায় আসছে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মেয়েটির কাণ্ডকারখানা দেখাই মনে হয় সবচে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী। এই পরিস্থিতিতে তিনি কী করবেন বা করতে পারেন সেই সম্পর্কে চিন্তাভাবনা সে নিশ্চয়ই করেছে। নিজেকে সম্ভাব্য সব রকম পরিস্থিতির জন্যে সে প্রস্তুত করে রেখেছে। মিসির আলির এমন কিছু করতে হবে যার সম্পর্কে মেয়েটির প্রস্তুতি নেই। সে কেন বাড়ি ছেড়ে এসেছে এই মুহূর্তে তা তাকে জিজ্ঞেস করা যাবে না। কারণ এই প্রশ্নটি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর মেয়েটি তৈরি করে রেখেছে। তাঁর বিস্মিত হওয়াও ঠিক হবে না। তাঁকে খুব সহজ এবং স্বাভাবিক থাকতে হবে। যেন এমন ঘটনা প্রতি সপ্তাহেই দুটা–একটা করে ঘটছে।

সায়রা বানু স্যুটকেস, হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকল। মিসির আলি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন সে গুনগুন করে কী একটা গানের সুরও যেন ভাজছে। কত সহজ স্বাভাবিক তার আচরণ।

'কেক খাবেন?'

'কেক?'

'হুঁ। আমার নিজের বেক করা, ডিমের পরিমাণ বেশি হয়েছে বলে একটু ডিম ডিম গন্ধ হয়ে গেছে। অনেকে ডিমের গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারে না। আমার কাছে অবিশ্যি খারাপ লাগে না। দেব আপনাকে এক পিস কেক?'

'না।'

'আপনাকে একটু বাজারে যেতে হবে, কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। আমি অতি দ্রুত চলে এসেছি তো কাজেই অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আনা হয় নি। টুথপেস্ট এনেছি, টুথব্রাশ আনি নি। আমার অভ্যাস হচ্ছে রাতে শোবার সময় কুটকুট করে কয়েকটা লবঙ্গ খাওয়া। লবঙ্গ খেলে শরীরের রক্ত পরিষ্কার থাকে, কখনো হার্টের অসুখ হয় না। সেই লবঙ্গ আনা হয় নি। আপনাকে লবঙ্গ আনতে হবে। পারবেন? আমি আপনাকে টাকা দিয়ে দেব। আমি সঙ্গে করে অনেক টাকা নিয়ে এসেছি। বলুন তো কত এনেছি?'

'বলতে পারছি না।'

'অনুমান করুন। আপনি হচ্ছেন বিখ্যাত মিসির আলি। আপনার অনুমান হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনুমান। বলুন আমার সঙ্গে কত টাকা আছে।'

'পাঁচ হাজার টাকা।'

'হয় নি। আমার সঙ্গে আছে মোট একান্ন হাজার টাকা। পাঁচ শ টাকার একটা বান্ডিল এনেছি আর এনেছি দশ টাকার একটা বান্ডিল। সেখান থেকে কিছু খরচ করেছি। বেবিট্যাক্সি ভাড়া দিয়েছি তিরিশ টাকা। ঠিক এই মুহূর্তে আমার কাছে আছে পঞ্চাশ হাজার নয় শ সত্তর টাকা। আপনাকে টুকটাক বাজারের জন্যে পাঁচ শ টাকা দিচ্ছি, যা লাগে খরচ করবেন বাকিটা ফেরত দেবেন। এই নিন।'

সায়রা বানু তার কাঁধে ঝুলানো কালো ব্যাগ খুলে টাকা বের করল। মিসির আলি টাকাটা নিলেন। মেয়েটি এক ধরনের খেলা শুরু করেছে। মিসির আলির মনে হল মেয়েটিকে সেই খেলা তার মতোই খেলতে দেয়া উচিত। এই মুহূর্তে এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে খেলা বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি মেয়েটিকে আগ্রহ নিয়ে দেখতে শুরু করেছেন—তার তাকানোর ভঙ্গি, হাঁটার ভঙ্গি, বসার ভঙ্গি। আপাতদৃষ্টিতে এইসব খুবই ছোটখাটো ব্যাপার থেকে অনেক কিছু জানা যায়।

সায়রা বানু চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আমার খাওয়া নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। যা খাওয়াবেন আমি তাই খাব। শুধু মাছ ছাড়া। মাছ আমি খেতে পারি না—গন্ধ লাগে। অবিশ্যি চিংড়ি মাছ খাই। চিংড়ি মাছ কেন খাই বলুন তো?

'বলতে পারছি না।'

'চিংড়ি মাছ খাই কারণ চিংড়ি মাছ হচ্ছে আসলে এক ধরনের পোকা। পোকা বলেই চিংড়ি মাছে আঁশটে গন্ধ নেই। ও আচ্ছা বলতে ভুলে গেছি। আরেকটা জিনিস খুব পছন্দ করে খাই। ইলিশ মাছের ডিম।'

'মাছের ডিমেরও তো আঁশটে গন্ধ থাকে।'

'ইলিশ মাছের ডিমে থাকে না। আপনি কেভিয়ার খেয়েছেন?'

'না।'

'কেভিয়ার হচ্ছে পৃথিবীর সবচে দামি খাবার। কালো রঙের মাছের ডিম। স্বাদ কী রকম জানেন?'

'যেহেতু খাই নি স্বাদ কেমন তা তো জানার কথা না।'

'স্বাদ কেমন আপনি জানেন। অনেকটা আমাদের শিং মাছের ডিমের মতো। তবে আঁশটে গন্ধ অনেক বেশি। নাক চেপে ধরে আমি একবার খানিকটা খেয়েছিলাম তারপর বমিটমি করে একাকার।'

মিসির আলি পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। সঙ্গে দেয়াশলাই নেই। দেয়াশলাইয়ের খোঁজে রান্নাঘরে যেতে হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। মেয়েটাকে কি বলবেন দেয়াশলাই এনে দিতে? মিসির আলিকে কিছু বলতে হল না। তার আগেই সায়রা বানু বলল, 'আপনার লাইটার লাগবে?'

'আছে তোমার কাছে?'

'আছে। আপনি সিগারেট মুখে দিন আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।'

মেয়েটা যে ভঙ্গিতে লাইটার ধরাল তাতে মনে হল সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে তার অভ্যাস আছে। সে নিজে সিগারেট খায় না তো? না খায় না, সিগারেটের ধোঁয়ায় সে নাক কুঁচকাচ্ছে।

'এই লাইটারটা আপনি রেখে দিন। লাইটারটা আমি আপনার জন্যে এনেছি।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'আর এক প্যাকেট সিগারেটও এনেছি। আপনার একটা বইয়ে পড়েছিলাম একজন কে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসত। যেদিনই আসত আপনার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসত।'

মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'একটু আগে বলেছিলে তুমি আমার একটা বইই পড়েছ।'

'মিথ্যা কথা বলেছিলাম। অনেকগুলি বই পড়েছি। সুধাকান্ত বাবুর উপর লেখা বইটা সবচে ভালো লেগেছে। ওইটা আমি পড়েছি তিনবার। না তিনবার না। আড়াইবার পড়েছি। দুবার পড়েছি পুরোটা। শেষ বার পড়েছি শুধু শেষের কুড়ি পাতা।'

'ভালো।'

'মিথ্যা কথা বললে কি আপনি রেগে যান?'

'না।'

'আমাকে কেউ মিথ্যা কথা বললে আমি অবিশ্যি খুব রেগে যাই। আর আমার এমনই কপাল যে সবাই শুধু আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে। তবে আপনি বলবেন না সেটা আমি জানি। আপনার চেহারা দেখেই বোঝা যায় আপনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। আপনি কি জানেন যারা সব সময় মিথ্যা কথা বলে তাদের চেহারায় একটা মাইডিয়ার ভাব থাকে।'

'তাই নাকি?'

'জি।'

'যেসব মেয়েকে দেখবেন খুব মায়া মায়া চেহারা, আপনি ধরেই নিতে পারেন তারা প্রচুর মিথ্যা কথা বলে।'

'এই তথ্য জানতাম না।'

'আপনি মিসির আলি আর আপনি এই সাধারণ তথ্য জানেন না? অথচ বইয়ে কত আশ্চর্য আশ্চর্য কথা যে আপনার সম্পর্কে লেখা হয়। যেমন কাউকে এক পলক দেখেই আপনি তার সম্পর্কে হড়বড় অনেক কথা বলে দিতে পারেন। আসলেই কি পারেন?'

'না। পারি না।'

'আচ্ছা চেষ্টা করে দেখুন না। আমার সম্পর্কে বলুন।'

'কী বলব?'

'আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে। এইসব। দেখি আপনার পাওয়ার অব অবজারভেশন।'

'দেখ সায়রা বানু, আমি পরীক্ষা দেই না।'

'পরীক্ষা ভাবছেন কেন? ভাবেন একটা খেলা। বলুন আমার সম্পর্কে বলুন।'

মিসির আলি হাতের সিগারেট ফেলে দিলেন। আরেকটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করছে। তিনি নিজের ওপর একটু বিরক্ত হচ্ছেন কারণ তাঁর টেনশান হচ্ছে। টেনশান হলেই একটা সিগারেট শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করে। তাঁর শরীর ভালো না। এখন কিছুদিন টেনশান ফ্রি জীবন যাপন করতে চান। অজানা-অচেনা একটা মেয়ে হুট করে উপস্থিত হয়ে তাতে বাধা দিচ্ছে।

মেয়েটি আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কী হল কিছু বলছেন না কেন?'

মিসির আলি খানিকটা বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'তোমার সম্পর্কে আমার প্রথম অবজারভেশন হচ্ছে তোমার নাম সায়রা বানু নয়।'

'এরকম মনে হবার কারণ কী?'

'মনে হবার কারণ হচ্ছে—সায়রা বানু যদি তোমার নাম হত তা হলে সায়রা বানু ডাকলে তুমি সহজ ভাবে রেসপন্স করতে। একটু আগে আমি বললাম, দেখ সায়রা বানু পরীক্ষা আমি দেই না। বাক্যটা আমি একবারে বলি নি। দেখ সায়রা বানু, বলে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করেছি। যখন দেখলাম তুমি হঠাৎ চমকে উঠলে তখনই আমি বাক্যটা শেষ করলাম। তোমার চমকে ওঠার কারণ হচ্ছে সায়রা বানু বলে যে তোমাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তা তুমি শুরুতে বুঝতে পার নি। যখন বুঝতে পেরেছ তখনই চমকে উঠেছ। তোমার নাম কী?'

'আমার নাম চিত্রা।'

'তোমার সম্পর্কে আমার দ্বিতীয় অবজারভেশন হচ্ছে তোমাকে দীর্ঘদিন একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। সেই ঘরের জানালা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। আলোহীন একটা ঘরে দীর্ঘদিন থাকলে গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তোমার তাই হয়েছে। তুমি আলোর দিকে ঠিকমতো তাকাতেও পারছ না। যতবার তাকাচ্ছ ততবার চোখের মণি ছোট হয়ে আসছে। ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে। আবার জানালা থেকে তুমি চোখ ফিরিয়েও নিতে পারছ না। বারবার বিস্মিত চোখে জানালা দিয়ে তাকাচ্ছ। কারণ অনেকদিন পরে তুমি জানালায় খোলা আকাশ দেখছ।'

'আরো কিছু বলবেন?'

'দীর্ঘদিন ধরে তুমি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছ। যে কোনো কারণেই হোক তোমাকে মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে। স্টোরি তৈরি করতে হচ্ছে। মিথ্যা বলাটা তোমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কি ঠিক বলেছি?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার হাত বাঁধা ছিল। মণিবন্ধে কালো দাগ পড়ে গেছে।'

'হুঁ।'

'তোমার ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল। তুমি কিছুক্ষণ পরপরই নাক কুঁচকাচ্ছ। এবং তাকাচ্ছ ঘরের দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিক থেকে নর্দমার দুর্গন্ধ আসছে। সেটা এত প্রবল

না যে এমনভাবে নাক কুঁচকাতে হবে। এর থেকে মনে হয়—হয় তোমার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল আর নয়তো তোমাকে অনেক উঁচু কোনো ঘরে আটকে রাখা হয়েছে, ছ তলা–সাত তলায় যেখানে রাস্তার নর্দমার গন্ধ পৌঁছে না।'

চিত্রা চুপ করে রইল। সে খুব একটা বিস্মিত হল বলে মনে হল না। মিসির আলি বললেন, 'এখন বল, তোমার ব্যাপারটা কী?'

'আপনি তো কিছু না জেনেই অনেক কিছু বলতে পারেন। আপনি নিজেই বলুন।'

'না আমি বলতে পারছি না।'

'অনুমান করুন। দেখি আপনার অনুমানশক্তি আমার ঘ্রাণশক্তির মতো কি না।'

'আমার ধারণা তুমি অসুস্থ। অসুস্থতাটা এমন যে রোগীকে ঘরে আটকে রাখতে হয়। তুমি কোনোক্রমে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছ।'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে আমি পাগল তাই আমাকে ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল? না আমি পাগল না। সুস্থ। ছিটেফোঁটা পাগলামি যা অন্যদের মধ্যে থাকে আমার তাও নেই। তবে আমাকে ঘরে আটকে রাখা হচ্ছিল তা ঠিক। ছাব্বিশ দিন হল ঘরে তালাবন্ধ। আমাকে সবাই মিলে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছে। কারণটাও খুব সাধারণ এবং আপনার মতো বুড়োর কাছে হয়তো বা হাস্যকর। কারণটা বলব?'

মিসির আলি হ্যাঁ–না কিছুই বললেন না। মেয়েটির স্বভাব যা তাতে তিনি যদি বলেন— হ্যাঁ বল—তা হলে সে নিশ্চিতভাবেই বলবে—না বলব না । তারচে চুপ করে থাকাই ভালো।

'ব্যাপারটা প্রেমঘটিত। আমি একটা ছেলেকে বিয়ে করতে চাই। দরিদ্র ফালতু টাইপ ছেলে। কিছুই করে না। তার প্রেমে পড়ার কারণ নেই। তারপরেও আমি পড়ে গেছি এবং এবং ...'

'এবং কী?'

'গোপনে বিয়ে করার জন্যে তার সঙ্গে পালিয়েও গিয়েছিলাম। আমাকে ধরে আনা হয়। আমি তো খুব জেদি মেয়ে, কাজেই আমি সবাইকে বলি—আমি আবারো পালিয়ে যাব। তোমাদের কোনো সাধ্য নেই আমাকে ধরে রাখার।'

'ছেলেটার নাম কী?'

'ছেলেটার নাম দিয়ে আপনার দরকার কী?'

'কোনো দরকার নেই। কৌতূহল বলতে পার।'

'উনার নাম ফরহাদ।'

'শুধুই ফরহাদ?'

'ফরহাদ খান।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কী?'

'তোমার কাছ থেকে এই কথা শোনার পর তারা তোমাকে তালাবন্ধ করে রাখল?'

'তাই তো রাখবে। যে মেয়ে এ জাতীয় কথা বলে তাকে নিশ্চয়ই কেউ কোলে করে ঘুরে বেড়াবে না। ঘুমপাড়ানি গান গাইয়ে ঘুম পাড়াবে না।'

'আজ তুমি ছাড়া পেয়েছ, আমার কাছে না এসে ওই ছেলেটির কাছে চলে যাচ্ছ না কেন?'

'যাব তো বটেই। আপনার কি ধারণা আমি চিরকালের জন্যে আপনার সঙ্গে থাকব?'

'মিসির আলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, চিত্রা তুমি আবারো মিথ্যা কথা বলছ।'

'বুঝলেন কী করে?'

'ছেলেটার নাম কী বল জিজ্ঞেস করার পর—থতমত খেয়ে গেলে। চট করে বলতে পারলে না। একটা কোনো নাম ভাবার জন্যে সময় নিলে। তারপর বললে উনার নাম ফরহাদ। উনি বললে—যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ তার প্রসঙ্গে উনি বলবে কেন? বলবে ওর নাম ফরহাদ।'

'তা হলে কি সত্যি কথা শুনতে চান?'

'আমি এখন সত্যি-মিথ্যা কোনো কথাই শুনতে চাই না। তুমি আমার সাহায্য চাচ্ছ। যদি সত্যি চাও আমি তোমাকে সাহায্য করি, তা হলে তোমাকে সত্যি কথা বলতে হবে। তা তুমি পারবে না। মিথ্যা বলাটা তোমার রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। কিছুক্ষণ সত্যি বলার পর আবার মিথ্যা শুরু করবে।'

'তাতে অসুবিধা কী? যেই মুহূর্তে আমি মিথ্যা বলব আপনি ধরে ফেলবেন। আপনার তো সেই ক্ষমতা আছে।'

মিসির আলি আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—'চিত্রা শোন আমার পক্ষে তোমাকে এ বাড়িতে রাখা সম্ভব না। তোমাকে চলে যেতে হবে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যেতে হবে।'

'আমার সমস্যা আপনি সমাধান করবেন না?'

'মানুষের বেশিরভাগ সমস্যাই এরকম যে তা তারা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। আমার ধারণা তোমার সমস্যার সমাধান তুমিই করতে পারবে।'

'আমি আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছি বলে কি আপনি রাগ করেছেন?'

'রাগ করার প্রশ্ন আসছে না। মিথ্যা কথা বলাটাকে সবাই যতবড় অন্যায় মনে করে আমি তা করি না। আমার কাছে মনে হয় মানুষের অনেক অদ্ভুত ক্ষমতার একটি হচ্ছে মিথ্যা বলার ক্ষমতা। কল্পনাশক্তি আছে বলেই সে মিথ্যা বলতে পারে। যে মানুষ মিথ্যা বলতে পারে না সে সৃষ্টিশীল মানুষ না—রোবট টাইপ মানুষ।'

'আপনি কি মিথ্যা বলেন?'

'না বলি না। মানুষ হিসেবে আমি রোবট টাইপের। শোন চিত্রা, তুমি এখন চলে যাও।'

চিত্রা বিস্মিত গলায় বলল, 'চলে যাব?'

'হ্যাঁ চলে যাবে।'

'আপনি আমাকে খুব অপছন্দ করেছেন তাই না?'

'আমি তোমাকে অপছন্দও করি নি আবার পছন্দও করি নি।'

'আমার বিষয়ে আপনার কোনো কৌতূহলও হচ্ছে না?'

'লোকজনের ধারণা আমার কৌতূহল খুব বেশি, আসলে তা না। আমার কৌতূহল কম। অনেক কম।'

'নীল রঙের মাছিটার দিকে আপনি যতটা কৌতূহল নিয়ে তাকিয়েছেন আমার দিকে তাও তাকান নি। আমি কি মাছির চেয়েও তুচ্ছ?'

মিসির আলি চুপ করে রইলেন।

চিত্রা ক্লান্ত গলায় বলল, আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি দয়া করে গম্ভীর হয়ে থাকবেন না। যাবার আগে হাসিমুখে থাকুন। আপনার হাসিমুখ দেখে যাই।

মিসির আলি হাসলেন। চিত্রা বলল, বাহ আপনার হাসি তো সুন্দর। যারা গম্ভীর ধরনের মানুষ তাদের হাসি খুব সুন্দর হয়। এরা হঠাৎ হঠাৎ হাসে তো এই জন্যে। আর যারা সব সময় হাসিমুখে থাকে তাদের হাসি হয় খুব বিরক্তিকর। তাদের কান্না হয় সুন্দর। আচ্ছা আমি তা হলে এখন উঠি।

চিত্রা উঠে দাঁড়াল। মেয়েটা এত সহজে চলে যেতে রাজি হবে তা মিসির আলি ভাবেন নি। তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

'আচ্ছা শুনুন, আমি আমার ব্যাগগুলি রেখে যাই। ব্যাগ হাতে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় খোঁজার তো কোনো মানে হয় না, তাই না?'

'বিছানা বালিশ নিয়ে যাওয়াই তো ভালো, সবাই ভাববে এই মেয়ের আসলেই আশ্রয় প্রয়োজন।'

'আপনি কিন্তু সেরকম ভাবেন নি। আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। যাই হোক আমি জিনিসপত্র রেখে যাচ্ছি। একসময় এসে নিয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

'আপনি আসলেই রোবট টাইপ মানুষ। যাই কেমন?'

'তুমি কি তোমার বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটি দিয়ে যাবে?'

'কেন? আচ্ছা দিচ্ছি। কাগজে লিখে দিচ্ছি। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে টেলিফোন করবেন না। আর যদি করেন আপনি ভয়াবহ বিপদে পড়ে যাবেন। এইবার কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি—কি বলছি না?'

'মনে হচ্ছে বলছ।'

চিত্রা তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে কাগজ নিয়ে টেলিফোন নাম্বার লিখল। ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, এই নিন নাম্বার। আবারো বলছি নিতান্ত প্রয়োজন না হলে টেলিফোন করবেন না।

'নিতান্ত প্রয়োজন বলতে তুমি কী বুঝাচ্ছ?'

'ধরুন আমি আপনার ঘর থেকে বের হলাম। আর হঠাৎ একটা ট্রাক এসে আমার গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল তখন আপনি বাসায় টেলিফোন করে বলবেন—চিত্রা মারা গেছে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

চিত্রা বেশ সহজ ভঙ্গিতেই বের হল। মিসির আলি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি আজ আর ঘর থেকে বের হবেন না। তিনি জানেন ঘণ্টা দু-একের ভেতর চিত্রা ফিরে আসবে, তার জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। মেয়েরা তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কোথাও রেখে স্বস্তি পায় না। কাজেই অপেক্ষা করাই ভালো।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার মেয়েটি চলে যাবার পর মিসির আলির একটু মন খারাপ হয়ে গেল। পাখি উড়ে যাবার পর পাখির পালক পড়ে থাকে। মেয়েটা চলে গেছে তার পরেও কিছু যেন রেখে গেছে। স্যুটকেস এবং হ্যান্ডব্যাগ নয়, অন্য কিছু।

মেয়েটির রেখে যাওয়া ৫০০ টাকার নোটটা পকেটে। টাকাটা ফেরত দিতে ভুলে গেছেন। আশ্চর্য কাণ্ড—মেয়েটি তার কালো ব্যাগও ফেলে গেছে। তার সব টাকা তো ওই ব্যাগে। বেবিট্যাক্সি নিয়ে যদি কোথাও যায় ভাড়া দিতে পারবে না।

মিসির আলি অস্বস্তি বোধ করছেন। মেয়েটাকে মাথা থেকে তাড়াতে পারছেন না। মাছিটা এখনো টেবিলে বসে আছে। মারা গেছে নাকি? না মারা যায় নি। কীট এবং পতঙ্গ জগতের নিয়ম হল মৃত্যুর পর উল্টো হয়ে থাকা। পিঠ থাকবে মাটিতে পা থাকবে শূন্যে। মাছির বেলাতেও নিশ্চয়ই সেই নিয়ম। মিসির আলি তার লাইব্রেরির দিকে এগুলেন—মাছি সম্পর্কে জানার জন্যে কোনো বই কি আছে লাইব্রেরিতে? থাকার তো কথা।

মাছি সম্পর্কে মিসির আলি তেমন কোনো তথ্য যোগাড় করতে পারলেন না। শুধু জানলেন পৃথিবীতে মোট ৮৫,০০০ প্রজাতির মাছি আছে। মৌমাছি যেমন মাছি, ড্রাগন ফ্লাইও মাছি। সবচে ছোট মাছি প্রায় অদৃশ্য আর সবচে বড় মাছি চড়ুই পাখি সাইজের। এদের সবারই দু জোড়া পাখা থাকে। এক জোড়া তারা ওড়ার কাজে ব্যবহার করে—অন্য জোড়া ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যবহার করে। বেশিরভাগ প্রজাতির মাছিই মানুষের পরম বন্ধু—শুধু হাউস ফ্লাই নয়। এদের প্রধান কাজ অসুখ ছড়ানো।

২

চিত্রা দু ঘণ্টার ভেতর ফিরে আসবে এ ব্যাপারে মিসির আলি নিশ্চিত ছিলেন। নিশ্চিত ব্যাপারগুলি মানুষের জীবনে প্রায় কখনো ঘটে না। চিত্রা দু ঘণ্টা কেন দশ দিনের মাথাতেও ফিরে এল না। তার হ্যান্ডব্যাগ এবং স্যুটকেসে ধুলা জমতে লাগল। সে একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গিয়েছিল। টেলিফোন নাম্বার লেখা চিরকুট তিনি ড্রয়ারে যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। অযত্নে অবহেলায় রাখা কাগজপত্র সব সময় পাওয়া যায়। যত্নে রাখা কাগজ কখনো পাওয়া যায় না। মারফির এই সূত্র ভুল প্রমাণিত হল। মিসির আলি ড্রয়ার খুলেই চিরকুটটি পেলেন এবং সেই চিরকুট দেখে তিনি ছোটখাটো একটা চমক খেলেন। চিরকুটে টেলিফোন নাম্বার লেখা নেই। শুধু সুন্দর অক্ষরে লেখা Help me!

মিসির আলির একটু মন খারাপ হল। মেয়েটির সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনলেই হত। তিনি এতটা অধৈর্য হলেন কেন? বাড়িঘর ছেড়ে নিতান্ত অকারণে এই বয়সের একটা মেয়ে চলে আসে না। এই বয়সের মেয়েদের মাথায় নানান উদ্ভট ব্যাপার খেলা করে তারপরেও বাড়িঘর ছাড়ার ব্যাপারে তারা খুব সাবধানী হয়। আশ্রয় মেয়েদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। প্রকৃতি মেয়েদের সেই ভাবেই তৈরি করেছে। ভবিষ্যতে এরা সন্তানের জন্ম দেবে। সেই জন্যে তাদের নিরাপদ আশ্রয় দরকার। কাজেই "হে মাতৃজাতি তোমরা আশ্রয় কখনো ছাড়বে না" এই হল ডি এন এ'র অনুশাসন। ডি এন এ অনুশাসনের বাইরে যাবার ক্ষমতা তাদের নেই।

মেয়েটি তার সঙ্গে যোগাযোগের কোনো পথ রাখে নি। পথ রাখলে তিনি বলতেন—হ্যাঁ আমি এখন তোমার কথা শুনব। সত্যি-মিথ্যা সব কথাই শুনব। আগের বারে

তোমার কথা শুনতে চাই নি। তোমার হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যাপারটাই আমার মাথায় প্রবলভাবে ছিল। তার জন্যে আমি দুঃখিত।

মেয়েটি তার হ্যান্ডব্যাগ বা স্যুটকেসে কোনো ঠিকানা কি রেখে গেছে?

স্যুটকেস খুললে কোনো গল্পের বই কি পাওয়া যাবে যেখানে তার নাম এবং বাড়ির ঠিকানা লেখা? বই পেলেও লাভ হবে না। এখনকার মেয়েরা বই-এ নিজের নাম লিখলেও বাড়ির ঠিকানা লেখে না। বাড়ির ঠিকানা লেখাটাকে গ্রাম্যতা বলে ধরা হয়। ডায়েরি পেলে সবচে ভালো হত। ডায়েরিতে নাম ঠিকানা থাকে। তবে ডায়েরি পাবার সম্ভাবনা অতি সামান্য। আজকালকার মেয়েদের ডায়েরি লেখার মতো সময় নেই। নিজেদের কথা তারা শুধু গোপন করতে চায়। লিখতে চায় না।

মিসির আলি মেয়েটির স্যুটকেস খুললেন। কয়েকটা শাড়ি, পলিথিনে মোড়া দু জোড়া স্যান্ডেল, হেয়ার ড্রায়ার, ট্রাভেলার্স আয়রন, কিছু কসমেটিকস, এক বোতল পানি, সুন্দর একটা চায়ের কাপ। একটা ফুলতোলা বেডশিট।

বই এবং ডায়েরি পাওয়া গেল না। তবে বেডশিটের নিচে একগাদা কাগজ পাওয়া গেল। দামি ওনিয়ন স্কিন পেপার। কাগজে চিকন নিবের কালির কলমে গুটিগুটি করে ঠাসবুনন লেখা। যত্ন করে কেউ অনেক দিন ধরে লিখেছে। মনে হচ্ছে দীর্ঘ কোনো চিঠি। কাকে লেখা? মিসির আলি ভুরু কুঁচকে সম্বোধন পড়লেন—

শ্রদ্ধাষ্পদেষু

জনাব মিসির আলি সাহেব।

চিঠিতে তারিখ নেই। যে লিখছে তার নামও নেই। এর হাতের লেখা এবং চিত্রার হাতের লেখা কি এক? ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট ছাড়া বলা যাবে না। চিত্রা ইংরেজিতে লিখেছে হেল্প মি, আর এই দীর্ঘ চিঠি লেখা বাংলায়। ইংরেজি এবং বাংলা হাতের লেখায় মিল-অমিল চট করে চোখে পড়ে না। তার পরেও মিসির আলির মনে হল দীর্ঘ এই চিঠির লেখিকা এবং চিত্রা এক মেয়ে নয়।

মেয়েটি বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে তার ব্যাগ গোছায় নি। মেয়েরা ব্যাগ গুছানোর সময় অবশ্যই প্রথম নেবে আন্ডার গার্মেন্টস, পেটিকোট, ব্লাউজ, ব্রা, প্যান্টি। এইসব কাপড়ের ব্যাপারে তারা অতিরিক্ত সেনসেটিভ। ব্যাগে আগে এইসব গুছানো হবে তারপর অন্য কিছু। কিন্তু মেয়েটির স্যুটকেস বা হ্যান্ডব্যাগে এইসব কিছু নেই। টাওয়েলও নেই। মেয়েটি ঘর ছাড়ার জন্যে ব্যাগ গোছায় নি। তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য কি তাকে দীর্ঘ চিঠিটা নাটকীয় ভঙ্গিতে দেয়া?

৩

শ্রদ্ধাষ্পদেষু

জনাব আপনাকে কেমন ভড়কে দিলাম। সরাসরি চিঠিটা আপনার কাছে দিলে আপনি এত আগ্রহ নিয়ে পড়তেন না। কাজেই সামান্য নাটক করতে হল। আশা করি আমার এই ছেলেমানুষি নাটকে আপনি বিরক্ত হন নি।

আমি আপনাকে চিনি না। আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয় নি। আপনার সম্পর্কে যা জানি বই পড়ে জানি। বইয়ে লেখকরা সবকিছু ঠিকঠাক লিখতে পারেন না। মূল চরিত্রগুলিকে তারা মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেন। আমি ধরেই নিয়েছি আপনার বেলাতেও তাই হয়েছে। বইয়ের মিসির আলি এবং ব্যক্তি মিসির আলি এক নন। কে জানে আপনি হয়তো বইয়ের মিসির আলির চেয়েও ভালো মানুষ।

আমি আপনার সম্পর্কে মনে মনে একটা ছবি দাঁড় করিয়েছি—আচ্ছা দেখুন তো সেই ছবিটার সঙ্গে কতটুকু মেলে। তারও আগে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেই। আমার ধারণা আপনি এখন ভুরু কুঁচকে ভাবছেন, চিঠির মেয়ে এবং চিত্রা কি এক? ব্যাপারটা আমি ধীরে ধীরে পরিষ্কার করব। আপাতত আপনি এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনাকে লেখা চিঠিটা মন দিয়ে পড়ুন। এই চিঠি আমি দু বছর ধরে রাত জেগে লিখেছি। অসংখ্য বার কাটাকুটি করেছি। বানান ঠিক করেছি। যেন চিঠি পড়ে আপনি কখনো বিরক্ত হয়ে না ভাবেন—মেয়েটা এই সহজ বানানও জানে না! আশ্চর্য তো!

ভালো কথা আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা কী এখন বলি, দেখুন তো মেলে কি না। আমার ধারণা আপনি হাসিখুশি ধরনের মানুষ। বইয়ে আপনার যে গম্ভীর প্রকৃতির কথা লেখা হয় সেটা ঠিক না। আপনার চেহারার যে বর্ণনা বইয়ে থাকে সেটাও ঠিক না। আপনার বিশেষত্বহীন চেহারার কথা লেখা হলেও আমি জানি আপনার চেহারা মোটেও বিশেষত্বহীন নয়। আপনার চোখ ধারালো ও তীব্র সার্চ লাইটের মতো। তবে সেই ধারালো চোখেও একটা শান্তি শান্তি ভাব আছে। আমার খুব ইচ্ছা কোনো একদিন আপনাকে এসে দেখে যাব। শান্ত ভঙ্গিতে আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকব। একসময় আপনাকে বলব, আমাকে একটা হাসির গল্প বলুন তো। আমার কেন জানি মনে হয় কেউ আপনার কাছে গল্প শুনতে আসে না। সবাই আসে ভয়ঙ্কর সব সমস্যা নিয়ে। দিনের পর দিন এইসব সমস্যা শুনতে কি আপনার ভালো লাগে? মাঝে মাঝে আপনার কি ইচ্ছা করে না সহজ স্বাভাবিক গল্প শুনতে এবং বলতে? যেমন আপনি একটা ভূতের গল্প শুনে ভয় পাবেন। ভুরু কুঁচকে ভাববেন—না, ভূত বলে কিছু নেই।

আমাদের চারপাশের জগৎটা সহজ স্বাভাবিক জগৎ, এই জগতে মাঝে মাঝে বিচিত্র এবং ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে। আমার নিজের জীবনেই ঘটে গেল। এবং আমি আপনাকে সেই গল্পই শুনাতে বসেছি। না শুনালেও চলত। কারণ আমি আপনার কাছ থেকে কোনো সাহায্য চাচ্ছি না। বা আপনাকে বলছি না আপনি আমার সমস্যার সমাধান করে দিন। তারপরেও সব মানুষেরই বোধহয় ইচ্ছা করে নিজের কথা কাউকে না কাউকে শুনাতে। আমার চারপাশে তেমন কেউ নেই।

এখন আমি আপনার একটা অস্বস্তি দূর করি। চিত্রা নামের যে মেয়েটি আপনার কাছে এসেছিল আমি সেই মেয়ে। কাজেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। চিত্রার সেদিন আপনাকে কেমন লেগেছিল তা আর আপনাকে কোনোদিন জানানো হবে না। কারণ চিত্রার সঙ্গে আপনার আর কোনোদিন দেখা হবে না। আপনাকে খানিকটা ধাঁধায় ফেলে চিত্রা বিদেয় নিয়েছে। আমিও বিদায় নেব। আমার দীর্ঘ চিঠি শেষ করার পর আপনি ভাববেন—আচ্ছা মেয়েটার কি মাথা খারাপ? সে এইসব কী লিখেছে? কেনই বা লিখেছে? দীর্ঘ লেখা পড়তে আপনার যেন ক্লান্তি না লাগে সে জন্যে আমি খুব চেষ্টা

করেছি। চেষ্টা কতটুকু সফল হল কে জানে। চ্যাপ্টার দিয়ে দিয়ে লিখলাম। চ্যাপ্টারের প্রথম কয়েক লাইন পড়ে আপনি ঠিক করবেন আপনি পড়বেন কি পড়বেন না। সব চ্যাপ্টার যে পড়তেই হবে তা না।

পরিচয়

নাম : চিত্রা (নকল নাম)।

বয়স : ২৩ বছর। (যখন লেখা শুরু করেছিলাম তখন বয়স ছিল ২০ বছর তিন মাস)।

উচ্চতা : পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

আমার প্রিয় রঙ : চাঁপা।

আমার দেখতে ভালো লাগে : চাঁদ এবং পানি।

পড়াশোনা : এস. এস. সি. পাস করার পর আর পড়াশোনা করতে পারি নি। তবে আমি খুব পড়ুয়া মেয়ে। শত শত বই পড়ে ফেলেছি। শুধু গল্পের বই না। সব ধরনের বই। বাড়িতে আমি যেন পড়তে পারি সে জন্যে আমার একজন শিক্ষক আছেন। দর্শনবিদ্যার শিক্ষক। তবে দর্শন আমার প্রিয় বিষয় নয়।

আমি কেমন মেয়ে? ভালো মেয়ে। খুব ভালো মেয়ে। আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছেন। ভাবছেন এই মেয়েটা এমন ছেলেমানুষি করছে কেন? আমি তো আসলে ছেলে মানুষই। ২৩ বছর তো এমন কোনো বয়স না তাই না? তবে আমি কিন্তু আসলেই ভালো মেয়ে।

দূর ছাই লেখার এই ধরনটা আমার ভালো লাগছে না। আমি বরং ধারাবাহিকভাবে শুরু করি। পড়তে পড়তে আমার সম্পর্কে আপনার ধীরে ধীরে একটা ধারণা তৈরি হবে। তখন আর আমাকে বলতে হবে না যে আমি ভালো মেয়ে। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

খুব অল্প বয়সে রোড অ্যাকসিডেন্টে আমার মা মারা যান। বান্দরবান থেকে একটা জিপে করে আমরা আসছিলাম। আমার বাবা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। বাবার পাশে মা বসেছিলেন। মার কোলে আমি। হঠাৎ গাড়ির সামনে একটা ছাগল পড়ল। বাবা সেই ছাগল বাঁচাতে গিয়ে গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে গেলেন। মা তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। আমার এবং বাবার কিছু হল না। বান্দরবানের রাস্তাগুলি খুব নির্জন থাকে। অ্যাকসিডেন্টের অনেক পরে লোকজন এসে আমাদের উদ্ধার করল। আমার তখন বয়স মাত্র দেড় বছর। আমার কিচ্ছু মনে নেই।

আমার বাবা পরে আবার বিয়ে করেন। সেই বিয়ে সুখের হয় নি। ছোট মার মেজাজ খুব খারাপ ছিল। তিনি অল্পতেই রেগে যেতেন। তাঁর আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল। বাবার সঙ্গে রাগারাগি হলেই বলতেন, সুইসাইড করব। শেষ পর্যন্ত মা সুইসাইড করেন। এই নিয়ে খুব ঝামেলা হয়। মা পক্ষের লোকজন মামলা করেন। তারা বলার চেষ্টা করেন মাকে মেরে ফেলা হয়েছে। যাই হোক মামলায় প্রমাণিত হয়, মা মানসিক রোগী ছিলেন। ছোট মা দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। গায়ের রঙ অবিশ্যি শ্যামলা ছিল। কিন্তু তার চেহারা এতই মিষ্টি ছিল—শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করত।

আপনি বুঝতেই পারছেন আমার শৈশবটা সুখের ছিল না। একটা বিরাট বাড়িতে আমি প্রায় একা একাই মানুষ হই। আমাদের বাড়িটা ছিল টু ইউনিট। একতলায় রান্নাঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর, স্টাডি আর দোতলায় শুধুই শোবার ঘর আর ফ্যামিলি লাউঞ্জ। কাজের লোকদের দোতলায় ওঠা নিষেধ ছিল। তারা সবাই বাবাকে ভয় পেত বলে দোতলায় উঠত না। আমি স্কুল থেকে ফিরে একা একাই দোতলায় খেলতাম। আমার মতো বাচ্চারা মনে মনে একজন খেলার সাথী তৈরি করে নেয়, তার সঙ্গেই খেলে। আমিও তাই করলাম। একজন খেলার সাথী বানিয়ে নিলাম। সেই খেলার সাথী হল আমার মা। আমার ছোট মা। আমার আসল মাকে তো আমি দেখি নি, কাজেই তার সম্পর্কে আমার কোনো মমতা বা ভালবাসা কিছুই ছিল না। ছোট মা আমাকে খুবই আদর করতেন। সেই আদরের একটা ছোট্ট নমুনা দিলেই আপনি বুঝবেন। যেমন মনে করুন তিনি আমাকে ডাকছেন—চিত্রা খেতে এস। চিত্রা বলার আগে তিনি একগাদা আদরের নাম অতি দ্রুত বলে যাবেন। তারপর বলবেন খেতে এস। তাঁর আদরের নামগুলি হল—

ভিটভিটি খিটখিটি,
মিটমিটি ফিটফিটি
ভুভুন খুনখুন
সুনসুন ঝুনঝুন।
এ্যাং বেঙ ঝেং, টেঙ টেঙ।

আদরের নাম ছাড়াও তাঁর নিজের কিছু কিছু বিচিত্র ছড়াও ছিল। ননসেন্স রাইমের মতো কোনো অর্থ নেই, কোনো মানে নেই। সেই সব ছড়া তিনি গানের সুরে বলতেন। সব সুর এক রকম। যেমন ধরুন—

ফানিম্যান হাসে তার
রং ঢং হাসি।
জানা কথা যে জানে না
না শুনে সে বাঁশি।

এইসব বিচিত্র ছড়া বলে তিনি খিলখিল করে হাসতেন। আমার খুবই মজা লাগত। মনে হত আহ কী আনন্দময় আমার জীবন।

অতি আদরের একজন মানুষ আমার খেলার সাথী হবে এটাই স্বাভাবিক। আমি নিজের মনে পুতুল খেলতাম, রান্নাবাটি খেলতাম এবং ক্রমাগত ছোট মায়ের সাথে কথা বলতাম, প্রশ্ন করতাম, ছোট মা উত্তর দিতেন। উত্তর তো আসলে দিতেন না। আমি উত্তরটা কল্পনা করে নিতাম। তখন আমার বয়স সাত। সাত বছরের বাচ্চারা এই ধরনের খেলা খেলে। এটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু একদিন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার

ঘটল। সেদিন স্কুল ছুটি ছিল। বাবা গেছেন ঢাকার বাইরে। আমি সারা দিন একা একা খেলেছি।

সন্ধ্যাবেলা আমার শরীর খারাপ করল। গা কেঁপে জ্বর এল। আমি চাদর গায়ে বিছানায় শুয়ে আছি। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। খাট থেকে একটু দূরে আমার পড়ার টেবিল। টেবিলে বাবার এনে দেয়া মোটা একটা ইংরেজি ছবির বই। শুয়ে শুয়ে ছবি দেখতে ইচ্ছা করল। বিছানা থেকে নেমে যে ছবির বইটা আনব সেই ইচ্ছা করছে না। আমি অভ্যাসমতো বললাম, ছোট মা বইটা এনে দাও। কল্পনার খেলার সাথী মাকে এই জাতীয় অনুরোধ আমি প্রায়ই করি। সেই অনুরোধ আমি নিজেই পালন করি। তারপর বলি, থ্যাংক ইউ ছোট মা। ছোট মার হয়ে আমি প্রায়ই বলি, ইউ আর ওয়েলকাম।

সেদিন সন্ধ্যায় অন্য ব্যাপার হল। অবাক হয়ে দেখলাম ছোট মা টেবিলের দিকে যাচ্ছেন। বইটা হাতে নিয়ে বিছানার দিকে ফিরছেন। বইটা আমার দিকে ধরে আছেন। আমি এতই অবাক হয়েছি যে হাত বাড়িয়ে বইটা নিতে পর্যন্ত ভুলে গেছি। ছোট মা আমার বিছানার পাশে বইটা রেখে নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। খোলা দরজাটা হাত দিয়ে ভিড়িয়ে দিয়ে গেলেন। ভয়ে আমার চিৎকার করে ওঠা উচিত ছিল। আমি চিৎকার করলাম না। ভয়ের চেয়ে বিস্ময়বোধই আমার প্রবল ছিল। চোখে ভুল দেখেছি এই জাতীয় চিন্তা আমার একবারও মনে আসে নি। বরং মনে হয়েছে আমি যা দেখছি ঠিকই দেখছি। ছোট মা আমাকে দেখতে এসেছেন। আমার শরীর ভালো না তো এই জন্যে আমাকে দেখতে এসেছেন।

নিঃসঙ্গ শিশুরা তার চারপাশের জগৎ সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা নিজেরা দাঁড় করায়। আমিও একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেললাম। এই ব্যাখ্যায় অসুস্থ শিশুকে দেখতে মৃত মানুষ ফিরে আসতে পারেন।

যদিও আমি নিজেই একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম তারপরেও আমার মনে হল এই ব্যাখ্যায় কিছু ফাঁকি আছে। ফাঁকির ব্যাপারটা আমি নিজে জানতে চাচ্ছিলাম না। কাজেই মাকে দেখতে পাওয়ার কথাটা কাউকে বললাম না। আমার মনে হল পুরো ব্যাপারটায় এক ধরনের গোপনীয়তা আছে। কেউ জেনে ফেললে মা রাগ করবেন, তিনি আর আসবেন না।

সেই রাতে আমার জ্বর খুব বাড়ল। মাথায় পানি দেয়া হল। তাতে কাজ হল না। বাথটাবে বরফ মেশানো ঠাণ্ডা পানিতে আমাকে ডুবিয়ে রাখা হল। ডাক্তার ডাকা হল। চিটাগাং-এ আমার বাবাকে জরুরি খবর পাঠানো হল। আমার খুব ভালো লাগতে লাগল এই ভেবে যে, যেহেতু আমার শরীর খুব খারাপ করেছে আমার ছোট মা নিশ্চয়ই আবারো আমাকে দেখতে আসবেন। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ছোট মা অবিশ্যি এলেন না।

আমার এই ঘটনা শুনে আপনি কী ভাবছেন তা আমি জানি। আপনি ভাবছেন হেলুসিনেশন। একটি নিঃসঙ্গ শিশু তার নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যে নিজের মধ্যে একটি জগৎ সৃষ্টি করেছে। হেলুসিনেশনের জন্ম সেই জগতে। আপনারা সাইকিয়াট্রিস্টরা খুব সহজেই সবকিছু ব্যাখ্যা করে ফেলেন। আপনাদের কাছে রহস্য বলে কিছু নেই।

আইনস্টাইন যখন বলেন সৃষ্টি রহস্যময়, সব রহস্যের জট এই মুহূর্তে খোলা সম্ভব না তখন আপনারা বলেন, ব্যাখ্যাতীত বলে কিছু নেই। সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায় । আমার এক জীবনে আমাকে অনেক সাইকোএনালিসিসের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। আমি এই সব ব্যাপার খুব ভালো জানি। আপনাদের মতো মনোবিদ্যা বিশারদদের দেখলে আমার সত্যিকার অর্থেই হাসি পায়। আপনারা একেকজন কী গম্ভীর ভঙ্গিতে কথা বলেন, যেন পৃথিবীর সবকিছু জেনে বসে আছেন। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর হয়। আপনাদের বিদ্যা শুধু যে অল্প তাই না, শূন্য বিদ্যা।

আপনি কি রাগ করছেন?

দয়া করে রাগ করবেন না। আমি জানি আপনি অন্যদের মতো না। আপনি আপনার সীমারেখা জানেন। প্রকৃতি মানুষের চারদিকে একটা গণ্ডি এঁকে দিয়ে বলে দেয়—এর বাইরে তুমি যেতে পারবে না। তোমার অতি উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়েও তোমাকে থাকতে হবে এই গণ্ডির ভেতর। এই সত্য আপনার জানা আছে। আপনি গণ্ডির ভেতর থেকেও গণ্ডি অতিক্রম করতে চেষ্টা করেন। এইখানেই আপনার বাহাদুরি। বড় বড় কথা বলছি? হয়তো বলছি। তবে এগুলি আমার নিজের কথা না। অন্য একজনের কথা। সেই অন্য একজন প্রচুর জ্ঞানের কথা বলেন এবং খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেন। তিনি যে জ্ঞানের কথা বলছেন তা তখন মনে হয় না। একটু চিন্তা করলেই মনে হয় ওরে বাবারে—এ তো অসম্ভব জ্ঞানের কথা। এই প্রসঙ্গে আমি পরে বলব। তবে আপনি হচ্ছেন মিসির আলি, কে জানে ইতিমধ্যে হয়তো অনেক কিছু বুঝে ফেলেছেন।

আপনি কীভাবে চিন্তাভাবনা করে একটা সমস্যা সমাধানের দিকে এগোন তা আমার জানতে ইচ্ছা করে। চিন্তাশক্তি আমার নিজের খুবই কম। সহজ রহস্যই ধরতে পারি না। আমাদের স্কুলে একবার একজন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাতে এসেছিলেন। বেচারি খুবই আনাড়ি ধরনের। যে ম্যাজিকই দেখান সবাই ধরে ফেলে। একমাত্র আমিই ধরতে পারি না। তিনি যা দেখান তাতেই আমি মুগ্ধ হই। আপনার সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিও হয়তো ম্যাজিকের মতো। সেই ম্যাজিক দেখে মুগ্ধ হতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা এই এতগুলি পাতা যে পড়লেন এর মধ্যে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছি। বলুন তো ইনফরমেশনটা কী? যদি বলতে পারেন তা হলে বুঝব আপনার সত্যি বুদ্ধি আছে। বলতে না পারলে তেত্রিশ পৃষ্ঠায় দেখুন।

মিসির আলি পড়া বন্ধ করলেন। তেত্রিশ পৃষ্ঠা না দেখে মেয়েটির সম্পর্কে বিশেষ কী বলা হয়েছে বের করার চেষ্টা করলেন। যা বলা হয়েছে তার বাইরে কি কিছু আছে? হ্যাঁ আছে, মেয়েটা তার আসল নাম বলেছে। তার আসল নাম ফারজানা। ফানিম্যান ছড়াটির প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষর নিলে ফারজানা নামটা পাওয়া যায়। এমন জটিল কোনো ধাঁধা না। এ ছাড়া আর কিছু কি আছে? আরেকবার পড়তে হবে। তবে যা পড়েছেন তাতে মেয়েটিকে খুঁজে বের করে ফেলার মতো তথ্য আছে। ফারজানা মেয়েটি বোধ হয় তা জানে না। যেমন মেয়েটির বাবার নামে একটি হত্যা মামলা হয়েছিল। সেই মামলা ডিসমিস হয়ে যায়। আদালতের নথিপত্র ঘাঁটলেই বের হয়ে পড়বে। ডেড বডির পোস্টমর্টেম হয়েছিল। হাসপাতাল থেকেও সেই সম্পর্কিত কাগজপত্র পাওয়া যাবে। একটু সময়সাপেক্ষ, তবে সহজ।

সেই সময়কার পুরোনো কাগজ ঘাঁটলেও অনেক খবর পাওয়া যাওয়ার কথা। ‘পাষণ্ড স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন’ জাতীয় খবর পাঠক-পাঠিকারা খুব মজা করে পাঠ করেন। পত্রিকাওয়ালারা গুরুত্বের সঙ্গে সেইসব খবর ছাপেন। প্রথম পাতাতেই ছবিসহ খবর আসার কথা। তারপরের কয়েকদিন খবরের ফলো আপ।

অবিশ্যি বাংলাদেশে পুরোনো কাগজ ঘাঁটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। যে কবার তিনি পুরোনো কাগজ ঘাঁটতে গেছেন সে কবারই তাঁর মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে। বিদেশের মতো ব্যবস্থা থাকলে ভালো হত। সবকিছু কম্পিউটারে ঢুকানো, বোতাম টিপে বের করে নেয়া।

মিসির আলি তার খাতা বের করলেন। কেইস নাম্বার দিয়ে ফারজানার নামে একটা ফাইল খোলা যেতে পারে। খাতার পাতায় ফারজানা নাম লিখতে গিয়ে মিসির আলি ইতস্তত করতে লাগলেন। ফাইল খোলার দরকার আছে কি? এখনো বোঝা যাচ্ছে না, ফারজানার লেখা সব কটা পাতা না পড়লে বোঝা যাবেও না। মিসির আলি পেনসিলে গোটা গোটা করে লিখলেন,

নাম : ফারজানা।

বয়স : ২৩

রোগ : স্কিজোফ্রেনিয়া *? ? ?*

স্কিজোফ্রেনিয়া লিখে তিনবার প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিলেন। ফারজানার লেখা যে কটি পাতা এখন পর্যন্ত পড়েছেন তা তিনি আরো তিনবার পড়বেন। তারপর ঠিক করবেন প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলি রাখবেন, কি রাখবেন না। সে যা লিখেছে তা সত্যি কি না তাও দেখার ব্যাপার আছে। সত্যি কথা না লিখলে তথ্যে ভুল থাকবে। প্রথম পাঠে তা ধরা পড়বে না। যত বেশি বার পড়া হবে ততই ধরা পড়তে থাকবে। তার নিজের নামটা সে যেমন কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছে তার থেকে মনে হয় আরো অনেক নাম লেখার ভেতর লুকিয়ে আছে। সেগুলিও খুঁজে বের করতে হবে। তার মায়ের নাম কি চাঁপা? প্রিয় রঙ বলছে চাঁপা। আবার প্রিয় দুটি জিনিস চাঁদ এবং পানির প্রথম অক্ষর নিলেও চাঁপা হচ্ছে। এটা কাকতালীয়ও হতে পারে। যদি কাকতালীয় না হয় তা হলে মেয়েটি তার সঙ্গে রহস্য করছে কেন? এই রহস্য করার জন্য তাকে প্রচুর সময় দিতে হয়েছে। চিন্তাভাবনা করতে হয়েছে। এটা সে কেন করছে? ব্যাপারটা ছেলেমানুষি তো বটেই। ফাইভ সিক্সে পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা এইসব করতে পারে। ২৩ বছরের একটা মেয়ে তুচ্ছ ধাঁধা তৈরি করার জন্য সময় নষ্ট করবে কেন? ব্যাপার কী এমন যে মেয়েটার কিছু করার নেই। দিনের পর দিন যারা বিছানায় শুয়ে থাকে তারা ক্রসওয়ার্ড পাজল, বা ব্রেইন টিজলার জাতীয় খেলায় আনন্দ পেতে পারে। এমনকি হতে পারে যে মেয়েটিকে দিনের পর দিন শুয়ে থাকতে হচ্ছে। চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে হাতে পাতার পর পাতা লেখা কষ্টকর। সে লিখেছে ১০০ পৃষ্ঠা, লিখতে তার সময় লেগেছে ২ বছর। একটা পৃষ্ঠা লিখতে তার গড়পড়তা সময় লেগেছে সাতদিনের কিছু বেশি। লেখাগুলি লেখা হয়েছে কালির কলমে। চিৎ হয়ে শুয়ে কালির কলমে লেখা যায় না। তাকে লিখতে হয়েছে উপুড় হয়ে। উপুড় হয়ে যে লিখতে পারে সে বিছানায় পড়ে থাকার মতো অসুস্থ না। কাজেই সে শয্যাশায়ী একজন রোগী এই হাইপোথিসিস বাতিল।

মিসির তার খাতায় গুটিগুটি করে লিখলেন—ফারজানা মেয়েটি শারীরিকভাবে সুস্থ।

তিনি আরেকটি কাজও করলেন—ফারজানার এক শ পৃষ্ঠার কোন অংশগুলি দিনে লেখা হয়েছে—কোন অংশগুলি রাতে লেখা হয়েছে—তা হলুদ মার্কার দিয়ে আলাদা করলেন। কাজটা জটিল মনে হলেও আসলে সহজ। রাতে আলো কমে যায় বলে রাতের লেখায় অক্ষরগুলি সামান্য বড় হয়। এবং লেখা স্পষ্ট করার জন্যে কলমে চাপ দিয়ে লেখা হয়। দিনের লেখা এবং রাতের লেখা আলাদা করার তেমন কোনো কারণ নেই। তারপরেও করে রাখা—হঠাৎ যদি এর ভেতর থেকে কিছু বের হয়ে আসে। খড়ের গাদায় হারিয়ে যাওয়া সুচও পাওয়া যায় যদি ধৈর্য ধরে প্রতিটি খড়—একটি একটি করে আলাদা করা হয়। মিসির আলি তাঁর অনুসন্ধানে ইনটিউশন যত না ব্যবহার করেন—পরিশ্রম তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহার করেন।

৪

ছোট মাকে আমি দেখতে শুরু করলাম। প্রথম প্রথম দু দিন, তিন দিন পরপর হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে দেখা যেত। তারপর রোজ-ই দেখতে পেতাম।।

শুরুতে তিনি আমার সঙ্গে কোনো কথা বলতেন না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে চুপচাপ শুনতেন। তারপর কথা বলা শুরু করলেন। কথা বলতেন ফিসফিস করে। কোথাও কোনো শব্দ হলে দারুণ চমকে উঠতেন।

হয়তো বাতাসে দরজা নড়ে উঠল—সেই শব্দে মা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে চলে গেলেন পর্দার আড়ালে। ছোট মার দেখা পাওয়াটা ঠিক স্বাভাবিক ব্যাপার না এটা আমার বোধের ভেতর ছিল। আমি এর বাইরেও কিছু কিছু ব্যাপার লক্ষ করলাম। যেমন ছোট মা কখনো কিছু খান না। আমি কমলা সেধেছি। প্লেট থেকে কেক তুলে দিয়েছি। তিনি কখনো কিছু মুখে দেন নি। তিনি যখন আশপাশে থাকতেন তখন আমি এক ধরনের গন্ধ পেতাম। মিষ্টি গন্ধ, তবে ফুলের গন্ধ না। ওষুধ ওষুধ গন্ধ।

আসল ছোট মার সঙ্গে এই মায়ের কিছু অমিলও ছিল। যেমন ছোট মা আমাকে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত নামে ডাকতেন। ইনি ডাকতেন না। একদিন আমি নিজেই বললাম, তুমি ওই নামগুলি বল না। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কোন নাম? তা থেকে বুঝলাম নামগুলি তিনি জানেন না।

ছোটরাও নিজেদের মতো করে কিছু পরীক্ষাটরীক্ষা করে। আমিও ছোট মাকে নিয়ে কিছু পরীক্ষা করলাম—যেমন একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী?

ছোট মা বললেন, জানি না তো।

আমি বললাম, সত্যি জান না?

তিনি বললেন, না। আমার কী নাম?

আমি বললাম, তোমার নাম চাঁপা।

তিনি খুবই অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি? আমার সামান্য খটকা লাগলেও আমি নির্বিকার ছিলাম। একজন খেলার সাথী পেয়েছি, এই আমার জন্যে যথেষ্ট ছিল।

ছোট মা খেলার সঙ্গী হিসেবে চমৎকার ছিলেন। যা বলা হত তাই রোবটের মতো করতেন। কোনো প্রশ্ন করতেন না। মা'দের ভেতর খবরদারির একটা ব্যাপার থাকে। ওনার ভেতর তা ছিল না।

পায়ে মোজা নেই কেন?

ঘর নোংরা করছ কেন?

ঘুমাতে যাচ্ছ না কেন?

এ জাতীয় প্রশ্ন করে তিনি আমাকে কখনো বিব্রত করতেন না। আমার বেশ কজন টিচার ছিলেন। পড়ার টিচার, গানের টিচার, নাচের টিচার। তাঁরা যখন আসতেন—নিচ থেকে ইন্টারকমে আমাকে বলা হত। আমি নিচে যাবার জন্যে তৈরি হতাম। মাকে সেই সময় খুব বিব্রত মনে হত। তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না কী করবেন। তাঁকে খুব কাঁদতেও দেখতাম। দু হাতে মুখ ঢেকে খুনখুন করে কাঁদতেন। চোখ দিয়ে তখন অবিশ্যি পানি পড়ত না। তাঁর কান্না সব সময় ছিল অশ্রুবিহীন।

মিসির আলি সাহেব আপনি আমার সামনে নেই বলে আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে। হয়তো আপনার মনে অনেক প্রশ্ন উঠে আসছে, কিন্তু আপনি প্রশ্নগুলি করতে পারছেন না। সামনাসামনি থাকলে প্রশ্ন করতে পারতেন। আর আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না—কোনো ডিটেল বাদ পড়ে যাচ্ছে কি না। গুরুত্বহীন মনে করে আমি হয়তো অনেক কিছু লিখছি না—যা আপনার কাছে মোটেই গুরুত্বহীন না। তবু আপনার মনে সম্ভাব্য যেসব প্রশ্ন আসছে বলে আমার ধারণা—আমি তার জবাব দিচ্ছি।

প্রশ্ন : উনার গায়ে কী পোশাক থাকত?

উত্তর : সাধারণ পোশাক শাড়ি। যেসব শাড়ি আগে পরতেন সেইসব শাড়ি।

প্রশ্ন : উনি কি হঠাৎ উপস্থিত হতেন এবং পরে বাতাসে মিলিয়ে যেতেন?

উত্তর : না। কখনো হঠাৎ উদয় হতেন না। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেন। বের হয়ে যাবার সময়ও দরজা খুলে বের হয়ে যেতেন। তাঁর পুরো ব্যাপারটাই খুব স্বাভাবিক ছিল। তাঁকে আমি কখনো শূন্যে ভাসতে দেখি নি—কিংবা লম্বা একটা হাত বের করে দূর থেকে কিছু আনতে দেখি নি।

প্রশ্ন : তুমি নিশ্চিত যে উনি তোমার ছোট মা?

উত্তর : জি নিশ্চিত। তবে আগেই তো বলেছি—আমার চেনা ছোট মার সঙ্গে তাঁর কিছু অমিল ছিল—যেমন তিনি পড়তে পারতেন না। অথচ ছোট মা আমাকে রোজ রাতে গল্পের বই পড়ে শুনাতেন। কাজেই আমি একদিন উনাকে গল্পের বই পড়ে শুনাতে বললাম। তিনি লজ্জিত গলায় বললেন যে তিনি বই পড়তে জানেন না। তিনি আমাকে বই পড়া শেখাতে বললেন।

প্রশ্ন : তুমি তাঁকে বই পড়া শেখালে?

উত্তর : জি। উনি খুব দ্রুত শিখে গেলেন।

প্রশ্ন : উনি কি তোমার জন্যে কখনো কোনো উপহার নিয়ে এসেছেন?

উত্তর : জি এনেছেন।

প্রশ্ন : কী উপহার?

উত্তর : সেটা আমি আপনাকে বলব না।

প্রশ্ন : তুমি ছাড়া আর কেউ কি উনাকে দেখেছে?
উত্তর : জি না।
প্রশ্ন : তাঁকে দিনে বেশি দেখা যেত, না রাতে?
উত্তর : দিন রাত কোনো ব্যাপার ছিল না।
প্রশ্ন : সব সময়ই কি একই কাপড় পরা থাকতেন?
উত্তর : জি না। একেক সময় একেক কাপড় পরা থাকত।
প্রশ্ন : তিনি তোমার গায়ে হাত দিয়ে আদর করতেন?
উত্তর : জি করতেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁর কোলে উঠে বসে থাকতাম।

যেসব প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে তার উত্তর দিলাম। অনেক চিন্তা করেও আর কোনো প্রশ্ন পাচ্ছি না। আপনারা যারা সাইকিয়াট্রিস্ট তাঁরা তো রাজ্যের প্রশ্ন করেন। উদ্ভট সব প্রশ্ন। আপনার মাথাতেও নিশ্চয়ই উদ্ভট সব প্রশ্ন আসছে। ও না ভুল করলাম—আপনি তো আবার অন্যদের মতো না। আপনি প্রশ্ন করেন না। শুধু শুনে যান। একই গল্প বারবার শোনেন। শুনতে শুনতে হঠাৎ এক জায়গায় খটকা লাগে। সেখান থেকে আপনার যাত্রা শুরু হয়। আমার গল্পে কোথাও কি কোনো খটকা লেগেছে? নাকি পুরো গল্পই 'খটকাময়'? পুরো গল্প খটকাময় হলে তো আপনি কাগজগুলি ছুড়ে ফেলে বলবেন—আরে দূর দূর।

প্লিজ তা করবেন না। আমার অনেক কিছু বলার আছে। Please Help Me. আপনি নিশ্চয়ই এখন বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাচ্ছেন। ভাবছেন মেয়েটার কী কন্ট্রাডিকশান—সাহায্য চাচ্ছে, আবার কোনো ঠিকানা দিচ্ছে না। যোগাযোগ করছে না। নিজের পরিচয় গোপন করছে। আসল নাম না বলে, বলছে নাম চিত্রা। তা হলে সাহায্যটা করা হবে কীভাবে? আসলে আমি সাহায্য চাই না। কারণ আমি ভালোই আছি। আমার বিচিত্র জীবন সম্পর্কে আমি আপনাকে বলব। আপনি শুনবেন। আমার সমস্যার সমাধান করবেন। তার উপর একটা বই লেখা হবে। সেই বই কিনে আমি পড়ব। আমার এতেই হবে। এর বেশি সাহায্যের আমার প্রয়োজন নেই।

আরেকটা কথা—আপনি আবার ভাবছেন না তো আমার এই গল্প বানোয়াট গল্প? আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে উদ্ভট একটা গল্প ফেঁদেছি? একবার আপনার মাথায় এই ব্যাপারটা ঢুকে গেলে আপনি মনোযোগ দিয়ে আমার লেখা পড়বেন না। এমনও হতে পারে যে কাগজগুলি ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন। আমার প্রধান দায়িত্ব আপনাকে বিশ্বাস করানো—আমি যা বলছি, সত্যি বলছি। আমার কাছে যা 'সত্যি' অন্যের কাছে হয়তো নয়। সত্য একেক জনের কাছে একেক রকম। Truth has many faces. তাই না?

আমি যে সত্যি বলছি সেটা কী করে প্রমাণ করব? আমি জানি না। আমি আপনার হৃদয়ের মহত্ত্বের কাছে সমর্পণ করছি এবং আশা করছি আমাকে বিশ্বাস করবেন। আজ এই পর্যন্তই লিখলাম। মাথা ধরেছে—এখন আর লিখতে পারছি না। আপনার ঠোঁটে কি এখন মৃদু একটা হাসির রেখা? সাইকিয়াট্রিস্টরা 'মাথা ধরেছে' বাক্যটা শুনলেই নড়েচড়ে বসেন। তাদের ভাবটা হচ্ছে—"এইবার পাওয়া গেছে" মাথায় সমস্যা বলেই মাথা ধরা।

আমেরিকার একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলাম। আমি যাই নি—আমার বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ কথা বলার পরই গম্ভীর গলায় বললেন, ইয়াং লেডি, তোমার কি প্রায়ই মাথা ধরে?

আমি বললাম—হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলার ঠোঁটে আনন্দের হাসি দেখা গেল। ভাবটা হচ্ছে—I got you at last.

তারপর অসংখ্য প্রশ্ন, সবই মাথা ধরা নিয়ে।

কখন মাথা ধরে? রাতে বেশি, না দিনে?

মাথা ধরার সময় কি চোখ জ্বালা করে?

কান লাল হয়ে যায়?

মাথা ধরার তীব্রতা কেমন?

কতক্ষণ থাকে?

তখন কি পানির পিপাসা হয়?

আমি যখন বললাম, ম্যাডাম আমার মাথা ধরাটা খুবই স্বাভাবিক ধরনের। মাঝে মধ্যে মাথা ধরে—প্যারাসিটামল খাই, কিংবা গরম চা খাই। মাথা ধরা সেরে যায়। ভদ্রমহিলা তাতে খুব হতাশ হলেন।

আপনিও কি হতাশ হচ্ছেন?

এমনিতে আমি কিন্তু খুব স্বাভাবিক মানুষ। আমি আমার মৃতা মাকে দেখতে পেতাম এই অস্বাভাবিকতাটা ছোটবেলায় ছিল—বেশি দিনের জন্যে কিন্তু না। খুব বেশি হলে সাত কিংবা আট মাস। হঠাৎ একদিন সব আগের মতো হয়ে গেল। ছোট মার আসা বন্ধ হল। আমি কিছুদিন প্রবল হতাশায় কাটালাম। ছোটদের হতাশা তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। তবে তার স্থায়িত্বও কম হয়। শিশুদের প্রবল শোক এবং প্রবল হতাশা কাটিয়ে ওঠার সহজাত ক্ষমতা থাকে। আমিও হতাশা কাটিয়ে উঠলাম। ধীরে ধীরে সব আগের মতো হয়ে গেল। অবিশ্যি ছোট মা আসা পুরোপুরি বন্ধ করলেন তাও না। তিন-চার মাস পরপর হঠাৎ চলে আসতেন। আমি তখন বলতাম, এতদিন আস নি কেন? তিনি বলতেন—আসার পথ ভুলে যাই। মনে থাকে না। আমার জীবন যাপন স্বাভাবিক হলেও আমি বড় হচ্ছিলাম নিঃসঙ্গতায়। আমার চারপাশে কেউ ছিল না। আমার নিঃসঙ্গতা দূর করলেন নীতু আন্টি। তিনি আমাদের বাড়িতে থাকতে এলেন। আরো পরিষ্কার করে বলি—বাবা তাঁকে বিয়ে করলেন। আচ্ছা আপনি কি বাবার ওপর বিরক্ত হচ্ছেন? কেমন মানুষ, একের পর এক বিয়ে করে যাচ্ছে। দয়া করে বিরক্ত হবেন না। আমার বাবা অসাধারণ একজন মানুষ।

এই যা মাথা ধরা নিয়ে অনেকক্ষণ লিখে ফেললাম। আচ্ছা আপনার কি এখন মাথা ধরেছে? কেন জিজ্ঞেস করলাম জানেন। ধরুন আপনি একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। যার সঙ্গে কথা বলছেন তার প্রচণ্ড মাথায় যন্ত্রণা। কিছুক্ষণ কথা বলার পরই দেখবেন আপনারও মাথা ধরেছে। কোনো কারণ ছাড়াই ধরেছে। এটা বহুল পরীক্ষিত একটা ব্যাপার। আমি অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। আপনিও করে দেখতে পারেন। এবার আপনাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। বলুন তো কোন প্রাণীর দুটা লেজ? খুব সহজ! একটু চিন্তা করলেই পেয়ে যাবেন।

মিসির আলি পড়া বন্ধ করলেন। তিনি অনেক ভেবেও বের করতে পারলেন না— কোন প্রাণীর দুটা লেজ। একবার টিকটিকির কথা মনে হয়েছিল। টিকটিকির একটা লেজ খসে গেলে আরেকটা গজায় সেই অর্থে টিকটিকিকে দুই লেজের প্রাণী কি বলা যায়? না—টিকটিকি হবে না।

উত্তরও কোথাও দেয়া নেই। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলেই উত্তরটা জানা যাবে। দেখা হবার সম্ভাবনা কতটুকু? এখনো তেমন কোনো সম্ভাবনা তিনি দেখছেন না। কারণ মেয়েটিকে খুঁজে বের করার কোনো চেষ্টা তিনি করছেন না। বয়সের কারণে তাঁর ভেতর এক ধরনের আলস্য কাজ করা শুরু করেছে। আশপাশের জগৎ সম্পর্কে উৎসাহ কমে যাচ্ছে। লক্ষণ খুব খারাপ।

আত্মার মৃত্যু হলেই এ জাতীয় ঘটনা ঘটে। কোনো কিছুই মনকে আকৃষ্ট করে না। আত্মার মৃত্যু হয়েছে কি হয় নি তা বের করার একটা সহজ পদ্ধতির কথা তিনি জানেন। বৃষ্টি কেটে যাবার পর আকাশে যখন রঙধনু ওঠে সেই রঙধনুর দিকে তাকিয়ে যে চোখ নামিয়ে নেয় এবং দ্বিতীয়বার তাকায় না, তার আত্মার মৃত্যু হয়েছে। আকাশে রঙধনু না উঠলে তিনি তার আত্মার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন না।

মৃত আত্মাকে জীবনদান করারও কিছু পদ্ধতি আছে। সবচে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে শিশুদের সঙ্গে মেশা। শিশুরা সব সময় তাদের আশপাশের মানুষদের তাদের আত্মা থেকে খানিকটা ধার দেয়।

সমস্যা হচ্ছে শিশুদের মিসির আলি তেমন পছন্দ করেন না। এদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেই তাঁর ভালো লাগে। শিশুরা সুন্দর—অসম্ভব সুন্দর। যে কোনো বড় সৌন্দর্যকে দেখতে হয় দূর থেকে। যত দূর থেকে দেখা যায় ততই ভালো। "কুৎসিত জিনিস দেখতে হয় কাছ থেকে, সুন্দর জিনিস দূর থেকে।" এটা যেন কার কথা? মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। তাঁর স্মৃতিশক্তি কি দুর্বল হতে শুরু করেছে?

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ক তার মেমোরি সেলে জমিয়ে রাখা স্মৃতি ফেলে দিয়ে সেলগুলি খালি করছে। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে মেমোরি সেলে কোনো মেমোরি থাকে না। মস্তিষ্ক সব ফেলে দিয়ে ঘর খালি করে দেয়।

মিসির আলি ঘুমাতে গেলেন রাত দশটায়। ইদানীং তিনি খুব নিয়মকানুন মেনে চলার চেষ্টা করছেন। যেমন রাত দশটা বাজতেই ঘুমাতে যাওয়া। সকালবেলা মর্নিং ওয়াক। ঘড়ি ধরে কাজ করার চেষ্টা। রাত দশটায় ঘুমাতে গেলেও লাভ হচ্ছে না—ঘুম আসতে আসতে তিনটা বেজে যাচ্ছে। দশটা থেকে রাত তিনটা এই পাঁচ ঘণ্টা মস্তিষ্ককে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় রাখা সম্ভব না। মিসির আলি সেই চেষ্টা করেনও না। তিনি শুয়ে শুয়ে ফারজানা মেয়েটিকে নিয়েই ভাবেন।

মেয়েটি স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী। সে তা জানে না। অধিকাংশ স্কিজোফ্রেনিয়াকই তা জানে না। তারা ভেবে নেয়—তাদের দেখা জগৎই সত্যি জগৎ। অন্যদের জগৎ ভ্রান্তিময়। তাদের একটা যুক্তি অবশ্যই আছে। কালার ব্লাইন্ড একজন মানুষ সবুজ রঙ দেখতে পায় না। তার জগতে সবুজের অস্তিত্ব নেই। সে বলবে পৃথিবীতে সবুজ রঙ নেই। তার কাছে এটাই সত্যি। তার সেই জগৎ মিথ্যা নয়।

মিসির আলি জেগে আছেন—তাঁর মাথায় ফারজানা মেয়েটি নেই। তাঁর মাথায় ঘুরছে কোন প্রাণীর লেজের সংখ্যা দুই। তাঁর হঠাৎ মনে হল ফারজানা মেয়েটি ইচ্ছে করে তাঁর মাথায় এই ধাঁধাটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। ধাঁধার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এটা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকবে। মেয়েটি এই ব্যাপার জানে। স্কিজোফ্রেনিয়াকরা খুব বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। তারা নিজেরা বিভ্রান্তির জগতে বাস করে বলেই হয়তো অন্যদের বিভ্রান্তিতে ফেলে আনন্দ পায়। মিসির আলির মাথা দপদপ করছে। রেলগাড়িতে চড়লে যেমন কিছুক্ষণ পরপর শব্দ হয়—তাঁর মাথার ভিতর ঠিক সেরকম খানিকক্ষণ পরপর প্রশ্ন উঠছে—

কোন প্রাণীর দুটা লেজ?

কোন প্রাণীর দুটা লেজ??

৫

এখন বাজছে সকাল ১১টা। কিছুক্ষণ আগে আমি নাস্তা খেয়ে লিখতে বসেছি। সকালের চা এখনো খাওয়া হয় নি। চা দিয়ে গেছে। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। আমার চায়ের কাপের ধোঁয়া দেখতে খুব ভালো লাগে। মিসির আলি সাহেব আপনার কি চায়ের কাপের ধোঁয়া দেখতে ভালো লাগে? মানুষের ভালোলাগাগুলি একরকম হয় না কেন বলুন তো? মানুষকে তো নানান ভাবে ভাগ করা হয়। তাদের ভালোলাগা, মন্দলাগা নিয়ে তাদের ভাগ করা হয় না কেন? আপনারা সাইকিয়াট্রিস্টরা সেরকম ভাগ করতে পারেন না?

যেমন ধরুন যেসব মানুষ—

ক) চায়ের কাপের ধোঁয়া ভালবাসেন।

খ) বেলি ফুলের গন্ধ ভালবাসেন।

গ) চাঁপা রঙ ভালবাসেন।

তাদের মানসিকতা এক ধরনের। (আমার মত।) তাদের চিন্তাভাবনায় খুব মিল থাকবে।

আচ্ছা আপনি কি আমার জ্ঞানী টাইপ কথা শুনে বিরক্ত হচ্ছেন?

থাক আর বিরক্ত হতে হবে না, এখন আমি মূল গল্পে ফিরে যাই। এখন যে চ্যাপ্টারটা বলব সেই চ্যাপ্টারের নাম—নীতু আন্টি।

আমি ঘুমাচ্ছিলাম—রাত দশটাটশটা হবে। আমার ঘরের দরজা খোলা। ছোট মানুষ তো কাজেই দরজা খোলা থাকত। যাতে রাতে-বিরাতে বাবা এসে আমাকে দেখে যেতে পারতেন। এই কাজটা বাবা করতেন—রাতে খুব কম করে হলেও দু বার এসে দেখে যেতেন। তখন ঘুম ভেঙে গেলেও আমি ঘুমিয়ে থাকার ভান করতাম। কারণ কী জানেন? কারণ হচ্ছে আমি যখন জেগে থাকতাম তখন বাবা আমাকে আদর করতেন না। ঘুমন্ত অবস্থাতেই শুধু আদর করতেন। মাথার চুলে বিলি কেটে দিতেন। হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতেন। এমনকি মাঝে মাঝে ঘুমপাড়ানি গানও গাইতেন। যদিও আমি তখন বড় হয়ে গেছি। ঘুমপাড়ানি গান শোনার কাল শেষ হয়েছে। ঘুমন্ত মানুষকে গান শুনানো—খুব মজার ব্যাপার না? আমার বাবা আসলেই বেশ মজার মানুষ। ভালবাসার প্রকাশকে

তিনি দুর্বলতা বলে ভাবেন। (আরেকটা ব্যাপারও হতে পারে, বাবা হয়তো আমাকে ভালবাসতেন না। ভালবাসার ভান করতেন। মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে ভান করা যায় না বলেই আমি যখন ঘুমাতাম তখন ভান করতেন।)

নীতু আন্টির মধ্যেও এই ব্যাপার ছিল। ভালবাসার প্রকাশকে তিনিও দুর্বলতা মনে করতেন। তাঁর প্রধান চেষ্টা ছিল কেউ যেন তাঁর দুর্বলতা ধরে না ফেলে। তিনি শুরু থেকেই আমাকে পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর দুর্বলতা আমি যেন ধরতে না পারি এটা নিয়ে সব সময় অস্থির থাকতেন।

তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখার গল্পটা শুনুন। আমি শুয়ে আছি। ঘুমাচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। দেখি কে একজন আমার চুলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথম ভাবলাম ছোট মা। তারপরই মনে হল, না ছোট মা না—ইনার গায়ের গন্ধ অন্যরকম। বেলি ফুলের গন্ধের মতো গন্ধ। আমি চোখ মেললাম। তিনি হাত সরিয়ে নিয়ে শুকনো গলায় বললেন, ঘুম ভাঙিয়ে ফেললাম?

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। তিনি আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, "শোন মেয়ে আমি এখন থেকে তোমাদের বাড়িতে থাকব। তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে।" আমি তাকিয়ে রইলাম। কিছু বললাম না। তিনি আগের মতোই শুকনো গলায় বললেন, তুমি তো ইতিমধ্যে দুজনকে মা ডেকে ফেলছ। আমাকে মা ডাকার দরকার নেই। আমাকে আন্টি ডাকতে পার। অসুবিধা নেই। আমার নাম নীতা। তুমি ইচ্ছে করলে নীতু আন্টিও ডাকতে পার।

'জি আচ্ছা।'

'ঘর এত নোংরা কেন? চারদিকে খেলনা। কাল সকালেই ঘর পরিষ্কার করবে।'

'জি আচ্ছা।'

'শোবার ঘরে স্যান্ডেল কেন? স্যান্ডেল থাকবে শোবার ঘরের বাইরে। শোবার ঘরটা থাকবে ঝকঝকে তকতকে, একদানা বালিও সেখানে থাকবে না। বুঝতে পারছ?'

'জি।'

'এখন থেকে শোবার আগে চুল বেঁধে শোবে। এতদিন তো চুল বাঁধার কেউ ছিল না। এখন থেকে আমি বেঁধে দেব। আরেকটা কথা শুনে রাখ—আমি কিন্তু আহ্লাদ পছন্দ করি না। আমার সাথে কখনো আহ্লাদী করবে না। না ডাকলে আমাকে এসে বিরক্ত করবে না। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'বাহ্ তোমার চুল তো খুব সুন্দর। সিল্কি চুল।'

এই বলে তিনি আমার মাথার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললাম—ইনি চমৎকার একজন মহিলা। ইনার সঙ্গে সব রকম আহ্লাদ করা যাবে। এবং আহ্লাদ করলেও তিনি রাগ করবেন না। আমি আরো বুঝলাম এই মহিলার ভেতরও অনেক ধরনের আহ্লাদীপনা আছে।

নীতু আন্টি খুব সুন্দর ছিলেন। তাঁর মুখ ছিল গোলাকার। চোখ বড় বড়। তবে বেশিরভাগ সময়ই চোখ ছোট করে ভুরু কুঁচকে তাকাতেন। ভাবটা এরকম যে তিনি খুব বিরক্ত হচ্ছেন।

তিনি বাড়িতে এসেই বাড়ির কিছু নিয়মকানুন পাল্টে দিলেন—যেমন আগে একতলা থেকে কাজের মানুষরা কেউ দোতলায় আসতে পারত না। এখন থেকে পারবে। শুধু যে পারবে তাই না—একটা কাজের মেয়ে রাখা হল, যার একমাত্র কাজ আমার ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা এবং রাতে আমার ঘরেই ঘুমানো। তার জন্যে একটা ক্যাম্প খাটের ব্যবস্থা করা হল। সে ঘুমাতে যাবার আগে আগে আমার শোবার ঘরে সেই ক্যাম্প খাট পাতা হত। কাজের মেয়েটার নাম শরিফা। পনের–ষোল বছর বয়স। ভারী শরীর। দেখতে খুব মায়া–কাড়া। তার ছিল কথা বলা রোগ। অন্যদের সামনে সে চুপ করে থাকত। রাতে ঘুমাতে যাবার সময় যখন আমি ছাড়া আর কেউ থাকত না তখন সে শুরু করত গল্প। ভয়ঙ্কর সব গল্প সে অবলীলায় বলত। গল্প শেষ করে সে নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘুমাতে যেত। বাকি রাতটা আমার ঘুম হত না।

ভয়ঙ্কর গল্পগুলি কী আপনি নিশ্চয়ই জানতে চাচ্ছেন। আপনার ধারণা ভয়ঙ্কর গল্প মানে ভূতপ্রেতের গল্প। আসলে তা না। ভয়ঙ্কর গল্প মানে নারী–পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গল্প। আমার কাছে ভয়ঙ্কর লাগত কারণ এই ব্যাপারটা অস্পষ্টভাবে জানতাম। আমার কাছে তা নোংরা, অরুচিকর এবং কুৎসিত মনে হত। আমি শরিফার গল্পের একটা নমুনা দিচ্ছি। আপনি আমার মানসিক অবস্থা ধরার চেষ্টা করছেন বলেই দিচ্ছি। অন্য কাউকে এ ধরনের গল্প আমি কখনো বলব না। আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। শরিফার যে গল্পটি আমি বলছি তা হচ্ছে তার কাছ থেকে শোনা সবচে ভদ্র গল্প। আমি শরিফার ভাষাতেই বলার চেষ্টা করি।

"বুঝছেন আফা—আমরা তো গরিব মানুষ—আমরার গেরামের বাড়িত টাট্টিখানা নাই। টাট্টিখানা বুঝেন আফা? পাইখানারে আমরা কই টাট্টিখানা। উজান দেশে কয় টাট্টি ঘর। তখন সইন্ধা রাইত—আমার ধরছে 'পেসাব'। বাড়ির পিছনে রওনা হইছি হঠাৎ কে জানি আমার মুখ চাইপ্যা ধরছে। চিক্কুর দিমু হেই উপায় নাই। আন্ধাইরে পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। খালি বুজতাছি দুইটা গুণ্ডা কিসিমের লোক আমারে টাইন্যা লইয়া যাইতাছে। আমি ছাড়া পাওনের জন্যে হাত পাও মুচড়াইতাছি। কোনো লাভ নাই। এরা আমারে নিয়া গেল ইস্কুল ঘরে। এরার মতলবটা তো আফা আমি বুঝতে পারতাছি। আমার কইলজা গেছে শুকাইয়া। এক মনে দোয়া ইউনুস পড়তাছি। এর মধ্যে ওরা আমারে শুয়াইয়া ফেলছে। একজনে টান দিয়া শাড়ি খুইল্যা ফেলছে ...."

গল্পের বাকি অংশ আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। আপনি অনুমান করে নিন। এ জাতীয় গল্প রোজ রাতে আমি শুনতাম। আমার শরীর ঝিমঝিম করত। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অনুভূতি। যার সঙ্গে আমি পরিচিত না। তখন আমার বয়স—মাত্র তের।

মিসির আলি সাহেব, শরিফার গল্প শোনার জন্যে আমি অপেক্ষা করতাম। 'ভয়ঙ্কর' ভালো লাগত। আপনি লক্ষ করুন আমি ভালো শব্দের আগে 'ভয়ঙ্কর' বিশেষণ ব্যবহার করেছি।

নীতু আন্টিও আমাকে গল্প বলতেন। সুন্দর সুন্দর সব গল্প। তার কিশোরী বয়সের সব গল্প। একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হয়েছেন। চাচাতো বোন ভাই সব মিলিয়ে বাড়িতে অনেকগুলি মানুষ। সারা দিন কোথাও না কোথাও মজার কিছু হচ্ছে। নীতু আন্টির এক বোন আবার প্ল্যানচেট করা জানত। সে রোজই আত্মা নিয়ে আসত। বিখ্যাত ব্যক্তিদের

আত্মা—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শেকসপীয়র, আইনস্টাইন, এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসতেন খুব ঘন ঘন। প্ল্যানচেট করলেই তিনি চলে আসতেন। দু লাইন, চার লাইনের কবিতা লিখে যেতেন। সেসব কবিতা খুব উচ্চমানের হত না। কে জানে কবিরা হয়তো মৃত্যুর পর তাদের কাব্যশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ওনার লেখা একটা কবিতার নমুনা—

"আকাশে মেঘমালা
বাতাসে মধু
নীতু নব সাজে সেজে
নবীনা বধূ"

একবার নীতু আন্টির বিয়ের কথা হচ্ছিল তখন রবীন্দ্রনাথ প্লানচেটে এই কবিতা লিখে যান। সেই বিয়ে অবশ্য হয় নি।

আমি নীতু আন্টিকে খুব করে ধরলাম আমাকে প্ল্যানচেট শিখিয়ে দিতে। তিনি শিখিয়ে দিলেন। খুব সহজ, একটা কাগজে এ বি সি ডি লেখা থাকে। একটা বোতামে আঙুল রেখে বসতে হয়। মুখোমুখি দুজন বসতে হয়। মুখে বলতে হয়—If any good soul passes by, please come. তখন মৃত আত্মা চলে আসেন এবং বোতামে আশ্রয় নেন। এবং বোতাম নড়তে শুরু করে। আত্মাকে প্রশ্ন করলে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সেই প্রশ্নের জবাব আসে। এক অক্ষর থেকে আরেক অক্ষরে গিয়ে পুরো বাক্য তৈরি হয়। এ বি সি ডি না লিখে অ, আ, লিখেও হয়। তবে A B C D লেখাই সহজ।

নীতু আন্টির কাছ থেকে শিখে আমি খুব আত্মা আনা শুরু করলাম। বেশিরভাগ সময়ই রবীন্দ্রনাথ আসেন। মনে হয় তাঁর অবসরই সবচেয়ে বেশি।

এক রাতে ছোট মা চলে এলেন। সে রাতে বাসায় কেউ ছিল না। বাবা এবং নীতু আন্টি গিয়েছেন বিয়েতে। ফিরতে রাত হবে। শরিফা গিয়েছে দেশের বাড়িতে। তার মামা এসে তাকে নিয়ে গেছে। তার বিয়ের কথা হচ্ছে। বিয়ে হয়ে গেলে সে আর ফিরবে না। একা একা প্ল্যানচেট নিয়ে বসেছি। বোতামে আঙুল রাখতেই বোতাম নড়তে শুরু করল। আমি বললাম, আপনি কি এসেছেন?

বোতাম চলে গেল "Yes" লেখা ঘরে। অর্থাৎ তিনি এসেছেন।

আমি বললাম, আপনি কে?

বোতাম চলে গেল "R" অক্ষরে। অর্থাৎ যিনি এসেছেন তাঁর নামের প্রথম অক্ষর "R" খুব সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ আবার এসেছেন। আমি বললাম, আপনার নামের শেষ অক্ষরও কি "R" বোতাম চলে গেল "Yes" এ। রবীন্দ্রনাথ যে এসেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি বললাম আমার মতো ছোট্ট একটা মেয়ের ডাকে যে আপনি এসেছেন তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এই সব হচ্ছে গৎ বাঁধা কথা। মৃত আত্মাকে সম্মান দেখানোর জন্য এইসব বলতে হয়। তবে শুধু ভালো আত্মাদের বেলায় বলতে হয়। খারাপ আত্মাদের বেলায় কিছু বলতে হয় না। খারাপ আত্মাদের অতি দ্রুত বিদেয় করার ব্যবস্থা করতে হয়।

আমি ধন্যবাদ দেয়া শেষ করার পরপর এক কাণ্ড হল। দরজার পরদা সরিয়ে ছোট মা ঘরে ঢুকলেন। অনেক অনেক দিন পর তাঁর দেখা পেলাম। আগে ছোট মাকে দেখে

কখনো ভয় পাই নি—সে রাতে হঠাৎ বুক ধক করে উঠল। ভয় পাবার প্রধান কারণ বাইরে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, আমার ভয় হচ্ছিল—এই বুঝি ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে। আমার ঘরে একটা চার্জার আছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে চার্জার জ্বলে ওঠার কথা। আমার ঘরের চার্জারটা নষ্ট। মাঝে মাঝে ইলেকট্রিসিটি চলে যায় কিন্তু চার্জার জ্বলে না। টেবিলের ড্রয়ারে অবিশ্যি মোমবাতি আছে। দেয়াশলাই আছে কি না জানি না। মনে হয় নেই। ভয়ে আমার বুক ধকধক করছে—আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ছোট মার দিকে। তিনি বললেন, ফারজানা কেমন আছ?

এইরে আমার আসল নাম বলে ফেললাম। যাই হোক আমার ধারণা ইতিমধ্যে আপনি আমার নাম জেনে ফেলেছেন। ভালো কথা চিত্রাও কিন্তু আমার নাম। আমার আসল মা আমার নাম রেখেছিলেন চিত্রা। মার মৃত্যুর পর কেন জানি এই নামটা আর ডাকা হত না। আমার আরো দুটা ডাকনাম আছে—বিবি, বাবা এই নামে আমাকে ডাকেন। আরেকটা হল—নিশি। বাবা ছাড়া বাকি সবাই আমাকে নিশি নামে ডাকে। বাকি সবাই বলতে আমি স্কুলের বন্ধুদের কথা বলছি।

যে কথা বলছিলাম, ছোট মা বললেন, 'ফারজানা কেমন আছ?'

আমি বললাম, 'ভালো।'

'তুমি, একা, তাই না?'

অমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'অনেক দিন পর তোমাকে দেখতে এসেছি। তোমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। চুল খুব সুন্দর করে কেটেছ। কে কেটে দিয়েছে?'

'নীতু আন্টি।'

'তিনি তোমাকে খুব ভালবাসেন?'

'হুঁ।'

'তাঁকে কি তুমি আমার কথা বলেছ?'

'না।'

'খুব ভালো করেছ। শরিফাকে আমার কথা বলেছ?'

'না।'

'শরিফা মেয়েটা খুব খারাপ তুমি কি তা জান?'

'না।'

'মেয়েটা তোমাকে খারাপ করে দিচ্ছে তা কি বুঝতে পারছ? মেয়েটাকে তুমি পছন্দ কর। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন? তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'ভয় পেও না।'

'আচ্ছা।'

'ভূত নামানোর খেলা কেন খেলছ? এইগুলি ভালো না। আর কখনো খেলবে না।'

'আচ্ছা।'

'নীতু আন্টিকে তুমি খুব পছন্দ কর?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে আমার কথা কখনো বলবে না।'

'আচ্ছা।'

'আমি এখন চলে যাব।'

'আর আসবেন না?'

'আসব। শরিফাকে শাস্তি দেবার জন্য আসব। ওকে আমি কঠিন শাস্তি দেব।'

একটা ব্যাপার আপনাকে বলি যে ছোট মা আমার কাছে আসতেন এই ছোট মা সেরকম নন। তাঁর চোখের দৃষ্টি কঠিন, গলার স্বর কঠিন। অথচ আগে যিনি আসতেন— তিনি ছিলেন আলাভোলা ধরনের। তাঁর মধ্যে ছিল অস্বাভাবিক মমতা। তিনি এসেই আমার মাথায় হাত দিতেন—অথচ ইনি দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। একবারও মাথায় হাত দিলেন না বা কাছেও এলেন না।

নিচে গাড়ির শব্দ হল। ছোট মা পরদা সরিয়ে বের হয়ে গেলেন। নীতু আন্টি তার কিছুক্ষণ পরই ঘরে ঢুকলেন। আমি জানি তিনি এখন কী করবেন—বিয়েবাড়িতে মজার ঘটনা কী কী ঘটল তা বলবেন। বলতে বলতে হেসে ভেঙে পড়বেন। যেসব ঘটনা বলতে বলতে তিনি হেসে গড়িয়ে পড়েন সাধারণত সেসব ঘটনা তেমন হাসির হয় না। তবু আমি তাঁকে খুশি করার জন্যে হাসি। আজ অন্যান্য দিনের মতো হল না। ঘরে ঢুকেই তিনি ভুরু কুঁচকে ফেললেন—তাঁর হাসি হাসি মুখ হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি শীতল গলায় বললেন, এই মেয়ে কেউ কি এসেছিল?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, না তো।

'ঘরে বিশ্রী গন্ধ কেন?'

'বিশ্রী গন্ধ?'

'অবশ্যই বিশ্রী গন্ধ। মনে হচ্ছে নর্দমা থেকে কেউ উঠে এসে ঘরে হাঁটাহাঁটি করেছে।'

আমি কথা ঘুরাবার জন্য বললাম, আন্টি বিয়েবাড়িতে আজ কী হল?

আন্টি বললেন, তোমার ঘরে কোনো কোনায় ইঁদুর মরে নেই তো? মরা মরা গন্ধ পাচ্ছি। তুমি পাচ্ছ না?

'না।'

'দাঁড়াও । ঘর ঝাড় দেবার ব্যবস্থা করি।'

নীতু আন্টি উপস্থিত থেকে ঘর ঝাঁট দেয়ালেন। স্যাভলন পানি দিয়ে মেঝে মুছালেন—তারপরও তার নাকে মরা মরা গন্ধ লেগে রইল। তিনি বাবাকে ডেকে নিয়ে এসে বললেন, তুমি কি কোনো গন্ধ পাচ্ছ?

বাবা বললেন, পাচ্ছি।

'কিসের গন্ধ?'

'স্যাভলনের গন্ধ।'

'পচা-কটু কোনো গন্ধ পাচ্ছ না?'

'না তো।'

'আমি পাচ্ছি।'

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, তোমার সুপার সেনসেটিভ নাক তুমি তো পাবেই। আমাদের পূর্বপুরুষ বানর ছিলেন। তোমার পূর্বপুরুষ সম্ভবত কুকুর।

'রসিকতা করবে না।'

নীতু আন্টি চিন্তিত মুখে বের হয়ে গেলেন। রাতে আমার ঘরে ঘুমাতে এলেন। এটা নতুন কিছু না। তিনি প্রায়ই রাতে আমার ঘরে ঘুমাতেন। না, প্রায়ই বলাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। সপ্তাহে একদিন বলাটা যুক্তিযুক্ত হবে। স্কুলের সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন তিনি গভীর রাত পর্যন্ত গুটুর গুটুর করে গল্প করতেন। আমার জন্য সেই রাতগুলি খুব আনন্দময় হত। শরিফার ভয়ঙ্কর গল্পগুলি শুনতে পেতাম না, তার জন্যে অবিশ্যি একটু খারাপ লাগত।

নীতু আন্টি আমার ঘরে ঘুমাতে এসেছেন আমার এত ভালো লাগল। আন্টি বললেন—আজ শরিফা নেই তো তাই তোমার সঙ্গে ঘুমাতে এসেছি। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে—একা ঘুমাতে ভয়ও পেতে পার। আজ কিন্তু গল্প হবে না। কাল তোমার স্কুল আছে। আমি বললাম, আন্টি খারাপ গন্ধটা কি এখনো পাচ্ছেন?

'হ্যাঁ পাচ্ছি।'

আন্টি বাতি নিভিয়ে আমাকে কাছে টেনে শুতে গেলেন। আমি হঠাৎ বললাম, আন্টি আপনাকে একটা কথা বলি—তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, বল। লম্বা-চওড়া কথা না তো? রাত জেগে গল্প শুনতে পারব না। আমার ঘুম পাচ্ছে।

আমি চাপা গলায় বললাম, আন্টি মৃত মানুষ কি আসতে পারে?

'তার মানে?'

'না, কিছু না।'

আন্টি বিছানায় উঠে বসলেন। হাত বের করে টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে বললেন, কী বলতে চাও ভালো করে বল। অর্ধেক কথা বলবে, অর্ধেক পেটে রাখবে তা হবে না।

আমি চুপ করে রইলাম। নীতু আন্টি কঠিন গলায় বললেন, উঠে বস।

আমি উঠে বসলাম।

'এখন বল মৃত মানুষের আসার কথা আসছে কেন? তুমি কি কোনো মৃত মানুষকে আসতে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'সে কি আজ এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'মৃত মানুষটা কি তোমার মা?'

'না, আমার ছোট মা।'

'পুরো ঘটনাটা আমাকে বল। কিছু বাদ দেবে না।'

'বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছে না করলেও বল। পুরো ব্যাপারটা আমাকে তুমি তোমার ভালোর জন্যে বলবে।'

'এটা বললে আমার ভালো হবে না।'

'তুমি বাচ্চা একটা মেয়ে—কিসে তোমার মঙ্গল, কিসে তোমার অমঙ্গল তা বোঝার ক্ষমতা তোমার হয় নি। বল ব্যাপারটা কী?'

'আরেক দিন বলব।'

'আরেক দিন না। আজই বলবে। এখনই বলবে।'

আমি বলতে শুরু করলাম। কিছুই বাদ দিলাম না। নীতু আন্টি চুপ করে শুনে গেলেন। কথার মাঝখানে একবারও বললেন না—তুমি এসব কী বলছ!

গল্প বলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম—আমি কী বলছি না বলছি সবই ছোট মা শুনছেন। তিনি ঘরের ভেতর নেই—কিন্তু কাছেই আছেন। পরদার ওপাশেই আছেন। পরদার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি যে নিশ্বাস ফেলছেন আমি তাও শুনতে পাচ্ছিলাম। গল্প শেষ করার পরপর নীতু আন্টি বললেন, ঘুমিয়ে পড়। বলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি সারা রাত জেগে রইলাম। এক ফোঁটা ঘুম হল না। শুরু হল আমার রাত জাগার কাল।

ছোটদের উদ্ভট অস্বাভাবিক কথা বড়রা সব সময় হেসে উড়িয়ে দেন। সেটাই স্বাভাবিক। ছোটদের উদ্ভট গল্প গুরুত্বের সঙ্গে কখনো গ্রহণ করা হয় না। গ্রহণ করা হয়তো ঠিকও নয়। আন্টি আমার গল্প কীভাবে গ্রহণ করলেন কিছুদিন আমি তা বুঝতেই পারলাম না। ছোট মার প্রসঙ্গ তিনি আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার তুললেন না। যেন কিছু শোনেন নি। পুরোপুরি স্বাভাবিক আচার আচরণ। শুধু রাতে আমার সঙ্গে ঘুমাতে আসেন। তখন অনেক গল্পটল্প হয়—ছোট মার প্রসঙ্গ কখনো আসে না।

আপনাকে তো আগেই বলেছি আমার ইনসমনিয়ার মতো হয়ে গিয়েছিল। শেষ রাতের দিকে ঘুম আসত। রাত একটার দিকে বাড়ি পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে যেত তখন বিচিত্র সব শব্দ শুনতে পেতাম। যেমন খাটের চারপাশে কে যেন হাঁটত। সে কে তা আমার কাছে পরিষ্কার না। ছোট মা হতে পারেন—অন্য কেউও হতে পারে। প্রচণ্ড ভয়ে আমি অস্থির হয়ে থাকতাম। যেহেতু রাতে ঘুম আসত না—দিনটা কাটত ঝিমুনিতে। ক্লাসে বসে আছি, স্যার অংক করাচ্ছেন । আমার তন্দ্রার মতো চলে এল। আধো ঘুম আধো জাগরণে চলে গেলাম। স্যারের দিকে তাকিয়ে থেকেই স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতে শুরু করতাম। এই স্বপ্নগুলি খুব অদ্ভুত। অদ্ভুত এই কারণে যে আমি তন্দ্রায় যেসব স্বপ্ন দেখতাম তার প্রতিটি সত্য হয়েছে। আমি তন্দ্রায় যা দেখতাম তাই ঘটত। তারচেয়ে মজার ব্যাপার, স্বপ্নগুলিকে আমি ইচ্ছামতো বদলাতে পারতাম। তবে আমি যে স্বপ্ন বদলাতেও পারি এটা বুঝতে সময় লেগেছিল। আগে বুঝতে পারলে খুব ভালো হত। আমি বোধহয় ব্যাপারটা আপনাকে বুঝাতে পারছি না। উদাহরণ দিয়ে বুঝাই।

ধরুন আমি স্বপ্নে দেখলাম বাবা চেয়ারে বসে লিখছেন। তিনি বসেছেন সিলিং ফ্যানের নিচে, হঠাৎ সিলিং ফ্যানটা খুলে তাঁর মাথায় পড়ে গেল। রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল। আমার এই স্বপ্ন দেখা মানে—ব্যাপারটা ঘটবে। আমি তৎক্ষণাৎ ঠিক করলাম—না ব্যাপারটা এরকম হবে না। স্বপ্নটা যেভাবেই হোক বদলে দিতে হবে তখন নতুন স্বপ্নের কথা ভাবলাম। যেমন ধরুন আমি ভাবলাম—বাবা লেখার টেবিলে বসেছেন। কী মনে করে হঠাৎ সিলিং ফ্যানের দিকে তাকালেন। তারপর সরে দাঁড়ালেন—অমনি ঝপাং শব্দ করে ফ্যান পড়ে গেল। বাবার কিছু হল না। পুরো

ব্যাপারটা ভেবে রাখার পর—অবিকল যেমন ভেবে রেখেছি তেমনি স্বপ্ন দেখতাম। আপনি এটাকে কি বলবেন, কোনো ক্ষমতা?

না আপনি তা বলবেন না। মানুষের যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থাকতে পারে এইসব আপনি বিশ্বাস করেন না। আপনার কাছে মানুষ যন্ত্রের মতো। একটা ছেলে যদি একটা মেয়েকে ভালবাসে তা হলে আপনি ধরেই নেবেন—ব্যাপারটা আর কিছুই না একজন আরেকজনের প্রতি শারীরিক আকর্ষণ বোধ করছে। শারীরিক আকর্ষণ যেহেতু নোংরা একটা ব্যাপার কাজেই ভালবাসা নামক মিষ্টি একটা শব্দ ব্যবহার করছে। কুইনাইনকে সুগার কোটেড করা হচ্ছে। আমি কি ভুল বললাম?

আমি ভুল বলি নি। আপনি যাই ভাবেন—কিন্তু শুনুন স্বপ্ন তৈরি করার ক্ষমতা আমার আছে। এবং আমি এখনো পারি। ঘটনা বলি। ঘটনা বললেই আপনি বুঝবেন।

শরিফা তো বাড়ি থেকে চলে গেল। ওর বিয়ে হবার কথা। বিয়ে হলে আর ফিরবে না। আমি একদিন স্বপ্ন দেখলাম ওর বিয়ে হচ্ছে। চেংড়া টাইপের ছেলে। পান খেয়ে দাঁত লাল করে আছে—আর ভ্যাক ভ্যাক করে হাসছে। স্বপ্ন দেখে খুব মেজাজ খারাপ হল। তখন ভাবলাম, বিয়ে হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু বরের সঙ্গে ওর খুব ঝগড়া হয়েছে, ও চলে এসেছে আমাদের বাড়িতে। যেরকম ভাবলাম অবিকল সেরকম স্বপ্ন দেখলাম। হলও তাই। এক সন্ধ্যাবেলা শরিফা উপস্থিত। তার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু বর তাকে নিচ্ছে না। বিয়ের সময় কথা হয়েছিল বরকে একটা সাইকেল এবং নগদ পাঁচ হাজার এক টাকা দেয়া হবে। কোনোটাই দেয়া হয় নি বলে তারা কনে উঠিয়ে নেবে না। যেদিন সাইকেল এবং টাকা দেয়া হবে সেদিনই মেয়ে তুলে নেবে। আমি শরিফাকে বললাম, তোমার কি মন খারাপ?

'শরিফা বলল, মন খারাপ কইরা লাভ আছে আফা?'

'তোমাকে যে তুলে নিচ্ছে না তোমার রাগ লাগছে না?'

'না। সাইকেল আর টেকা দিব বইল্যা দেয় নাই। তারার তো আফা কোনো দোষ নাই। একটা জিনিস দিবেন বলবেন, তারপরে দিবেন না—এইটা কেমন কথা?'

'তোমার বর পছন্দ হয়েছে?'

'হুঁ।'

'তোমার সঙ্গে তোমার বরের কথা হয়েছে?'

'ওমা কথা আবার হয় নাই? এক রাইত তার লগে ছিলাম না?'

'রাতে তোমরা কী করলে?'

'কওন যাইব না আফা। বড়ই শরমের কথা। লোকটার কোনো লজ্জা নাই। এমন বেহায়া মানুষ জন্মে দেখি নাই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

'না, বল আমি শুনব।'

'অসাম্ভাব কথা আফা। ছিঃ।'

'তুমি বলবে না?'

'জীবন থাকতে না।'

আমি নিষিদ্ধ কথা শোনার জন্যে ছটফট করছিলাম। এবং আমি জানি শরিফাও নিষিদ্ধ কথাগুলি বলার জন্যে ছটফট করছিল।

দেখলেন তো স্বপ্ন পাল্টে কীভাবে শরিফাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম? আপনি বলবেন, কাকতালীয়। মোটেই না, শরিফার বরকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করল, কাজেই একদিন খুব ভাবলাম, শরিফার বর এসেছে। যেমন ভাবলাম, ঠিক সেরকম স্বপ্ন দেখলাম। শরিফার বর চলে এল। নীল রঙের একটা লুঙ্গি। রবারের জুতা। সিল্কের চক্রাবক্রা একটা শার্ট। এসেই বাসার সবাইকে পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলল। এমনকি আমাকেও। শরিফার বরের নাম সিরাজ মিয়া। সে নারায়ণগঞ্জে একটা লেদ মেশিনের হেল্পার।

আন্টি তাকে খুব বকা দিলেন। কঠিন গলায় বললেন, তুমি পেয়েছ কী? যৌতুক পাও নি বলে বউ ঘরে নেবে না। তুমি কি জান পুলিশে খবর দিলে তোমার পাঁচ বছরের জেল হয়ে যাবে। বাংলাদেশে যৌতুক নিবারণী আইন পাস হয়েছে। দেব পুলিশে খবর?

সিরাজ মিয়া বলল, ইচ্ছা হইলে দেন। আফনেরা বড়লোক। আফনেরা যা বলবেন সেইটাই ন্যায়।

আন্টি আরো রেগে গেলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল এখনই তিনি ধানমন্ডি থানার ওসিকে খবর দেবেন। আমাকে বললেন, ফারজানা দাও তো টেলিফোনটা। ওসি সাহেবকে আসতে বলি।

আমি টেলিফোন এনে দিলাম। আমার একটু ভয় ভয় করছিল, কিন্তু সিরাজ মিয়া নির্বিকার। তাকে চা আর কেক খেতে দেয়া হয়েছে। সে চায়ে কেক ডুবিয়ে বেশ মজা করে খাচ্ছে।

আন্টি ধানমন্ডি থানার ওসিকে খবর দিলেন না। কাকে যেন টেলিফোন করে বললেন, একটা নতুন সাইকেল কিনে বাসায় নিয়ে আসতে।

সিরাজ মিয়া নির্লজ্জের মতো বলল, আমারে টেকা দেন। আমি দেইখ্যা শুইন্যা কিনব। বাজারে নানান পদের সাইকেল—সব সাইকেল ভালো না।

আন্টি বললেন, তোমাকে দেখেশুনে কিছুই কিনতে হবে না। তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে আস। আমি তোমাকে সাইকেল আর পাঁচ হাজার এক টাকা দিয়ে দেব। তুমি শরিফাকে নিয়ে যাবে। যদি শুনি এই মেয়ের উপর কোনো অত্যাচার হয়েছে আমি তোমার চামড়া খুলে ফেলব। গরুর চামড়া যেভাবে খোলে ঠিক সেইভাবে খোলা হবে।

সিরাজ মিয়া চা কেক খেয়ে হাসিমুখে চলে গেল। বলে গেল আগামী বুধবার সে তার বাবাকে নিয়ে আসবে। এবং সেদিনই বউ নিয়ে চলে যাবে।

আন্টির এই ব্যাপারটা আমার কী যে ভালো লাগল। আনন্দে আমার চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আর শরিফা যে কী খুশি হল। এক্কেবারে পাগলের মতো আচরণ। এই হাসছে। এই কাঁদছে।

বুধবার সকালে শরিফাকে নিয়ে যাবে। আন্টি তার বরের জন্যে শুধু যে সাইকেল আনালেন তা না—একটা নতুন শার্ট কেনালেন। শরিফাকে দিলেন দুটা শাড়ি—কানের দুল। শরিফা নিজেই দোকান থেকে রুপার নূপুর কিনে এনে পায়ে পরেছে। যখন হাঁটে ঝমঝম শব্দ হয়। খুব হাস্যকর ব্যাপার।

মঙ্গলবার আমাদের স্কুল ছুটি ছিল। বৌদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি। আমি দুপুরে শুয়ে আছি—

হঠাৎ স্বপ্নে দেখি—ছোট মা এসে আমাকে বলছেন, ফারজানা আমি বলেছিলাম না এই মেয়েটাকে শাস্তি দেব? ও চলে যাচ্ছে—যাবার আগে শাস্তি দিয়ে দেয়া দরকার তাই না?

আমি চুপ করে রইলাম। ছোট মা বললেন—কথা বলছ না কেন? কী ধরনের শাস্তি দেয়া যায় বল তো। তুমি যেরকম শাস্তির কথা বলবে আমি ঠিক সেরকম শাস্তি দেব।

'আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।'

'না আমি ক্ষমা করব না। ওকে শাস্তি পেতেই হবে। ওর চোখ দুটা গেলে দি—কী বল? উলের কাঁটা দিয়ে চোখ গেলে দি?'

আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তবে খুব চিন্তিত হলাম না। কারণ আমি স্বপ্ন বদলাতে পারি। আমি স্বপ্নটা বদলে ফেলব। কীভাবে বদলাব সেটাও ঠিক করে ফেললাম। বিকেলে গানের টিচার চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে আমি স্বপ্নটা বদলাব। গানের টিচার গেলেন সন্ধ্যাবেলা। আমি আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই শরিফার গলা শুনতে পেলাম। সে ফিসফিস করে ডাকছে—আফা। ও আফা।

শব্দটা আসছে খাটের নিচ থেকে। আমি নিচু হয়ে দেখি শরিফা হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচে বসে আছে। কুকুর যেভাবে বসে থাকে ঠিক সেভাবে শরিফা বসে আছে। কুকুরের মতো জিভ বের করে খানিকটা হাঁপাচ্ছেও। তাকে কেমন যেন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। আমি বললাম, তুমি এখানে কী করছ? বের হয়ে আস। খাটের নিচ থেকে বের হয়ে আস।

সে বলল, আফাগো আমি বাঁইচ্যা নাই। আমারে মাইরা ফেলছে। ছাদে কাপড় আনতে গেছিলাম আমারে ধাক্কা দিয়া ফেলছে। আমি অনেক দূর চইল্যা যাব। যাওনের আগে আফনেরে শেষ দেখা দেখতে আইছি গো।

এই বলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে গেল। আমি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। সবাই ছুটে এলেও তখনই আমার ঘরে ঢুকতে পারল না। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তাদের ঢুকতে হল দরজা ভেঙে।

আমি বলছি সন্ধ্যাবেলার ঘটনা। শরিফা যে সত্যি সত্যি মারা গেছে এই খবর জানা গেল রাত আটটার দিকে। আমাদের বাড়ির পেছনের দেয়ালে পড়ে তার মাথা থেঁতলে গিয়েছিল। কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী কেউ—কারণ দেয়ালটা বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে—ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে এত দূরে ফেলতে অনেক শক্তি দরকার।

আমার মাথা ধরছে। আমি আপাতত লেখা বন্ধ করলাম।

এই মুহূর্তে আপনি আমার সম্পর্কে কী ভাবছেন বলব?

আমি অন্তর্যামী নই। অন্য একজনের মনের খবর আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি কী ভাবছেন তা আমি বলতে পারব। কারণ আপনার চিন্তার পদ্ধতি আমি জানি।

আপনি আমার লেখা পড়ছেন। যতই পড়ছেন আমার সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠছে। ধারণাগুলি করছেন যুক্তির ভেতর দিয়ে। পুরোপুরি অংক কষা হচ্ছে দুই যোগ তিন হচ্ছে পাঁচ, কখনো ছয় বা সাত নয়। এ জাতীয় মানুষের মনের ভাব আঁচ করা মোটেই কঠিন না।

অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাপারে আপনার সামান্যতম বিশ্বাসও নেই। যেই আমি ছোট মাকে দেখার কথা বলেছি অমনি আপনি ভুরু কুঁচকেছেন। কঠিন কিছু শব্দ মনে মনে আওড়েছেন, যেমন স্কিজোফ্রেনিক, সাইকোপ্যাথ ....তাই না?

শরিফার মৃত্যুর খবর শুনে আপনি খানিকক্ষণ ঝিম মেরে ছিলেন। তারপর সিগারেট ধরালেন। ধূমপায়ী মানুষরা সামান্যতম সমস্যার মুখোমুখি হলেই ফস করে সিগারেট ধরায়। ভাবটা এমন যে নিকোটিনের ধোঁয়া সব সমস্যা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে বলেছেন—খুনটা কে করেছে? কারণ আপনার কাছে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলে কিছু নেই। একটা মেয়ে খুন হয়েছে। ভূতপ্রেত তাকে খুন করবে না। মানুষ খুন করবে। সেই মানুষটা কে?

ডিটেকটিভ গল্পে কী থাকে? একটা খুন হয়—আশপাশের সবাইকে সন্দেহ করা হয়। সবচে কম সন্দেহ যাকে করা হয় দেখা যায় সে-ই খুন করেছে। গল্প-উপন্যাসের ডিটেকটিভদের মতো আপনি যদি খুন রহস্যের সমাধান করতে চান তা হলে প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি হচ্ছি আমি। এখন আপনি ভাবছেন মেয়েটা যে খুন করল তার মোটিভ কী? একটু চিন্তা করলে আপনি মোটিভও পেয়ে যাবেন। আমি আপনাকে সাহায্য করি?

ক) মেয়েটি মানসিকভাবে অসুস্থ। স্কিজোফ্রেনিক এবং সাইকোপ্যাথ। একজন অসুস্থ মানুষ যে কোনো অপরাধ করতে পারে। অসুস্থতাই তার মোটিভ।

খ) শরিফা মেয়েটি তার স্বামীর কাছে বুধবার চলে যাবে। সে ছিল ফারজানার সঙ্গিনী। ফারজানা চাচ্ছিল মেয়েটিকে রেখে দিতে। খুন করা হয়েছে সে কারণে। অসুস্থ মেয়েটি ভাবছে শরিফা খুন হয়েছে ঠিকই কিন্তু চলে যায় নি—এই তো সে বাস করছে খাটের নিচে। কুকুরের মতো হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

মিসির আলি সাহেব আপনি কি তাই ভাবছেন? না আপনি তা ভাবছেন না। মানুষের মনের ভেতরে যে আরেকটি মন বাস করে আপনি সেই মন নিয়ে কাজ করেন। যুক্তির ক্ষমতা আপনি যেমন জানেন যুক্তির অসারতাও আপনি জানেন। দুই যোগ তিন পাঁচ হয় এটা আপনি যেমন জানেন ঠিক তেমনি জানেন মাঝে মাঝে সংখ্যাকে যুক্ত করা যায় না। যোগ চিহ্ন কোনো কাজে আসে না। এই তথ্য জানেন বলেই—আমি আমার জীবনের বইটি আপনার সামনে খুলে দিয়েছি। আপনাকে পড়তে দিয়েছি।

আপনি হয়তো ভাবছেন—এতে লাভ কী? মেয়েটির সঙ্গে তো আমার কখনো দেখা হবে না। সে তার ঠিকানা দেয় নি। ঠিকানা দেই নি এটা ঠিক না। ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা এমনভাবে দিয়েছি যেন ইচ্ছা করলেই আপনি বের করতে পারেন আমাদের বাড়িটা কোথায়। ধানমন্ডি থানার ওসিকে আন্টি টেলিফোন করতে চাচ্ছে তা থেকে আপনি কি অনুমান করতে পারছেন না আমাদের বাড়ি ধানমন্ডিতে। টু ইউনিট বাড়ি এটিও বলেছি। আরো অনেক কিছু বলেছি। থাক এখন টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। যদি মনে করেন আমার সঙ্গে কথা বলা দরকার টেলিফোন করবেন। নাম্বারটা হচ্ছে ষষ্ঠ মৌলিক সংখ্যা, পঞ্চম মৌলিক সংখ্যা, চতুর্থ মৌলিক সংখ্যা, তৃতীয় মৌলিক সংখ্যা। সংখ্যাগুলির আগে আট বসাবেন।

সরাসরি টেলিফোন নাম্বার লিখে দিলে হত। সেটা আপনার মনে থাকত না। এইভাবে বলায় আর কখনো ভুলবেন না।

৮, (ষষ্ঠ মৌলিক সংখ্যা=১১), (পঞ্চম মৌলিক সংখ্যা=৭), (চতুর্থ মৌলিক সংখ্যা=৫), (তৃতীয় মৌলিক সংখ্যা=৩)

অর্থাৎ আমার টেলিফোন নাম্বার হচ্ছে—

৮১১৭৫৩

আমাদের টেলিফোন নাম্বারটা রহস্যময় না? আমাদের বাসায় তিনটা টেলিফোন আছে। সবচে রহস্যময় নাম্বারটা আপনাকে দিলাম। এই টেলিফোন বাবা আমাকে দিয়েছেন। নাম্বারটা আমি কাউকে দেই নি। কাজেই আমার টেলিফোনে কেউ আমাকে পায় না। অথচ আমি অন্যদের পাই। ব্যাপারটা মজার না? তোমরা আমাকে খুঁজে পাবে না—কিন্তু আমি ইচ্ছা করলেই তোমাদের পেয়ে যাব।

মাঝে মাঝে আমার যখন ইনসমনিয়ার মতো হয়—আমি এলোমেলোভাবে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরাতে থাকি। অচেনা কোনো একটা জায়গায় রিং বেজে ওঠে। সদ্য ঘুম ভাঙা গলায় কেউ একজন ভারী গলায় বলে—কে?

আমি করুণ গলায় বলি, আমার নাম ফারজানা।

কাকে চাই?

কাউকে চাই না। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব, প্লিজ টেলিফোন রেখে দেবেন না। প্লিজ! প্লিজ! এই সময় পুরুষ মানুষরা যে কী অদ্ভুত আচরণ করে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। শতকরা সত্তর ভাগ পুরুষ প্রেম করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অতি মিষ্টি গলায় উত্তর দিতে থাকে। শতকরা দশ ভাগ কুৎসিত সব কথা বলে। অতি নোংরা, অতি কুৎসিত সব বাক্য। গলার স্বর থেকে মনে হয় মধ্যবয়স্ক পুরুষরা এই নোংরামিগুলি বেশি করেন। এই পুরুষরাই হয়তো স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী। অফিসে আদর্শ অফিসার। কী অদ্ভুত বৈচিত্র্যের ভেতরই না আমাদের জীবনটা কাটে।

আমরা সবাই ড. জেকিল এবং মিস্টার হাইড। আপনিও কিন্তু তাই—একদিকে অসম্ভব যুক্তিবাদী মানুষ অন্যদিকে...যুক্তিহীন জগতেও চরম আস্থা আছে এমন একজন। তাই না? খুব ভুল কি বলেছি?

৬

একটি তরুণী মেয়ে বাড়ির ছাদ থেকে পা ফসকে পড়ে গিয়ে মরে গেছে। ঘটনা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। বয়স্কা মহিলা পা ফসকে পড়ে গেছেন—বিশ্বাসযোগ্য, অল্প বয়েসী মেয়ে পড়ে গেছে এটিও বিশ্বাসযোগ্য। তরুণী মেয়ের অপঘাতে মৃত্যু মানেই নানান প্রশ্ন। বিশেষ করে সেই মেয়ে যদি কাজের মেয়ে হয়।

আমার বাবাকে নিশ্চয়ই এইসব ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিছুদিন তাঁকে খুব চিন্তিত দেখেছি। তারপর একসময় তিনি চিন্তামুক্ত হয়েছেন। বিত্তবানরা খুব সহজেই চিন্তামুক্ত হতে পারেন। তাদের সামান্য অর্থ ব্যয় হয়—এই যা।

শরিফার বাবাকে কিছু টাকা দেয়া হল—কত আমি জানি না। নিশ্চয়ই সে যত আশা করেছিল তারচে বেশি। কারণ সেই বেচারা টাকা হাতে নিয়ে আমাদের সবার মঙ্গল

কামনা করে দীর্ঘ মোনাজাত শুরু করল। মোনাজাতের বিষয়বস্তু হচ্ছে—

আমাদের মতো ভালোমানুষ সে তার জীবনে দেখে নি। আমাদের কাছে তার মেয়ে খুব সুখে ছিল। কপালে সুখ সইল না।

শরিফার স্বামীও বেশ কিছুদিন ঘোরাঘুরি করল। বেচারার দাবি সামান্য। যে সাইকেলটা তার জন্যে কেনা হয়েছিল সেই সাইকেল যেন তাকে দিয়ে দেয়া হয়। সম্ভব হলে পাঁচ হাজার এক টাকা। এই টাকাটা তো আইনত তারই প্রাপ্য—ইত্যাদি।

আন্টি তাকে ভাগিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন—কখনো যেন তাকে গেটের ভেতর ঢুকতে না দেয়া হয়।

সব ঝামেলা মিটে যাবার পর বাবা এক সন্ধ্যায় আমাকে ডাকলেন। বাবার পরিচয় আপনাকে দেয়া হয় নি—এখন দিচ্ছি। তিনি মোটামুটি কঠিন ধরনের মানুষ। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। শান্ত—ধীর, স্থির। তিনি খুব রেগে গেলেও সহজ ভঙ্গিতে কথা বলতে পারেন। পেশায় তিনি পাইলট। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আছেন। আমার সব সময় মনে হয়েছে পাইলট না হয়ে বাবা যদি ইউনিভার্সিটির অংকের টিচার হতেন তাঁকে খুব মানাত। বই পড়া তাঁর প্রধান শখ। বেশিরভাগ সময় আমি তাঁর হাতে বই দেখেছি। হালকা ধরনের বই না—বেশ সিরিয়াস ধরনের বই।

বাবা তাঁর স্টাডিতে একা বসেছিলেন। তাঁর সামনে একটা বাটিতে খেজুর গুড় টুকরো করা। শীতকালে খেজুর গুড় তাঁর প্রিয় একটা খাবার। প্রায়ই দেখেছি গল্পের বই পড়তে পড়তে তিনি খেজুর গুড়ের টুকরো মুখে দিচ্ছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন—মা বস।

আমি তাঁর সামনে বসলাম।

'কেমন আছ মা?'

আমি বললাম, ভালো।

'শরিফা মেয়েটি এইভাবে মারা গেল নিশ্চয়ই তোমার মন খুব খারাপ?'

আমি বললাম, হ্যাঁ মন খারাপ।

বাবা ইতস্তত করে বললেন, তোমাকে কিন্তু কান্নাকাটি করতে দেখি নি। আমার কাছে তোমাকে বেশ স্বাভাবিকই মনে হয়েছে।

আমি বুঝতে পারলাম না বাবা ঠিক কী বলতে চাচ্ছেন। তাঁর কথা বলার মধ্যে জেরা করার ভাবটা প্রবল। যেন আমি কিছু গোপন করার চেষ্টা করছি বাবা তা বের করে ফেলতে চাচ্ছেন।

'শরিফা যে সন্ধ্যায় মারা গেল—সেই সন্ধ্যায় তুমি কি ছাদে গিয়েছিলে?'

'না।'

'সেদিন ছাদে যাও নি?'

'না।'

'আমি যতদূর জানি—ছাদ তোমার খুব প্রিয় জায়গা। বেছে বেছে ওই দিনই ছাদে যাও নি কেন?'

'ওই দিন যেতে ইচ্ছে করে নি।'

'তুমি ঘরের দরজা বন্ধ করে চিৎকার করে কাঁদছিলে। দরজা ভেঙে তোমাকে বের

কথা হয়। তুমি প্রথম যে কথাটি তখন বল তা হচ্ছে শরিফা মারা গেছে। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'সে যে মারা গেছে তোমার তা জানার কথা না। কারণ কেউই জানে না। তুমি জানলে কীভাবে?'

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বাটিটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—দাও গুড় খাও। আমি এক টুকরো গুড় নিয়ে মুখে দিলাম। বাবা শান্ত গলায় বললেন, তুমি রাগ করে, কিংবা নিজের অজান্তে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও নি তো?

'না।'

'অনেক সময় খেলতে গিয়েও এরকম হয়। হয়তো হাসতে হাসতে ধাক্কা দিয়েছ—সে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছে। তোমার কোনো দোষ ছিল না।'

'না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

'ভালো।'

'গান কেমন হচ্ছে?'

'ভালো।'

'এবারের গানের টিচার কেমন?'

'ভালো।'

'গান কি তুলেছ না এখনো সারে গামা করে যাচ্ছ?'

'একটা গান তুলেছি।'

'কী গান?'

'নজরুল গীতি।'

'গানের লাইনগুলি কী?'

'পথ চলিতে যদি চকিতে—গাইব?'

'না থাক। আরেকদিন শুনব।'

'আমি কি এখন চলে যাব?'

'আচ্ছা যাও।'

আমি উঠে চলে এলাম। বাবা ভুরু কুঁচকে বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলেন। তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন নি এটা বোঝা যাচ্ছে। তিনি যে আমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাও বুঝতে পারছি। খুব অল্প বয়সেই আমি আসলে বেশি বেশি বুঝতে শিখেছিলাম। বেশি বুঝতে পারাটা এক ধরনের দুর্ভাগ্য। যারা কম বুঝতে পারে—এই পৃথিবীতে তারাই সবচে সুখী। বোকা মানুষরা কখনো আত্মহত্যা করে না।

বাবা আমার কথা বিশ্বাস না করলেও আন্টি করলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে নিজ থেকে তাঁকে আমার কিছু বলতে হল না। তিনি আপনাতেই সব বুঝতে পারলেন। ঘটনাটা এরকম—রাতে তিনি আমার সঙ্গে ঘুমাতে এসেছেন (শরিফার মৃত্যুর পর তিনি প্রতি রাতেই আমার সঙ্গে ঘুমাতেন।) বাতি নিভিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে মৃদু গলায় গল্প শুরু করলেন—তাদের গ্রামের বাড়ির গল্প। বাড়ির পেছনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। তিনি পাকা পেয়ারার খোঁজে গাছে উঠেছেন। হঠাৎ দেখলেন গাছের ডাল পেঁচিয়ে একটা

সাপ। সাপটার গায়ের রঙ অবিকল পেয়ারা গাছের ডালের মতো। সাপটা তাঁকে দেখে পালিয়ে গেল না—উল্টো তাঁর দিকে আসতে শুরু করল ....।

এই পর্যায়ে আন্টি গল্প থামিয়ে দিলেন। আমি বললাম, কী হয়েছে?

আন্টি বললেন, ফোঁপাচ্ছে কে? আমি ফোঁপানির শব্দ শুনছি। তুমি কি শুনছ?

শব্দ আমিও শুনছিলাম। ফোঁপাচ্ছে শরিফা। খাটের নিচে বসে মাঝে মধ্যেই সে ফোঁপানির মতো শব্দ করে। আমি আন্টির প্রশ্নের জবাব দিলাম না। চুপ করে রইলাম। আন্টি বললেন, মনে হচ্ছে খাটের নিচে কেউ বসে আছে। ফোঁপাচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

'না।'

'আমি পরিষ্কার শুনছি—পচা গন্ধও পাচ্ছি। তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?'

'না।'

আন্টি উঠে বসলেন। টেবিলল্যাম্প জ্বালালেন। বিছানা থেকে নেমে তাকালেন খাটের নিচে। আমি তাকিয়ে রইলাম আন্টির মুখের দিকে। আমি দেখলাম ভয়ে এবং আতঙ্কে হঠাৎ আন্টির মুখ ছোট হয়ে গেল। তিনি বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। কী বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না। আন্টি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিলেন। তার ফর্সা গাল হয়েছে টকটকে লাল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আন্টিকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। আন্টি চাপা গলায় বললেন— কে কে?

'আম্মা আমি শরিফা।'

'শরিফা!'

'জে আম্মা। আমি এইখানে থাকি।'

'শরিফা!'

'জে আম্মা। আমি হাঁটাচলা করতে পারি না—এইখানে থাকি। আমারে বিদায় দিয়েন না আম্মা। আমার যাওনের জায়গা নাই...।'

আন্টি উঠে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে খাটের কাছে এসে খাটে উঠলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লেন। আমি বললাম, কী হয়েছে?

আন্টি জড়ানো গলায় বললেন, কিছু না। তুমি ঘুমাও।

আমি বললাম, খাটের নিচে কিছু দেখেছেন আন্টি?

তিনি বললেন, না। তুমি ঘুমাও। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। আন্টি সম্ভবত সারা রাতই জেগে রইলেন। পরদিন ভোরে জেগে উঠে দেখি আন্টি হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। ঘরে তখনো টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। আন্টির চোখ জ্বলজ্বল করছে। এক রাতেই তাঁর চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। আন্টি ক্লান্ত গলায় বললেন, ফারজানা তুমি কি রান্নাঘরে গিয়ে বলে আসবে আমাকে এক কাপ চা দিতে?

আমি বললাম, আন্টি আপনার কি শরীর খারাপ করেছে? তিনি বললেন, না। শরীর ভালো আছে।

আন্টি বিছানায় বসে চা খেলেন। তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হল। আমাকে অবিশ্যি তিনি কিছুই বললেন না। আমি সহজ স্বাভাবিকভাবেই হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা করলাম। স্কুলে চলে গেলাম। আন্টি সারা দিন আমার ঘরেই থাকলেন। ঘর থেকে বেরুলেন না।

বাবা সে সময় দেশে ছিলেন না। বছরে একবার পাইলটদের নতুন করে কী সব

শেখায়। রিভিয়্যু হয়। বাবা সেই ট্রেনিঙে তখন আমস্টারডামে। বাড়িতে আমি আর আন্টি। আন্টি আমার ঘরেই থাকেন। তিনি রাতে একেবারেই ঘুমান না। আমার কিন্তু ঘুম পায়। আগের অনিদ্রা রোগ তখন সেরে গেছে। বিছানায় যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে বাথরুম পেলে কিংবা পানির পিপাসা পেলে ঘুম ভাঙে। আমি দেখি আন্টি মেঝেতে বসে আছেন। তার বসার ভঙ্গি শরিফার বসার ভঙ্গির মতোই। তিনি মৃদু স্বরে শরিফার সঙ্গে কথা বলেন।

'শরিফা!'

'জে আম্মা?'

'কী করছ?'

'কিছু করনের নাই আম্মা। বইসা আছি।'

'এখান থেকে চলে যাও।'

'কই যামু? যাওনের জায়গা নাই। পথঘাটও চিনি না।'

'চাও কী তুমি?'

'কিছু চাই না। কী চামু?'

'দিনের বেলা তোমাকে দেখি না কেন? দিনে তুমি কোথায় যাও?'

'জানি না আম্মা। কী হইতেছে আমি কিছুই বুঝি না। দিশা পাই না।'

'তোমার ক্ষুধা হয়?'

'জে হয়। জবর ভুখ লাগে—কিন্তু আম্মা খাওন নাই। আমারে কে খাওন দিব?'

'এখন ক্ষুধা হয়েছে?'

'জে হয়েছে।'

'বিস্কুট আছে খাবে? বিস্কুট দেব?'

'জে না। আফনাগো খাওন আমি খাইতে পারি না।'

'তুমি কি খুব কষ্টে আছ?'

'বুঝি না আম্মা। কিচ্ছু বুঝি না। দিশা পাই না।'

'তুমি যে মারা গেছ তা কি জান?'

'জে জানি।'

'কেউ কি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে?'

'জে।'

'কে ফেলেছে?'

'ছোট আফা ফেলছে। ছোট মানুষ বুঝে নাই। তার ওপরে রাগ হইয়েন নাঁ আম্মা।'

'ফারজানা তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে?'

'জে।'

'তুমি কি তাকে দেখেছ ধাক্কা দিয়ে ফেলতে?'

'জে না। পিছন থাইক্যা ধাক্কা দিছে। অন্য কেউও হইতে পারে।'

অতিদ্রুত আন্টির শরীর খুব খারাপ করল। তিনি একেবারেই ঘুমাতে পারেন না। গাদা গাদা ঘুমের ওষুধ খান—তারপরেও জেগে থাকেন। সারাক্ষণ নিজের মনে বিড়বিড়

করে কথা বলেন। অর্থহীন এলোমেলো সব কথা। হঠাৎ হাসতে শুরু করেন সেই হাসি কিছুতেই থামে না। আবার যখন কাঁদতে থাকেন—সেই কান্নাও চলতে থাকে।

বাবা যখন দেশে ফিরলেন তখন আন্টি পুরোপুরি উন্মাদ। কাউকেই চিনতে পারেন না। আমাকেও না। আন্টির চেহারাও খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মুখ শুকিয়ে মিসরের মমিদের মতো হয়ে গেছে। দাঁত বের হয়ে এসেছে। সারা শরীরে বিকট গন্ধ। বাবা হতভম্ব হয়ে গেলেন। আন্টির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল। চিকিৎসায় কোনো লাভ হল না। ক্রমে ক্রমে তাঁর পাগলামি বাড়তে থাকল। বাবাকে দেখলেই তিনি ক্ষেপে উঠতেন। একদিন সকালে পাউরুটি কাটার ছুরি নিয়ে তিনি বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারত। ভাগ্যক্রমে ঘটে নি—শুধু বাবার পিঠ কেটে রক্তারক্তি হয়ে গেল।

আন্টিকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হল। আন্টির বাবা এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন। সেখানে থেকে তিনি কিছুটা সুস্থ হলেন। তখন তাঁকে আবার আমাদের এখানে আনা হল। তিনি আবারো অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাকে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হল।

মাঝে মধ্যে আমি ওনাকে দেখতে যেতাম। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন না। কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকতেন। আন্টিদের বাড়ির কেউ চাইত না যে আমি যাই। আমি যাওয়া ছেড়ে দিলাম।

শরিফার প্রসঙ্গে আসি। শরিফার হাত থেকে আমি খুব সহজে মুক্তি পেয়ে যাই। শরিফাকে আমি এক রাতে বলি—শরিফা তোমার কি উচিত না তোমার স্বামীর সঙ্গে গিয়ে থাকা?

শরিফা বলল, 'জে উচিত।'

'তুমি তার কাছে চলে যাও।'

'হে কই থাকে জানি না আফা।'

'আমি তাকে এনে দেব?'

'জে আফা।'

আমি শরিফার স্বামীকে খবর পাঠালাম সে যেন এসে তার সাইকেল নিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর যেন আসে।

সে খুশি মনে সাইকেল নিতে এল। সাইকেলের সঙ্গে সে অন্য কিছুও নিয়ে গেল। মিসির আলি সাহেব—আপনার জন্যে বিস্ময়কর খবর হল—মাসখানেক পরে আমি খবর নিয়ে জানতে পারি শরিফার স্বামীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার আত্মীয়স্বজনরা তাকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছিল। ভর্তি করাতে না পেরে শহরেই তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে।

৭

মিসির আলি সাহেব,

এই সম্বোধন বারবার করতে আমার কুৎসিত লাগছে। নামের শেষে সাহেব আবার কী? নামের শেষে সাহেব লাগালেই মানুষটাকে অনেক দূরের মনে হয়। দূরের মানুষের

কাছে কি এমন অন্তরঙ্গ চিঠি লেখা যায়? একবার ভেবেছিলাম 'স্যার' লিখি। তারপর মনে হল—স্যার তো সাহেবের মতোই দূরের ব্যাপার। মিসির আলি চাচা লিখব? না তাও সম্ভব না। মিসির আলি এমনই এক চরিত্র যাকে চাচা বা মামা ডাকা যায় না। গৃহী কোনো সম্বোধন তাঁকে মানায় না। দেখলেন আপনাকে আমি কত শ্রদ্ধা করি? না দেখেই কোনো মানুষকে এতটা শ্রদ্ধা করা কি ঠিক?

থাকুক তত্ত্বকথা—নিজের গল্পটা বলে শেষ করি। অনেকদূর তো বলেছি—আপনি কি বুঝতে পারছেন যা বলছি সব সত্যি বলছি? অর্থাৎ আমি যা সত্যি বলে বিশ্বাস করছি তাই বলছি।

যতটুকু পড়েছেন সেখান থেকে কি বুঝতে পারছেন যে বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো না।

বাবা আমাকে পছন্দ করেন না।

কেন করেন না, আমি জানি না। আমি কখনো জিজ্ঞেস করি নি। কিন্তু বুঝতে পেরেছি। পছন্দ করেন না মানে এই না যে তিনি সারাক্ষণ ধমকাধমকি করেন। এইসব কিছুই না। মাঝে মাঝে গল্প করেন। লেজার ডিস্কে ভালো ছবি আনলে হঠাৎ বলেন, মা এস ছবি দেখি। জন্মদিনে খুব দামি গিফট দেন। যতবারই বাইরে যান আমার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসেন। তারপরেও আমি বুঝতে পারি বাবা আমাকে তেমন পছন্দ করেন না। মেয়েরা এইসব ব্যাপার খুব সহজে ধরতে পারে। কে তাকে পছন্দ করছে কে করছে না—এই পর্যবেক্ষণশক্তি মেয়েদের সহজাত। এই বিদ্যা তাকে কখনো শিখতে হয় না। সে জন্মসূত্রে নিয়ে আসে। ওই যে কবিতা—

"এ বিদ্যা শিখে না নারী আসে আপনাতে"

আন্টি অসুস্থ হয়ে যাবার পর বাবা যেন কেমন কেমন চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন। যেন আমিই আন্টিকে অসুস্থ করেছি। আমি যেন ভয়ঙ্কর কোনো মেয়ে—আমার সংস্পর্শে যে আসবে সেই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

বাবার দুশ্চিন্তার কারণও আছে। ছোট মা অসুস্থ হবার পর আমার ঘরেই বেশিরভাগ সময় থাকতেন। তিনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমার বিছানাতে শুয়ে মারা যান। যে রাতে তিনি মারা যান সে রাতে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করেন। আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর তিনি ঘুমের ওষুধ খান—একটা চিঠি লেখেন। তারপর আমার সঙ্গে ঘুমাতে আসেন। আমি ভোরবেলা জেগে উঠে দেখি তিনি কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন—চোখ আধা খোলা। চোখের সাদা অংশ চকচক করছে। মুখ খানিকটা হাঁ করা। হাত-পা হিম হয়ে আছে। আমার তখন খুব কম বয়স। তারপরেও আমি বুঝলাম তিনি মারা গেছেন। আমি ভয় পেলাম না। চিৎকার দিলাম না। শান্ত ভঙ্গিতেই বিছানা থেকে নামলাম। দরজা ভেতর থেকে ছিটকিনি দেয়া। আমি চেয়ারে দাঁড়িয়ে ছিটকিনি খুলে বাবার ঘরে গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাবাকে বললাম, ছোট মা মারা গেছেন।

বাবা তখন কফি খাচ্ছিলেন। তিনি খুব ভোরবেলা ওঠেন। নিজেই কফি বানিয়ে খান। তিনি মনে হল আমার কথা বুঝতে পারলেন না, কাপ নামিয়ে রেখে বললেন—মা কী বললে?

আমি আবারো বললাম, ছোট মা মারা গেছেন।

বাবা দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করলেন না।

আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। এক পলক ছোট মাকে দেখলেন।

তাঁর কপালে হাত রাখলেন। তারপর রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

ছোট মার পর শরিফা মারা গেল। সেও থাকত আমার ঘরে। সেও কি মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? আমরা যদি ধরে নেই কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে নি, তা হলে বুঝতে হবে শরিফা নিজেই ছাদ থেকে লাফ দিয়েছে। যে মেয়ে পরদিন স্বামীর কাছে যাবে সে এই কাণ্ড কখন করবে? মানসিকভাবে অসুস্থ হলেই করবে। শরিফাও তা হলে অসুস্থ ছিল।

আন্টির অসুস্থতাতো চোখের সামনে ঘটল। আমার ঘরেই তার শুরু। কাজেই বাবা যদি ভেবে থাকেন প্রতিটি অসুস্থতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে তা হলে বাবাকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না।

এক রাতে, খাবার টেবিলে তিনি বললেন—নিশি, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমি বললাম, বল।

বাবা বললেন, খাবার টেবিলে বলতে চাচ্ছি না, খাওয়া শেষ করে আমার ঘরে আস। দুজন কথা বলি।

আমি বললাম, আচ্ছা।

তোমার বয়স এখন কত?

আমি বললাম, অক্টোবরে পনের হবে।

তা হলে তো তুমি অনেক বড় মেয়ে। তোমার বয়স পনের হতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারি নি।

আমি হাসলাম। বাবা বললেন, তুমি যে খুব সুন্দর হয়েছ তা কি তুমি জান?

'না।'

'কেউ তোমাকে বলে নি? তোমার বন্ধুবান্ধবরা?'

'না। আমার কোনো বন্ধুও নেই।'

'নেই কেন?'

'কারো সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় না।'

'হয় না কেন?'

'আমি তো জানি না কেন হয় না। মনে হয় আমাকে কেউ পছন্দ করে না।'

'তোমাকে পছন্দ না করার তো কোনো কারণ নেই।'

'তুমি নিজেই আমাকে পছন্দ কর না। অন্যদের দোষ দিয়ে কী হবে?'

'আমি তোমাকে পছন্দ করি না?'

'না কর না।'

'তোমার এই ধারণা হল কেন?'

আমি চুপ করে রইলাম। বাবাও চুপ করে গেলেন। মনে হচ্ছে তিনি খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন। অস্বস্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিস্ময়বোধ। অতি কাছের একজনকে নতুন করে আবিষ্কারের বিস্ময়।

রাত দশটার দিকে বাবার ঘরে গেলাম। ইচ্ছে করে খুব সেজেগুজে গেলাম। লাল পাড়ের হালকা সবুজ একটা শাড়ি পরলাম। কপালে টিপ দিলাম। আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই চমকে গেলাম—কী সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে বিয়েবাড়ির মেয়ে। কনের ছোট বোন।

বাবা আমার সাজগোজ দেখে আরো ভড়কে গেলেন। বিব্রত গলায় বললেন, মা বোস। তোমাকে তো চেনা যাচ্ছে না।

আমি বসতে বসতে বললাম, তোমার জরুরি কথা শুনতে এসেছি।

বাবা বললেন, এত সেজেছ কেন?

'এমনি সাজলাম। মাঝে মাঝে আমার সাজতে ইচ্ছা করে।'

'আমি আগে কখনো তোমাকে সাজতে দেখি নি।'

'আমাকে কি সুন্দর লাগছে না বাবা?'

'অবশ্যই সুন্দর লাগছে। কপালের টিপটা কি নিজেই এঁকেছ?'

আমি বললাম, বাবা তুমি নানান কথা বলে সময় নষ্ট করছ। কী বলবে সরাসরি বলে ফেল। অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই।

'অস্বস্তি বোধ করার কথা আসছে কেন?'

'তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তুমি অস্বস্তি বোধ করছ। তুমি বরং এক কাজ কর, দুই পেগ হুইস্কি খেয়ে নাও—এতে তোমার ইনহিবিশন কাটবে। যা বলতে চাচ্ছ সরাসরি বলে ফেলতে পারবে।'

'হুইস্কি খেলে ইনহিবিশন কাটে এই তথ্য জানলে কোত্থেকে?'

'গল্পের বই পড়ে। তোমার কাছ থেকে আমার গল্পের বই পড়ার অভ্যাস হয়েছে। আমিও দিনরাত বই পড়ি।'

'এটা একটা ভালো অভ্যাস।'

'বাবা তোমার কথাটা কী?'

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ দুম করে বললেন, তোমার ভেতর কিছু রহস্য আছে। রহস্যটা কী?

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না বাবা। তুমি কোন রহস্যের কথা বলছ? সব মানুষের মধ্যেই তো রহস্য আছে।'

বাবা বললেন, সব মানুষের মধ্যে রহস্য আছে ঠিকই। তবে সেই সব রহস্য ব্যাখ্যা করা যায়। তোমার রহস্য ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। আমি সেটাই জানতে চাচ্ছি।

'আমি এখনো তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। আলমারি খুলে হুইস্কির বোতল বের করলেন।

মিসির আলি সাহেব আপনাকে এতক্ষণ একটা কথা বলা হয় নি। লজ্জা লাগছিল বলেই বলতে পারি নি—আমার বাবা প্রচুর মদ্যপান করেন। এটা তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস। আমার ধারণা মা যে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা যান তার কারণ মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে বাবা অ্যাকসিডেন্ট করেন। আমি অবিশ্যি এসব নিয়ে বাবাকে কখনো কোনো প্রশ্ন করি নি। আরেকটা কথা আপনাকে বলা হয় নি—ছোট মা বাবার কাছ থেকে মদ্যপানের অভ্যাস করেছিলেন। এই অংশটি এতক্ষণ গোপন রাখার জন্যে আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

বাবা বললেন, নিশি শোন। নিজের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? তুমি নিজে কি মনে কর তোমার চরিত্রে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে?

'না।'

'তুমি নিশ্চিত যে তোমার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।'

'আমি নিশ্চিত।'

'তোমার আশপাশে যারা থাকে তারা অস্বাভাবিক আচরণ করে কেন?'

'আমি জানি না। তুমিও তো আমার আশপাশেই থাক—তুমি তো অস্বাভাবিক আচরণ কর না।'

'তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ কেন?'

'তর্ক করছি না। তুমি প্রশ্ন করছ আমি তার জবাব দিচ্ছি।'

'আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে তোমাকে দেখাতে চাই।'

'বেশ তো দেখাও।'

'আগামী সপ্তাহে আমি মেরিল্যান্ডে যাচ্ছি। আমাদের সুপারসনিকের ওপর শর্ট ট্রেনিং হবে। তুমিও চল। সাইকিয়াট্রিস্ট তোমাকে দেখবে।'

'আচ্ছা।'

'মা ঠিক করে বল, তোমার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই?'

'না।'

'তুমি তোমার ছোট মাকে মাঝে মাঝে দেখতে পাও এটা কি সত্যি? তোমার আন্টি আমাকে বলেছিল।'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'তুমি শরিফা মেয়েটিকেও দেখতে পাও।'

'আগে পেতাম এখন পাই না।'

'তোমার কাছে কি মনে হয় না—এই ব্যাপারগুলি অস্বাভাবিক?'

'না। কারণ শরিফাকে নীতু আন্টিও দেখেছেন।'

'হ্যাঁ সে আমাকে বলেছে। শরিফাকে এখন আর তুমি দেখতে পাও না?'

'না সে তার স্বামীর কাছে চলে গেছে। তবে আমি চাইলে সে আবার চলে আসবে।'

'বুঝিয়ে বল।'

'আমি স্বপ্নে যা দেখি তাই হয়। স্বপ্নে কী দেখতে চাই এটাও আমি ঠিক করতে পারি। কাজেই আমি যদি ভাবি স্বপ্নে দেখছি শরিফা চলে এসেছে তা হলে সে চলে আসবে। এবং তখন তুমি চাইলে তুমিও তাকে দেখতে পাবে।'

'এ ব্যাপারটাও তোমার কাছে নরমাল মনে হয়? অস্বাভাবিক মনে হয় না?'

'না, আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না। আমার মনে হয় সব মানুষেরই ইচ্ছাপূরণ ধরনের স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা আছে। কী করে সেই স্বপ্নটা দেখতে হয় তা তারা জানে না বলে স্বপ্ন দেখতে পারে না।'

'নিশি!'

'জি।'

'তুমি এক কাজ কর। শরিফা মেয়েটিকে নিয়ে এস আমি তাকে দেখতে চাই।'

'আচ্ছা।'

'কদিন লাগবে তাকে আনতে?'

'বেশি দিন লাগবে না। স্বপ্নটা দেখতে পেলেই সে চলে আসবে।'

'যত তাড়াতাড়ি পার তাকে নিয়ে এস কারণ মেরিল্যান্ড যাবার আগে আমি তাকে দেখতে চাই।'

'আচ্ছা।'

'তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

'খুব ভালো হচ্ছে।'

'গান শেখা কেমন হচ্ছে?'

'গান শেখাও ভালো হচ্ছে।'

'তোমার গানের স্যারের সঙ্গে কদিন আগে কথা হল। তিনি তোমার গানের গলার খুব প্রশংসা করলেন। তোমার নাকি কিন্নর কণ্ঠ।'

'সব গানের স্যাররাই তাদের ছাত্রছাত্রীদের গানের গলা সম্পর্কে এ জাতীয় কথা বলে। আমার গানের গলা ভালো না।'

'আমি তোমার গান একদিন শুনতে চাই।'

'এখন গাইব?'

'এখন গাইতে হবে না।'

'তোমার জরুরি কথা বলা কি শেষ হয়েছে বাবা?'

'হুঁ।'

'আমি চলে যাব?'

'হ্যাঁ যাও। শরিফা মেয়েটি এলে আমাকে খবর দিও।'

'আচ্ছা।'

আমি আমার ঘরে এসে ঘড়ি দেখলাম, এগারটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। আমি রাত সাড়ে এগারটার সময় আবার বাবার ঘরে গেলাম। তিনি সম্ভবত ক্রমাগতই মদ্যপান করে যাচ্ছেন। তাঁর চোখ খানিকটা লাল। মুখে বিবর্ণ ভাব। এমনিতে তিনি সিগারেট খান না—আজ খুব সিগারেট খাচ্ছেন। ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। বাবা আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার মা?

'আমার ঘরে এস।'

'কেন?'

'শরিফাকে দেখতে চেয়েছিলে শরিফা এসেছে।'

'তুমি না ডাকতেই চলে এসেছে?'

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বললেন, শরিফা সত্যি এসেছে?

'হ্যাঁ।'

'কী করছে?'

'আমার খাটের নিচে বসে আছে।'

বাবা হাসলেন। অবিশ্বাসী মানুষের হাসি। বাবা বললেন, তুমি কি তার সঙ্গে কথাও বল?

'হ্যাঁ বলি।'

'সে কি আমার সঙ্গে কথা বলবে?'

'জানি না। বলতেও পারে।'

আমার ধারণা সে আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমি তাকে দেখতেও পাব না। কারণ শরিফা নামের মেয়েটি খাটের নিচে বসে নেই। তোমার মাথার ভেতর একটা ঘর আছে, যে ঘর অবিকল তোমার শোবার ঘরের মতো। সেই ঘরের খাটের নিচে সে বসে আছে। কাজেই তাকে দেখতে পাবার কোনো কারণ নেই। বুঝতে পারছ?

'পারছি।'

'কাজেই মেয়েটিকে দেখতে যাওয়া অর্থহীন।'

'তুমি যাচ্ছ না?'

'না।'

আমি ফিরে আসছি বাবা পেছন থেকে ডাকলেন—নিশি দাঁড়াও আসছি। আমি দাঁড়ালাম। বাবার মদ্যপান আজ মনে হয় একটু বেশিই হয়েছে। তিনি সহজভাবে হাঁটতেও পারছেন না। সামান্য টলছেন। আমি বললাম, বাবা তোমার হাত ধরব? তিনি বললেন, না। আই অ্যাম জাস্ট ফাইন।

বাবা আমার ঘরে ঢুকলেন। ঘরে টেবিলল্যাম্প জ্বলছে—মোটামুটি আলো আছে। বাবা নিচু হয়ে খাটের নিচে তাকালেন। আমি তাকিয়ে রইলাম বাবার দিকে। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম—বাবার শান্ত ভঙ্গি বদলে যাচ্ছে—তাঁর চোখে ভয়ের ছায়া। সেই ছায়া গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। তিনি হতভম্ব চোখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন খাটের নিচে। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। আমি বললাম, বাবা কিছু দেখতে পাচ্ছ?

তিনি হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করতে লাগলেন। যেন তাঁর বুকে বাতাস আটকে গেছে তিনি তা বের করতে পারছেন না। খুব যারা বুড়ো মানুষ তারা এ ধরনের শব্দ করে। তবে নিজেরা সেই শব্দ শুনতে পায় না। অন্যরা শুনতে পায়।

আমি বাবাকে হাত ধরে টেনে তুললাম। তাঁকে ধরে ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলাম। তিনি প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললেন—প্রচুর মদ্যপান করেছি। আমার আবার লিমিট পাঁচ পেগ সেখানে আট পেগ খেয়েছি তো—তাই হেলুসিনেশন হচ্ছে। খাটের নিচে কিছুই ছিল না। কিছুই না। অন্ধকার তো, আলো-ছায়াতে মানুষের মতো দেখাচ্ছে। টর্চ লাইট নিয়ে গেলে কিছুই দেখব না।

'টর্চ লাইট নিয়ে দেখতে চাও বাবা?'

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন—না।

পরের সপ্তাহে আমি বাবার সঙ্গে মেরিল্যান্ড চলে গেলাম। মিসেস জেন ওয়ারেন নামের এক মহিলা সাইকিয়াট্রিস্ট আমার চিকিৎসা শুরু করলেন। মিসেস জেন ওয়ারেন এম ডি-র বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমেরিকান বৃদ্ধা মহিলারা খুব সাজগোজ করেন। ঠোঁটে কড়া করে লিপস্টিক দেন, চুল পার্ম করেন, কানে রঙচঙা প্লাস্টিকের দুল পরেন। হাঁটুর উপরে খুব রঙিন—ঝলমলে স্কার্ট পরেন। তাঁদের দেখেই মনে হয় তাঁরা খুব সুখে আছেন।

মিসেস জেন ওয়ারেনও তার ব্যতিক্রম নন। এত নাম করা মানুষ কিন্তু কেমন খুকি সেজে ছটফট করছেন। আহ্লাদী ভঙ্গিতে কথা বলছেন।

সাইকিয়াট্রিস্টদের অনেক ব্যাপার আমি লক্ষ করেছি। তাঁরা প্রথম যে কাজটি করেন তা হচ্ছে রোগীর সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে কথা বলেন। যেন রোগী তাঁর অনেক দিনের চেনা প্রায় বন্ধু স্থানীয়। মিসেস জেন ওয়ারেন এই কাজটা ভালোই করেন। আমাকে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে যে কথাটা বললেন তা হল—"ও ডিয়ার, তোমাকে আজ এত সুন্দর লাগছে কেন?" ভাবটা এরকম যেন তিনি আমাকে আগেও দেখেছেন তখন এত সুন্দর লাগে নি। বিদেশীরা গায়ে হাত দিয়ে কথা বলে না—ইনি প্রথমবারেই গায়ে হাত রাখলেন।

'তোমার নাম হল নিশি। আমার উচ্চারণ ঠিক হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'নিশি অর্থ হল Night'

'হ্যাঁ।'

'মুন লিট নাইট?'

'জানি না।'

'অফকোর্স মুন লিট নাইট। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তোমার জীবন আলোময়।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'তোমার বয় ফ্রেন্ডের নাম কী?'

'আমার কোনো বয় ফ্রেন্ড নেই।'

'এমন রূপবতী কন্যার বয় ফ্রেন্ড থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। তুমি বলতে চাচ্ছ না? এইসব চলবে না—তোমার বয় ফ্রেন্ডের নাম বল, তার ছবি দেখাও।'

ভদ্রমহিলা আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন, আমিও কিন্তু তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করছি। আমি যে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করছি সেটা মনে হয় তিনি ধরতে পারছেন না। বেশিরভাগ মানুষ নিজেদেরকে অন্যের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। মিসেস জেনও তাই করছেন। আমাকে কিশোরী একটা মেয়ে ভেবে কথা বলছেন, মন জয় করার চেষ্টা করছেন। আমি এমন ভাব করছি যেন ভদ্রমহিলার কথাবার্তায় অভিভূত। আমি তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। ঠিক যে জবাবগুলি তিনি শুনতে চাচ্ছেন—সেই জবাবগুলিই দিচ্ছি। কোনো মানুষ যখন প্রশ্ন করে তখন সে যে জবাব শুনতে চায় সেই জবাবটা কিন্তু প্রশ্নের মধ্যেই থাকে।

জেন ওয়ারেন বললেন, আচ্ছা নিশি বাবাকে কি তুমি খুব ভালবাস?

প্রশ্ন করার মধ্যেই কিন্তু যে জবাবটা তিনি শুনতে চাচ্ছেন সেটা আছে। তিনি শুনতে চাচ্ছেন যে বাবাকে আমি মোটেই ভালবাসি না। এই জবাব শুনলে হয়তো তাঁর রোগ ডায়াগনোসিসে সুবিধা হয়। কাজেই তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম এবং খুব অনিচ্ছার ভঙ্গিতে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

ভদ্রমহিলা দারুণ খুশি হয়ে গেলেন।

শোন নিশি—ইয়াং লেডি। যদিও তুমি এফারমেটিভ ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছ তারপরেও

মনে হয় তুমি সত্যি কথা বলছ না। আমরা বন্ধু—একজন বন্ধু অন্য বন্ধুকে অবশ্যই সত্যি কথা বলবে তাই না! এখন বল—তুমি কি তোমার বাবাকে খুব ভালবাস?

আমি হ্যাঁ–না কিছুই বললাম না।

ভদ্রমহিলা আমার আরো কাছে ঘেঁষে এসে বললেন, তুমি কি বাবাকে পছন্দ কর না?

আমি আবারো চুপ করে রইলাম। ভদ্রমহিলা এবার প্রায় ফিসফিস করে বললেন—তুমি কি তোমার বাবাকে ঘৃণা কর? আচ্ছা ঠিক আছে মুখে বলতে না চাইলে এখানে দুটা কাগজ আছে একটাতে লেখা Yes এবং একটাতে No, যে কোনো একটা কাগজ তুলে নাও। প্রশ্নটা মন দিয়ে শোন—

তুমি কি তোমার বাবাকে ঘৃণা কর?

আমি Yes লেখা কাগজটা তুললাম। এবং এমন ভাব করলাম যে লজ্জায় দুঃখে আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। আমার চোখে পানি চলে এল। আমি এমন ভাব করছি যেন চোখের জল সামলাতে আমার কষ্ট হচ্ছে। একসময় হাউমাউ করে কেঁদে ফেললাম। বিদেশীরা চোখের পানি কম দেখে বলে চোখের পানিকে তারা খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখে। বাঙালি মেয়েরা যে অতি সহজে চোখের পানি নিয়ে আসতে পারে এই তথ্য তারা জানে না। তা ছাড়া আমি যে কত বড় অভিনেত্রী তাও তিনি জানেন না। তিনি ছুটে গিয়ে টিস্যু পেপার নিয়ে এলেন। নিজেই চোখ মুছিয়ে দিলেন। করুণা বিগলিত গলায় বললেন, শোন মেয়ে তোমার লজ্জিত বা দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমেরিকান স্ট্যাটিসটিকস বলছে শতকরা ২৮.৬০ ভাগ আমেরিকান পুত্র–কন্যারা তাদের বাবাকে ঘৃণা করে। তুমি আমাকে যা বলেছ তোমার বাবা তা কোনো দিন জানবেন না। এই বিষয়ে তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এখন একটু শান্ত হও। কফি খাবে?

আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম, খাব।

আমরা কফি খেলাম। ভদ্রমহিলা আনন্দিত গলায় বললেন—আমার ধারণা তোমার সমস্যা আমি ধরতে পারছি। সেই সমস্যার সমাধান করা এখন আর কঠিন হবে না। অবিশ্যি তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

'হুঁ।'

'ভেরি গুড। আমরা দুজনে মিলে তোমার সমস্যা সমাধান করব। কেমন?'

'আচ্ছা।'

'তোমার বাবাকে তুমি কেন ঘৃণা কর?'

'বাবা মদ খায়।'

'শুধু মদ্যপান করে বলেই ঘৃণা কর?'

'মাতাল হয়ে তিনি একদিন গাড়ি চালাচ্ছিলেন তখন অ্যাকসিডেন্ট হয়। সেই অ্যাকসিডেন্টে আমার মা মারা যান।'

'তোমার বাবা আমাকে তোমার মার মৃত্যুর কথা বলেছেন। কিন্তু কীভাবে মারা গেছেন তা বলেন নি। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।'

জেন ওয়ারেন সিগারেট ধরালেন। তিনি বেশ কায়দা করে সিগারেট টানছেন।

'নিশি, সিগারেটের ধোঁয়ায় তোমার অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'জি না।'

'আমি সিগরেট ছাড়ার চেষ্টা করছি পারছি না। যে কোনো ভালো অভ্যাস সামান্য চেষ্টাতেই ছেড়ে দেয়া যায়—খারাপ অভ্যাস হাজার চেষ্টাতেও ছাড়া যায় না। ঠিক না?'

'ঠিক।'

'এখন বল তুমি নাকি তোমার মাকে দেখতে পাও এটা কি সত্যি?'

'না, সত্যি না।'

'তা হলে বল এই মিথ্যা কথাটা কেন বলতে?'

'বাবাকে ভয় দেখাবার জন্যে বলতাম।'

'বাবাকে ভয় দেখানোর জন্যে তুমি তা হলে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথাই বলেছ?'

'জি।'

'যা বলেছ তোমার বাবা তাই বিশ্বাস করেছেন?'

'জি।'

'আচ্ছা আজকের মতো তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ। কাল আবারো আমরা বসব। কেমন!'

'জি আচ্ছা।'

'মেরিল্যান্ডে দেখার মতো সুন্দর সুন্দর জিনিস অনেক আছে। তুমি কি দেখেছ?'

'জি না।'

'কাল আমি তোমাকে লিস্ট করে দেব। দেশে যাবার আগে তুমি দেখে যাবে।'

'আচ্ছা।'

'তুমি কি জান যে তুমি খুব ভালো মেয়ে?'

'জানি।'

ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে আরো তিন দিন সিটিং দিলেন। আমি তাঁকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করলাম। তাঁকে যা বিশ্বাস করাতে চাইলাম তিনি তাই বিশ্বাস করলেন এবং খুব আনন্দিত হলেন এই ভেবে যে তিনি বিদেশিনী এক কিশোরী মেয়ের জীবনের সমস্ত জটিলতা দূর করে ফেলেছেন। তাঁর অন্ধকার ঘরে এক হাজার ওয়াটের বাতি জ্বেলে দিয়েছেন।

আমার সম্পর্কে তিনি যা ধারণা করলেন তা হচ্ছে—

১) আমি খুব ভালো একটা মেয়ে, সরল, বুদ্ধি কম, জগতের জটিলতা কিছু জানি না।

(খুব ভুল ধারণা।)

২) আমি নিঃসঙ্গ একটি মেয়ে। আমার সবচে বড় শত্রু আমার নিঃসঙ্গতা। (ভুল ধারণা। আমি নিঃসঙ্গ নই। আমি কখনো একা থাকি না। নিজের বন্ধুবান্ধব নিজে কল্পনা করে নেই। কল্পনাশক্তিসম্পন্ন মানুষ কখনো নিঃসঙ্গ হতে পারে না।)

৩) আমি খুব ভীতু ধরনের মেয়ে।

(আবারো ভুল। আমার মধ্যে আর যাই থাকুক ভয় নেই। যখন আমার সাত আট বছর বয়স তখনো রাতে ঘুম না এলে আমি একা একা ছাদে চলে যেতাম।)

৪) বাবাকে আমি অসম্ভব ঘৃণা করি।

(খুব ভুল কথা। বাবা চমৎকার মানুষ। আমার ক্ষুদ্র জীবনে যে কজন ভালো মানুষ দেখেছি তিনি তাদের একজন।)

আমি ভদ্রমহিলার মাথায় এইসব ভুল ঢুকিয়ে দিয়েছি। তিনি খুশি মনে ভুলগুলি গ্রহণ করেছেন।

মানুষ কী অদ্ভুত দেখেছেন? মানুষ কত সহজেই না 'ভুল'—সত্যি ভেবে গ্রহণ করে।

৮

আমেরিকান মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ বাবাকে কী বলেছিলেন আমি জানি না। বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করি নি। তবে অনুমান করতে পারি যে তিনি বাবাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। বাবা দেশে ফিরেই সেই উপদেশমতো চলতে শুরু করলেন। প্রথমেই আমার শোবার ঘর বদলে দিলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন শোবার ঘর বদলানোর ব্যাপারে আমি খুব আপত্তি করব। নানান ভণিতা করে তিনি বললেন—মা তোমার এই ঘরটা খুব ছোট। তুমি বড় হয়েছ তোমার আরো বড় ঘর দরকার। তা ছাড়া আমি ভাবছি তোমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেব...কম্পিউটার টেবিল সেট করার জন্যেও জায়গা লাগবে...........

আমি তাঁকে কথা শেষ করতে দিলাম না, তার আগেই বললাম—বাবা আমাকে তুমি একটা বড় ঘর দাও। এই ঘরটা আসলেই ছোট।

তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, নতুন ঘরে যখন যাচ্ছ তখন এক কাজ করা যাক। নতুন ঘরের জন্যে আলাদা করে ফার্নিচার কেনা যাক।

আমি বললাম, আচ্ছা।

বাবা বললেন, আমার পাশের ঘরটা তুমি নিয়ে নাও। বাবা-মেয়ে পাশাপাশি থাকব, কী বল? ভালো হবে না?

'খুব ভালো হবে বাবা।'

আমার ঘর বদল হল। নতুন ফার্নিচার এল। যা ভেবেছিলাম তাই হল, পুরোনো খাট বদলে কেনা হল আধুনিক বক্স খাট। যার নিচে বসার উপায় নেই। সাইকিয়াট্রিস্ট নিশ্চয়ই বাবাকে এই বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি—আমার আগের শোবার ঘরের কোনো ফার্নিচার নেই। সব ফার্নিচার কোথায় যেন পাচার করা হয়ে গেছে। বাবার পাশের ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। নতুন ফার্নিচার। একটা টেবিলে ঝকঝকে কম্পিউটার।

কম্পিউটার কিনে দেবার কথাও হয়তো সাইকিয়াট্রিস্ট বাবাকে বলে দিয়েছিলেন। কম্পিউটারে নানা ধরনের খেলা নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকব। খাটের নিচে কে বসে আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাব না।

নতুন ঘরে থাকতে এলাম। বাবা আমার ঘরের দরজায় লাল ফিতা দিয়ে রেখেছেন। ফিতা কেটে ঢুকতে হবে। গৃহ-প্রবেশের মতো ঘর-প্রবেশ অনুষ্ঠান।

বাবা বললেন, এসএসসিতে তুমি খুব ভালো রেজাল্ট করেছ বলে এই কম্পিউটার।

আমি বললাম, থ্যাংক য়্যু।

'নতুন যুগের কম্পিউটার—খুব পাওয়ারফুল। টু গিগা বাইট মেমোরি। এই কম্পিউটার দিয়ে তুমি অনেক কিছু করতে পারবে।'

'অনেক কিছু মানে কী?'

'কম্পিউটার গ্রাফিকস করা যাবে। এনিমেশন করা যাবে। ইচ্ছে করলে ডিজনীর মতো— "লিটল মারমেইড" জাতীয় কার্টুন ছবিও বানিয়ে ফেলতে পার। তোমার যা বুদ্ধি, ভালো কম্পিউটার পেলে তুমি অনেক কিছু করতে পারবে।'

'আমার যে খুব বুদ্ধি তা তুমি বুঝলে কী করে?'

'তোমার রেজাল্ট দেখে বুঝেছি। আমি তো কল্পনাও করি নি তুমি এত ভালো রেজাল্ট করবে।'

মিসির আলি সাহেব, প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা নিয়েও আমি খুব ভালো রেজাল্ট করি। কেমন ভালো জানেন? সব পত্রিকায় আমার ছবি ছাপা হয়। আমার প্রিয় লেখক কে, প্রিয় গায়ক কে, প্রিয় খেলোয়াড় কে এইসবও ছাপা হয়।

ওই প্রসঙ্গ থাক। কম্পিউটার প্রসঙ্গে চলে আসি। বাবা শুধু যে আমাকে কম্পিউটার কিনে দিলেন তাই না—আমাকে সবকিছু শেখানোর জন্যে একজন ইন্সট্রাকটার রেখে দিলেন। ইন্সট্রাকটারের নাম—হাসিবুর রহমান। লোকটা লম্বা, রোগা। ইটে চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মতো চেহারা। বয়স এই ধরুন পঁচিশ-ছাব্বিশ। দেখতে ভালো। মেয়েদের মতো টানা টানা চোখ। একটা ভুল কথা বলে ফেললাম। সব মেয়েদের তো আর টানা টানা চোখ থাকে না।

কম্পিউটারের সব বিষয়ে হাসিবুর রহমানের জ্ঞান অসাধারণ। কিন্তু লোকটি হতদরিদ্র। তার থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই। রাতে সে ঘুমায় একটা কম্পিউটারের দোকানে। তাকে অতি সামান্য কিছু টাকা সেই দোকান থেকে দেয়া হয়—এতে তার দুবেলা খাওয়াও বোধহয় হয় না, তবে এতেই সে খুশি। এত অল্পতে কাউকে খুশি হতেও আমি দেখি নি।

বাবা আমাদের বাড়িতে তাকে থাকতে দিলেন। আমাদের গ্যারেজে তিনটা কামরা আছে। একটা দারোয়ানের, একটা ড্রাইভারের। একটা কামরা খালি। সেই খালি কামরাটায় তাকে থাকতে দেয়া হল। সে মহা খুশি। সারা দিন ঘষামাজা করে ঘর সাজাল। আমার কাছে এসে ক্যালেন্ডার চাইল—দেয়ালে সাজাবে।

তার পড়াশোনা সামান্য। এসএসসি সেকেন্ড ডিভিশন। টাকাপয়সার অভাবে এসএসসি-র বেশি সে পড়তে পারে নি। কম্পিউটারের দোকানে কাজ নিয়েছে। নিজের আগ্রহে কম্পিউটার শিখেছে।

ভদ্রলোককে আমার কয়েকটি কারণে পছন্দ হল। প্রথম কারণ তিনি আমাকে অত্যন্ত সম্মান করেন। আমাকে দেখামাত্র লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান। দ্বিতীয় কারণ আমার প্রতিটি কথা তিনি বিশ্বাস করেন।

যেহেতু তিনি আমাকে কম্পিউটার শেখাতে এসেছেন প্রথম দিনই আমি তাঁকে স্যার ডাকলাম। তিনি খুবই লজ্জা পেয়ে বললেন, ম্যাডাম আপনি আমাকে স্যার ডাকবেন না। আমার খুবই লজ্জা লাগছে।

'আপনাকে তা হলে কী ডাকব?'

'নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম হাসিব।'

'আপনাকে হাসিব ডাকব?'

'জি।'

'আচ্ছা বেশ তাই ডাকব।'

আমি সহজ ভাবেই তাকে হাসিব ডাকা শুরু করলাম। ভদ্রলোক আমার কম্পিউটারের টিচার হলেও তার সঙ্গে আমার কথাবার্তার ধরন ছিল মুনিব–কন্যা এবং কর্মচারীর মতো। আমার তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। ওনারও হচ্ছিল না। স্যার ডাকলেই হয়তো অনেক বেশি অসুবিধা হত।

কম্পিউটারের নানান বিষয় আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শিখতে লাগলাম। উনিও খুব আগ্রহ নিয়ে শেখাতে লাগলেন। বুদ্ধিমতী আগ্রহী ছাত্রীকে শেখানোর মধ্যেও আনন্দ আছে। সেই আনন্দ তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠত। রাত জেগে জেগে তাঁর সঙ্গে আমি 3D STUDIO এবং MICRO MEDIA DIRECTOR এই দুটি প্রোগ্রাম শিখছি। একটা সফটওয়্যার তৈরি করছি। যে সফটওয়্যারে কম্পিউটারের পর্দায় শরিফা এসে উপস্থিত হবে। তাকে প্রশ্ন করলে সে প্রশ্নের জবাব দেবে। সহজ প্রশ্ন কিন্তু অদ্ভুত জবাব। যেমন,

প্রশ্ন : আপনার নাম?

উত্তর : আমার কোনো নাম নেই, আমি হচ্ছি ছায়াময়ী। ছায়াদের কি নাম থাকে?

প্রশ্ন : আপনার পরিচয় কী?

উত্তর : আমার কোনো পরিচয়ও নেই। পরিচয় মানেই তো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা। আমাকে ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় ধরা যাবে না।

পর্দায় প্রশ্নের উত্তরগুলি লেখা হবে না। পর্দায় ভাসবে শরিফার বিচিত্র সব ছবি এবং উত্তরগুলি ধাতবকণ্ঠে শোনা যাবে।

হাসিব একদিন জিজ্ঞেস করলেন (খুব ভয়ে ভয়ে। আমাকে যে কোনো প্রশ্নই খুব ভয়ে ভয়ে করেন। ভাবটা এরকম যেন প্রশ্ন শুনলেই আমি রেগে যাব)—

'শরিফা কে?'

আমি বললাম 'শরিফা একটি মৃতা মেয়ে।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন?'

'জি করি। করব না কেন?'

'ভূত দেখেছেন কখনো?'

'জি না।'

'আপনি যদি শরিফাকে দেখতে চান আমি তাকে দেখাতে পারি। ওর সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় আছে। আমি বললেই সে আসবে।'

'জি না দেখতে চাই না। আমি খুব ভীতু।'

'আমি ডাকলেই শরিফা চলে আসবে আপনি এটা বিশ্বাস করলেন?'

'বিশ্বাস করব না কেন? আপনি তো আর শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলবেন না। আপনি সেই ধরনের মেয়ে না।'

'আমি কোন ধরনের মেয়ে?'

'খুব ভালো মেয়ে।'

'আপনি কম্পিউটারের মতো আধুনিক জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, আবার ভূতও বিশ্বাস করেন?'

'জ্বি ভূত বিশ্বাস করি, জিনও বিশ্বাস করি। কুরআন শরিফে জিনের কথা আছে। একটা সুরা আছে—সুরার নাম হল—সুরায়ে জিন।'

'তাই বুঝি?'

'জ্বি।'

'আপনি আমাকে একটা ভূতের গল্প বলুন তো।'

'ম্যাডাম আমি ভূতের গল্প জানি না।'

'কিছু না কিছু নিশ্চয়ই জানেন মনে করে দেখুন। ছোটবেলায় ভয় পেয়েছিলেন এমন কিছু।'

'খুব ছোটবেলায় একবার শ্মশান-কোকিলের ডাক শুনেছিলাম।'

'কিসের ডাক শুনেছিলেন?'

'শ্মশান-কোকিল। ভয়ঙ্কর ডাক। কেউ যদি শ্মশান-কোকিলের ডাক শোনে তার নিকটাত্মীয় মারা যায়।'

'আপনার কি কেউ মারা গিয়েছিল?'

'আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন।'

'মৃত্যুর পর তাঁকে কখনো দেখেছেন?'

'প্রায়ই স্বপ্নে দেখি।'

'স্বপ্নের কথা বলছি না। জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে কখনো দেখেছেন?'

'জ্বি না।'

'শ্মশান-কোকিল পাখিটা দেখতে কেমন?'

'দেখতে কেমন জানি না ম্যাডাম। শ্মশানের আশপাশে থাকে। কেউ দেখে না।'

'আপনাদের গ্রামে শ্মশান আছে?'

'জ্বি আছে। মহাশ্মশান। খুব বড়।'

'আমার শ্মশান দেখতে ইচ্ছে করছে। আপনি কি আমাকে আপনাদের গ্রামে নিয়ে যাবেন।'

উনি হতভম্ব গলায় বললেন, 'থাকবেন কোথায়?'

'কেন আপনাদের গ্রামের বাড়িতে।'

'অসম্ভব কথা বলছেন ম্যাডাম। আমরা খুবই গরিব। খড়ের চালা ঘর। মাটির দেয়াল।'

হাসিব খুবই নার্ভাস হয়ে গেলেন। তার ভাবটা এরকম যেন এখনই তাকে নিয়ে আমি তাদের গ্রামের বাড়িতে রওনা হচ্ছি। মানুষের সারল্য যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে তা তাকে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। তবে হাসিব বোকা ছিলেন না। আমাদের ধারণা সরল মানুষ মানেই বোকা মানুষ এই ধারণা সত্যি নয়।

মিসির আলি সাহেব আপনার কি ধারণা আমি এই মানুষটার প্রেমে পড়েছি?

আমার মনে হয় না। মানুষটাকে আমি করুণা করতাম। প্রেম এবং করুণা এক

ব্যাপার নয়। প্রেম সর্বগ্রাসী ব্যাপার। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে অগ্নি। আগুন যেমন সব পুড়িয়ে দেয় প্রেমও সব ছারখার করে দেয়। হাসিব নামের মানুষটির প্রতি প্রবল করুণা ছাড়া আমি কিছু বোধ করি নি।

তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলতে ভালো লাগত—এই পর্যন্তই। আমি নিঃসঙ্গ একটা মেয়ে, কারো সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হওয়াটাকে আপনি নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক বলবেন না।

ছোটবেলা থেকেই আমার অনেক খেলনা ছিল। খেলনা নিয়ে খেলতে ভালো লাগত। হাসিবের সঙ্গে আমার ব্যাপারটাও সেরকম। সে ছিল আমার কাছে মজার একটা খেলনার মতো।

তাঁকে আমি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গল্প বলে ভয় দেখাতাম। শরিফার গল্প। আমার ছোট মা'র গল্প। মানুষটা ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে যেত। দেখে আমার এমন মজা লাগত!

আমি তখন একটা অন্যায় করলাম। খুব বড় ধরনের অন্যায়। একটা নির্দোষ খেলাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবার অন্যায়। আমি তাঁকে ভয় দেখালাম। কীভাবে ভয় দেখালাম জানেন? শরিফা সেজে ভয় দেখালাম।

তিনি সে রাতে আমাকে কম্পিউটার শেখানো শেষ করে তাঁর ঘরে ঘুমাতে যাবেন, আমি বললাম, আপনি কি ভাত খেয়েছেন?

তিনি বললেন, জি না। ভাত রাঁধব তারপর খাব।

আমি বললাম, এত রাতে ভাত রেঁধে খেতে হবে না। আমি বুয়াকে বলে দিচ্ছি—আপনাকে খাইয়ে দেবে। একেবারে খাওয়াদাওয়া করে তারপর ঘুমাতে যান।

তিনি সুবোধ বালকের মতো মাথা নাড়লেন।

হাসিব যখন ভাত খাচ্ছিলেন তখন আমি গ্যারেজে তাঁর ঘরে উপস্থিত হলাম। কেউ আমাকে দেখল না। দারোয়ান দুজনই ছিল গেটে। ড্রাইভার বাইরে। আমি কয়েক সেকেন্ড ভাবলাম তারপর হুট করে তাঁর ঘরে ঢুকে গেলাম। ঠিক করে রাখলাম অনেক রাত পর্যন্ত খাটের নিচে বসে থাকব। তিনি খাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকবেন। দরজা লাগাবেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়বেন। তখন হাসির শব্দ করে তাঁর ঘুম ভাঙাব। ঘুম ভাঙতেই তিনি শব্দ শুনে খাটের নিচে তাকাবেন—আধো আলো আধো অন্ধকারে এলোমেলো চুলে শরিফা বসে আছে...সম্পূর্ণ নগ্ন এক ভয়ঙ্কর তরুণী। তাঁর কাছে কী ভয়ঙ্করই না লাগবে! ভাবতেও আনন্দ!

৯

'কে বলছেন?'

'আমার নাম মিসির আলি।'

'স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। কে কথা বলছ—নিশি?'

'জি।'

'তুমি ভালো আছ?'

'জি।'

'আরো আগেই টেলিফোন করতাম—আমার নিজের টেলিফোন নেই। আমি সাধারণত একটা পরিচিত দোকান থেকে ফোন করি। সেই দোকান গত এক সপ্তাহ্ ধরে বন্ধ।'

'বন্ধ কেন?'

'জানি না কেন। খোঁজ নেই নি।'

'একটা দোকান এক সপ্তাহ হল বন্ধ। আর আপনি হলেন বিখ্যাত মিসির আলি। আপনি খোঁজ নেবেন না?'

'খোঁজ নেয়াটা তেমন জরুরি মনে করি নি।'

'আমার তো ধারণা ব্যাপারটা খুবই জরুরি। বড় ধরনের কোনো কারণ ছাড়া কেউ এক সপ্তাহ ধরে দোকান বন্ধ রাখে না। আজ কি আপনি সেই দোকান থেকে টেলিফোন করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা দোকান বন্ধ রেখেছিল কেন?'

'দোকানের মালিকের মেয়ের বিয়ে ছিল। তিনি দোকানের সব কর্মচারীদের নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

'ও আচ্ছা। মেয়ের বিয়েতে আপনাকে দাওয়াত দেয় নি?'

'না। আমার সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই।'

'কম পরিচয় থাকলেও তো আপনাকে দাওয়াত দেয়ার কথা। আপনি এত বিখ্যাত ব্যক্তি। বিখ্যাত মানুষরা খুব দাওয়াত পায়। সবাই চায় তাদের অনুষ্ঠানে বিখ্যাতরা আসুক।'

'তুমি যত বিখ্যাত আমাকে ভাবছ আমি তত বিখ্যাত নই।'

'আপনি কি আমার লেখাটা পড়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'পুরোটা পড়েছেন?'

'না পুরোটা পড়ি নি।'

'কতদূর পড়েছেন?'

'তুমি হাসিব সাহেবকে ভয় দেখানোর জন্যে খাটের নিচে বসে রইলে পর্যন্ত।'

'বাকিটা পড়েন নি কেন?'

'আমার যতটুকু পড়ার পড়ে নিয়েছি। বাকিটা পড়ার দরকার বোধ করছি না। আমার মনে হচ্ছে সবটা পড়ে ফেললে কনফিউজড হয়ে যাব। আমি কনফিউজড হতে চাচ্ছি না। তোমার লেখার প্রধান লক্ষ্য মানুষকে কনফিউজ করা, বিভ্রান্ত করা।'

'আপনি একটু ভুল করছেন। এই লেখাগুলি আমি আপনার জন্যে লিখেছি—মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে লিখি নি।'

'তা ঠিক। হ্যাঁ আমাকে বিভ্রান্ত করা তোমার প্রধান লক্ষ্য ছিল।'

'আমার ধারণা ছিল আপনি পুরো লেখাটা পড়বেন তারপর টেলিফোন করবেন।'

'তোমার সব ধারণা যে সত্যি হবে তা মনে করা কি ঠিক?'

'সাধারণত আমার সব ধারণাই সত্যি হয়।'

'শোন নিশি আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কথা তো বলছেন।'

'এভাবে না। মুখোমুখি বসে কথা বলতে চাই। তোমার পাণ্ডুলিপিও নিশ্চয়ই তুমি ফেরত চাও। চাও না?'

'চাই।'

'আমার কাছে তোমার কিছু জিনিসপত্রও আছে। হ্যান্ডব্যাগ, স্যুটকেস। বেশ কিছু টাকা।'

'ওগুলি আমি নেব না।'

'টাকা নেবে না?'

'টাকাটা আপনি রেখে দিন। আপনি রহস্য সমাধানের জন্যে অনেক কর্মকাণ্ড করেন আপনার টাকার দরকার হয়। যেমন ধরুন আমার ছোট মার মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল। কেইস কি দেয়া হয়েছিল? পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কী ছিল তা জানার জন্যে আপনি টাকা খরচ করেন নি?'

'করেছি। অতি সামান্যই করেছি।'

'আচ্ছা একটা কথা—আমাদের বাড়ির ঠিকানা কি আপনি আমার লেখা পড়ে জেনেছেন না আগেই জেনেছেন?'

'আগেই জেনেছি। থানা থেকে জেনেছি।'

'আপনি পুরোনো পত্রিকা ঘাঁটেন নি?'

'ঘেঁটেছি। আমি নিজে ঘাঁটি নি—একজনকে ঠিক করেছিলাম সে ঘেঁটেছে। তবে সেখান থেকে বাড়ির ঠিকানা পাই নি।'

'আপনি যে এইসব কর্মকাণ্ড করবেন তা কিন্তু আমি জানতাম।'

'তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে।'

'আপনি কি আন্টির সঙ্গে দেখা করেছেন—নীতু আন্টি। তিনি তো এখন মোটামুটি সুস্থ।'

'ওনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। উনি দেখা করেন নি। শোন নিশি আমি কি এখন আসব?'

'না আজ না।'

'আজ না কেন?'

'বাবা বাড়িতে আছেন এই জন্যে আজ না। যদিও বাবা আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। বাবার ধারণা আপনি সাধারণ মানুষ নন। আপনি মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। আপনার ওপর লেখা বইগুলি বাবাই আমাকে প্রথম পড়তে দেন।'

'তোমার বাবার সঙ্গে তা হলে তো দেখা করাটা খুবই জরুরি।'

'জরুরি কেন?'

'তোমার বাবা যাতে বুঝতে পারেন যে আমি মহাপুরুষ পর্যায়ের কেউ নই—আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ।'

'আপনি আমার সমস্যার সমাধান করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন, এত আত্মবিশ্বাস থাকা কি ঠিক?'

'না ঠিক না। তবে তোমার ক্ষেত্রে আমি ভুল করি নি।'

'একটা জিনিস শুধু জানতে চাচ্ছি—আমি যে খাটের নিচে শরিফাকে দেখতে পাই এবং এখনো দেখতে পাই তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

'করি।'

'আপনি কি শরিফাকে দেখতে চান?'

'না চাই না। অস্বাভাবিক কিছু আমার দেখতে ভালো লাগে না। আমি স্বাভাবিক মানুষ। আমি আমার চারপাশে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দেখতেই আগ্রহী।'

'পৃথিবীতে সব সময়ই কি স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ঘটে?'

'না ঘটে না।'

'আচ্ছা আপনি আসুন।'

'কখন আসব?'

'আজই আসুন। রাতে আমার সঙ্গে খাবেন। আমি নিজে আপনার জন্যে রান্না করব।'

'তুমি রাঁধতে জান?'

'সহজ রান্নাগুলি জানি। যেমন ডিম ভাজতে পারি। ডাল চচ্চড়ি পারি। ভাত রাঁধতে অবিশ্যি পারি না। হয় ভাত নরম জাউ জাউ হয়ে যায় আর নয়তো চালের মতো শক্ত থাকে। আমি আপনাকে গরম গরম ডিম ভেজে দেব। ডিম ভাজা কি আপনার পছন্দের খাবার?'

'হ্যাঁ খুব পছন্দের খাবার।'

'আপনি কি আইসক্রিম পছন্দ করেন?'

'হ্যাঁ করি।'

'আমিও খুব আইসক্রিম পছন্দ করি। বাবা পরশু হংকং থেকে দু লিটারের একটা আইসক্রিম এনেছেন। বিমানের ক্যাপ্টেন হবার অনেক সুবিধা। প্লেনের ফ্রিজে করে নিয়ে এসেছেন—এত ভালো আইসক্রিম আমি অনেক দিন খাই নি। কালো রঙের আইসক্রিম। আপনাকে খাওয়াব।'

'আচ্ছা। আমি কি টেলিফোন রাখব?'

'জি না আরেকটু ধরে রাখুন। আচ্ছা শুনুন এই দীর্ঘ সময় যে টেলিফোন করছেন—দোকানের মালিক বিরক্ত হন নি?'

'না হন নি। দোকানের মালিক আমাকে খুব পছন্দ করেন।'

'খুব যদি পছন্দ করে তা হলে আপনাকে দাওয়াত করেন নি কেন? আসলে আমার খুব রাগ লাগছে। আচ্ছা ভদ্রলোকের যে মেয়েটির বিয়ে হয়েছে তার নাম কী?'

'নাম তো জানি না।'

'নাম জিজ্ঞেস করে দেখুন। আমার ধারণা মেয়েটির নাম লায়লা।'

'তুমি জান কী করে?'

'আমি জানি না। আমি অনুমান করছি। আমার অনুমানশক্তি ভালো। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

'আচ্ছা জিজ্ঞেস করব। তোমার সঙ্গে কথা শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করব।'

'জিজ্ঞেস করতে আবার ভুলে যাবেন না যেন।'

'না ভুলব না। এখন টেলিফোন রাখি?'

'এক মিনিট ধরে রাখুন। কোনো কথা বলতে হবে না শুধু ধরে রাখুন। এক মিনিট পার হবার পর রিসিভার রেখে দেবেন।'

'আচ্ছা।'

'এক মিনিট শুধু শুধু টেলিফোন ধরে রাখতে বলছি কেন জানেন?'

'না।'

'আচ্ছা থাক জানতে হবে না।'

মিসির আলি ঘড়ি ধরে এক মিনিট টেলিফোন রিসিভার কানে রাখলেন, তারপর রিসিভার নামালেন। মিতা স্টোরের মালিক ইদ্রিস উদ্দিন হাসিমুখে বললেন—টেলিফোন শেষ হয়েছে?

'জি।'

'আপনার জন্যে চা বানাতে বলেছি। চা খেয়ে যান। চায়ে চিনি খান তো?'

'জি খাই।'

মিসির আলি বললেন, আপনার যে মেয়েটির বিয়ে হল তার নাম কী?

তার নাম আফরোজা বানু। আমরা লায়লা বলে ডাকি। মেয়ের বিয়েতে আপনাকে বলার খুব শখ ছিল। আপনার ঠিকানা জানি না কার্ড দিতে পারি নি। আপনাকে একদিন বাসায় নিয়ে যাব। মেয়ে এবং মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আপনাদের দোয়ায় ছেলে ভালো পেয়েছি। অতি ভদ্র। কাস্টমসে আছে।

যাব একদিন আপনাদের বাসায়। আপনার মেয়ে এবং মেয়ে-জামাই দেখে আসব।

১০

বাড়ির সামনে লোহার গেট। গেটের পেছনে খাকি পোশাক পরা দারোয়ান। কিন্তু সব কেমন অন্ধকার। গেটে বাতি জ্বলছে না, পোর্চেও জ্বলছে না। দারোয়ানকে দেখে মনে হচ্ছে সে অন্ধকার পাহারা দিচ্ছে। বাড়ির সামনে বাগানের মতো আছে। স্ট্রিট লাইটের আলোয় সেই বাগানকে খুব অগোছালো বাগান বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই প্রকাণ্ড বাড়ির জন্যে কোনো মালি নেই। মিসির আলি গাছপালা চেনেন না—বোগেনভিলিয়া চিনতে পারছেন। গাছ ভরতি ফুল তাও বোঝা যাচ্ছে। অন্ধকারের জন্যে মনে হচ্ছে গাছ ভরতি কালো ফুল ফুটেছে।

মিসির আলি গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দারোয়ান টুল ছেড়ে উঠে এল।

মিসির আলি বললেন, আমার নাম মিসির আলি। আমি নিশির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

দারোয়ান কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে গেট খুলল। একটা কথাও বলল না। মানুষদের অনেক অদ্ভুত স্বভাবের একটি হচ্ছে অন্ধকারে তারা কম কথা বলে। মানুষ ছাড়া অন্য সব জীবজন্তু অন্ধকারেই সাড়াশব্দ বেশি করে।

'নিশি কি আছে?'

দারোয়ান হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার গলার স্বর কেমন—মিসির আলির শোনার আগ্রহ ছিল, কিন্তু সে মনে হয় কথা বলবে না।

বেল টেপা হয়েছে—কেউ সদর দরজা খুলছে না। মিসির আলি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে পাঁচটা গোলাপ। ঢাকা শহরে এখন গোলাপ চাষ হচ্ছে। সুন্দর সুন্দর গোলাপ পাওয়া যায়। পঁচিশ টাকায় যে পাঁচটা গোলাপ কিনেছেন সেই গোলাপগুলির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। ফুলের দোকানদার গোলাপের কাঁটা ফেলে দিতে চেয়েছিল—তিনি ফেলতে দেন নি। কাঁটা হচ্ছে গোলাপের সৌন্দর্যের একটা অংশ। কাঁটা ছাড়ানো গোলাপকে তাঁর কাছে নগ্ন বলে মনে হয়।

দারোয়ান আরো একবার বেল টিপে তার টুলে গিয়ে বসল। সে মনে হয় আর বেল টিপবে না। বাকি রাতটা টুলে বসে পার করে দেবে।

ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। ঢাকা শহরে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায় না। এই পোকাটা কি মনের ভুলে এদিকে চলে এসেছে? ঝিঁঝি পোকার ডাক, জোনাকির আলো, শেয়ালের প্রহর যাপন ধ্বনি কিছুই আর শোনা হবে না। সব চলে যাবে। প্রাণের বিবর্তনের মতো হবে শব্দের বিবর্তন।

পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। চটি পায়ে কে যেন আসছে। নিশি? হতে পারে। বসার ঘরের বাতি জ্বলল। দরজার ফাঁক দিয়ে সেই আলো এসে পড়ল মিসির আলির গায়ে। কটা বাজছে দেখার জন্যে মিসির আলি তার পাঞ্জাবির হাতা গুটালেন। হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়ি নষ্ট বলে ফেলে রেখেছেন। নতুন ঘড়ি কেনা হচ্ছে না। তিনি নিদারুণ অর্থ সংকটে আছেন। পাঁচটা গোলাপ কেনার সময়ও বুকের ভেতর খচখচ করছিল।

'আসুন ভেতরে আসুন।'

দরজা ধরে নিশি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির পরনে কালো সিল্কের শাড়ি। সে খুব সেজেছে। কপালে টিপ। চোখে কাজল। গয়নাও পরেছে। গলায় সরু চেইনের লকেট। লকেটের মাথায় লাল একটা পাথর। সেই পাথর আধো অন্ধকারেও কেমন ঝলমল করছে। কী পাথর এটা? জিরকণ? একমাত্র জিরকণই এমন কড়া লাল হয়—এমন দ্যুতিময় হয়।

'নিশি তোমার জন্যে কিছু গোলাপ এনেছি।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'সাবধানে ধর। কাঁটা সরানো হয় নি।'

নিশি ফুল হাতে নিয়ে হাসল। মিসির আলি মনে মনে বললেন—বাহ্ কী সুন্দর মেয়ে। সৃষ্টিকর্তা রূপের কলস মেয়েটির গায়ে ঢেলে দিয়েছেন।

বাবা বাড়িতে নেই। মাত্র বিশ মিনিট আগে চলে গেছেন। জরুরি কল পেয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। পাইলটদের এই সমস্যা—মজা করে ছুটি কাটাচ্ছে হঠাৎ ইমার্জেন্সি কল। আপনি কি ড্রয়িং রুমে বসবেন না স্টাডিতে বসবেন?

'এক জায়গায় বসলেই হল।'

'আসুন স্টাডিতে বসি। আমাদের ড্রয়িং রুমটা এমন যে কেউ বসে স্বস্তি পায় না। আমি কিন্তু আপনার জন্যে রান্না করেছি। ভাত, ডাল, চচ্চড়ি আর ডিম ভাজা।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'ডিম ভাজা এখনো হয় নি। ডিম ফেটে রেখেছি—খেতে বসবেন আর আমি ভেজে দেব।'

'আচ্ছা।'

'আপনার যখন খিদে হবে বলবেন ভাত দিয়ে দেব।'

'তোমাদের বাড়িতে কি আর লোকজন নেই?'

'এই মুহূর্তে শুধু আমি আর দারোয়ান ভাই আছি। আমাদের একজন কাজের মেয়ে আছে—কিসমতের মা। তার জলবসন্ত হয়েছে তাকে ছুটি দিয়েছি। সে দেশের বাড়িতে চলে গেছে। সে কবে আসবে কে জানে। মনে হয় আসবে না। আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করে তারা ছুটিতে গেলে আর ফিরে আসে না।'

নিশি মিসির আলিকে স্টাডিতে নিয়ে বসাল। মাঝারি আকৃতির ঘর। হালকা সবুজ কার্পেটে মেঝে মোড়া। দুটা চেয়ার মুখোমুখি বসানো। একটা চেয়ারের পাশে অ্যাশট্রে।

'আপনি যেভাবে বসেন, সেইভাবে আরাম করে বসুন। পা তুলে বসুন। আজ আপনি আসুন আমি তা চাচ্ছিলাম না। কেন বলুন তো?'

'বলতে পারছি না।'

'আমি আপনাকে খুব ভালো করে খাওয়াতে চাচ্ছিলাম। কাজের মেয়েটি নেই ভালো কিছু খাওয়াতে পারব না। তবে আমি আপনাকে বাইরের খাবার খাওয়াতে চাচ্ছিলাম না। যা পেরেছি রেঁধেছি।'

'আমার জন্যে খাবার তেমন জরুরি না। অনেকে খাবার জন্যে বেঁচে থাকেন। আমি বাঁচার জন্যে খাই।'

'কফি খাবেন?'

'হ্যাঁ খাব।'

'বসুন কফি বানিয়ে আনি। কফি খেতে খেতে গল্প করি। আপনার কি গরম লাগছে?'

'না গরম লাগবে কেন?'

'বন্ধ ঘর তো। হালকা করে ফ্যান ছেড়ে দি।'

'দাও।'

'আপনি পা উঠিয়ে আরাম করে বসুন।'

মিসির আলি পা উঠিয়ে বসলেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। একটু শীত শীত লাগছে। তাই ভালো। শীতের রাতে শীত না লাগলে ভালো লাগে না।

'কফি নিন।'

মিসির আলি কফি নিলেন। গন্ধ থেকেই বলে দেয়া যায়—কফি খুব ভালো হয়েছে।

'ব্রাজিলের কফি বিনের কফি। আমার বাবার খুব প্রিয়।'

'কফি ভালো হয়েছে।'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে তা তো বললেন না।'

'তোমাকে অপূর্ব লাগছে।'

'আপনি আসবেন এই জন্যেই সন্ধ্যা থেকে সাজ করছি। আপনি যখন বেল টিপলেন

তখন আমার টিপ দেয়া শেষ হয় নি। এই জন্যেই দরজা খুলতে দেরি হল। কালো রঙ কি আপনার পছন্দ?'

'হ্যাঁ পছন্দ। খুব পছন্দ।'

'আমাকে দেখে কি আপনার শীত শীত লাগছে না?'

'কেন বল তো?'

'শীতকালে সিল্কের শাড়ি পরা কাউকে দেখলে শীত শীত লাগে। যে শাড়ি পরে আছে তার শীতটা যে দেখছে তার গায়ে চলে আসে।'

'তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি ভালো।'

'আপনার চেয়েও কি ভালো?'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন—আমি যে সবকিছু খুব খুঁটিয়ে দেখি তা কিন্তু না। এই কাজটা লেখকরা করেন। সবকিছু দেখেন ক্যামেরার চোখে। যা দেখছেন তারই ছবি তুলে ফেলছেন।

'আপনি কীভাবে দেখেন?'

'আমি আর দশটা মানুষ যেভাবে দেখে সেভাবেই দেখি। দেখতে দেখতে কোনো একটা জায়গায় খটকা লাগে। তখন খটকার অংশটা ভালো করে দেখি। বারবার দেখি।'

'বুঝিয়ে বলুন।'

'মনে কর এক টুকরা কাপড় আমাকে দেয়া হল। আমি কাপড়টা দেখব। তার ডিজাইন দেখব, রঙ দেখব, বুনন দেখব। অন্যরা যেভাবে দেখবে সেইভাবেই দেখব। দেখতে গিয়ে হঠাৎ যদি চোখে পড়ে একটা সুতা ছেঁড়া তখন সকল নজর পড়বে ওই ছেঁড়া সুতায়। তখন দেখব সুতাটা কোথায় ছিঁড়েছে, কেন ছিঁড়েছে।'

'আমি যে আপনার কাছে আমার পাণ্ডুলিপি দিলাম সেখানেও কি আপনি ছেঁড়া সুতা পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বলুন শুনি।'

নিশি একটু ঝুঁকে এল। তার মুখ ভরতি হাসি। মনে হচ্ছে সে খুব মজা পাচ্ছে। মিসির আলি বললেন—তার আগে তুমি বল তোমার কি কোনো বোরকা আছে? সউদি বোরকা যেখানে শুধু চোখ বের হয়ে থাকে।

নিশি শান্ত গলায় বলল, হ্যাঁ আছে।

মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন—তা হলে বলা যেতে পারে তোমার সমস্যার সমাধান আমি করেছি।

'বলুন আপনার সমাধান।'

'সমাধান বলা ঠিক হবে না। আমি সমস্যা ধরতে পেরেছি। সমাধান তোমার হাতে।'

'আপনি সমস্যাটা কীভাবে ধরলেন বলুন। গোড়া থেকে বলুন। আপনার সমস্যার মূলে পৌঁছার প্রক্রিয়াটা জানার আমার খুব আগ্রহ। ধরে নিন আমি আপনার একজন ছাত্রী। আপনি আমাকে বুঝাচ্ছেন। আমি আপনার কাছে শিখছি—'

মিসির আলি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন—তারপর সহজ স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। তার বলার ভঙ্গিটি আন্তরিক। মনে হচ্ছে তিনি তাঁর ছাত্রীকেই বুঝাচ্ছেন—

নিশি আমি যা করলাম তা হচ্ছে তোমার লেখা পড়ে গেলাম। খটকার অংশগুলি বের করলাম। যেসব জায়গায় আমার খটকা লাগল সেগুলি হচ্ছে—

ক) তুমি তোমার লেখায় কোথাও তোমার খালা, মামা, চাচা, ফুফুদের কথা আন নি। তাদের সম্পর্কে কিচ্ছু লেখা নেই।

খ) তোমাদের কোনো কাজের লোকের দোতলায় ওঠার অনুমতি পর্যন্ত নেই অথচ শরিফা নামের কাজের মেয়েকে তোমার ঘরে ঘুমাতে দেয়া হচ্ছে। কেন?

গ) শরিফার স্বামী পাগল হয়ে গেছে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে পাবনা শহরে—এই খবর তুমি জানলে কী করে? তোমার জানার কথা না।

আমি অগ্রসর হয়েছি এই তিনটি 'খটকা' নিয়ে। তুমি যে কাপড় বুনেছ তার সবই ভালো শুধু তিনটা সুতা ছিঁড়ে গেছে। কেন ছিঁড়ল। ছেঁড়া সুতাগুলিকে জোড়া লাগানো যায় কীভাবে? এই তিনটি সুতার ভেতর কি কোনো সম্পর্ক আছে? তখন আমার কাছে মনে হল তোমার যদি কোনো বোরকা থাকে—সউদি বোরকা, তা হলে খটকাগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি হয়। তিনটি সুতার ভেতর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

তোমার কি মনে আছে তোমার বোরকাওয়ালী এক বান্ধবীর গল্প করতে গিয়ে তুমি নানান ধরনের বোরকার কথা বলেছ। মনে আছে?

নিশি বলল, মনে আছে।

বোরকা সম্পর্কে তুমি জান। তুমি হয়তো ব্যবহারও কর। এই তথ্যটা বেশ জরুরি।

মিসির আলি আরেকটি সিগারেট ধরালেন। নিশির মুখ হাসি হাসি। মনে হচ্ছে সে খুব মজা পাচ্ছে। মিসির আলি বললেন—নিশি আমি এক কাজ করি। আগে তোমার সমস্যাটা বলি তারপর বরং ব্যাখ্যা করি সমস্যায় কীভাবে পৌঁছেছি।

আপনার যেভাবে ভালো লাগে সেইভাবেই বলুন। তবে বোরকা পরে আমি ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াই তা কিন্তু না। শখ করে কিনেছিলাম—একদিনই পরেছি। আচ্ছা আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বলুন।

মিসির আলি শান্ত গলায় বললেন, তুমি হচ্ছ তোমার বাবা-মার পালিতা কন্যা। যে কারণে তোমার নিজের জগৎ ছাড়া বাইরের কারো সঙ্গে তোমার যোগাযোগ নেই। খালা, মামা, চাচা, ফুফুরা তোমার ভুবনে অনুপস্থিত। তোমার লেখায় তারা কেউ নেই।

তোমার অসম্ভব বুদ্ধি। তুমি খুব সহজেই ব্যাপারটা আঁচ করে ফেল। তোমার নিজের জগৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

তোমার নীতু আন্টি সেই লণ্ডভণ্ড জগৎ ঠিক করতে চান। তিনি হঠাৎ মনে করেন যে, তোমার একজন সার্বক্ষণিক সঙ্গী থাকলে ভালো হয়। তিনি সঙ্গী নিয়ে এলেন। শরিফাকে নিয়ে এলেন। সেই শরিফাকে থাকতে দেয়া হল তোমার সঙ্গে। কেন? তোমার নীতু আন্টি ভেবেছিলেন তুমি কারণটা ধরতে পারবে না। তুমি চট করে ধরে ফেলেছ। ভালো কথা, শরিফা মেয়েটিও খুব রূপবতী।

তুমি ধরে ফেললে শরিফা তোমার বোন। হতদরিদ্র এই পরিবার থেকেই একসময় তোমাকে আনা হয়েছিল। শরিফা অবিশ্যি কিছু জানল না। মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। তুমি তাকে যেতে দিলে না। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। প্রবল অপরাধবোধ

তোমাকে গ্রাস করল। তুমি সেই অপরাধবোধের কারণেই বোরকা পরে একদিন দেখতে গেলে বোনের স্বামীকে। কিছু একটা তুমি তার সঙ্গে করেছ—সেটা কী আমি জানি না। মনে হয় ভয়ঙ্কর কিছু। বোনের কাছ থেকে শোনা শারীরিক গল্পগুলি তোমাকে প্রভাবিত করতে পারে। তুমি নাটকীয়তা পছন্দ কর। আমার ধারণা তুমি তার সঙ্গে বড় ধরনের কিছু নাটকীয়তাও করেছ। এই মুহূর্তে আমার যা মনে হচ্ছে তা হল তুমি তোমার বোনের শাড়ি পরে—বোন সেজেই তার কাছে গিয়েছ। এমন কাজ তুমি কর। শরিফা সেজে তুমি হাসিব নামের একজনকে ভয় দেখিয়েছ। যদিও আমার ধারণা ভয় দেখানো তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। তুমি গভীর রাতে তার কাছে উপস্থিত হতে চেয়েছিলে। তাই না?

'জানি না।'

'ভয় পাবার পর হাসিব কী করল?'

'তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।'

'তুমি কি তার জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত সেই ঘরে ছিলে?'

'না আমি চলে এসেছিলাম।'

'জ্ঞান ফেরার পর কী হল?'

'জানি না কী হল। আমি ঘর থেকে নামি নি। দোতলা থেকে শুনেছি খুব হইচই হচ্ছে। সকালবেলা হাসিব বাসা ছেড়ে চলে যান।'

'কাউকে কিছু বলে যায় নি?'

'বাবাকে বলে গেছেন। আমাকে কিছু বলে যান নি।'

'তার থেকে কি আমরা ধারণা করতে পারি যে সে বুঝতে পেরেছিল শরিফা নয় গভীর রাতে তুমি তার ঘরে উপস্থিত হয়েছিলে?'

'নিশি চুপ করে রইল।'

'তুমি কি পরে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছ?'

'করেছি। পাই নি। যে কম্পিউটারের দোকানে তিনি কাজ করতেন সেখানেও তিনি আর ফিরে যান নি।'

'তুমি যদি চাও আমি তাকে খুঁজে বের করার একটা চেষ্টা করতে পারি। হারানো মানুষ খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমার নাম আছে। তুমি কি চাও?'

'না আমি চাই না। খাটের নিচে যে আমি শরিফাকে দেখতাম সেই সম্পর্কে বলুন। আপনার ধারণাটা কী শুনি।'

'তুমি যে খাটের নিচে অনেক কিছু দেখতে পাও এইসব সত্যিও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। তোমার মাথার একটা অংশ এখন কাজ করছে না। সেই অংশ নানান ছবি তৈরি করে তোমাকে দেখাচ্ছে। তবে দেখালেও তুমি জান—এইসব মায়া। তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে। তুমি বুঝতে পারবে না তা না।'

'আমার ছোট মা এবং বাবা এরাও কিন্তু শরিফাকে দেখেছেন?'

'শোন নিশি আমি তো ওদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি মাথা ঘামাচ্ছি তোমার সমস্যা নিয়ে। তুমি কী দেখছ না দেখছ সেটা নিয়েই বিচার-বিবেচনা হবে। আমার এখন খিদে লেগেছে, আমাকে খেতে দাও।'

নিশি নড়ল না, বসেই রইল।

মিসির আলি বললেন, তোমার জীবনটা কাটছে একটা তন্দ্রার মধ্যে। তুমি যা ভাবছ যা করছ তা আর কিছু না—তন্দ্রাবিলাস। তন্দ্রাবিলাস নামটা খুব সুন্দর মনে হলেও তন্দ্রাবিলাসের জগৎটা মোটেই সুন্দর না। ভয়াবহ ধরনের অসুন্দর। এই জগতের সবচে বড় সমস্যা হচ্ছে এ জগতের বাসিন্দারা মনে করে তাদের জগৎটাই সত্যি। যা আসলে সত্যি না। আমি মনেপ্রাণে কামনা করি—তন্দ্রাবিলাসের জগৎ থেকে তুমি একদিন বের হয়ে আসবে।

নিশি নড়ে বসল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কিছু বলবে?'

নিশি চাপা গলায় বলল, 'আপনি কি আমার সঙ্গে একটু আসবেন?'

'কোথায় যাব?'

'আমার শোবার ঘরে।'

'কেন?'

'শরিফা আমার ঘরে বসে আছে। আপনি তাকে দেখবেন, তার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'আমি দেখতে চাচ্ছি না নিশি। তোমার ভয়ঙ্কর জগতের অংশ আমি হতে চাই না।'

'আসুন না প্লিজ।'

'না। শোন নিশি আমি যখন না বলি তখন সেই 'না' কখনো হ্যাঁ হয় না। ওই প্রসঙ্গ থাক। ভালো কথা তুমি যে ওই দিন টেলিফোনে ফট করে বলে দিলে দোকানের মালিকের মেয়ের নাম লায়লা—কীভাবে বললে? আমি অনেক চিন্তা করেও বের করতে পারি নি।'

'আমি যদি বলি শরিফা আমাকে বলেছে আপনি কি বিশ্বাস করবেন?'

'না।'

'আপনার খিদে পেয়েছে আসুন খাবার দি।'

মিসির আলি খুব তৃপ্তি করে খেলেন। সামান্য খাবার কিন্তু খেতে এত ভালো হয়েছে।

আলু ভর্তার উপর মেয়েটি গাওয়া ঘি ছড়িয়ে দিল। গন্ধে চারদিক ম ম করছে।

'আপনাকে কি শুকনো মরিচ ভেজে দেব? একটা বইয়ে পড়েছিলাম ভাজা শুকনো মরিচ আপনার খুব পছন্দ।'

'দাও।'

নিশি মরিচ ভেজে নিয়ে এল। কী যত্ন করেই না মেয়েটি তার প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছে। মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ করলেন মেয়েটির চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে।

একবার তাঁর ইচ্ছে হল নিজের হাতে মেয়েটির চোখের জল মুছে দেন—পরমুহূর্তেই মনে হল—না, নিশির চোখের জল মুছিয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁর না। তাঁর দায়িত্ব জলের উৎসমুখ খুঁজে বের করা। এই কাজটা তিনি করেছেন। তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়েছে। মেয়েটি যদি তার চোখের জল মুছতে চায় তা হলে তাকেই তা করতে হবে।

হিমুর দ্বিতীয় প্রহর

১

ভীতু মানুষ বলতে যা বোঝায় আমি তা না। হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলে আমার বুকে ধক করে ধাক্কা লাগে না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যদি শুনি বাথরুমে ফিসফাস শোনা যাচ্ছে—কে যেন হাঁটছে, গুনগুন করে গান গাইছে, কল ছাড়ছে-বন্ধ করছে, তাতেও আতঙ্কগ্রস্ত হই না। একবার ভূত দেখার জন্যে বাদলকে নিয়ে শ্মশানঘরে রাত কাটিয়েছিলাম। শেষরাতে ধুপধাপ শব্দ শুনেছি। চারদিকে কেউ নেই অথচ ধুপধাপ শব্দ। ভয়ের বদলে আমার হাসি পেয়ে গেল। আমার বাবা তার পুত্রের মন থেকে 'ভয়' নামক বিষয়টি পুরোপুরি দূর করার জন্যে নানান পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। পদ্ধতিগুলি খুব যে বৈজ্ঞানিক ছিল তা বলা যাবে না, তবে পদ্ধতিগুলি বিফলে যায় নি। কাজ কিছুটা করেছে। চট করে ভয় পাই না।

রাত–বিরেতে একা একা হাঁটি। কখনো রাস্তায় আলো থাকে, কখনো থাকে না। বিচিত্র সব মানুষ এবং বিচিত্র সব ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি—কখনো আতঙ্কে অস্থির হই নি। তিন–চার বছর আগে এক বর্ষার রাতে ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখেছিলাম। রাত দুটা কিংবা তারচেয়ে কিছু বেশি বাজে। আমি কাঁটাবনের দিক থেকে আজিজ মার্কেটের দিকে যাচ্ছি। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। চারপাশ জনমানবশূন্য। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগুচ্ছি। খুবই মজা লাগছে। মনে হচ্ছে সোডিয়াম ল্যাম্পগুলি থেকে সোনালি বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি—প্যান্ট এবং সাদা গেঞ্জি পরা একজন মানুষ আমার দিকে ছুটে আসছে। রক্তে তার সাদা গেঞ্জি, হাত–মুখ মাখামাখি—ছুরিতেও রক্ত লেগে আছে। বৃষ্টিতে সেই রক্ত ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে। মানুষটা কি কাউকে খুন করে এদিকে আসছে? খুনি কখনো হাতের অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে পালায় না। ব্যাপার কী? লোকটা থমকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। স্ট্রিট লাইটের আলোয় আমি সেই মুখ দেখলাম। সুন্দর শান্ত মুখ, চোখ দুটিও মায়াকাড়া ও বিষণ্ন। লোকটির চিবুক বেয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। লোকটা চাপাগলায় বলল, কে? কে?

আমি বললাম, আমার নাম হিমু।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে রইল। এই কয়েক মুহূর্তে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারত। সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। অস্ত্র–হাতে খুনি ভয়ঙ্কর জিনিস। যে–অস্ত্র মানুষের রক্ত পান করে সেই অস্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সে বার বার রক্ত পান করতে চায়। তার তৃষ্ণা মেটে না।

লোকটি আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি একই জায়গায় আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমি খবরের কাগজ পড়ি না—পরদিন সবকটা কাগজ কিনে খুঁটিয়ে পড়লাম। কোনো হত্যাকাণ্ডের খবর কি কাগজে উঠেছে? ঢাকা নগরীতে নিউ এলিফেন্ট রোড এবং কাঁটাবন এলাকার আশপাশে কাউকে কি জবাই করা হয়েছে? না, তেমন কিছু পাওয়া গেল না। গত রাতে আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই জায়গায় আবার গেলাম। ছোপ ছোপ রক্ত পড়ে আছে কি না সেটা দেখার কৌতূহল। রক্ত দেখতে না পাওয়ারই কথা। কাল রাতে অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে। যেসব রাস্তায় পানি ওঠার কথা না সেসব রাস্তাতেও হাঁটুপানি।

আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম—না, রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই। আমার অনুসন্ধান অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বাঙালির দৃষ্টি বড় কোনো ঘটনায় আকৃষ্ট হয় না, ছোট ছোট ঘটনায় আকৃষ্ট হয়। একজন এসে অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন, ভাইসাহেব, কী খোঁজেন?

'কিছু খুঁজি না।'

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার অনুসন্ধান দেখতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি আরো কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেল। এরপর আর রক্তের দাগ খোঁজা অর্থহীন। আমি চলে এলাম। ওই রাতের ঘটনা ভয় পাবার মতো ঘটনা তো বটেই—আমি ভয় পাই নি। বাবার ট্রেনিং কাজে লেগেছিল। কিন্তু ভয় আমি একবার পেয়েছিলাম। সেই ভয়ে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। ভয়াবহ ধরনের ভয় যা মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। যে-ভয়ের জন্ম এই পৃথিবীতে না, অন্য কোনো ভুবনে। ভয় পাবার সেই গল্পটি আমি বলব।

আমার বাবা আমার জন্যে কিছু উপদেশ লিখে রেখে গেছেন। সেই উপদেশগুলির একটি ভয়-সম্পর্কিত।

"একজন মানুষ তার একজীবনে অসংখ্যবার তীব্র ভয়ের মুখোমুখি হয়। তুমিও হইবে। ইহাই স্বাভাবিক। ভয়কে পাশ কাটাইয়া যাইবার প্রবণতাও স্বাভাবিক প্রবণতা। তুমি অবশ্যই তা করিবে না। ভয় পাশ কাটাইবার বিষয় নহে। ভয় অনুসন্ধানের বিষয়। ঠিকমতো এই অনুসন্ধান করিতে পারিলে জগতের অনেক অজানা রহস্য সম্পর্কে অবগত হইবে। তোমার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে তোমাকে বলিয়া রাখি এই জগতের রহস্য পেঁয়াজের খোসার মতো। একটি খোসা ছাড়াইয়া দেখিবে আরেকটি খোসা। এমনভাবে চলিতে থাকিবে—সবশেষে দেখিবে কিছুই নাই। আমরা শূন্য হইতে আসিয়াছি, আবার শূন্যে ফিরিয়া যাইব। দুই শূন্যের মধ্যবর্তী স্থানে আমরা বাস করি। ভয় বাস করে দুই শূন্যে। এর বেশি এই মুহূর্তে তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না।"

আমার বাবা মহাপুরুষ তৈরির কারখানার চিফ ইনজিনিয়ার সাহেব যদিও আমাকে বলেছেন ভয়কে পাশ না-কাটাতে, তবুও আমি ভয়কে পাশ কাটাচ্ছি। সব ভয়কে না—বিশেষ একটা ভয়কে। আচ্ছা, ঘটনাটা বলি।

আমার তারিখ মনে নেই। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হতে পারে। শীত তেমন নেই। আমার গায়ে সুতির একটা চাদর। কানে ঠাণ্ডা লাগছিল বলে চাদরটা মাথার উপর পেঁচিয়ে দিয়েছি। আমি বের হয়েছি পূর্ণিমা দেখতে। শহরের পূর্ণিমার অন্যরকম আবেদন। সোডিয়াম-ল্যাম্পের হলুদ আলোর সঙ্গে মেশে চাঁদের ঠাণ্ডা আলো। এই মিশ্র আলোর আলাদা মজা। তার উপর যদি কুয়াশা হয় তা হলে তো কথাই নেই। কুয়াশায় চাঁদের আলো চারদিকে ছড়ায়। সোডিয়াম-ল্যাম্পের আলো ছড়ায় না। মিশ্র আলোর একটি ছড়িয়ে যাচ্ছে, অন্যটি ছড়াচ্ছে না—খুবই ইন্টারেস্টিং!

সে-রাতে সামান্য কুয়াশাও ছিল। মনের আনন্দেই আমি শহরে ঘুরছি। পূর্ণিমার রাতে লোকজন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্যি। অল্প কিছু মানুষ সারারাত জাগে। তারা ঘুমাতে যায় চাঁদ ডোবার পরে।

ইংরেজিতে এই ধরনের মানুষদের একটা নাম আছে Moon Struck, এরা চন্দ্রাহত। এদের চলাফেরায় ঘোর-লাগা ভাব থাকে। এরা কথা বলে অন্যরকম স্বরে। এরা কিন্তু ভুলেও চাঁদের দিকে তাকায় না। বলা হয়ে থাকে চন্দ্রাহত মানুষদের চাঁদের আলোয় ছায়া পড়ে না। এদের যখন আমি দেখি তখন তাদের ছায়ার দিকে আগে তাকাই।

অনেকক্ষণ রাস্তায় হাঁটলাম। একসময় মনে হল সোডিয়াম-ল্যাম্পের আলো বাদ দিয়ে জোছনা দেখা যাক। কোনো একটা গলিতে ঢুকে পড়ি। দুটা রিকশা পাশাপাশি যেতে পারে না এমন একটা গলি। খুব ভালো হয় যদি অন্ধ গলি হয়। আগে থেকে জানা থাকলে হবে না। হাঁটতে হাঁটতে শেষ মাথায় চলে যাবার পর হঠাৎ দেখব পথ নেই। সেখানে সোডিয়াম ল্যাম্প থাকবে না—শুধুই জোছনা।

ঢুকে পড়লাম একটা গলিতে। ঢাকা শহরের মাঝখানেই এই গলি। গলির নাম বলতে চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি না কৌতূহলী কেউ সেই গলি খুঁজে বের করুক। কিছুদূর এগুতেই কয়েকটা কুকুর চোখে পড়ল। এরা রাস্তার মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল—আমাকে দেখে সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সব মিলিয়ে চারটা কুকুর। কুকুরদের স্বভাব হচ্ছে সন্দেহজনক কাউকে দেখলে একসঙ্গে ঘেউঘেউ করে ওঠা। ভয় দেখানোর চেষ্টা। এরা তা করল না। এদের একজন সামান্য একটু এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। বাকি তিনজন তার পেছনে। সামনের কুকুরটা কি ওদের দলপতি? লিডারশিপ ব্যাপারটা কুকুরদের আদি গোত্র নেকড়েদের মধ্যে আছে। কুকুরদের নেই। তবে সামনের কুকুরটাকে লিডার বলেই মনে হচ্ছে—। আমি ভাব জমাবার জন্য বললাম, তারপর তোমাদের খবর কী? জোছনা কুকুরদের খুব প্রিয় হয় বলে শুনেছি, তোমাদের এই অবস্থা কেন? মনমরা হয়ে শুয়ে আছ? Is anything wrong?

কুকুরদের শরীর শক্ত হয়ে গেল। এরা কেউ লেজ নাড়ছে না। কুকুর প্রচণ্ড রেগে গেলে লেজ নাড়া বন্ধ করে দেয়। লক্ষণ ভালো না।

এদের অনুমতি না নিয়ে গলির ভেতর ঢুকে পড়া ঠিক হবে না। কাজেই বিনয়ী গলায় বললাম, যেতে পারি?

আমার ভাষা না বুঝলেও গলার স্বরের বিনয়ী অংশ বুঝতে পারার কথা। অধিকাংশ পশুই তা বোঝে।

এরা নড়ল না। অর্থাৎ এরা চায় না আমি আর এগুই। তখন একটা কাণ্ড হল—আমি স্পষ্টই শুনলাম কেউ একজন আমাকে বলছে—তুমি চলে যাও। জায়গাটা ভালো না—তুমি চলে যাও। চলে যাও।

অবচেতন মনের কোনো খেলা? কোনো কারণে আমি নিজেই গলিতে ঢুকতে ভয় পাচ্ছি বলে আমার অবচেতন মন আমাকে চলে যেতে বলছে? না, ব্যাপারটা তা না। আমি তা ভাবার কোনো কারণ নেই। আসলেই গলির ভেতর ঢুকতে চাচ্ছি। আমাকে গলির ভেতরের জোছনা দেখতে হবে। তারচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি কোনো দুর্বল মনের মানুষ না যে অবচেতন মন আমাকে নিয়ে খেলবে। আর যদি খেলেও থাকে সেই খেলাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। ধরে নিলাম অবচেতন মনই আমাকে চলে যেতে বলছে—অবচেতন মনকে শোনানোর জন্যেই স্পষ্ট করে বললাম, আমার এই গলিতে ঢোকা অত্যন্ত জরুরি। কুকুরগুলি একসঙ্গে আমাকে কামড়ে না ধরলে আমি অবশ্যই যাব।

তখন একটা কাণ্ড হল। সবকটা কুকুর একসঙ্গে পেছনের দিকে ফিরল। দলপতি কুকুরটা এগিয়ে গিয়ে দলপতির আসন নিল। তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেও সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করলাম। পরিবর্তনটা কী বোঝার চেষ্টা করছি তখন অস্পষ্টভাবে লাঠির ঠকঠক আওয়াজ কানে এল। লাঠি-হাতে কেউ কি আসছে? গ্রামের মানুষ সাপের ভয়ে লাঠি ঠকঠক করে যেভাবে পথে হাঁটে তেমন করে কেউ একজন হাঁটছে। পাকা রাস্তায় লাঠির শব্দ। কুকুরদের শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তারা কি শব্দের মধ্যে বিশেষ কিছু পাচ্ছে? এদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা গেল। অস্থিরতা সংক্রামক। আমার মধ্যেও সেই অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। আর তখনই আমি জিনিসটা দেখলাম। লাঠি ঠকঠক করে একজন 'মানুষ' আসছে। তাকে মানুষ বলছি কেন? সে কি সত্যি মানুষ? সে কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়াল। চারটা কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠে থেমে গেল। তারা একটু পিছিয়ে গেল।

আমি দেখলাম রাস্তার ঠিক মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখ, নাক, মুখ, কান কিছুই নেই। ঘাড়ের উপর যা আছে তা একদলা হলুদ মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু না। সেই মাংসপিণ্ডটা চোখ ছাড়াও আমাকে দেখতে পেল, সে লাঠিটা আমার দিকে উঁচু করল। আমি দ্বিতীয় যে-ব্যাপারটা লক্ষ করলাম তা হচ্ছে চাঁদের আলোয় লাঠিটার ছায়া পড়েছে, কিন্তু 'মানুষটা'র কোনো ছায়া পড়ে নি। ধক করে নাকে পচা মাংসের গন্ধ পেলাম। বিকট সেই গন্ধ। পাকস্থলী উলটে আসার উপক্রম হল।

আমার মাথার ভেতর আবারো কেউ একজন কথা বলল, এখনো সময় আছে, দাঁড়িয়ে থেকো না, চলে যাও। এই জিনিসটা যদি তোমার দিকে হাঁটতে শুরু করে তা হলে তুমি আর পালাতে পারবে না। কুকুরগুলি তোমাকে রক্ষা করছে। আরো কিছুক্ষণ রক্ষা করবে। তুমি দৃষ্টি না ফিরিয়ে নিয়ে পেছন দিকে হাঁটতে শুরু কর। খবরদার এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবে না। এবং মনে রেখো আর কখনো এই গলিতে ঢুকবে না। কখনো না। এই গলি তোমার জন্যে নিষিদ্ধ।

আমি আস্তে আস্তে পেছন দিকে হাঁটছি—কুকুরগুলিও আমার হাঁটার তালে তাল মিলিয়ে পেছন দিকে যাচ্ছে।

জিনিসটার কোনো চোখ নেই। চোখ থাকলে বলতাম—জিনিসটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য, চোখ ছাড়াও তা হলে দেখা যায়!

মাথার ভেতর আবারো কেউ একজন কথা বলল, তুমি জিনিসটার সীমার বাইরে চলে এসেছ। জিনিসটার ক্ষমতা প্রচণ্ড। কিন্তু তার ক্ষমতার সীমা খুব ছোট। এই গলির বাইরে আসার তার ক্ষমতা নেই। তুমি এখন চলে যেতে পার।

আমি চলে গেলাম না। জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে তার লাঠি নামিয়ে ফেলেছে। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। তার গায়ে কাঁথার মতো একটা মোটা কাপড়। এই কাপড়টাই শরীরে জড়ানো। সে হাঁটছে হেলেদুলে। একবার মনে হচ্ছে বামে হেলে পড়ে যাবে, আবার মনে হচ্ছে ডানে হেলে পড়ে যাবে। জিনিসটাকে এখন আগের চেয়ে অনেক লম্বা দেখাচ্ছে। যতই সে দূরে যাচ্ছে ততই লম্বা হচ্ছে। জিনিসটা আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। কুকুরগুলি ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। ওদের দলপতি শুধু একবার আমার দিক তাকিয়ে ঘেউঘেউ করল। মনে হয় কুকুরের ভাষায় বলল, যাও, বাসায় চলে যাও।

ডিসেম্বর মাসের শীতেও আমার শরীর ঘামছে। হাঁটার সময় লক্ষ করলাম ঠিকমতো পা ফেলতে পারছি না। রাস্তা কেমন উঁচুনিচু লাগছে। নতুন নতুন চশমা পরলে যা হয় তা-ই হচ্ছে। বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। কাচের জগভরতি একজগ ঠাণ্ডা পানি এক চুমুকে খেতে পারলে হত। কার কাছে পানি চাইব? কিছুক্ষণ হাঁটার পর মনে হল আমার দিক-ভুল হচ্ছে। আমি কোথায় আছি বুঝতে পারছি না। কোনদিকে যাচ্ছি তাও বুঝতে পারছি না। রিকশা চোখে পড়ছে না যে কোনো একটা রিকশায় উঠে বসব। হোঁস-হোঁস করে কিছু গাড়ি চলে যাচ্ছে। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে এরা কেউ কি থামাবে? না, কেউ থামাবে না। ঢাকার গাড়িযাত্রীরা পথচারীর জন্যে গাড়ি থামায় না। নিয়ম নেই। আমি ফুটপাতেই বসে পড়লাম। আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। অনেকক্ষণ ধরে বমি চেপে রেখেছিলাম। বসামাত্রই হড়হড় করে বমি হয়ে গেল।

'আফনের কী হইছে?'

মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। ফুটপাতে বস্তা মুড়ি দিয়ে যারা ঘুমায় তাদের একজন। বস্তার ভেতর থেকে মাথা বের করেছে। তার গলায় মমতার চেয়ে বিরক্তি বেশি।

আমি বললাম, শরীর ভালো না।

'মিরগি ব্যারাম আছে?'

'না। পানি খাওয়া যাবে—? পানি খাওয়া দরকার।'

'রাইতে পানি কই পাইবেন?'

'রাতে পানির পিপাসা পেলে আপনারা পানি কোথায় পান?'

লোকটা বস্তার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিল। আমার উদ্ভট প্রশ্নে সে হয়তো বিরক্ত হচ্ছে। প্রশ্নটা তেমন উদ্ভট ছিল না। এই যে অসংখ্য মানুষ ফুটপাতে ঘুমায়, রাতে পানির তৃষ্ণা পেলে তারা পানি পায় কোথায়?

কটা বাজছে জানা দরকার। রাত শেষ হয়ে গেলে রিকশা বেবিট্যাক্সি চলা শুরু করবে—তখন আমার একটা গতি হলেও হতে পারে। বিটের পুলিশও দেখছি না। পূর্ণিমা রাতে বোধহয় বিটের পুলিশ বের হয় না।

আমি বস্তা মুড়ি দেওয়া লোকটার দিকে তাকিয়ে ডাকলাম, ভাইসাহেব! এই যে ভাইসাহেব! এই যে বস্তা-ভাইয়া!

একা বসে থাকতে ভালো লাগছে না। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। বমি হয়ে যাওয়ায় শরীরটা একটু ভালো লাগছে, তবে ভয়টা মাথার ভেতর ঢুকে আছে।

কারো সঙ্গে কথাটথা বলতে থাকলে হয়তো-বা তাকে ভুলে থাকা যাবে। আমি গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, এই যে বস্তা-ভাই, ঘুমিয়ে পড়লেন?

লোকটা বিরক্তমুখে বস্তার ভেতর থেকে মুখ বের করল।

'কী হইছে?'

'এটা কোন জায়গা? জায়গাটার নাম কী?'

'চিনেন না?'

'জি না।'

'বুঝছি, মাল খাইয়া আইছেন। আরেক দফা গলাত আঙ্গুল দিয়া বমি করেন—শইল ঠিক হইব। আরেকটা কথা কই ভাইজান, আমারে ত্যক্ত করবেন না।'

'রাত কত হয়েছে বলতে পারেন?'

'জে না, পারি না।'

লোকটা আবার বস্তার ভেতর ঢুকে গেল। লোকটার পাশে খালি জায়গায় শুয়ে পড়ব? গায়ে চাদর আছে। চাদরের ভেতর ঢুকে পড়ে বাকি রাতটা পার করে দেওয়া যায়। রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি। গাছের তলায় ঘুমিয়েছি। ফুটপাতে ঘুমানো হয় নি।

বস্তা-ভাইয়ের পাশে শুয়ে পড়ার আগে কি তার অনুমতি নেওয়ার দরকার আছে? ফুটপাতে যারা ঘুমায় তাদের নিয়মকানুন কী? তাদেরও নিশ্চয়ই অলিখিত কিছু নিয়মকানুন আছে। ফুটপাতে অনেক পরিবার রাত কাটায়—স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ের সোনার সংসার। সেইরকম কোনো পরিবারের পাশে নিশ্চয়ই উটকো ধরনের কেউ মাথার নিচে ইট বিছিয়ে শুয়ে পড়তে পারে না।

'বস্তা-ভাই। এই যে বস্তা-ভাই!'

'আবার কী হইছে?'

'আপনার পাশের ফাঁকা জায়গাটায় কি শুয়ে পড়তে পারি? যদি অনুমতি দেন।'

বস্তা-ভাই জবাব দিলেন না, তবে সরে গিয়ে খানিকটা জায়গা করলেন। এই প্রথম লক্ষ করলাম—বস্তা-ভাই একা ঘুমাচ্ছেন না, তাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্রও আছে। তিনি পুত্রকেও নিজের দিকে টানলেন এবং কঠিন গলায় বললেন, বস্তা-ভাই বস্তা-ভাই করতেছেন কেন? ইয়ারকি মারেন? গরিবরে লইয়া ইয়ারকি করতে মজা লাগে?

'না রে ভাই, ইয়ারকি করছি না। গরিব নিয়ে ইয়ারকি করব কী, আমিও আপনাদের দলে। মুখভরতি বমি। মুখ না ধুয়ে ঘুমাতে পারব না। পানি কোথায় পাব বলে দিন। একটু দয়া করুন।'

বস্তা-ভাই দয়া করলেন। আঙুল উঁচিয়ে কী যেন দেখালেন। আমি এগিয়ে গেলাম। সম্ভবত কোনো চায়ের দোকান। দোকানের পেছনে জালাভরতি পানি। মিনারেল ওয়াটারের একটা খালি বোতলও আছে। আমি পানি দিয়ে মুখ ধুলাম। দুই বোতলের

মতো পানি খেয়ে ফেললাম। এক বোতল পানি ঢেলে দিলাম গায়ে। ভয় নামক যে-ব্যাপারটা শরীরে জড়িয়ে আছে—পানিতে তা ধুয়ে ফেলার একটা চেষ্টা। তারপর শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল। আমি তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে। কোনো এক পর্যায়ে কেউ একজন সাবধানে আমার গায়ের চাদর তুলে নিয়ে চলে গেল। তাতেও আমার ঘুম ভাঙল না। সারারাত আমার গায়ে চাঁদের আলোর সঙ্গে পড়ল ঘন হিম। যখন ঘুম ভাঙল তখন আমার গায়ে আকাশ-পাতাল জ্বর। নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছি না। দিনের আলোয় রাতের ভয়টা থাকার কথা না, কিন্তু লক্ষ করলাম ভয়টা আছে। গুটিশুটি মেরে ছোট হয়ে আছে। তবে সে ছোট হয়ে থাকবে না। যেহেতু সে একটা আশ্রয় পেয়েছে সে বাড়তে থাকবে।

জ্বরে আমার শরীর কাঁপছে। চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার। সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাওয়া। হাসপাতালে ভর্তির নিয়মকানুন কী? দরখাস্ত করতে হয়? নাকি রোগীকে উপস্থিত হয়ে বলতে হয়—আমি হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্যে এসেছি? আমার রোগ গুরুতর। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখুন। চিকিৎসার চেয়ে আমার যেটা বেশি দরকার তা হচ্ছে সেবা। ঘরে সেবা করার কেউ নেই। হাসপাতালের নার্সরা নিশ্চয়ই সেবাও করবেন। গভীর রাতে চার্জ-লাইট হাতে নিয়ে বিছানায়-বিছানায় যাবেন, রোগের প্রকোপ কেমন দেখবেন। স্যার, দয়া করে আমাকে ভর্তি করিয়ে নিন!

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া যতটা জটিল হবে ভেবেছিলাম দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই তত জটিল না। একজনকে দেখলাম দুটাকা করে কী একটা টিকিট বিক্রি করছে। খুব কঠিন ধরনের চেহারা। সবাইকে ধমকাচ্ছে। তাকে বললাম, ভাই, আমার এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার। কী করতে হবে একটু দয়া করে বলে দিন।

সে বিস্মিত হয়ে বলল, হাসপাতালে ভর্তি হবেন?

'জি।'

'নিয়ে এসেছে কে আপনাকে?'

'কেউ নিয়ে আসে নি। আমি নিজে নিজেই চলে এসেছি। আমি আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে যাব।'

'আপনার হয়েছে কী?'

'ভূত দেখে ভয় পেয়েছি। ভয় থেকে জ্বর এসে গেছে।'

'ভূত দেখেছেন?'

'জি স্যার।'

'আমার কাছে এসেছেন কেন? আমি তো আউটডোর পেশেন্ট রেজিস্ট্রেশন স্লিপ দিই।'

'কার কাছে যাব তা তো স্যার জানি না।'

'আচ্ছা, আপনি বসুন ওই টুলটায়।'

'টুলে বসতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে যাব। আমি বরং মাটিতে বসি।'

'আচ্ছা বসুন।'

'থ্যাংক য়্যু স্যার।'

'আমাকে স্যার বলার দরকার নেই। যাদের স্যার বললে কাজ হবে তাদের বলবেন।'

'আপনাকে বলাতেও কাজ হয়েছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।'

'আমি ব্যবস্থা করব কী? আমি দুই পয়সার কেরানি। আমার কি সেই ক্ষমতা আছে? যারা ব্যবস্থা করতে পারবেন তাদের কাছে নিয়ে যাব—এইটুকু।'

'স্যার, এইটুকুই-বা কে করে?'

এই লোক আমাকে একজন তরুণী-ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। খুবই ধারালো চেহারা। কথাবার্তাও ধারালো। আমি এই তরুণীর কঠিন জেরার ভেতর পড়ে গেলাম।

'আপনার নাম কী?'

'ম্যাডাম, আমার নাম হিমু।'

'আপনার ব্যাপার কী?'

'ম্যাডাম, আমি খুবই অসুস্থ। আমার এক্ষুনি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার। ভূত দেখে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছি।'

'আপনি অসুস্থ। আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার—আপনি হাসপাতালে ভর্তি হতে চান—খুব ভালো কথা। দরিদ্র দেশের সীমিত সুযোগ-সুবিধার ভেতর যতটুকু করা যায়—আপনার জন্যে ততটুকু করা হবে। হাসপাতালে সিট নেই। আপনার কি ধারণা হোটেলের মতো আমরা বিছানা সাজিয়ে বসে আছি! আপনাদের জ্বর হবে, সর্দি হবে—আপনারা এসে বিছানায় শুয়ে পড়বেন। নার্সকে ডেকে বলবেন, কোলবালিশ দিয়ে যাও। এই আপনার ধারণা?'

'জি না ম্যাডাম।'

'আপনি কি ভেবেছেন উদ্ভট একটা গল্প বললেই আমরা আপনাকে ভর্তি করিয়ে নেব? ভূত দেখে জ্বর এসে গেছে? রসিকতা করার জায়গা পান না!'

'ম্যাডাম, সত্যি দেখেছি। আপনি চাইলে আমি পুরো ঘটনা বলতে পারি।'

'আমি আপনার ঘটনা শুনতে চাচ্ছি না।'

'ম্যাডাম, আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন না?'

'আপনি দয়া করে কথা বাড়াবেন না।'

'শেকসপীয়ারের মতো মানুষও কিন্তু ভূত বিশ্বাস করতেন। তিনি হ্যামলেটে বলেছেন—There are many things in Heaven and Earth. আমার ধারণা তিনি ভূত দেখেছেন। এদিকে আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন—'

'স্টপ ইট।'

আমি 'স্টপ' করলাম।

তরুণী-ডাক্তার আমাকে যে-লোকটি নিয়ে এসেছিল (নাম রশীদ) তার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন। রশীদ বেচারা জোঁকের মুখে লবণ পড়ার মতো মিইয়ে গেল।

'রশীদ!'

'জি আপা?'

'একে এখান থেকে নিয়ে যাও। ফালতু ঝামেলা আমার কাছে আর কখনো আনবে না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি আমি হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে আছি। আমাকে

স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। তরুণী-ডাক্তার আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছেন। চোখ মেলতেই তিনি বললেন, হিমু সাহেব, এখন কেমন বোধ করছেন?

'ভালো।'

এইটুকু বলে আমি দ্বিতীয়বারের মতো জ্ঞান হারালাম, কিংবা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

হাসপাতালের তৃতীয় দিনে আমাকে দেখতে এলেন মেজো ফুপা—বাদলের বাবা। তাঁর হাতে এক প্যাকেট আঙুর। একটা সময় ছিল যখন মৃত্যুপথযাত্রীকে দেখতে যাবার সময় আঙুর নিয়ে যাওয়া হত। ফলের দোকানি আঙুর বিক্রির সময় মমতামাখা গলায় বলত—রুগীর অবস্থা সিরিয়াস?

এখন আঙুর এক শ টাকা কেজি—বরই বরং এই তুলনায় দামি ফল।

মেজো ফুপা আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, অবস্থা কী?

আমি জবাব দিলাম। কেউ রোগী দেখতে এসে যদি দেখে রোগী দিব্যি সুস্থ, পা নাচাতে নাচাতে হিন্দি গান গাইছে—তখন সে শকের মতো পায়। যদি দেখে রোগীর অবস্থা এখন-তখন, শ্বাস যায়-যায় অবস্থা, তখন মনে শান্তি পায়—যাক, কষ্ট করে আসাটা বৃথা যায় নি। কাজেই ফুপার প্রশ্নে আমি চোখমুখ করুণ করে ফেললাম, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এরকম একটা ভাবও করলাম।

'জবাব দিচ্ছিস না কেন? অবস্থা কী?'

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, ভালো। এখন একটু ভালো।

তোকে খুঁজে বের করতে খুবই যন্ত্রণা হয়েছে, কোন ওয়ার্ড, বেড নাম্বার কী কেউ জানে না।

'ও আচ্ছা।'

'একবার তো ভেবেছি ফিরেই চলে যাই। নেহায়েত আঙুর কিনেছি বলে যাই নি। আঙুর খেতে নিষেধ নেই তো?'

'জি না।'

'নে, আঙুর খা।'

আমি টপাটপ আঙুর মুখে ফেলছি আর ভাবছি—ব্যাপারটা কী? আমি যে হাসপাতালে এই খোঁজ ফুপা পেলেন কোথায়? কাউকেই তো জানানো হয় নি। আমি বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না যে খবরের কাগজে নিউজ চলে গেছে—

হিমুর সর্দিজ্বর

জনদরদি দেশনেতা প্রাণপ্রিয় হিমু সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে যান। কিছুক্ষণ তাঁর শয্যাপার্শ্বে থেকে তাঁর আশু আরোগ্য কামনা করেন। মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্যও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বনমন্ত্রী, তেল ও জ্বালানিমন্ত্রী, ত্রাণ উপমন্ত্রী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন—হিমু সাহেবের শারীরিক অবস্থা এখন ভালো। হিমু সাহেবের ভক্তবৃন্দের চাপে হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন তাঁরা যেন হিমু সাহেবকে বিরক্ত না করেন। হিমু সাহেবের দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। তাঁর শরীরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বুলেটিন প্রতিদিন দুপুর বারটায় প্রকাশ করা হবে।

আমি যে হাসপাতালে এই খবর তো আমার কাঁধের দুই ফেরেশতা ছাড়া আর কারোরই জানার কথা না! ধরা যাক খবরটা সবাই জানে, তার পরেও ফুপা হাসপাতালে চলে আসবেন এটা হয় না। এত মমতা আমার জন্যে বাদল ছাড়া আর কারোরই নেই। অন্য কোনো ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা কী?

'ফুপা, আমি যে হাসপাতালে এটা জানলেন কীভাবে? পেপারে নিউজ হয়েছে?'

'পেপারে নিউজ হবে কেন? তুই কে? হাসপাতাল থেকে আমাকে টেলিফোন করেছে।'

'আপনার নাম্বার ওরা পেল কোথায়?'

'তুই দিয়েছিস।'

আমার মনে পড়ল কোনো এক সময় হাসপাতালে ভর্তির ফরম তরুণী-ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজেই ফিলআপ করেছেন এবং আগ বাড়িয়ে অসুখের খবর দিয়েছেন।

'খুব মিষ্টি গলার একজন মেয়ে-ডাক্তার আপনাকে খবর দিয়েছে, তাই না?'

'হুঁ। তোর সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিল।'

'কী জানতে চাচ্ছিল?'

'তুই কী করিস না-করিস এইসব। তোর হলুদ পাঞ্জাবি, উদ্ভট কথাবার্তা শুনে ভড়কে গেছে আর কি! তুই আর কিছু পারিস বা না পারিস মানুষকে ভড়কাতে পারিস।'

'ডাক্তাররা এত সহজে ভড়কায় না। তারপর বলুন ফুপা আমার কাছে কেন এসেছেন?'

'তোকে দেখতে এসেছি আর কি।'

'আমাকে দেখতে হাসপাতালে চলে আসবেন এটা বিশ্বাসযোগ্য না। ঘটনা কী?'

'বাদলের ব্যাপারে তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

ফুপা ইতস্তত করে বললেন।

আমি শান্ত গলায় বললাম, বাদলকে নিয়ে তো আপনার এখন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সে কানাডায়। আমার প্রভাববলয় থেকে অনেক দূরে। আমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার কোনো দায়িত্বও আপনাকে পালন করতে হচ্ছে না। নাকি সে কানাডাতেও খালিপায়ে হাঁটা শুরু করেছে?

ফুপা চাপাগলায় বললেন, বাদল এখন ঢাকায়।

'ও আচ্ছা।'

'মাসখানিক থাকবে। তোর কাছে আমার অনুরোধ এই এক মাস তুই গা-ঢাকা দিয়ে থাকবি। ওর সঙ্গে দেখা করবি না।'

'গা-ঢাকা দিয়েই তো আছি। হাসপাতালে লুকিয়ে আছি।'

'হাসপাতালে তো আর এক মাস থাকবি না, তোকে নাকি আজ-কালের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।'

'আমাকে বাদলের কাছ থেকে এক শ হাত দূরে থাকতে হবে, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'নো প্রবলেম।'

'শোন হিমু, আমরা চাচ্ছি ওর একটা বিয়ে দিতে। মোটামুটি নিমরাজি করিয়ে ফেলেছি। এখন তুই যদি ভুজং ভাজং দিস তা হলে তো আর বিয়ে হবে না। সে হলুদ পাঞ্জাবি পরে হাঁটা দেবে।'

'আমি কেন ভুজং ভাজং দেব?'

'তোকে দিতে হবে না। তোকে দেখলেই ওর মধ্যে আপনাআপনি ভুজং ভাজং হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে তাকে নরম্যাল করেছি, সব জলে যাবে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।'

'কথা দিচ্ছিস?'

'হুঁ।'

'বাদল এয়ারপোর্টে নেমেই বলেছে—হিমুদা কোথায়? আমি মিথ্যা করে বলেছি, সে কোথায় কেউ জানে না।'

'ভালো বলেছেন।'

'মেসের ঠিকানা চাচ্ছিল—তোর আগের মেসের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি।'

'খুবই ভালো করেছেন, আগের ঠিকানায় খোঁজ নিতে গিয়ে ঠক খাবে।'

'খোঁজ নিতে এর মধ্যেই গিয়েছে। ছেলেটাকে নিয়ে কী যে দুশ্চিন্তায় আছি! বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। চিন্তাভাবনা যা করার বৌমা করবে।'

'বিয়ে ঠিকঠাক করে ফেলেছেন?'

'কয়েকটা মেয়ে দেখা হয়েছে—এর মধ্যে একটাকে তোর ফুপুর পছন্দ হয়েছে। মেয়ের নাম হল—চোখ।'

'মেয়ের নাম চোখ?'

'হ্যাঁ, চোখ। আজকাল কি নামের কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে! যার যা ইচ্ছা নাম রাখছে।'

'চোখ নাম হবে কীভাবে! আঁখি না তো?'

'ও হ্যাঁ, আঁখি। সুন্দর মেয়ে—ফড়ফড়ানি টাইপ। একটা কথা জিজ্ঞেস করলে তিনটা কথা বলে। বাদলের সঙ্গে মানাবে। একজন কথা বলে যাবে, একজন শুনে যাবে।'

'মেয়ে আপনার পছন্দ না?'

'তোর ফুপুর পছন্দ। পুরুষমানুষের কি সংসারে কোনো say থাকে? থাকে না। পুরুষরা পেপার-হেড হিসেবে অবস্থান করে। নামে কর্তা, আসলে ভর্তা। তুই বিয়ে না করে খুব ভালো আছিস। দিব্যি শরীরে বাতাস লাগিয়ে ঘুরছিস। তোকে দেখে হিংসা হয়। স্বাধীনতা কী জিনিস তার কী মর্ম সেটা বোঝে শুধু বিবাহিত পুরুষরাই। উঠিরে হিমু।'

'আচ্ছা।'

'বাদলের প্রসঙ্গে যা বলছি মনে থাকে যেন।'

'মনে থাকবে।'

‘ও আচ্ছা, তোর অসুখের ব্যাপারটাই তো কিছু জানলাম না। কী অসুখ?’

‘ঠাণ্ডা লেগেছে।’

‘ঠাণ্ডা লাগল কীভাবে?’

‘ফুটপাতে চাদর–গায়ে শুয়েছিলাম। চোর চাদর নিয়ে গেল।’

‘ফুটপাতে ঘুমাচ্ছিলি?’

‘জি।’

‘ঘরে ঘুমাতে আর ভালো লাগে না?’

‘তা না—’

‘শোন হিমু, বাদলের কাছ থেকে দূরে থাকবি। মনে থাকে যেন।’

‘মনে থাকবে।’

‘টাকা–পয়সা কিছু লাগবে? লাগলে বল, লজ্জা করিস না। ধর, পাঁচ শ টাকা রেখে দে। অষুধপত্র কেনার ব্যাপার থাকতে পারে।’

আমি নোটটা রাখলাম। ফুপা চিন্তিত ভঙ্গিতে বের হয়ে গেলেন। ছেলে আমার ফাঁদে পড়ে যদি আবার ফুটপাতে শয্যা পাতে! কিছুই বলা যায় না।

হাসপাতাল আমার বেশ পছন্দ হল। হাসপাতালের মানুষগুলির ভেতর একটা মিল আছে। সবাই রোগী। রোগযন্ত্রণায় কাতর। ব্যাধি সব মানুষকে এক করে দিয়েছে। একজন সুস্থ মানুষ অপরিচিত একজন সুস্থ মানুষের জন্যে কোনো সহমর্মিতা বোধ করবে না, কিন্তু একজন অসুস্থ মানুষ অন্য একজন অসুস্থ মানুষের জন্যে করবে।

হাসপাতালে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে না। সকালে নাশতা আসছে। দুবেলা খাবার আসছে। দুনম্বরি ব্যবস্থাও আছে। জায়গামতো টাকা খাওয়ালে স্পেশাল ডায়েটের ব্যবস্থা হয়। ডাক্তারদের অনেক সংস্থাটংস্থা আছে। করুণ গলায় তরুণ ডাক্তারদের কাছে অভাবের কথা বলতে পারলে ফ্রি অষুধ তো পাওয়া যায়ই, পথ্য কেনার টাকাও পাওয়া যায়।

রোগ সেরে গেছে, তার পরেও কিছুদিন হাসপাতালে থেকে শরীর সারাবার ব্যবস্থাও আছে। খাতাপত্রে নাম থাকবে না—কিন্তু বেড থাকবে। এক-একদিন এক-এক ওয়ার্ডে গিয়ে ঘুমাতে হবে।

ছেলেমেয়ে নিয়ে গত সাত মাস ধরে হাসপাতালে বাস করছে এমন একজনের সন্ধানও পাওয়া গেল। নাম ইসমাইল মিয়া। স্ত্রীর ক্যানসার হয়েছিল, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে মাসখানিক চিকিৎসা করাল। সেই থেকে ইসমাইল মিয়ার হাসপাতালের সঙ্গে পরিচয়। ধীরে ধীরে পুরো পরিবার নিয়ে সে হাসপাতালে পার হয়ে গেল। স্ত্রী মরে গেছে। তাতে অসুবিধা হয় নি। বাচ্চারা হাসপাতালের বারান্দায় খেলে। এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডে ঘোরে। কেউ কিছু বলে না। ইসমাইল মিয়া দিনে বাইরে কাজকর্ম করে (মনে হয় দুনম্বরি কাজ—চুরি, ফটকাবাজি) রাতে হাসপাতালে এসে ছেলেমেয়েদের খুঁজে বের করে। ঘুমানোর একটা ব্যবস্থা করে।

ইসমাইল মিয়ার সঙ্গে পরিচয় হল। অতি ভদ্র। অতি বিনয়ী। হাসিমুখ ছাড়া কথা বলে না। তার মধ্যে দার্শনিক ব্যাপারও আছে। আমি বললাম, হাসপাতালে আর কতদিন থাকবে?

ইসমাইল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, ক্যামনে বলি ভাইজান? আমার হাতে তো কিছু নাই।

'তোমার হাতে নেই কেন?'

'সব তো ভাইজান আল্লাহ্পাকের নির্ধারণ। আল্লাহ্পাক নির্ধারণ করে রেখেছে আমি বালবাচ্চা নিয়া হাসপাতালে থাকব—এইজন্যে আছি। যেদিন নির্ধারণ করবেন আর দরকার নাই—সেইদিন বিদায়।'

'তা তো বটেই।'

'আল্লাহ্পাকের হুকুম ছাড়া তো ভাইজান কিছুই হওনের উপায় নাই।'

'তাও ঠিক।'

'সামান্য যে পিপীলিকা আল্লাহ্পাক তারও খবর রাখে। আপনার পায়ের তলায় পইরা দুইটা পিপীলিকার মৃত্যু হবে তাও আল্লাহ্পাকের বিধান। আজরাইল আলাইহেস সালাম আল্লাহ্পাকের নির্দেশে দুই পিপীলিকার জান কবজ করবে।'

'ও আচ্ছা।'

'এইজন্যেই ভাইজান কোনো কিছু নিয়া চিন্তা করি না। যার চিন্তা করার কথা সে-ই চিন্তা করতেছে। আমি চিন্তা কইরা কী করব।'

'কার চিন্তা করার কথা?'

'কার আবার, আল্লাহ্পাকের!'

ইসমাইল মিয়া খুবই আল্লাহ্ভক্ত। সমস্যা হচ্ছে তার প্রধান কাজ—চুরি। চুরির পক্ষেও সে ভালো যুক্তি দাঁড় করিয়েছে—

'চুরিতে আসলে কোনো দোষ নাই ভাইজান। ভালুক কী করে? পেটে খিদা লাগলে মৌমাছির মৌচাক থাইক্যা মধু চুরি করে। এর জন্যে ভালুকের দোষ হয় না। এখন বলেন মানুষের দোষ হইব ক্যান।'

বগার মা নামের এক বৃদ্ধার সঙ্গেও পরিচয় হল। সে ঝাড়ফুঁক করে। ঝাড়ার কাঠি নিয়ে রোগীদের ঝাড়ে। তাতে নাকি অতি দ্রুত রোগ আরোগ্য হয়। হাসপাতালে সর্বাধুনিক চিকিৎসার সাথে সাথে চলে ঝাড়ফুঁক।

এই বৃদ্ধা দশ টাকার বিনিময়ে আমাকেও একদিন ঝেড়ে গেলেন। আমি দশ টাকার বাইরে আরো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ঝাড়ার মন্ত্র খানিকটা শিখে নিলাম।

"ও কালী সাধনা
বিষ্টু কালী মাতা।
উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম।
রাও নাও — ঈশানে যাও
.................."

বগার মার সঙ্গে অনেক গল্পগুজবও করলাম। জানা গেল বগা বলে তাঁর কোনো ছেলে বা মেয়ে নেই। তাঁর তিনবার বিয়ে হয়েছিল। কোনো ঘরেই কোনো সন্তান হয় নি। কী করে তাঁর নাম বগার মা হয়ে গেল তিনি নিজেও জানেন না।

আমি বললাম, মা, ঝাড়ফুঁকে রোগ সারে?

বগার মা অতি চমৎকৃত হয়ে বললেন, কী কও বাবা! ঠিকমতো ঝাড়তে পারলে ক্যানসার সারে।

'আপনি সারিয়েছেন?'

'অবশ্যই—ত্রিশ বচ্ছর ধইরা ঝাড়তেছি। ত্রিশ বচ্ছরে ক্যানসার ম্যানসার কত কিছু ভালো করেছি। একটা কচকা ঝাড়া দশটা "পেনিসিলি" ইনজেকশনের সমান। বাপধন, তোমারে যে ঝাড়া দিলাম এই ঝাড়ায় দেখবা আইজ দিনে-দিনে সিধা হইয়া দাঁড়াইবা।'

হাসপাতালে আমি অনেককিছুই শিখলাম। হাসপাতালের ব্যাপারটা সম্ভবত আমার বাবার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। নয়তো তিনি অবশ্যই তাঁর পুত্রকে কিছুদিন হাসপাতালে রেখে দিতেন। এবং তাঁর বিখ্যাত উপদেশমালার সঙ্গে আরো একটি উপদেশ যুক্ত হত—

> "প্রতি দুই বৎসর অন্তর হাসপাতালে সাতদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিবে। মানুষের জরা-ব্যাধি ও শোক তাহাদের পার্শ্বে থাকিয়া অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিবে। ব্যাধি কী, জীবজগৎকে ব্যাধি কেন বার বার আক্রমণ করে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তবে মনে রাখিও, ব্যাধিকে ঘৃণা করিবে না। ব্যাধি জীবনেরই অংশ। জীবন আছে বলিয়াই ব্যাধি আছে।"

'কেমন আছেন হিমু সাহেব?'

'জি ম্যাডাম, ভালো আছি।'

'আপনার বুকে কনজেশন এখনো আছে। অ্যান্টিবায়োটিক যা দেওয়া হয়েছে—কনটিনিউ করবেন। সেরে যাবে।'

'থ্যাংক য়্যু ম্যাডাম।'

'আপনাকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে, আপনি চলে যেতে পারেন।'

'থ্যাংক য়্যু ম্যাডাম।'

'প্রতিটি বাক্যে একবার করে ম্যাডাম বলছেন কেন? ম্যাডাম শব্দটা আমার পছন্দ না। আর বলবেন না।'

'জি আচ্ছা, বলব না।'

'আপনার হাতে কি সময় আছে? সময় থাকলে আমার চেম্বারে আসুন। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি।'

'জি আচ্ছা।'

আমি তরুণী-ডাক্তারের পেছনে পেছনে যাচ্ছি। তাঁর নাম ফারজানা। সুন্দর মানুষকেও সবসময় সুন্দর লাগে না। কখনো খুব সুন্দর লাগে, কখনো মোটামুটি লাগে। এই তরুণীকে আমি যতবার দেখেছি ততবারই মুগ্ধ হয়েছি। অ্যাপ্রন ফেলে দিয়ে ফারজানা যদি ঝলমলে একটা শাড়ি পরত তা হলে কী হত? ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, কপালে টিপ। হালকা নীল একটা শাড়ি—কানে ঝুলবে নীল পাথরের ছোট্ট দুল। এই মেয়ে কি বিয়েবাড়িতে সেজেগুজে যায় না? তখন চারদিকে অবস্থাটা কী হয়? বিয়ের কনে নিশ্চয়ই মন-খারাপ করে ভাবে—এই মেয়েটা কেন এসেছে। আজকের দিনে আমাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখানোর কথা। এই মেয়েটা সেই জায়গা নিয়ে নিয়েছে। এটা সে পারে না।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'বসুন।'

আমি বসলাম। আমার সামনে পিরিচে ঢাকা একটা চায়ের কাপ। ফারজানার সামনেও তাই। চা তৈরি করে সে আমাকে নিয়ে এসেছে। আমি তার ভেতরে সামান্য হলেও কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পেরেছি।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনি কি সিগারেট খান?'

'কেউ দিলে খাই।'

'নিন, সিগারেট নিন। ডাক্তাররা সব রোগীকে প্রথম যে-উপদেশ দেয় তা হচ্ছে—সিগারেট ছাড়ুন। সেখানে আমি আপনাকে সিগারেট দিচ্ছি—কারণ কী বলুন তো?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কারণ, আমি নিজে একটা সিগারেট খাব। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সিগারেট ধরেছিলাম। ছেলেরা সিগারেট খাবে, আমরা মেয়েরা কেন খাব না? এখন এমন অভ্যাস হয়েছে। এর থেকে বেরুতে পারছি না। চেষ্টাও অবিশ্যি করছি না।'

ফারজানা সিগারেট ধরাল। আশ্চর্য—সিগারেটটাও তার ঠোঁটে মানিয়ে গেল! পাতলা ঠোঁটের কাছে জ্বলন্ত আগুন। বাহ্, কী সুন্দর! সুন্দরী তরুণীদের ঘিরে যা থাকে সবই কি সুন্দর হয়ে যায়?

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'এখন গল্প করুন। আপনার গল্প শুনি।'

'কী গল্প শুনতে চান?'

'আপনি অস্বাভাবিক একটা দৃশ্য দেখে ভয় পেয়েছিলেন। ভয় পেয়ে অসুখ বাধিয়েছেন। সেই অস্বাভাবিক দৃশ্যটা কী আমি জানতে চাচ্ছি।'

'কেন জানতে চাচ্ছেন?'

'জানতে চাচ্ছি—কারণ এই পৃথিবীতে অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে না। পৃথিবী চলে তার স্বাভাবিক নিয়মে। মানুষ সেইসব নিয়ম একে একে জানতে শুরু করেছে—এই সময় আপনি যদি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখতে শুরু করেন তা হলে তো সমস্যা।'

'মানুষ কি সবকিছু জেনে ফেলেছে?'

ফারজানা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, সবকিছু না জানলেও অনেককিছুই জেনেছে। ইউনিভার্স কীভাবে সৃষ্টি হল তাও জেনে গেছে।

আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে হাসিমুখে বললাম, ইউনিভার্স কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

'বিগ ব্যাং থেকে সবকিছুর শুরু। আদিতে ছিল প্রিমরডিয়েল অ্যাটম যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা কিছুই নেই। সেই অ্যাটম বিগ ব্যাং-এ ভেঙে গেল—তৈরি হল স্পেস এবং টাইম। সেই স্পেস ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এক্সপানডিং ইউনিভার্সে।'

'সময়ের শুরু তা হলে বিগ ব্যাং থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'বিগ ব্যাং-এর আগে সময় ছিল না?

'না।'

'বিগ ব্যাং-এর আগে তা হলে কী ছিল?'

'সেটা মানুষ কখনো জানতে পারবে না। মানুষের সমস্ত বিদ্যা এবং জ্ঞানের শুরুও বিগ ব্যাং-এর পর থেকেই।'

'তা হলে তো বলা যেতে পারে—জ্ঞানের একটা বড় অংশই মানুষের আড়ালে রেখে দেওয়া হয়েছে।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছেন?

'না, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আমি তর্ক করি না। তারা যা বলে তা-ই হাসিমুখে মেনে নিই।'

'সস্তা ধরনের কনভারসেশন আমার সঙ্গে দয়া করে করবেন না। "সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আমি তর্ক করি না" এটা বহু পুরাতন ডায়ালগ। বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। শুনলেই গা-জ্বালা করে। আপনি খুব অল্প কথায় আমাকে বলুন—কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন, তারপর রিলিজ অর্ডার নিয়ে বাসায় চলে যান।'

'আমি আপনাকে বলব না।'

ফারজানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। তার ঠোঁটের সিগারেট নিভে গিয়েছিল—সে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, কেন বলবেন না?

আমি শান্তগলায় বললাম, আপনাকে আমি বলে ব্যাপারটা বোঝাতে পারব না। আপনাকে দৃশ্যটা দেখাতে হবে। ঘটনাটা কী পরিমাণে অস্বাভাবিক তা জানার জন্যে আপনাকে নিজের চোখে দেখতে হবে। আমি বরং আপনাকে দেখাবার ব্যবস্থা করি।

'আপনি আমাকে ভূত দেখাবেন?'

'ভূত কি না তা তো জানি না—যে-জিনিসটা দেখে ভয় পেয়েছিলাম সেটা দেখাব।'

'কবে?'

'কবে তা বলতে পারছি না। কোনো একদিন এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

ফারজানা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, আচ্ছা বেশ, নিয়ে যাবেন। আমি অপেক্ষা করে থাকব।

২

আমি গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

ঢাকা শহরের অন্যসব গলির মতোই একটা গলি। একপাশে নোংরা নর্দমা। নর্দমায় গলা পিচের মতো ঘন-কালো ময়লা পানি। গলিতে ডাস্টবিন বসানো হয় না বলে দুপাশের বাড়ির ময়লা গলিতেই ফেলা হয়। সেই ময়লার বেশিরভাগ লোকের পায়ে-পায়ে চলে যায়। আর বাকিটা জমে থেকে–থেকে একসময় গলিরই অংশ হয়ে যায়।

চারটা কুকুর থাকার কথা—এদের দেখলাম না। সেই জায়গায় ছোট ছোট কিছু বাচ্চাকে দেখলাম টেনিস-বল দিয়ে ক্রিকেট খেলছে। খেলা আপাতত বন্ধ, কারণ বল নর্দমায় ডুবে গেছে। কাঠি দিয়ে বল খোঁজা হচ্ছে। ঘন ময়লা পানির নর্দমায় টেনিস-বলের ডুবে যাবার কথা না—আর্কিমিডিসের সূত্র অনুযায়ী ভেসে থাকার কথা। ডুবে গেল কেন কে জানে!

আমি গলির শেষ মাথা পর্যন্ত যাব কি যাব না ঠিক করতে পারছি না। এখন এই দিনের আলোয় শেষ মাথা পর্যন্ত যাওয়া না-যাওয়া অর্থহীন—মধ্যরাতের পরেই কোনো এক সময় আসতে হবে। আজ বরং কিছুক্ষণ বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলা দেখে ফিরে আসা যাক। সাতদিন হাসপাতালে শুয়ে থেকে শরীর অন্যরকম হয়ে গেছে। শরীর ঠিক করতে হবে। হিমু-টাইপ জীবনচর্চা শুরু করা দরকার।

বাচ্চারা বল খুঁজে পেয়েছে। নর্দমা থেকে বল তুলতে গিয়ে ছটা বাচ্চা নোংরায় মাখামাখি হয়েছে। তাতে তাদের কোনো বিকার নেই। বল খুঁজে পাওয়ার আনন্দেই তারা অভিভূত। তারা তাদের খেলা শুরু করল।

আমি শুরু করলাম আমার খেলা—ঢাকা শহরের রাস্তায়-রাস্তায় হাঁটা। গত সাতদিন এদের কাউকে দেখি নি। রাস্তাগুলির জন্যে আমার মন কেমন করছে। রাস্তাদেরও হয়তো আমার জন্যে মন কেমন করছে। কথা বলার ক্ষমতা থাকলে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে দেখে আনন্দিত গলায় জীবনানন্দের মতো বলত—হিমু সাহেব এত দিন কোথায় ছিলেন?

সন্ধ্যার দিকে আমি কাকরাইলের কাছাকাছি চলে এলাম। আমার পদযাত্রা কিছুক্ষণের জন্যে স্থগিত হল—কারণ আমার পায়ের কাছে একটা মানিব্যাগ। পেট ফুলে মোটা হয়ে আছে। আমার কাছে মনে হল মানিব্যাগটা চিৎকার করে বলছে—এই গাধা, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমাকে তুলে পকেটে লুকিয়ে ফেল। কেউ দেখছে না।

কালো পিচের রাস্তায় কালো রঙের মানিব্যাগ, চট করে চোখে পড়ে না। তা ছাড়া অন্ধকার হয়ে এসেছে। অন্ধকারে লোকজন মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে না, সোজাসুজি তাকিয়ে হাঁটে। এইজন্যেই কি কারো চোখে পড়ে নি? তার পরেও পেটমোটা একটা মানিব্যাগ রাস্তায় পড়ে থাকবে আর তা কারো চোখে পড়বে না এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য না। আমি সাতদিন রাস্তায় ছিলাম না। এই সাতদিনে বাংলাদেশের রাজপথগুলিতে কি অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা ঘটতে শুরু করেছে?

আমি হাত বাড়িয়ে মানিব্যাগ তুললাম। অতিরিক্ত পেটমোটা মানিব্যাগে সাধারণত মালপানি থাকে না, কাগজপত্রে ঠাসা থাকে। এখানেও হয়তো তা-ই। তুলে ঠক খাব। আমার আগে অনেকেই এই ব্যাগ তুলে ঠক খেয়ে আবার ফেলে দিয়েছে। এমনও হতে পারে সে ঘাপটি মেরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে মজা দেখার জন্যে।

ব্যাগ খুললাম। গুপ্তধন পাওয়ার মতো আনন্দ হল। ব্যাগভরতি টাকা। রাবারের রিবন দিয়ে বাঁধা পাঁচশ টাকার নোটের স্তূপ। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার তো হবেই, বেশিও হতে পারে। ব্যাগটা ঝট করে পাঞ্জাবির পকেটে লুকিয়ে ফেলতে যাব তখন মনে হল আমার পাঞ্জাবির পকেট নেই। আমি হচ্ছি হিমু। হিমুদের পাঞ্জাবির পকেট থাকে না। হিমুরা অন্যের মানিব্যাগ এমন ঝট করে লুকিয়েও ফেলতে চায় না। এখন কী করব?

ব্যাগটা যেখানে ছিল সেখানে ফেলে রাখব? অসম্ভব! রাস্তায় পড়ে থাকা দশ টাকার একটা নোট ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু পাঁচশ টাকার নোট ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না। নোটটা চুম্বক হয়ে মানবসন্তানদের আকর্ষণ করতে থাকে। অতি বড় যে সাধু তার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে একটা ছিঁচকে চোর।

ব্রাদার, আপনার হাতে এটা কি মানিব্যাগ?

আমি পাশ ফিরলাম। ছুঁচালো চেহারার এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ না ধুলে চেহারায় যেমন অসুস্থ ভাব লেগে থাকে তার মুখে সেই অসুস্থ ভাব। চোখ হলুদ। ঠোঁট কালচে মেরে আছে। নিচের ঠোঁট খানিকটা ঝুলে গেছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁত দেখা যায়। তবে কাপড়চোপড় বেশ পরিপাটি। শুধু জুতাজোড়া ময়লা। অনেক দিন কালি করা হয় নি, রং চটে গেছে। একটু দূরে আরো একজন। তার চেহারাও ছুঁচালো। তার মুখেও অসুস্থ ভাব এবং চোখ হলুদ। কোনো ডাক্তার দেখলে দুজনকেই বিলিরুবিন টেস্ট করতে পাঠাত। আমি এই জাতীয় যুবকদের চিনি। সামান্য চুরি থেকে শুরু করে মানুষের পেটে দশ ইঞ্চি ছুরি ঢুকিয়ে মোচড় দেওয়ার মতো অপরাধ এরা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে করতে পারে। এরা কখনো একা চলাফেরা করে না। আবার এদের দল বড়ও হয় না। দুজনের ছোট ছোট দল। দুজনের একজন (সাধারণত দুবলা-পাতলা জন) ওস্তাদ, তিনি হুকুম দেন। অন্যজন সেই হুকুম পালন করে।

এই দলটার যিনি ওস্তাদ তিনি আবার কথা বললেন, কী ব্রাদার, কথা বলছেন না কেন? হাতে কি মানিব্যাগ?

আমি হাই তোলার ভঙ্গি করে বললাম, তাই তো মনে হয়।

'কুড়িয়ে পেয়েছেন?'

'কুড়িয়ে পাব কীভাবে? মানিব্যাগ তো আর ফুল না যে পড়ে থাকবে আর কুড়িয়ে নেব!'

'পেয়েছেন কোথায়?'

'ছিনতাই করেছি।'

দ্বিতীয় ছুঁচালো যুবক এবার হালকা চালে এগিয়ে আসছে। এ বেশ বলশালী হলেও হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তার মুখভরতি পান। সে ঠিক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমার পায়ের কাছে পানের পিক ফেলে অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, কী হইছে? প্রশ্নটা সে আমাকেই করল। তার পরেও আমি বিস্মিত হবার মতো করে বললাম, আমাকে বলছেন?

'জে আপনারে, প্রবলেমটা কী?'

'কোনো প্রবলেম নেই। আমার হাতে একটা মানিব্যাগ আছে, এটাই প্রবলেম। মানিব্যাগভরতি পাঁচশ টাকার নোট। ত্রিশ–পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হবার কথা। দেখবেন? এই যে নিন দেখুন।'

তারা মুখ–চাওয়াচাওয়ি করল। দেখতে চাইল না। তার পরেও আমি ব্যাগ খুলে ভেতরটা দেখিয়ে দিলাম। তারা আবারো মুখ–চাওয়াচাওয়ি করল। আমার ব্যবহারে তারা মনে হল খানিকটা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। আমি মিষ্টি করে হাসলাম। তাদের বিভ্রান্তি আরো বাড়িয়ে দিয়ে মধুর গলায় বললাম, মানিব্যাগ নিতে চান?

কাক মানুষের হাত থেকে খাবার নিয়ে উড়ে যায়। কিন্তু তাদেরকে যদি যত্ন করে থালায় খাবার বেড়ে ডাকা হয় 'আয় আয়' তখন তারা আর কাছে আসে না। দূর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে। উড়ে চলেও যায় না, আবার কাছেও আসে না। যুবক দুটির মধ্যে কাকভাব প্রবল বলে মনে হল। তারা সরুচোখে মানিব্যাগের দিকে তাকিয়ে আছে। হাত বাড়াচ্ছে না। আমাকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে না। আমি আবারো বললাম, কী, মানিব্যাগ নিতে চান? নিতে চাইলে নেন।

পানমুখের যুবক আবারো পিক ফেলল। সে একটু চিন্তিতমুখে তার ওস্তাদের দিকে তাকাচ্ছে। ওস্তাদের নির্দেশের অপেক্ষা। ওস্তাদ নির্দেশ দিচ্ছেন না। সময় নিচ্ছেন। পরিস্থিতি তিনি যত সহজ ভেবেছিলেন এখন তত সহজ মনে হচ্ছে না। চট করে ডিসিশান নেওয়া যাচ্ছে না।

জায়গাটা নির্জন নয়। ঢাকা শহরে নির্জন জায়গা নেই। তবে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সে-জায়গাটায় এই মুহূর্তে লোকচলাচল নেই। ওস্তাদ এবং শাগরেদ আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওস্তাদের বাঁ হাত তার প্যান্টের পকেটে। লোকটি সম্ভবত বাঁয়া। এবং সে তার বাঁ হাতে ক্ষুর ধরে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে ক্ষুর বের করবে। সেই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা।

আমি হঠাৎ করেই লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা শুরু করলাম। তারা একটু হকচকিয়ে গেল, তবে তৎক্ষণাৎ আমার পেছনে পেছনে আসতে শুরু করল। ওস্তাদ বিশেষ ভঙ্গিতে কাশলেন, সঙ্গে সঙ্গে শাগরেদ প্রায় দৌড়ে আমার সামনে চলে এল। এখন আমরা তিনজন হাঁটছি। শাগরেদ সবার আগে, মাঝখানে আমি এবং পেছনে ওস্তাদ। ওরা আমার হাত থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে দৌড় দিচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না। সবচে সহজ এবং যুক্তিযুক্ত কাজ হল মানিব্যাগ নিয়ে দৌড় দেওয়া। অবিশ্যি এদের নানান রকম টেকনিক আছে। এরা কোন টেকনিক ফলো করছে কে জানে!

কাকরাইলের আশপাশের রাস্তার একটা নিয়ম হল কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একদল তবলিগ জামাতি কোত্থেকে যেন উদয় হয়। এখানেও তা-ই হল। দশ-এগার জনের একটা দল পোঁটলা-পুঁটলি, বদনা, ছাতা নিয়ে উপস্থিত। হাসিখুশি কাফেলা। তারা চলছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। আমি মাথা ঘুরিয়ে আমার পেছনের ওস্তাদের দিকে তাকালাম। বেচারার মুখ হতাশায় মিইয়ে গেছে। নিচের ঠোঁট আরো নেমে গেছে। ভালো একটা শিকার পেয়েছিল। সেই শিকার হাসিমুখে তবলিগ জামাতিদের দলে ভিড়ে গেছে।

তবলিগের দল কাকরাইল মসজিদের দিকে চলে গেল। আমি ইচ্ছা করলে ওদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারতাম। তা করলাম না। আমি রওনা হলাম চায়ের দোকানের দিকে। ওস্তাদ এবং শাগরেদের মধ্যে নতুন উৎসাহ দেখা দিল। তারা চোখে-চোখে কিছু কথা বলল। দুজনই একসঙ্গে সিগারেট ধরাল। তারাও আসছে। আসুক। চা-টা একসঙ্গে খাই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই মজাদার নাটকের ভেতর ঢুকে গেছি। ভালো লাগছে। নাটকের শেষটা রক্তারক্তি পর্যন্ত না গড়ালেই হয়।

চায়ের দোকানের মালিকের নাম কাওছার মিয়া। এক মধ্যরাতে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। কাওছার মিয়ার ধারণা সেই রাতে আমি তাকে ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে

উদ্ধার করেছিলাম। মধ্যরাতের পরিচিতজনরা সাধারণত সন্ধ্যারাতে কেউ কাউকে চেনে না। কাওছার মিয়া চিনল। "আরে হিমু ভাইয়া, আফনে!" এই বলে যে-চিৎকার দিল তাতে নামায ভঙ্গ করে কাকরাইল মসজিদের মুসুল্লিদের ছুটে আসার কথা। তাঁরা ছুটে এলেন না, তবে ওস্তাদ ও শাগরেদের আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। কাওছার মিয়া চায়ের দোকানের মালিক হলেও তাকে দেখাচ্ছে ভীমভবানীর মতো। সে আদর করে কারো পিঠে থাবা দিলে সেই মানব-সন্তানের মেরুদণ্ডের বেশ কিছু হাড় খুলে পড়ে যাবার কথা।

কাওছার মিয়া চিৎকার দিয়েই থামল না, দোকান ফেলে ছুটে এসে পায়ে পড়ে গেল। যেন অনেক দিন পর শিষ্য তার গুরুর দেখা পেয়েছে। চরণধূলি না নেওয়া পর্যন্ত শিষ্য-গুরুর সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ হবে না।

'আফনেরে যে আবার দেখমু ভাবি নাই। আল্লাহপাকের খাস রহমতে আফনেরে পাইছি। আছেন কেমুন হিমু ভাই?'

'ভালো।'

'আফনে একটা বড়ই আচায্য মানুষ। অখন কন কেমনে আফনের খেদমত করি।'

'চা খাওয়াও। পয়সা কিন্তু দিতে পারব না।'

কাওছার হতভম্ব গলায় বলল, পয়সার কথা তুললেন? এর থাইক্যা জুতা দিয়া দুই গালে দুইটা বাড়ি দিতেন।

আমি ওস্তাদ ও শাগরেদকে দেখিয়ে বললাম, আমার দুজন গেস্ট আছে। এদেরও চা দাও।

কাওছার মিয়া তার সবকটা দাঁত বের করে বলল, আর কী খাইবেন কন।

'আর কিছু লাগবে না।'

'ছিরগেট? ছিরগেট আইন্যা দেই?'

'দাও।'

কাওছার মিয়া দোকানের ছেলেটাকে পান-সিগারেট আনতে পাঠাল। তিনশলা বেনসন। তিনটা মিষ্টি পান, জরদা "আলিদা"।

ওস্তাদ ও শাগরেদ পুরোপুরি থমকে গেল। তবে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। এখন তাদের চোখ আমার হাতে-ধরা মানিব্যাগের দিকে। আমি চায়ের কাপ তাদের দিকে বাড়িয়ে বললাম, ভাই, চা খান। অনেকক্ষণ আমার পিছনে পিছনে ঘুরছেন, নিশ্চয়ই টায়ার্ড।

ওস্তাদ বললেন, চা খাব না।

শাগরেদও সঙ্গে সঙ্গে বলল, চা খাব না।

কাওছার মিয়া চোখ কপালে তুলে বলল, হিমু ভাইয়া চা সাধতেছে, আর চা খাইবেন না! কন কী আফনে? আচায্য ঘটনা! ধরেন, চা নেন।

ওস্তাদ ও শাগরেদ দুজনেই শুকনো মুখে চায়ের কাপ তুলল। কাওছার মিয়া তার বেনসন সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আফনাদের পরিচয়?

ওস্তাদ ও শাগরেদ মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছে। আমি তাদের পরিচয়দান থেকে রক্ষা করলাম। কাওছারকে বললাম, শোনো কাওছার মিয়া। আমি একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে

পেয়েছি। মানিব্যাগে টাকার পরিমাণ ভালোই, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার তো বটেই! টাকাটা দিয়ে কী করা যায় বল তো!

কাওছারের মুখ হাঁ হয়ে গেল। সে বিড়বিড় করে বলল, খাইছে রে! আমি ওস্তাদ ও শাগরেদের দিকে তাকালাম। তারা মনে হচ্ছে দুঃখে কেঁদে ফেলবে। আমি তাদের দিকে মানিব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, ভালো করে দেখুন তো কোনো ঠিকানা-লেখা কাগজ আছে কি না। আর টাকাটাও গুনে দেখুন। ঠিকানা পাওয়া গেলে চলুন দিয়ে আসি। এতগুলি টাকা একা একা নিয়ে যাওয়া ঠিক না। আমার নাম হিমু, আপনাদের পরিচয়টা কী?

ওস্তাদ বিড়বিড় করে বললেন, আমার নাম মোফাজ্জল। আর এ জহিরুল।

'ঠিকানা পাওয়া গেছে?'

'টুকরা কাগজ অনেক আছে—কোনটা ঠিকানা কে জানে!'

'ওই দেখে দেখে বের করে ফেলব। আপনাদের কাজ না থাকলে চলুন আমার সঙ্গে। কাজ আছে?'

'না।'

'তা হলে মানিব্যাগটা আপনার পকেটে রাখুন। আমার পাঞ্জাবির পকেট নেই। আপনাদের পাওয়ায় আমার সুবিধাই হল।'

মোফাজ্জল আমার দিকে তাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। আমি তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে তার চেয়েও বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলাম। বিচিত্র হাসি বিচিত্র হাসিতে কাটাকাটি।

কাওছার উৎসাহের সঙ্গে বলল, টেকাটা আগে গনেন। কত টেকা?

জহিরুল টাকা গুনছে। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই গুনছে। কাওছার বলল, আরেক দফা চা দিমু হিমু ভাই?

'দাও।'

'মোফাজ্জল ভাই, জহিরুল ভাই, আফনেরারে দিমু?'

জহিরুল টাকা গোনায় ব্যস্ত। সে কিছু বলল না। মোফাজ্জল উদাস গলায় বলল, দাও।

আমরা রাত দুটার দিকে ঝিকাতলার এক টিনের বাড়ির দরজায় প্রবল উৎসাহে কড়া নাড়তে লাগলাম। আমরা কড়া নাড়ছি বলা ঠিক হচ্ছে না। আমি কড়া নাড়ছি, বাকি দুজন চিমশামুখে দাঁড়িয়ে আছে। এরা আমাকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে না, আবার সঙ্গে থাকার কোনো কারণও বোধহয় খুঁজে পাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর এক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। পঞ্চাশ-ষাট হবে বয়স। মাথার চুল ধবধবে সাদা। ভদ্রলোক মনে হয় অসুস্থ। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আমাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছেন, কিন্তু চোখের পলক ফেলছেন না। আমি বললাম, আপনার কি কোনো মানিব্যাগ হারিয়েছে?

ভদ্রলোক কিছু বললেন না, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, মানিব্যাগে অনেকগুলি টাকা ছিল। আমার ধারণা আপনারই মানিব্যাগ।

ভদ্রলোক বাড়ির ভিতরের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় ডাকলেন, মীরা! মীরা!

মীরা বের হয়ে এল। আমি হিমু না হয়ে অন্য কেউ হলে তৎক্ষণাৎ মেয়েটির প্রেমে পড়ে যেতাম। কী মিষ্টি যে তার মুখ! মনে হচ্ছে এইমাত্র সে গোসল করে চোখে কাজল দিয়ে এসেছে। সব রূপবতী মেয়ের চোখ বিষণ্ন হয়। এই মেয়ের চোখও বিষণ্ন।

ভদ্রলোক বললেন, মা, তোকে আমি বলেছিলাম না টাকাটা পাওয়া যাবে? এখন বিশ্বাস হল?

মীরা তাকাল আমার দিকে। আমি বললাম, ভালো আছেন?

মীরা ভুরু কুঁচকে ফেলল। আমি মোফাজ্জলের দিকে তাকিয়ে বললাম, মানিব্যাগ দিয়ে দিন। মোফাজ্জল কঠিন গলায় বলল, মানিব্যাগ যে উনাদের তার প্রমাণ কী?

আমি উদাস গলায় বললাম, প্রমাণ লাগবে না। মীরা, তুমি টাকাটা গুনে নাও।

মীরার কোঁচকানো ভুরু আরো কুঁচকে গেল। আমার মতো অভাজন তাকে তুমি করে বলবে তা সে মেনে নিতে পারছে না। মানিব্যাগ-সংক্রান্ত জটিলতা না থাকলে সে নিশ্চয়ই শুকনো গলায় বলত, আমাকে তুমি করে না বললে খুশি হব।

মোফাজ্জল অপ্রসন্ন মুখে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল। এরকম অপ্রীতিকর কাজ সে মনে হয় তার জীবনে আর করে নি। মোফাজ্জলের চেয়েও বেশি মন খারাপ হয়েছে তার টেণ্ডল জহিরুলের। জহিরুল মনে হয় মনের দুঃখে কেঁদেই ফেলবে।

ভদ্রলোক আবারো মীরাকে বললেন, বলেছিলাম না সব টাকা ফেরত পাব, বিশ্বাস হল? তুই তো কেঁদে অস্থির হচ্ছিলি। নে, টাকাটা গুনে দেখ। সাঁইত্রিশ হাজার নয়শ একুশ টাকা আছে।

মীরা বলল, গুনতে হবে না।

ভদ্রলোক বললেন, আহা, গুনে দেখ-না!

আমি বললাম, মীরা, তুমি সাবধানে গুনতে থাক। আমরা চললাম।

শুরুতেই তুমি বলায় মেয়েটা রেগে গেছে, তাকে আবারো তুমি বলে আরো রাগিয়ে দিয়ে বের হয়ে এলাম।

মোফাজ্জল ক্রুদ্ধ গলায় বলল, এতগুলা টাকা ফেরত পেয়েছে তার কোনো আলামত নাই। শালার দুনিয়া! লাথি মারি এমন দুনিয়ারে!

জহিরুল বলল, এক হাজার টাকা বকশিশ দিলেও তো একটা কথা ছিল! কী বলেন ওস্তাদ? বকশিশ না দেওয়াটা অধর্ম হয়েছে।

আমি বললাম, বকশিশ পেলে কী করতেন?

জহিরুল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, কী আর করতাম—মাল খাইতাম। গত চাইরদিনে তিন আঙ্গুল পরিমাণ বাংলা খাইছি। তিন আঙ্গুল বাংলায় কী হয় কন। তিন আঙ্গুল মাল ইচ্ছা করলে একটা মশাও খাইতে পারে। মাল খাওয়া তো দূরের কথা, আজ সারাদিনে ভাতও খাই নাই। আপনার পিছে পিছে বেফিকির হাঁটতেছি। আইজ যত হাঁটা হাঁটছি একটা ফকিরও অত হাঁটা হাঁটে না।

মোফাজ্জল বিরক্ত মুখে বলল, চুপ কর। এত কথার দরকার কী! হিমু ভাইয়া বিদায় দেন, আমরা এখন যাই।

'যাবেন কোথায়?'

'জানি না কই যাব।'

'আমার সঙ্গে চলেন, মাল খাওয়াব।'

মোফাজ্জল সরু চোখে তাকিয়ে রইল। সে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি বাস করা খুবই কষ্টকর। মোফাজ্জল আছে সেই কষ্টে।

'কী, যাবেন?'

'সত্যি মাল খাওয়াবেন?'

'হুঁ।'

'কী খাওয়াবেন—বাংলা?'

'বাংলা ইংরেজি জানি না, তবে খাওয়াব।'

'চলেন যাই।'

মোফাজ্জল অনিচ্ছার সঙ্গে হাঁটছে। তবে জহিরুলের চোখ চকচক করছে। কিছু মানুষ আছে যাদের জন্মই হয় শিষ্য হবার জন্যে। জহিরুল হল সেই মানুষ। এরা কখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি বাস করে না। এরা বাস করে বিশ্বাসের জগতে। যে যা বলে তা-ই বিশ্বাস করে।

জহিরুল বলল, হিমু ভাই, আপনেরে আমার পছন্দ হয়েছে।

'কেন?'

'জানি না কেন।'

'মাল খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি এই জন্যে?'

'হইতে পারে। আপনের পকেটে সিগারেট আছে হিমু ভাই? একটা সিগারেট দেন ধরাই।'

'আমার পাঞ্জাবির পকেটই নেই, আবার সিগারেট!'

'সত্যই আপনের পাঞ্জাবির পকেট নাই!'

পাঞ্জাবির পকেট যে নেই তা আমি দেখালাম। মোফাজ্জল বলল, টাকা-পয়সা কই রাখেন? পায়জামার সিক্রেট পকেটে?

আমি হাসিমুখে বললাম, আমার কোনো সিক্রেট পকেট নেই। আমি সঙ্গে কখনো টাকা-পয়সা রাখি না।

মোফাজ্জল আবারো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি জগতে চলে গেল। আগের অবস্থা, আমার কথা বিশ্বাসও করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। সে দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। তবে জহিরুল আমার কথা বিশ্বাস করেছে।

আমি তাদের নিয়ে বাদলদের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। এত রাতে কারোরই জেগে থাকার কথা না, কিন্তু আমি জানি তারা সবাই জেগে আছে।

আমার মন বলছে—প্রবল ভাবেই বলছে। কিছু-কিছু সময় আমার ইনটিউশন খুব কাজ করে।

আমি মেজো ফুপার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি বাদলের ত্রিসীমানায় থাকব না। নির্বিঘ্নে বাদলের বিয়ে হয়ে যাবে। এখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রাত আড়াইটায় দুই উটকো লোক নিয়ে উপস্থিত হলে ঘটনা কী ঘটবে কে জানে! মেজো ফুপা ব্যাপারটা খুব সহজভাবে

নেবেন বলে মনে হয় না। তবে সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ যে তিনি ইতিমধ্যে বোতল নিয়ে ছাদে চলে গেছেন। কারণ আজ বুধবার। ফুপার মদ্যপান দিবস। বোতল নিয়ে বসার জন্যে সুন্দর অজুহাতও আছে—ছেলের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। এই তো সেদিন ছোট্ট একটা ছেলে ছিল, শীতের দিনে বিছানায় পিপি করে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলত, মা, কে যেন পানি ফেলে দিয়েছে। সে আজ বিয়ে করে বউ আনতে যাচ্ছে। এ তো শুধু আনন্দের ঘটনা না, মহা আনন্দের ঘটনা। সেই আনন্দটাকে একটু বাড়িয়ে দেবার জন্যে সামান্য কয়েক ফোঁটা দিয়ে গলা ভেজানো।

মেজো ফুপা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকলে কোনো সমস্যা হবে না। মোফাজ্জল এবং জহিরুল এরাও ভাগ পাবে। মদ্যপায়ীরা মদের ব্যাপারে খুব দরাজদিল হয়। দশটা টাকা ধার চাইলে এরা দেবে না, কিন্তু তিন হাজার টাকা দামের বোতলের পুরোটা আনন্দের সঙ্গে অন্যকে খাইয়ে দেবে।

যা ভেবেছি তা-ই।

বাড়ির সব বাতি জ্বলছে। হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আনন্দ উছলে পড়ছে। খোলা জানালায় সেই আনন্দ উছলে বের হয়ে আসছে। হাসির শব্দ, হইচইয়ের শব্দ, ছোট বাচ্চাদের কান্নাকাটির শব্দ। আমি কলিংবেলে হাত রাখার আগেই দরজা খুলে গেল। মেজো ফুপু দরজা খুললেন। তাঁর পরনে লাল বেনারসি, ইদানীংকার ফ্যাশনের মতো কপালে সিঁদুর। মেজো ফুপু হাসিমুখে বললেন, কী রে হিমু, তুই এত দেরি করলি? তোর জন্যে বাদল এখনো না খেয়ে বসে আছে।

আমি হাসলাম। "দেরি করার অপরাধে খুবই লজ্জিত" এই টাইপের হাসি। ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছি না। বাদলের বিয়ে হয়ে গেল নাকি? বিয়ে বোধহয় না। মনে হচ্ছে গায়ে-হলুদ। ফুপুর কপালে হলুদ লেগে আছে।

'আশ্চর্য, একটা দিন সময়মতো আসবি না, আমি কি রোজই ছেলের বিয়ে দেব? গায়ে-হলুদের এমন জমজমাট অনুষ্ঠান—আর তুই নেই! বাদল অস্থির হয়ে আছে তোর জন্যে। ঝিম মেরে আছিস, ব্যাপার কী? কথা বলছিস না কেন?'

'তোমাকে আসলে চিনতেই পারি নি। এইজন্যেই চুপ করে ছিলাম। মাই গড, তোমাকে তো দারুণ লাগছে! কে বলবে তোমার ছেলের বিয়ে! মনে হচ্ছে তোমারই বিয়ে হয় নি।'

'পাম-দেওয়া কথা বলবি না তো! দরজায় দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়, ভেতরে আয়।'

আমি গলা নিচু করে বললাম, ফুপু, আমার দুজন গেস্ট আছে, ওদের নিয়ে আসব?

'ওরা কোথায়?'

'রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। বাড়িতে ঢুকতে দাও কি না-দাও জানি না তো!'

'তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি দিনদিন চলে যাচ্ছে নাকি? আমার ছেলের বিয়েতে তুই বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবি না তো কি পাড়ার লোকের বিয়েতে আসবি! আর তোর আক্কেলটাই-বা কী রকম! রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলি কোন হিসাবে—ওরা না-জানি কী ভাবছে!'

'কিছুই ভাবছে না, আমি নিয়ে আসছি। ফুপা কি বাসায় আছেন?'

'বাসায় থাকবে না তো যাবে কোথায়? একটা অজুহাত পেয়েছে ছেলের বিয়ে—বোতল নিয়ে ছাদে চলে গেছে। বাড়িভরতি লোকজন। না-জানি কী ভাবছে!'

'তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে ফুপু! শাড়ি কি কোনো নতুন কায়দায় পরেছ? মোটাটা অনেকটা ঢাকা পড়েছে।'

'সত্যি বলছিস?'

'অবশ্যই সত্যি বলছি।'

'রীণাও বলছিল আমাকে নাকি স্লিম লাগছে। তুই কথা বলে সময় নষ্ট করিস না তো! তোর বন্ধুদের নিয়ে আয়, আমি খাবার গরম করছি।'

'বন্ধুরা কিছু খাবে না ফুপু। ওরা খেয়ে এসেছে। আমি বাদলের সঙ্গে খাব, ওরা ছাদে বসে ফুপার সঙ্গে গল্প করবে।'

ফুপা আমাকে দেখে আনন্দে অভিভূত হলেন। মাতালরা একটা পর্যায়ে যে-কোনো ব্যাপারে আনন্দে অভিভূত হয়। তাঁর এখন সেই অবস্থা চলছে। ফুপার মনেই নেই যে তিনি আমাকে আসতে নিষেধ করেছেন।

'আরে হিমু! হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'ফুপা, এরা হল আমার দুই বন্ধু, একজন মোফাজ্জল আর একজন জহিরুল।'

ফুপা মধুর গলায় বললেন, তোমরা কেমন আছ? তুমি করে বললাম। কিছু মনে কোরো না আবার! হিমু হচ্ছে আমার ছেলের মতো, সেই হিসেবে তোমরাও আমার ছেলে। হা হা হা, দাঁড়িয়ে আছ কেন, বসো। খুব ঠাণ্ডা তো, এইজন্যেই দুফোঁটা হুইস্কি খাচ্ছি। তার ওপর ছেলের বিয়ে—মহা আনন্দের ব্যাপার! মেয়ের বিয়ে হলে কষ্টের ব্যাপার হত। মেয়ের বিয়ে মানে মেয়ের বিদায়। ছেলের বিয়ে মানে নতুন একটা মেয়েপ্রাপ্তি। এই উপলক্ষে সামান্য মদ্যপান করা যায়। ঠিক না?

জহিরুল বলল, এই দিনে যদি মদ না খান খাবেন কবে!

'এই ব্যাপারটাই তো তোমাদের ফুপুকে বোঝাতে পারছিলাম না। শরৎচন্দ্রের দেবদাস পড়ে মেয়েরা ধরেই নিয়েছে মদ একটা ভয়াবহ ব্যাপার। পরিমিত মদ্যপান যে হার্টের কত বড় অষুধ তা এরা জানে না। টাইম পত্রিকায় একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছে—সেখানে পরিষ্কার লেখা যারা পরিমিত মদ্যপান করে তাদের হার্ট অ্যাটাকের রিস্‌ক্ অর্ধেক কমে যায়। তোমরা কি একটু খেয়ে দেখবে?'

মোফাজ্জল বলল, জি না, জি না। আপনি মুরুব্বি মানুষ।

'লজ্জা করবে না তো, খাও। এত বড় একটা আনন্দ-উৎসবে আমি একা একা বসে আছি। তোমরা আসায় তাও কথা বলার লোক পাচ্ছি। হিমু যা তো, দুটা গ্লাস এনে দে। বোতল আরেকটা লাগবে। আমার ঘরে চলে যা। বুকশেলফের তিন নম্বর তাকে বইগুলোর পেছনে একটা ব্ল্যাক ডগের বোতল আছে। এইসব জিনিস একা খেয়ে কোনো আনন্দ নেই—তাই না তফাজ্জল?'

'স্যার, আমার নাম মোফাজ্জল।'

'স্যার বলছ কেন? আমি হিমুর ফুপা, তোমারও ফুপা। এই যে শুটকা ছেলেটা তারও ফুপা। তোমার নাম যেন কী?'

'জহিরুল।'

‘শুটকা ছেলে বলায় রাগ কর নি তো?’

‘জি না।’

‘তোমার ফুপুকে দেখার পর পৃথিবীর যে-কোনো মানুষকেই আমার কাছে শুটকা মনে হয়। একবার কী হয়েছে শোনো। প্লেনে করে চিটাগাং যাচ্ছি—সে দেখি প্লেনের সিটে ঢোকে না। হাস্যকর ঘটনা। এয়ার হোস্টেস, আমি দুজনে মিলে ঠেলাঠেলি। এখনো মনে করলে লজ্জায় মরে যাই।’

আমি নিচে চলে এলাম। মোফাজ্জল আর জহিরুলকে নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। তারা মনের সুখে ব্ল্যাক ডগ খেতে পারবে। ফুপা যত্ন করে মুখে তুলে তুলে খাওয়াবেন। বোতল শেষ হলেও কোনো সমস্যা নেই। বিচিত্র সব জায়গা থেকে নতুন নতুন বোতল বের হবে। শেষের দিকে সিচুয়েশন আউট অব হ্যান্ড হয়ে যাবার সম্ভাবনাও অবিশ্যি আছে। এক মাতাল হয় বিষণ্ন প্রকৃতির, দুই মাতাল হয় মিত্রভাবাপন্ন। তিন মাতাল সর্বদাই ভয়াবহ।

খাওয়া শেষ করে আমি বাদলের ঘরে গিয়ে বসেছি। বাদলের গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে রাখি। চোখেমুখে লজ্জিত একটা ভাব। বিবাহ-নামক অপরাধ করতে যাচ্ছে এই কারণে সে যেন ছোট হয়ে আছে। তাকে দেখাচ্ছেও খুব সুন্দর। বিয়ের আগে-আগে শুধু যে মেয়েরাই সুন্দর হয়ে যায় তা না, ছেলেরাও সুন্দর হয়। আমি বাদলের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি।

‘বাদল, তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। গায়ের রঙও তো মনে হয় খোলতাই হয়েছে।’

বাদল হাসিমুখে বলল, হলুদ দিয়ে ডলাডলি করে গায়ের চামড়া তুলে ফেলেছে, রং তো খোলতাই হবেই।

‘বিয়ে হচ্ছে যার সঙ্গে সেই মেয়েটার নাম কী?’

‘পুরোনো ধরনের নাম—আঁখি।’

‘মেয়েটা কেমন?’

‘জানি না কেমন। কথা হয় নি তো!’

‘খুব সুন্দর?

‘সবাই তো তা-ই বলছে।’

‘তুই বলছিস না?’

বাদল লজ্জা-লজ্জা গলায় বলল, আমিও বলছি।

‘তোর খুব ভালো একটা দিনে বিয়ে হচ্ছে। ২২ ডিসেম্বর। অদ্ভুত!’

‘২২ ডিসেম্বর কি খুব শুভদিন হিমুদা?

‘বৎসরের সবচেয়ে লম্বা রাতটা হল ২২ ডিসেম্বরের রাত। তোরা দুজন গল্প করার জন্যে অনেক সময় পাবি। এই কারণেই শুভ।’

বাদল লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, আঁখির সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলব সেটাই বুঝতে পারছি না! বোকার মতো হয়তো কিছু বলব, পরে সে এটা নিয়ে হাসাহাসি করবে।

‘করুক-না হাসাহাসি! তোর যা মনে আসে তুই বলবি। দুই-একটা কবিতাটবিতা মুখস্থ করে যা।’

'কী কবিতা?'

'প্রেমের কবিতা।'

'প্রেমের তো অনেক কবিতা আছে, কোনটা মুখস্থ করব সেটা বলো।'

'কোনটা বলব, আমার তো দুই-তিন লাইনের বেশি কোনো কবিতা মনে থাকে না।'

'দুই-তিন লাইনই বলো। এক সেকেন্ড দাঁড়াও—আমি কাগজ-কলম নিয়ে আসি—লিখে ফেলি।'

বাদল গম্ভীর ভঙ্গিতে বলপয়েন্ট আর কাগজ নিয়ে বসেছে। আমি কবিতা বলব, সে লিখে মুখস্থ করবে, বাসররাতে তার স্ত্রীকে শোনাবে। হাস্যকর একটা ব্যাপার, কিন্তু আমার কেন জানি হাস্যকর লাগছে না। বাদল বলল, কই, চুপ করে আছ কেন, বলো!

আমি বললাম, লিখে ফেল—

এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।
নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে পাহাড় তাকে সয় না।
এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।
কীভাবে হয়? কেমন করে হয়?
কেমন করে ফুলের কাছে রয়
গন্ধ আর বাতাস দুই জনে...
এভাবে হয়, এমন ভাবে হয়।

বাদল বলল, এটা কার কবিতা, তোমার?

'পাগল হয়েছিস? আমি কবিতা লিখি নাকি? এই কবিতা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের।'

'কতদিন পর তোমাকে দেখছি, কী যে অদ্ভুত লাগছে!'

'অদ্ভুত লাগছে?'

'হুঁ, লাগছে। আঁখির সঙ্গে বেশি গল্প হবে তোমাকে নিয়ে।'

'ওকে নিয়ে আবার খালিপায়ে হাঁটতে বের হবি না তো!'

'অবশ্যই বের হব। আমি পরব হলুদ পাঞ্জাবি ওকে পরাব হলুদ শাড়ি। তারপর...'

'তারপর কী?'

'সেটা বলতে পারব না, লজ্জা লাগছে। হিমুদা শোনো, তোমার জন্যে আমি খুব সুন্দর একটা গিফট এনেছি। আন্দাজ করো তো কী?'

'আন্দাজ করতে পারছি না।'

'একটা খুব দামি স্লিপিং-ব্যাগ নিয়ে এসেছি। তুমি তো যেখানে-সেখানে রাত কাটাও—ব্যাগটা থাকলে সুবিধা—ব্যাগের ভেতর ঢুকে পড়বে। স্লিপিং-ব্যাগের কালার তোমার পছন্দ হবে না। মেরুন কালার। অনেক খুঁজেছি—হলুদ পাই নি।'

বাদল স্লিপিং-ব্যাগ নিয়ে এল। বোঝাই যাচ্ছে—অনেক টাকা দিয়ে কিনেছে।

'হিমুদা পছন্দ হয়েছে?'

'খুব পছন্দ হয়েছে।'

'ব্যাগটা থাকায় তোমার খুব সুবিধা হবে। ধরো তুমি জঙ্গলে জোছনা দেখতে গিয়েছ। অনেক রাত পর্যন্ত জোছনা দেখলে—ঘুম পেয়ে গেলে কোনো একটা গাছের নিচে ব্যাগ রেখে তার ভেতর ঢুকে গেলে।'

'আমার তো এখনই ব্যাগ নিয়ে জঙ্গলে চলে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'আমারও ইচ্ছে করছে—হিমুদা চলো, কাছেপিছের কোনো একটা জঙ্গলে চলে যাই—জয়দেবপুরের শালবনে গেলে কেমন হয়?'

'বিয়ের আগে তোর কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। বিয়ে হয়ে যাক, তারপর তুই আর আঁখি, হিমু ও হিমি...'

আমি বাক্যটা শেষ করার আগেই রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ফুপু ঢুকলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে খরখরে গলায় বললেন, তুই কাদের নিয়ে বাসায় এসেছিস? বাঁদর দুটাকে যোগাড় করেছিস কোথায়?

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কেন, ওরা কী করেছে?

'দুটাই তো ন্যাংটো হয়ে ছাদে নাচানাচি করছে! তোর ফুপাও নাচছে।'

'বল কী!'

'তুই এক্ষুনি এই মুহূর্তে এদের নিয়ে বিদেয় হবি।'

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। আমার বগলে বাদলের আনা মেরুন রঙের স্লিপিং-ব্যাগ।

ফুটপাতে যারা ঘুমায় দেখা যাচ্ছে তাদের কিছু নীতিমালা আছে। তারা জায়গা বদল করে না। ঘুমুবার জায়গা সবারই নির্দিষ্ট। যে নিউমার্কেটের পাশে ঘুমায় সে যদি সন্ধ্যাবেলায় বাসাবোতে থাকে—সেও হেঁটে হেঁটে নিউমার্কেটের পাশে এসে নিজের জায়গায় ঘুমুবে।

কাজেই বস্তা-ভাইকে খুঁজে বের করতে আমার অসুবিধা হল না। দেখা গেল সাত দিন আগে তারা যেখানে ঘুমাচ্ছিল এখনো সেখানেই ঘুমাচ্ছে। পিতা এবং পুত্র চটের ভেতরে ঢুকে আরামে নিদ্রা দিচ্ছে। আমি তাদের ঘুম ভাঙালাম। বস্তা-ভাইয়ের পুত্রের বয়স খুবই কম। চার-পাঁচ বছর হবে। কাঁচা ঘুম ভাঙায় সে খুবই ভয় পেয়েছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি বললাম, এই গাবলু, তোর নাম কী?

গাবলু জবাব দিল না। বাবার কাছে সরে এল। বাবা বিরক্তমুখে বলল, আফনের কী বিষয়? চান কী?

আমি হাসিমুখে বললাম, আমাকে চিনতে পারছেন না! আমি হচ্ছি আপনাদের সহনিদ্রক। একসঙ্গে ঘুমালাম—মনে নেই? শেষরাতে জ্বর উঠে গেল। আপনি রিকশা ডেকে—আমাকে ধরাধরি করে তুলে দিলেন।

'মনে আছে। আফনে চান কী?'

'কিছু চাই না। আপনাদের সঙ্গে ঘুমাব—অনুমতি চাচ্ছি।'

'অনুমতির কী আছে? গভমেন্টের জায়গা। ঘুমাইতে ইচ্ছা হইলে ঘুমাইবেন।'

আমি তাদের পাশে আমার স্লিপিং-ব্যাগ বিছালাম। পিতা এবং পুত্র দুজনেই চোখ

বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। ব্যাগের জিপার খুলে আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই জিনিসটার নাম স্লিপিং–ব্যাগ। এর অনেক সুবিধা—ভেতরে ঢুকে জিপার লাগিয়ে দিলে—শীত লাগবে না, মশা কামড়াবে না। বৃষ্টির সময় ভিজতে হবে না। চোর এসে তুলে নিয়ে চলে যেতে পারবে না। চোর যদি নিতে চায় আমাকেসুদ্ধ নিতে হবে।

বস্তা–ভাই তার বিস্ময় সামলাতে পারল না। ক্ষীণস্বরে বলল, এই জিনিসটার দাম কী রকম ভাইজান?

আমি ঘুম–ঘুম গলায় বললাম, জানি না। বলেই জিপার লাগিয়ে দিলাম। স্লিপিং–ব্যাগটা আমি আসলে এনেছি এই দুজনকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেবার জন্যে। হিমুরা স্লিপিং–ব্যাগ নিয়ে পথে হাঁটে না। আমি ঠিক করেছি বাকি রাতটা স্লিপিং ব্যাগে ঘুমাব। সকালে ব্যাগ থেকে বের হয়ে এক কাপ চা খাব। তারপর পিতা এবং পুত্রকে ব্যাগটা উপহার দিয়ে চলে যাব। আহা, এই দুজন আরাম করে ঘুমাক। ছেলেটার চেহারা খুব মায়াকাড়া। কী নাম ছেলেটার? আচ্ছা, নামটা সকালে জানলেও হবে। এখন ভালো ঘুম পাচ্ছে। সামান্য দুশ্চিন্তাও হচ্ছে, বাদলদের বাড়ি থেকে মোফাজ্জল এবং জহিরুলকে নিয়ে আসা হয় নি। এরা এতক্ষণে কী কাণ্ড করছে কে জানে? মনের আনন্দে ছাদ থেকে লাফিয়ে না পড়লেই হয়।

স্লিপিং–ব্যাগটা আসলেই আরামদায়ক। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।

'ভাইজান, ও ভাইজান!

'কী?'

'আমার ছেলে আফনের এই জিনিসটা একটু হাত দিয়া ছুইয়া দেখতে চায়।'

'উঁহুঁ, ময়লা হবে। হাত যেন না দেয়।'

'জে আচ্ছা।'

'ছেলের নাম কী?'

'সুলায়মান।'

'ছেলের মা কোথায়?'

'সেইটা ভাইজান এক বিরাট হিস্টুরি।'

'থাক বাদ দিন, বিরাট হিস্টুরি শোনার ইচ্ছা নেই, ঘুম পাচ্ছে।'

'ভাইজান!'

'হুঁ।'

'জিনিসটার ভিতরে কি দুইজন শোয়া যায়?'

'তা যায়। বড় করে বানানো।'

'বালিশ আছে?'

'না, বালিশ নেই। বালিশের দরকার হয় না।'

'যদি কিছু মনে না নেন ভাইজান, সুলেমান জিনিসটার ভিতরে কী একটু দেখতে চায়। তার খুব শখ হইছে।'

আমি ভেতর থেকে বের হয়ে এলাম। পিতা এবং পুত্রের কাছে ব্যাগ বুঝিয়ে দিলাম।

তারা হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের হতভম্ব দৃষ্টি দেখে আমার চোখে পানি আসার উপক্রম হল। হিমুদের চোখে পানি আসতে নেই—আমি ওদের পেছনে ফেলে দ্রুত হাঁটছি। রাস্তার শেষ মাথায় এসে একবার পেছনে ফিরলাম। পিতা-পুত্র দুজনই ব্যাগের ভেতর ঢুকেছে। দুজনই মাথা বের করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কে জানে তারা কী ভাবছে।

৩

ঘুম ভেঙেই দেখি আমার বিছানার পাশের চেয়ারে বাদল বসে আছে। আমি চট করে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সাতসকালে বাদলের আমার পাশে বসে থাকার কথা না। আজ ২৩ ডিসেম্বর। কাল রাতে তার বিয়ে হয়েছে। বউ ফেলে ভোরবেলাতেই সে আমার কাছে চলে আসবে কেন? চোখ বন্ধ করে ব্যাপারটা একটু চিন্তা করা যাক।

আমি থাকি আগামসি লেনের একটা মেসে। মেসের ঠিকানা বাদল জানে না। শুধু বাদল কেন, আমার পরিচিত কেউই জানে না। বাদলকে সেই ঠিকানা খুঁজে বের করতে হয়েছে। সেটা তেমন জটিল কিছু না—আগে যে-মেসে ছিলাম সেই মেসের ম্যানেজার নিতাই কুণ্ডু বর্তমান মেসের ঠিকানা জানেন। তাঁকে যদিও বলা হয়েছে আমার ঠিকানা কাউকে দেবেন না—তার পরেও ভদ্রলোক দিয়েছেন। বাদল নিশ্চয়ই এমন কিছু বলেছে বা করেছে যে ঠিকানা না দিয়ে ভদ্রলোকের উপায় ছিল না। খুব সম্ভব কেঁদে ফেলেছে। বাদল খুব সহজে কাঁদতে পারে।

একবার মেসে ঢুকে পড়ার পর আমার ঘরে ঢোকা অবিশ্যি খুবই সহজ। আমি দরজা এবং জানালা সব খোলা রেখে ঘুমাই। হিমুকে তা-ই করতে হয়। আমার বাবা আমার জন্যে যে-উপদেশনামা লিখে রেখে গেছেন তার সপ্তম উপদেশ হচ্ছে—

> নিদ্রা ও জাগরণের যে বাঁধাধরা নিয়ম আছে, যেমন দিবসে জাগরণ নিশাকালে নিদ্রা—এইসব নিয়ম মানিয়া চলার কোনো আবশ্যকতা নাই। কোনোরকম বন্ধনে নিজেকে বাঁধিও না। খোলা মাঠ বা প্রান্তরে নিদ্রা দিতে চেষ্টা করিবে। কোনো প্রকোষ্ঠে শয়ন করিলে সেই প্রকোষ্ঠের দরজা-জানালা সবই খুলিয়া রাখিবে যেন নিদ্রাকালে খোলা প্রান্তরের সহিত তোমার নিদ্রাকক্ষের যোগ সাধিত হয়।
> নিদ্রাকালে তস্কর বা ডাকাত আসিয়া তোমার মালামাল নিয়া পলায়ন করিবে এই চিন্তা মাথায় রাখিও না, কারণ তস্কর আকর্ষণ করিবার মতো কিছু তোমার কখনোই থাকিবে না। যদি থাকে তবে তাহা তস্কর কর্তৃক নিয়া যাওয়াই শ্রেয়।

বাবার উপদেশ আমি অনেক দিন থেকেই মেনে চলছি। খোলা প্রান্তরে শোয়া সম্ভব হচ্ছে না—দরজা-জানালা খোলা ঘরে ঘুমাচ্ছি। তস্করের হাতে পড়েছি তিনবার। প্রথমবার সে একটা দামি জিনিসই নিয়ে গেছে—ওয়াকম্যান। সনি কোম্পানির ওয়াকম্যান আমাকে উপহার দিয়েছিল রূপা। রূপার উপহার দেয়ার পদ্ধতি খুব সুন্দর।

গিফট–র‍্যাপে মুড়ে লাল রিবনের ফুল লাগিয়ে বিরাট শিল্পকর্ম। রূপা গিফট আমার হাতে দিয়ে বলল, নাও, তোমার জন্মদিনের উপহার।

আমি বললাম, আজ তো আমার জন্মদিন না।

সে নিজের মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, তোমার কবে জন্মদিন সেটা তো আমি জানি না। তুমি আমাকে বলবেও না। কাজেই আমি ধরে নিলাম আজই জন্মদিন।

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা না, বলো থ্যাংক য়ু্য। উপহার পেলে ধন্যবাদ দেয়া সাধারণ ভদ্রতা। মহাপুরুষরা ভদ্রতা করেন না, তা তো না।'

'ধন্যবাদ। কী আছে এর মধ্যে?'

'একটা ওয়াকম্যান। তুমি তো পথে–পথেই ঘুরে বেড়াও। মাঝে মাঝে এটা কানে দিয়ে ঘুরবে। আমার পছন্দের তেরটা গান আমি রেকর্ড করে দিয়েছি।'

'আবারো ধন্যবাদ।'

আমি খুব যত্ন করে টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায় রূপার উপহার সাজিয়ে রাখলাম। সাজিয়ে রাখা পর্যন্তই। ব্যাটারির অভাবে গান শোনা গেল না। রূপা মূল যন্ত্র দিয়েছে, ব্যাটারি দেয় নি। আমারও কেনা হয় নি। মাঝে মাঝে যন্ত্রটা শুধু শুধু কানে দিয়ে বসে থাকতাম। কানের ফুটো বন্ধ থাকার জন্যেই বোধহয় শোঁ শোঁ শব্দ হত। সেই শব্দও কম ইন্টারেস্টিং ছিল না। যাই হোক, এক রাতে চোর (বাবার ভাষায়—তস্কর) এসে আমাকে ব্যাটারি কেনার যন্ত্রণা থেকে বাঁচাল।

দ্বিতীয় দফায় তস্কর এসে আমার স্যান্ডেলজোড়া নিয়ে গেল। হিমুর স্যান্ডেল থাকার কথা না—খালিপায়ে হাঁটাহাঁটি করার কথা। তার পরও একজোড়া চামড়ার স্যান্ডেল কিনেছিলাম। দাম নিয়েছিল দু শ তেত্রিশ টাকা। সাতদিনের মাথায় স্যান্ডেল চলে গেল।

তৃতীয় দফায় চোরের হাতে আমার বিছানার চাদর এবং বালিশ চলে গেল। আমার ঘুমন্ত অবস্থায় চোর কী করে বিছানার চাদর এবং বালিশ নিয়ে গেল সেই রহস্যের সমাধান এখনো হয় নি।

চোর–বিষয়ক সমস্যা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার কিছু নেই—আমার সামনে জটিল সমস্যা বসে আছে—বাদল। আমি চট করে দ্বিতীয়বার তাকে দেখে নিলাম। তার চোখেমুখে হতভম্ব ভাব। রাতে এক ফোঁটাও ঘুমায় নি তাও বোঝা যাচ্ছে। চোখের নিচে এক রাতেই কালি পড়ে গেছে। আনন্দময় নিশি–জাগরণে চোখের নিচে কালি পড়ে না। কাজেই গত রাতটা তার কাছে ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। তা হলে কি তার বিয়ে হয় নি?

আমি চোখ বন্ধ রেখেই বললাম, বাদল, তোর বিয়েটা কি কোনো কারণে ভেঙে গেছে?

বাদল বলল, হুঁ।

'চা খাবি?'

'হুঁ।'

'নিচে চলে যা। রাস্তা পার হলেই দেখবি তোলা উনুনে বাচ্চা একটা ছেলে চা বানাচ্ছে। ওর নাম মফিজ। মফিজকে বলে আয় দুকাপ চা পাঠাতে।'

'আমার বিয়েটা যে ভেঙে যাবে সেটা কি তুমি আগে থেকেই জানতে?'

'আগে থেকে জানব কীভাবে? আমি কি পীর-ফকির নাকি?'

'আমার মনে হয় তুমি জানতে। জানতে বলেই বরযাত্রী হিসেবে তুমি বিয়েতে যাও নি।'

'বরযাত্রী হিসেবে যাই নি, কারণ আমাকে ফুপা নিষেধ করে দিয়েছিলেন।'

'তোমাকে তো আমি কিছু বলি নি—তা হলে তুমি বুঝলে কী করে যে আমার বিয়ে হয় নি?'

'তোর চেহারা দেখে বুঝেছি। মানুষের সমগ্র অতীত তার চেহারায় লেখা থাকে। যারা সেই লেখা পড়তে পারে তারা মানুষকে দেখেই হড়হড় করে অতীত বলে দিতে পারে।'

'তুমি পার?'

'বেশি পারি না—সামান্য পারি। যা, চার কথা বলে আয়।'

বাদল উঠে দাঁড়াল। বাদলের চেহারা খুব সুন্দর। আজ এই সকালের আলোতে তাকে আরো সুন্দর লাগছে। ক্রিম কালারের এই শার্টটা তাকে খুব মানিয়েছে। যদি বিয়েটা হত তা হলে ভোরবেলায় বাদলকে দেখে আঁখি মেয়েটার মন ভালো হয়ে যেত। যতই মেয়েটা বাদলের কাছাকাছি যেত ততই সে বাদলকে পছন্দ করত। আমার ফুপা এবং ফুপুর চরিত্রের ভালো যা আছে তার সবই আছে বাদলের মধ্যে। ফুপা এবং ফুপুর অন্ধকার দিকের কিছুই বাদল পায় নি। বাদলের জন্যে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। যদিও হিমুর মন-খারাপ হতে নেই। বাবার উপদেশনামার তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে—

> জগতের কর্মকাণ্ড চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া যাইবে। কোনোক্রমেই বিচলিত হইবে না। আনন্দে বিচলিত হইবে না, দুঃখেও বিচলিত হইবে না। সুখ-দুঃখ এইসব নিতান্তই তুচ্ছ মায়া। তুচ্ছ মায়ায় আবদ্ধ থাকিলে জগতের প্রধান মায়ার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে না।

মুশকিল হচ্ছে, জগতের প্রধান মায়ার স্বরূপ বোঝার জন্যে কোনোরকম ব্যস্ততা এখনো তৈরি হয় নি। আমার আশপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মায়া আমাকে বড়ই বিচলিত করে।

মফিজ আমার জন্য যে চা বানায় তার নাম—ইসপিসাল, ডাবলপাত্তি। এই চায়ের বিশেষত্ব হচ্ছে ঘন লিকার, প্রচুর দুধ, প্রচুর চিনি। ইসপিসাল চা কাপে করে আসে না—প্রমাণ সাইজের গ্লাসভরতি হয়ে আসে। এক গ্লাস ইসপিসাল ডাবলপাত্তি খেলে সকালের নাশতা খেতে হয় না।

বাদল চায়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। তার মুখ থমথম করছে। আমি বললাম, সিগারেট খাবি?

'না, সিগারেট তো খাই না।'

'চা খেতে খেতেই ঘটনা কী বল।'

'ঘটনা বলে কী হবে?'

'তা হলে ভোররাতে এসেছিস কেন?'

বাদল চুপ করে রইল। আমি বললাম, কিছু বলতে ইচ্ছে না করলে বলতে হবে না। চা খেয়ে চলে যা।

'দেখি একটা সিগারেট দাও, খাই।'

আমি সিগারেট দিলাম। বাদল সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর মুখে প্রফেশন্যালদের মতো টানছে। নাকে-মুখে ভোঁস-ভোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছে।

'হিমুদা!'

'বল।

'বলার মতো কোনো ঘটনা না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমরা তো সবাই গেলাম—পনেরটা গাড়ি, দুটো মাইক্রোবাসে প্রায় এক শ জন বরযাত্রী। আগে থেকে কথা হয়ে আছে রাত আটটায় কাজী চলে আসবে। বিয়ে পড়ানো হবে। কাবিনের অ্যামাউন্ট নিয়ে যেন ঝামেলা না হয় সেজন্যে সব আগে থেকেই ঠিকঠাক করা। পাঁচ লক্ষ এক টাকা কাবিন।

কাজী চলে এল আটটার আগেই। উকিলবাবা কবুল পড়িয়ে মেয়ের সই নিতে যাবে মেয়ের বাবা বললেন, একটু সবুর করুন। নয়টা বেজে গেল। মেয়েপক্ষরা হঠাৎ বলল, আপনাদের খাওয়া হয়ে যাক। দুই-তিন ব্যাচে খাওয়া হবে, সময় লাগবে। তখন বাবা বললেন, বিয়ে হোক, তারপর খাওয়া। বিয়ের আগে কিসের খাওয়া! মেয়ের মামা বললেন—একটু সমস্যা আছে। সামান্য দেরি হবে।

কী ব্যাপার তারা কিছুতেই বলতে চায় না। অনেক চাপাচাপির পর যা জানা গেল তা হল—মেয়ের নাকি সকালবেলায় তার মার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছে। মেয়ে রাগ করে তার কোন এক বন্ধুর বাড়িতে চলে গেছে। সেখান থেকে টেলিফোন করেছিল, বলেছে চলে আসবে। কোথায় আছে তা কেউ জানে না বলে তাকে আনার জন্যেও কেউ যেতে পারছে না।

বাবা রাগ করে বললেন, মেয়ে কি তার প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে? এই কথায় মেয়ের মামা খুব রাগ করে বললেন, এইসব নোংরা কথা কী বলছেন? আমাদের মেয়ে সেরকম না। মার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। টেলিফোনে কথা হয়েছে। চলে আসবে, একটু অপেক্ষা করুন।

আমরা রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। বাসায় এসেও বিরাট লজ্জায় পড়লাম। বাবা বাসায় ব্যান্ডপার্টির ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। বর-কনে আসবে, ব্যান্ড বাজা শুরু হবে। আমাদের ফেরত আসতে দেখে ব্যান্ড বাজা শুরু হল। উদ্দাম বাজনা। পাড়ার লোক ভেঙে পড়ল। লজ্জায় আমার ইচ্ছা করছিল...'

'কী ইচ্ছা করছিল?'

বাদল চুপ করে গেল। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় চোখের পানি সামলাচ্ছে। আমি বললাম, তুই আমার কাছে এসেছিস কেন?

'এমনি এসেছি। মনটা ভালো করার জন্যে এসেছি।'

'মন ভালো হয়েছে?'

'না।'

'তা হলে চল আমার সঙ্গে, হাঁটাহাঁটি করবি। হাঁটাহাঁটি করলে মন ভালো হয়।'

'কে বলেছে?'

'আমি বলছি।'

বাদল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

'চিড়িয়াখানায় যাবি?'

'চিড়িয়াখানায় যাব কেন?'

'জীবজন্তু দেখলে মন দ্রুত ভালো হয়। চল বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ওদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দেখে আসি। তারপর চল হাতির পিঠে চড়ি। পারহেড দশ টাকা নিয়ে ওরা হাতির পিঠে চড়ায়। তোর কাছে টাকা আছে তো?'

'আছে! আমরা মিরপুর পর্যন্ত কি হেঁটে যাব?'

'অবশ্যই! ভালো কথা—তোর "হতে পারত শ্বশুরবাড়ির" টেলিফোন নাম্বার কি তোর কাছে আছে? টেলিফোন করে দেখতাম আঁখি বাসায় ফিরেছে কি না। একটা মেয়ে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে—সে ফিরেছে কি না সেটা জানা আমাদের দায়িত্ব না? আছে টেলিফোন নাম্বার?'

'হুঁ।'

'তুই ওদের টেলিফোন নাম্বার পকেটে নিয়ে ঘুরছিস কেন?'

'পকেটে করে ঘুরছি না—তোমার এখানে আসা যখন ঠিক করেছি তখন মনে হয়েছে তুমি ওদের টেলিফোন নাম্বার চাইতে পার, তাই মনে করে নিয়ে এসেছি।'

'ভালো করেছিস।'

'তুমি কি সত্যি মিরপুর পর্যন্ত হেঁটে যাবে?'

'হুঁ। ঘণ্টা দু-এক লাগবে—এটা কোনো ব্যাপারই না।'

আমি হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম। মনে হচ্ছে আজকের দিনটি হবে আমার জন্যে কর্মব্যস্ত একটি দিন।

পথে নেমেই শুনি কোকিল ডাকছে। তার মানে কী? শীতকালে কোকিল ডাকছে কেন?

'বাদল!'

'হুঁ।'

'কোকিল ডাকছে শুনছিস?'

'হুঁ।'

'ব্রেইন ডিফেক্ট কোকিল—অসময়ে ডাকাডাকি করছে।'

'হুঁ।'

'তুই কি ঠিক করেছিস হুঁর বেশি কিছু বলবি না?'

'কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'কোকিল সম্পর্কে একটা তথ্য শুনবি?'

'বলো।

'কোকিলের গলা কিন্তু এমনিতে খুব কর্কশ। সে মধুর গলায় তার সঙ্গীকে ডাকে মেটিং সিজনে। তখনই কোকিল-কণ্ঠ শুনে আমরা মুগ্ধ হই।'

'ভালো।'

'তোর কি একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না?'

'না।'

'পথে হাঁটার নিয়ম জানিস?'

'হাঁটার আবার নিয়ম কী, হাঁটলেই হল।'

'সবকিছুর যেমন নিয়ম আছে—হাঁটারও নিয়ম আছে। হাঁটতে হয় একা একা। বল তো কেন?'

'জানি না।'

'দুজন বা তার চেয়ে বেশি মানুষের সঙ্গে হাঁটলে কথা বলতে হয়। কথা বলা মানেই হাঁটার প্রথম শর্ত ভঙ্গ করা। হাঁটার প্রথম শর্ত হচ্ছে—নিঃশব্দে হাঁটা।'

'হুঁ।'

'হাঁটার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে হাঁটার সময় চারদিকে কী হচ্ছে দেখা, কিন্তু খুব গভীরভাবে দেখার চেষ্টা না করা। ইংরেজিতে "Glance"—চট করে তাকানো, "Look" না।'

'হুঁ।'

'হাঁটার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে পথে কোথাও থামা চলবে না। কাজেই তুই চট করে দাঁড়িয়ে পড়বি না।'

'আচ্ছা।'

'পেছন দিকে তাকানো চলবে না।'

'আচ্ছা।'

'তোর কি একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?'

বাদল জবাব দিল না। আমি বললাম, বাদল, তুই হাঁটার চতুর্থ শর্ত ভঙ্গ করছিস।

'চতুর্থ শর্তটা কী?'

'তুই মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছিস। হাঁটার সময় মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটা চলবে না।'

'ও আচ্ছা।'

'তোর হাঁটতে কষ্ট হলে রিকশা নিয়ে নি।'

'কষ্ট হচ্ছে না।'

'আচ্ছা, তুই একটা প্রশ্নের জবাব দে। খুব সহজ প্রশ্ন। রিকশাওয়ালাদের রিকশায় প্যাডেল চাপতে হয়। এই কাজটা করার জন্যে তাদের সবচে ভালো পোশাক হচ্ছে ফুলপ্যান্ট কিংবা পায়জামা। পুরোনো কাপড়ের দোকানে সস্তায় ফুলপ্যান্ট পাওয়া যায়। রিকশাওয়ালারা কিন্তু কেউই ফুলপ্যান্ট বা পায়জামা পরে না। তারা সব সময় পরে লুঙ্গি। এখন বল কেন? খুব সহজ ধাঁধা।'

'জানি না কেন। ধাঁধা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে না।'

'কী নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে?'

'কোনোকিছু নিয়েই ভাবতে ইচ্ছা করছে না।'

'চোখের কতগুলি প্রতিশব্দ বল তো! প্রথমটা আমি বলে দিচ্ছি—আঁখি।'

'বললাম তো হিমুদা, ধাঁধার খেলা খেলতে ইচ্ছা করছে না।'

'আহা আয়–না একটু খেলি! বল দেখি চোখ, আঁখি....তারপর?'

'চোখ, আঁখি, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, লোচন....'

'গুড, ভালোই তো বলেছিস!'

'হিমুদা, খিদে লেগে গেছে।'

'খিদে ব্যাপারটা কেমন ইন্টারেস্টিং দেখেছিস—তোর যত ঝামেলা, যত সমস্যাই থাকুক, খিদের সমস্যা সবসময় সবচে বড় সমস্যা।'

'ফিলসফি করবে না। ফিলসফি ভালো লাগছে না।'

'খিদের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানিস?'

'না।'

'খুব সহজ উপায়। বাহাত্তুর ঘণ্টা কিছু না খেয়ে থাকা। পানি পর্যন্ত না। বাহাত্তুর ঘণ্টা পর এক চামুচ বা দুচামুচ পানি খাওয়া যেতে পারে। বাহাত্তুর ঘণ্টা পার করার পর দেখবি খিদেবোধ নেই—শরীরে ফুরফুরে ভাব। মাথার ভেতরটা অসম্ভব ফাঁকা। মাঝে মাঝে ঝনঝন করে আপনাআপনি বাজনা বেজে ওঠে। আলোর দিকে তাকালে নানান রং দেখা যায়—তিনকোনা কাচের ভেতর দিয়ে তাকালে যেমন রং দেখা যায় তেমন রং।'

'তুমি দেখেছ?'

'হুঁ।'

'কতদিন না খেয়ে ছিলে?'

'বাহাত্তুর ঘণ্টা থাকার কথা, বাহাত্তুর ঘণ্টা ছিলাম।'

'বাহাত্তুর ঘণ্টা থাকার কথা তোমাকে কে বলল?'

'বাবা বলেছিলেন। আমার গুরু হচ্ছেন আমার পিতা। মহাপুরুষ বানাবার কারিগর। তোর কি খিদে বেশি লেগেছে?'

'হুঁ।'

'কী খেতে ইচ্ছে করছে?'

'যা খেতে ইচ্ছে করছে তা-ই খাওয়াবে?'

'আমি কি ম্যাজিশিয়ান নাকি, তুই যা খেতে চাইবি—মন্ত্র পড়ে তা-ই এনে দেব?'

'তুমি ম্যাজিশিয়ান তো বটেই। অনেক বড় ম্যাজিশিয়ান। অন্যরা কেউ জানে না, আমি জানি। আমার বাসি পোলাও খেতে ইচ্ছে করছে।'

'বাসি পোলাও মানে?'

'গতরাতে রান্না করা হয়েছে। বেঁচে গেছে, ফ্রিজে রেখে দেয়া হয়েছে। সেই বাসি পোলাওয়ের সঙ্গে গরম গরম ডিমভাজা।'

'খুব উপাদেয় খাবার?'

'উপাদেয় কি না জানি না। একবার খেয়েছিলাম, সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে। মাঝে মাঝে আমার এই খাবারটা খেতে ইচ্ছা করে। বাসি পোলাও তো আর চাইলেই পাওয়া যায় না। তবে তুমি চাইলে পাবে।'

'আমি চাইলে পাব কেন?'

'কারণ তুমি হচ্ছ মহাপুরুষ।'

'মহাপুরুষরা বুঝি চাইলেই বাসি পোলাও পায়?'

বাদল জবাব দিল না। আমি বললাম, আয় লাক ট্রাই করতে করতে যাই। রেসিডেনশিয়াল এরিয়ার ভেতর ঢুকে যাই। সব বাড়ির সামনে দাঁড়াব। কলিংবেল

টিপব—বাড়ির মালিক বের হলে বলব, আমরা একটা সার্ভে করছি। সকালবেলা কোন বাড়িতে কী নাশতা হয় তার সার্ভে। ইনকাম গ্রুপ এবং নাশতার প্রফাইল।'

'কী যে তুমি বল!'

'আরে আয় দেখি!'

'তুমি কি সত্যি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই সিরিয়াস। তবে সার্ভের কথা বলে শুধু হাতে উপস্থিত হওয়া চলবে না। কাগজ লাগবে, বলপয়েন্ট লাগবে। তুই বলপয়েন্ট আর কাগজ কিনে দে।'

'আমার ভয়-ভয় লাগছে হিমুদা।'

'ভয়ের কিছু নেই, আয় তো!'

প্রথম যে-বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়ালাম সেই বাড়ির নাম উত্তরায়ণ। বেশ জমকালো বাড়ি। গেটে দারোয়ান আছে। গেটের ফাঁক দিয়ে বাড়ির মালিকের দুটো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটা গাড়ি মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে কেনা হয়েছে। ঝকঝক করছে।

দারোয়ান বলল, কাকে চান?

আমি বললাম, আমরা স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো থেকে এসেছি। বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

'আপনার নাম?'

'হিমু।'

'কার্ড দেন।'

'আমার সঙ্গে কার্ড নেই। আমরা ছোট কর্মচারী, আমাদের সঙ্গে তো কার্ড থাকে না। আপনি ভেতরে গিয়ে খবর দিন। বলবেন স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো।'

দারোয়ান ভেতরে চলে গেল। বাদল বলল, ভয়-ভয় লাগছে হিমুদা। শেষে হয়তো পুলিশে দিয়ে দেবে। মারধোর করবে।

'ভয়ের কিছু নেই।'

'তোমার খালি পা। খালি পা দেখেই সন্দেহ করবে।'

'মানুষ চট করে পায়ের দিকে তাকায় না। তাকায় মুখের দিকে। তা ছাড়া আমাদের ভেতরে নিয়ে বসাবে। তখন খালি পায়ে বসলে ভাববে স্যান্ডেল বাইরে খুলে এসেছি।'

'তোমার মারাত্মক বুদ্ধি হিমুদা।'

'তোর মন-স্যাঁতসেঁতে ভাবটা কি এখন দূর হয়েছে?'

'হুঁ।'

'একটা উত্তেজনার মধ্যে তোকে ফেলে দিয়েছি যাতে আঁখি মেয়েটির চিন্তা থেকে আপাতত মুক্তি পাস।'

দারোয়ান এসে বলল, যান, ভিতরে যাইতে বলছে।

আমরা রওনা হলাম। বাদল ভালো ভয় পেয়েছে। তার চোখেমুখে ঘাম। তবে সে আঁখির হাত থেকে এখন মুক্ত।

আমাদের বসাল ড্রয়িংরুমের পাশে ছোট একটা ঘরে। এটা বোধহয় গুরুত্বহীন মানুষদের বসার জন্যে ঘর। দেশ থেকে লোক আসবে—এখানে বসবে। বিল নিতে আসবে, বসবে এই খুপরিতে।

এক ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে ঢুকলেন। বয়স্ক লোক। সকালবেলায় হঠাৎ যন্ত্রণায় তিনি বিরক্ত। বিরক্তি চাপার চেষ্টা করছেন, পারছেন না।

'আপনাদের ব্যাপারটা কী?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার, আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির সোসিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা সমীক্ষা চালাচ্ছি। সমীক্ষাটা হচ্ছে ঢাকা শহরের মানুষদের ব্রেকফাস্টের প্রোফাইল।

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, কিসের প্রোফাইল?

'কোন পরিবারে কী ধরনের নাশতা খাওয়া হয় এর উপর একটা জেনারেল স্টাডি। আজ আপনাদের বাসায় কী নাশতা হয়েছে, আপনি কী খেয়েছেন?'

'সকালে তো আমি নাশতাই খাই না। একটা টোস্ট খাই আর এক কাপ কফি খাই।'

আমি গম্ভীর মুখে কাগজে লিখলাম—টোস্ট, কফি।

'কফি কি ব্ল্যাক কফি?'

'না, ব্ল্যাক কফি না, দুধ কফি।'

'বাড়িতে নিশ্চয়ই অন্য সবার জন্যে কোনো একটা নাশতা তৈরি হয়েছে, সেটা কী?'

'দাঁড়ান, আমার ভাগ্নিকে পাঠাই। ও বলতে পারবে। এই জাতীয় স্টাডির কথা প্রথম শুনলাম। যেসব স্টাডি হবার সেসব হচ্ছে না—নাশতা নিয়ে গবেষণা!'

ভদ্রলোক চলে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে-মেয়েটি ঢুকল সে মীরা। গভীর রাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কুড়িয়ে পাওয়া মানিব্যাগ এই মেয়েটির হাতেই দিয়েছি। তবে এমন জমকালো বাড়িতে নয়। মেয়েটি আমাকে চিনতে পারল না। সেও ভদ্রলোকের মতোই বিরক্ত মুখে বলল, আজ এ-বাড়িতে কোনো নাশতা হয় নি। গতরাতে বাড়িতে একটা উৎসব ছিল। বড়মামার পঞ্চাশতম জন্মদিন। সেই উপলক্ষে পোলাও রান্না হয়েছে। অনেক পোলাও বেঁচে গেছে। ডিপ ফ্রিজে রাখা ছিল। সকালে সে-পোলাও গরম করে দেওয়া হয়েছে।

আমি সহজ গলায় বললাম, আমরা দুজন কি সেই বাসি পোলাও খেয়ে দেখতে পারি? পোলাওয়ের সঙ্গে ডিমভাজা।

বাদল চোখমুখ শুকনো করে ফেলল। মীরা তাকাল তীক্ষ্নদৃষ্টিতে।

আমি বললাম, তারপর মীরা, তুমি ভালো আছ?

মীরা এখনো তাকিয়ে আছে।

'আমাকে চিনতে পারছ তো? ওই যে তোমাকে টাকা দিয়ে এলাম সাঁইত্রিশ হাজার নয় শ একুশ টাকা?'

মীরা পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। মেয়েরা হতচকিত অবস্থা থেকে চট করে উঠে আসতে পারে। মীরা পারছে না। মেয়েটি মনে হয় সহজ-সরল জীবনে বাস করে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তেমন যোগ নেই। তার জীবনে হকচকিয়ে যাবার ঘটনা তেমন ঘটে নি।

'মীরা, আমাকে চিনতে পারছ তো?'

'হুঁ।'

'ভেরি গুড! আমাদের নাশতা দিয়ে দাও, খেয়ে চলে যাই। স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাটা

সংগ্রহের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি এসব ধাপ্পাবাজি। আমরা আসলে নাশতা খেতে এসেছি।'

'ও আচ্ছা।'

'আসল কথা বলতে ভুলে গেছি, নাশতা একজনের জন্যে আনবে, শুধু বাদলের জন্যে। আমি একবেলা খাই। বাদলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি। এ হচ্ছে আমার ফুপাতো ভাই। পিএইচ. ডি. করার জন্যে কোথায় যেন গিয়েছে। জায়গাটা কোথায় রে বাদল?'

বাদল মাথা নিচু করে ছিল। সে মাথা নিচু করে ক্ষীণস্বরে বলল, কানাডা।

অপরিচিত মানুষের সামনে বাদল একেবারেই সহজ হতে পারে না। মেয়েদের সামনে তো নয়ই। বিশেষ করে মেয়ে যদি সুন্দরী হয় তা হলে বাদলের জিহ্বা জড়িয়ে যায়। তোতলামি শুরু হয়। রাতে মীরা মেয়েটাকে যত সুন্দর দেখাচ্ছিল দিনে তারচেয়েও বেশি সুন্দর লাগছে।

ভেতর থেকে ভারী গলায় কে যেন ডাকল—মীরা! মীরা!

মনে হয় শুরুতে যে-ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনিই ডাকছেন। সকালে কী নাশতা হয় তার তালিকা দিতে মীরার এত দেরি হবার কথা না। মীরা বলল, আপনারা বসুন। আমি আসছি।

বাদল মাথা তুলল। তার কানটান লাল হয়ে আছে। বিয়ে না হয়ে ভালোই হয়েছে, বিয়ে হলে বাদল তো মনে হয় সারাক্ষণ কান লাল করে বসে থাকত। পার্মানেন্ট তোতলা হয়ে যেত। কেমন আছিস রে বাদল? জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিত—ভা ভা ভা লো।

'হিমুদা!'

'হুঁ?'

'এই মেয়েটাকে তুমি চেন?'

'হুঁ।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্যের কী আছে! সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকতে পারে না?'

'সেইজন্যে আশ্চর্য বলছি না। অন্য কারণে আশ্চর্য বলছি।'

'কী কারণ?'

'বাসি পোলাও খেতে চেয়েছি—তুমি এই বাড়িতে নিয়ে এলে। এই বাড়িতে আজই বাসি পোলাও নাশতা।'

'একে বলে কাকতালীয় যোগাযোগ।'

'কাকতালীয় না—এর নাম হিমুতালীয়। তোমার যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে তা আমি গোড়া থেকেই জানি—তবে ক্ষমতাটা যে এত প্রবল তা জানতাম না।'

'আমিও জানতাম না।'

'হিমুদা!'

'হুঁ?'

'তুমি কাউকে দেখে তার ভবিষ্যৎ বলতে পার?'

'আমার নিজের ভবিষ্যৎ বলতে পারি—অন্যেরটা পারি না।'

'তোমার ভবিষ্যৎ কী?'

'বলা যাবে না।'

'হিমুদা!'

'হুঁ?'

'তুমি কি জানতে এ–বাড়িতে আজ নাশতা হচ্ছে বাসি পোলাও?'

'জানতাম না।'

মীরা ঢুকেছে। তার হাতে ট্রে। ট্রে ভরতি খাবার। মীরার পেছনে একটা কাজের মেয়ে—তার হাতেও ট্রে। শুধু যে বাসি পোলাও এসেছে তা না, পরোটা এসেছে, গোশত এসেছে। ছোট ছোট গ্লাসে কমলার রস। মীরা বলল, আপনারা চা খাবেন, না কফি খাবেন?

আমি বাদলকে বললাম, 'কী খাবি বল?'

'বাদল বলল, ক ক কফি।'

বাদলকে তোতলামিতে ধরে ফেলেছে।

মীরা আমার সামনে বসল। তার বসার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে নিজেকে তৈরি করে এনেছে। কী কী বলবে সব ঠিক করা। নাশতা নিয়ে ঢোকার আগে সে নিশ্চয়ই মনে মনে রিহার্সেল দিয়েও এসেছে। মীরা বলল, আপনার নাম হিমু? উনি হিমুদা বলে ডাকছিলেন।

'আমার নাম হিমু।'

'ওই রাতে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি। আসলে আমি আর বাবা আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম টাকাটা কখনো পাওয়া যাবে না। বাবা অবিশ্যি বার বারই বলছিলেন টাকাটা ফেরত পাওয়া যাবে। তবে এটা ছিল নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে কথার কথা। আপনি যখন সত্যি সত্যি মানিব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন আমরা এতই হতভম্ব হয়ে গেলাম যে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। আপনি যেমন হুট করে উপস্থিত হলেন তেমনি হুট করেই চলেও গেলেন। তখন বাবা খুব হইচই শুরু করলেন, মানুষটা গেল কোথায়, মানুষটা গেল কোথায়? বাবা খুব অল্পতে অস্থির হয়ে পড়েন। তখন তাঁর ব্লাড প্রেসারও বেড়ে যায়। তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। আপনাদের খুঁজে বের করার জন্যে রাত আড়াইটার সময় ঘর থেকে বের হলেন।

'বল কী!'

'আমার বাবা খুব অস্থির প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সঙ্গে কথা না বললে বুঝতে পারবেন না। উনি রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আপনাদের খুঁজে বেড়ালেন। আমি একা একা ভয়ে অস্থির।'

'একা কেন?'

'একা, কারণ আমাদের সংসারে দুজনই মানুষ। আমি আর আমার বাবা। যাই হোক, বাবা বাসায় ফিরেই বললেন, মীরা শোন, আমি নিশ্চিত টাকা নিয়ে যারা এসেছিল তারা মানুষ না অন্যকিছু।'

আমি বললাম, অন্যকিছু মানে?

বাবা বললেন, অন্যকিছুটা কী আমি নিজেও জানি না। আমাদের দৃশ্যমান জগতে মানুষ যেমন বাস করে, মানুষ ছাড়া অন্য জীবরাও বাস করে। তাঁদের কেউ এসেছিলেন। বাবা এমনভাবে বললেন যে আমি নিজেও প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। সেই কারণেই আপনাকে দেখে এমন চমকে উঠেছিলাম।

'ও আচ্ছা।'

'এখন আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে বাবার সঙ্গে দেখা করুন। বাবার মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূর করুন। আজ কি যেতে পারবেন?'

'বুঝতে পারছি না। আজ আমাদের অনেক কাজ।'

'কী কাজ?'

'বাঁদর দেখার জন্যে চিড়িয়াখানায় যেতে হবে। হাতির পিঠে চড়তে। এ জার্নি বাই এলিফেন্ট টাইপ ব্যাপার। আঁখি নামের একটা মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'বেশ, কাল আসুন।'

'দেখি পারি কি না।'

'আপনি আমার বাবার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না। একটা ভুল ধারণা তাঁর মনে ঢুকে গেছে। এটা বের করা উচিত।'

আমি হাসিমুখে বললাম, কোনটা ভুল ধারণা, কোনটা শুদ্ধ ধারণা সেটা চট করে বলাও কিন্তু মুশকিল। এই পৃথিবীতে সবকিছুই আপেক্ষিক।

'আপনি নিশ্চয়ই প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন না যে আপনি মানুষ না, অন্যকিছু?'

আমি আবারো হাসলাম। আমার সেই বিখ্যাত বিভ্রান্ত-করা হাসি। তবে বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা অনেক চালাক, যত বিভ্রান্তির হাসিই কেউ হাসুক মেয়েরা বিভ্রান্ত হয় না। তা ছাড়া পরিবেশের একটা ব্যাপারও আছে। বিভ্রান্ত হবার জন্যে পরিবেশও লাগে। আমি যদি রাত দুটায় হঠাৎ করে মীরাদের বাসায় উপস্থিত হই এবং এই কথাগুলি বলি— কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সে বিভ্রান্ত হবে।

এখন ঝলমলে দিনের আলো। আমাদের নাশতা দেওয়া হয়েছে। কফি পটভরতি। কফির পট থেকে গরম ধোঁয়া উড়ছে। এই সময় বিভ্রান্তি থাকে না।

বাদল মাথা নিচু করে বাসি পোলাও খাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাসি পোলাও-এর মতো বেহেশতি খানা সে এই জীবনে প্রথম খাচ্ছে।

আমরা চিড়িয়াখানায় গেলাম।

বাঁদরদের বাদাম খাওয়ালাম। তাদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দেখলাম। তারপর হাতির পিঠে চড়লাম। দশ টাকা করে টিকিট। তারপর গেলাম শিম্পাঞ্জি দেখতে। শিম্পাঞ্জি দেখে তেমন মজা পাওয়া গেল না। কারণ তার অবস্থা বাদলের মতো। খুবই বিমর্ষ। আমরা একটা কলা ছুঁড়ে দিলাম—সে ফিরেও তাকাল না। বাঁদরগোত্রীয় প্রাণী, অথচ কলার প্রতি আগ্রহ নেই—এই প্রথম দেখলাম। বাদলকে বললাম, চল জিরাফ দেখি।

বাদল শুকনো গলায় বলল, জিরাফ দেখে কী হবে!

'জিরাফের লম্বা গলা দেখে যদি তোর মনটা ভালো হয়।'

'আমার মন ভালো হবে না। আমি এখন বাসায় চলে যাব।'

'যা, চলে যা। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। সন্ধ্যাবেলা সব পশুপাখি একসঙ্গে ডাকাডাকি শুরু করে—ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার।'

'কোনো ইন্টারেস্টিং ব্যাপারে আমি এখন আর আগ্রহ বোধ করছি না।'

'তা হলে যা, বাড়িতে গিয়ে লম্বা ঘুম দে।'

'তুমি আঁখিকে টেলিফোন করবে না?'

'করব।'

'এখন করো। চিড়িয়াখানায় কার্ডফোন আছে। আমার কাছে কার্ড আছে।'

'তুই কি ফোন-কার্ড সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? এ পর্যন্ত ওই বাড়িতে কবার টেলিফোন করেছিস?'

'দুবার।'

'তোর সঙ্গে কথা বলে নি?'

'না।'

'তোর সঙ্গেই কথা বলে নি, আমার সঙ্গে কি আর বলবে?'

'তোমার সঙ্গে বলবে—কারণ তুমি হচ্ছ হিমু।'

'টেলিফোন করে কী বলব?'

বাদল চুপ করে রইল। আমি হাসিমুখে বললাম, তুই নিশ্চয়ই চাস না—কেমন আছ, ভালো আছি টাইপ কথা বলে রিসিভার রেখে দি? মেয়েটাকে আমি কী বলব সেটা বলে দে।

'তোমার যা ইচ্ছা তা-ই বোলো।'

'আমি কি বলব—আঁখি শোনো, মগবাজার কাজী অফিস চেন? এক কাজ করো—রিকশা করে কাজী অফিসে চলে আস। আমি বাদলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এলে তোমাদের বিয়ে দিয়ে দেব। কোনো সমস্যা নেই।'

বাদল মাথা নিচু করে ফেলল। মনে হচ্ছে সে খুবই লজ্জা পাচ্ছে। প্রায় ফিসফিস করে বলল, তুমি আসতে বললে আঁখি চলে আসবে।

'তোর তাই ধারণা?'

'হ্যাঁ।'

'তুই কিন্তু ভালোই বোকা।'

'আমি বোকা হই যা-ই হই তুমি হচ্ছ হিমু। তুমি যা বলবে তা-ই হবে।'

'আচ্ছা পরীক্ষা হয়ে যাক—আমি আঁখিকে আসতে বলি। বলব?'

বাদল প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, বলো।

বেশ কয়েকবার টেলিফোন করা হল। ওপাশ থেকে কেউ ফোন ধরছে না। বাদল শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বাদলকে দেখে খুবই মায়া লাগছে। মায়া লাগলেও কিছু করার নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে প্রতি পদে পদে মায়াকে তুচ্ছ করতে হয়।

৪

কোনো ভদ্রলোকের যদি বিয়ের দুবছরের মাথায় সন্তানপ্রসবজনিত জটিলতায় স্ত্রীবিয়োগ হয়, তিনি যদি আর বিয়ে না করেন এবং বাকি জীবন কাটিয়ে দেন সন্তানকে বড় করার জটিল কাজে তখন তাঁর ভেতর নানান সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যার মূল কারণ

অপরাধবোধ। স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজেকে দায়ী করেন। সন্তানের জন্ম না হলে স্ত্রী মারা যেত না। সন্তানের জন্মের জন্যে তাঁর ভূমিকা আছে এই তথ্য তাঁর মাথায় ঢুকে যায়। মাতৃহারা সন্তানকে মাতৃস্নেহবঞ্চিত করার জন্যেও তিনি নিজেকে দায়ী করেন। তাঁর নিজের নিঃসঙ্গতার জন্যেও তিনি নিজেকে দায়ী করেন। তিনি সংসারে বেঁচে থাকেন অপরাধীর মতো। যতই দিন যায় তাঁর আচার, আচরণ, জীবনযাপন পদ্ধতি ততই অসংলগ্ন হতে থাকে। স্ত্রী জীবিত অবস্থায় তাঁকে যতটা ভালবাসতেন, মৃত্যুর পর তারচে অনেক বেশি ভালবাসতে শুরু করেন। সেই ভালবাসাটা চলে যায় অসুস্থ পর্যায়ে।

আশরাফুজ্জামান সাহেবকে দেখে আমার তা-ই মনে হল। মীরার বাবার নাম আশরাফুজ্জামান। একসময় কলেজের শিক্ষক ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর চাকরি ছেড়ে দেন। এটাই স্বাভাবিক। অস্থিরতায় আক্রান্ত একটা মানুষ স্থায়ীভাবে কিছু করতে পারে না। বাকি জীবনে তিনি অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছেন—ইনসিউরেন্স কোম্পানির কাজ, ট্রাভেলিং এজেন্সির চাকরি থেকে ইনডেনটিং ব্যবসা, টুকটাক ব্যবসা সবই করা হয়েছে। এখন কিছু করছেন না। পৈতৃক বাড়ি ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় সংসার চালাচ্ছেন। সংসারে দুটিমাত্র মানুষ থাকায় তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। ভদ্রলোকের প্রচুর অবসর। এই অবসরের সবটাই কাটাচ্ছেন মৃত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতি উদ্ভাবনে। ভদ্রলোক খুব রোগা। বড় বড় চোখ। চোখের দৃষ্টিতে ভরসা-হারানো ভাব। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বয়সে মাথায় কাঁচাপাকা চুল থাকার কথা। তাঁর মাথার সব চুলই পাকা। ধবধবে সাদা চুলে ভদ্রলোকের মধ্যে ঋষি-ঋষি ভাব চলে এসেছে। তাঁর গলার স্বর খুব মিষ্টি। কথা বলার সময় একটু ঝুঁকে কাছে আসেন। তাঁর হাত খুবই সরু। মৃত মানুষের হাতের মতো—বিবর্ণ। কথা বলার সময় গায়ে হাত দেওয়ার অভ্যাসও তাঁর আছে। তিনি যতবারই গায়ে হাত দিয়েছেন, আমি ততবারই চমকে উঠেছি।

'আপনার নাম হিমু?'

'জি।'

'মানিব্যাগ নিয়ে রাতে আপনি যখন এসেছিলেন তখন আপনার চেহারা একরকম ছিল—এখন অন্যরকম।'

আমি বললাম, তাজমহল দিনের একেক আলোয় একেক রকম দেখা যায়—মানুষ তো তাজমহলের চেয়েও অনেক উন্নত শিল্পকর্ম, মানুষের চেহারাও বদলানোর কথা।

'আমার ধারণা ছিল আপনি মানুষ না।'

'এখন কী ধারণা, আমি মানুষ?'

আশরাফুজ্জামান সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখেমুখে এক ধরনের অস্বস্তি। মনে হচ্ছে তিনি আমার ব্যাপারে এখনো সংশয়মুক্ত না। আমি হাসিমুখে বললাম, একদিন দিনের বেলা এসে আপনাকে দেখাব—রোদে দাঁড়ালে আমার ছায়া পড়ে।

আশরাফুজ্জামান সাহেব নিচু গলায় বললেন, মানুষ না, কিন্তু মানুষের মতো জীবদেরও ছায়া পড়ে।

'তাই নাকি?'

'জি। এরা মানুষদের মধ্যেই বাস করে।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি অনেককিছু জানি, কিন্তু কাউকে মন খুলে বলতে পারি না। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। পাগল ভাববে। মীরাকেও আমি তেমন কিছু বলি না।'

'আমাকে বলতে চাচ্ছেন?'

'জি না।'

'বলতে চাইলে বলতে পারেন।'

'আচ্ছা, আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয় আমি অসুস্থ?'

'না, তা মনে হচ্ছে না।'

'মীরার ধারণা আমি অসুস্থ। যতই দিন যাচ্ছে ততই তার ধারণা প্রবল হচ্ছে। অথচ আমি জানি আমি খুবই সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ। আমার অস্বাভাবিকতা বলতে এইটুকু যে মীরার মার সঙ্গে আমার দেখা হয়, কথাবার্তা হয়।'

'তাই বুঝি?'

'জি। মানিব্যাগ হারিয়ে গেল। আমি খুবই আপসেট হয়ে বাসায় এসেছি। আমি মোটামুটিভাবে দরিদ্র মানুষ—এতগুলি টাকা! মীরাকে খবরটা দিয়ে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছি—তখন মীরার মার সঙ্গে আমার কথা হল। সে বলল, তুমি মন-খারাপ কোরো না, টাকা আজ রাতেই ফেরত পাবে। আমি মীরাকে বললাম, সে হেসেই উড়িয়ে দিল।'

'হেসে উড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক হয় নি। টাকা তো সেই রাতেই ফেরত পেয়েছিলেন। তাই না?'

'জি। মীরার মা সারাজীবন আমাকে নানানভাবে সাহায্য করেছে। এখনো করছে।'

'ওনার নাম কী?'

'ইয়াসমিন।'

'উনি কি সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলেন, না প্ল্যানচেটের মাধ্যমে তাঁকে আনতে হয়।'

তিনি নিচুগলায় বললেন, শুরুতে প্ল্যানচেট করে আনতাম। এখন নিজেই আসে। যা বলার সরাসরি বলে।

'তাঁকে চোখে দেখতে পান?'

'সবসময় পাই না—হঠাৎ হঠাৎ দেখা পাই। আপনি বোধহয় আমার কোনো কথা বিশ্বাস করছেন না। অবিশ্বাসের একটা হাসি আপনার ঠোঁটে।'

'আমি আপনার সব কথাই বিশ্বাস করছি। আমি তো মিসির আলি না যে সব কথা অবিশ্বাস করব। আমি হচ্ছি হিমু। হিমুর মূলমন্ত্র হচ্ছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।'

'মিসির আলি কে?'

'আছেন একজন। তাঁর মূলমন্ত্র হচ্ছে তর্কে মিলায় বস্তু, বিশ্বাসে বহুদূর। তাঁর ধারণা জীবনটা অঙ্কের মতো। একের সঙ্গে এক যোগ করলে সবসময় দুই হবে। কখনো তিন হবে না'।

'তিন কি হয়?'

'অবশ্যই হয়—আপনার বেলায় তো হয়ে গেল। আপনি এবং মীরা—এক এক

দুই হবার কথা। আপনার বেলায় হচ্ছে তিন। মীরার মা কোত্থেকে যেন উপস্থিত হচ্ছেন!'

'আপনি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলেন। চা খাবেন?'

'চা কে বানাবে, মীরা তো বাসায় নেই।'

'চা আমিই বানাব। ঘর-সংসারের কাজ সব আমিই করি। চা বানানো, রান্না—সব করতে পারি। মোগলাই ডিশও পারি।'

'আপনার কোনো কাজের লোক নেই?'

'না।'

'নেই কেন? মীরার মা পছন্দ করেন না?'

'জি না। আপনি ঠিক ধরেছেন।'

'কোনো কাজের মানুষের সাহায্য ছাড়া মেয়েকে বড় করতে আপনার কোনো সমস্যা হয় নি?'

'সমস্যা তো হয়েছেই। তবে ইয়াসমিন আমাকে সাহায্য করেছে। যেমন ধরুন মেয়ে রাতে কাঁথা ভিজিয়ে ফেলেছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, ঘুমে অচেতন। ইয়াসমিন আমাকে ডেকে তুলে বলবে—মেয়ে ভেজা কাঁথায় শুয়ে আছে।'

'বাহ্, ভালো তো!'

'মীরার একবার খুব অসুখ হল। কিছু খেতে পারে না, যা খায় বমি করে ফেলে দেয়—শরীরে প্রবল জ্বর। ডাক্তাররা কড় কড়া অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, জ্বর সারছে না। তখন ইয়াসমিন এসে বলল, তুমি মেয়েকে অষুধ খাওয়ানো বন্ধ কর। কাগজি লেবুর শরবত ছাড়া কিছু খাওয়াবে না।'

'আপনি তা-ই করলেন?'

'প্রথম দিকে করতে চাই নি। ভরসা পাচ্ছিলাম না—কারণ মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ। তাকে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। এরকম একজন রোগীর অষুধপত্র বন্ধ করে দেওয়াটা কঠিন কাজ।'

'অর্থাৎ আপনি আপনার স্ত্রীর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন নি?'

'জি করেছি, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। মেয়ের অবস্থা আরো যখন খারাপ হল তখন প্রায় মরিয়া হয়েই অষুধপত্র বন্ধ করে লেবুর শরবত খাওয়াতে শুরু করলাম। দুদিনের মাথায় মেয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল।'

'এরকম ভূত-ডাক্তার ঘরে থাকাটা তো খুব ভালো।'

'দয়া করে আমার স্ত্রীকে নিয়ে কোনো রসিকতা করবেন না। আমি এমনিতেই রসিকতা পছন্দ করি না। স্ত্রীকে নিয়ে রসিকতা একেবারেই পছন্দ করি না। চা খাবেন কি না তা তো বলেন নি।'

'চা খাব।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব চা আনতে গেলেন। সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে। পুরো রাত আমার সামনে পড়ে আছে। আশরাফুজ্জামান সাহেব চা বানাতে থাকুন, আর আমি বসে বসে গুছিয়ে ফেলি রাতে কী কী করব। অনেকগুলি কাজ জমে আছে।

ক) আঁখি নামের মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ হয় নি। যোগাযোগ করতে হবে। টেলিফোন করলেই ওপাশ থেকে পোঁ পোঁ শব্দ হয়। বাদল কি টেলিফোন নাম্বার ভুল এনেছে?

খ) মেজো ফুপু জরুরি খবর পাঠিয়েছেন। আমার মনে হয় আঁখিসংক্রান্ত বিষয়েই আলাপ করতে চান।

গ) এক পীরের সন্ধান পাওয়া গেছে—নাম ময়লা বাবা। সারা গায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন। তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার।

ঘ) মিসির আলি সাহেবের ঠিকানা পাওয়া গেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা। উনি কথা বলবেন কি না কে জানে! যুক্তিসঙ্গত কারণ উপস্থিত না করলে উনি কথা বলবেন বলে মনে হয় না। এই ধরনের মানুষরা যুক্তির বাইরে পা দেন না। তাঁরা জানেন অ্যান্টিলজিক হচ্ছে লজিকেরই উলটো পিঠ।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনার চা নিন। চায়ে আপনি কচামচ চিনি খান?'

'যে যত চামচ দেয় তত চামচই খাই। আমার কোনোকিছুতেই কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।'

'আমি এক চামচ চিনি দিয়েছি।'

'খুব ভালো করেছেন। এবং চা অসাধারণ হয়েছে—গরম মশল্লা দিয়েছেন নাকি?'

'সামান্য দিয়েছি—এক দানা এলাচ, এক চিমটি জাফরান। ফ্লেভারের জন্যে দেয়া।'

'খুব ভালো করেছেন।'

'আমার স্ত্রী চা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত। কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে রেখে দিত। মাঝে মাঝে চায়ে সামান্য কমলালেবুর খোসা দিয়ে দিত। অসাধারণ টেস্ট! কমলালেবুর শুকনো খোসা আমার কাছে আছে, একদিন আপনাকে খাওয়াব।'

'জি আচ্ছা। একটা কথা—আপনার স্ত্রী কি এই বাড়িতেই থাকেন, মানে ভূত হবার পর আপনার সঙ্গেই আছেন?'

'ইয়াসমিন প্রসঙ্গে ভূত-প্রেত এই জাতীয় শব্দ দয়া করে ব্যবহার করবেন না।'

'জি আচ্ছা, করব না। উনি কি এখন আশপাশেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর উপস্থিতি আপনি বুঝতে পারেন?'

'পারি।'

'আমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'আপনি কথা বললে সে শুনবে। সে আপনার সঙ্গে কথা বলবে কি না তা তো জানি না। সে মীরার সঙ্গেই কথা বলে না। মীরা তার নিজের মেয়ে।'

'আমি আপনার স্ত্রীকে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। কীভাবে বলব? বাতি নিভিয়ে বলতে হবে?'

'বাতি নেভাতে হবে না। যা বলার বলুন, সে শুনবে।'

'সম্বোধন করব কী বলে? ভাবি ডাকব?'

'হিমু সাহেব, আপনি পুরো ব্যাপারটা খুব হালকাভাবে নেবার চেষ্টা করছেন। এটা ঠিক না। আমার স্ত্রীকে আপনার যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে জিজ্ঞেস করুন। আমি তার কাছ থেকে জবাব এনে দিচ্ছি।'

'চা শেষ করে নিই। চা খেতে খেতে যদি ওনার সঙ্গে কথা বলি, উনি হয়তো এটাকে বেয়াদবি হিসেবে নেবেন।'

'আবারো রসিকতা করছেন?'

'আর করব না।'

আমি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, আমার ভালো নাম হিমালয়। ডাকনাম হিমু। সবাই এখন আমাকে এই নামে চেনে। আমাকে বলা হয়েছে মীরার মৃতা মা এই বাড়িতে উপস্থিত আছেন। আমি এর আগে কোনো মৃত মানুষের সঙ্গে কথা বলি নি। আমি জানি না তাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়। আমার কথাবার্তায় যদি কোনো বেয়াদবি প্রকাশ পায়—দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। আমি আপনার কাছ থেকে একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি। আমি এক রাতে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। কী দেখে ভয় পেয়েছিলাম সেটা কি আপনি বলতে পারবেন?

কথা শেষ করে মিনিট পাঁচেক চুপচাপ বসে রইলাম। আশরাফুজ্জামান সাহেবও চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। মনে হয় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমন্ত মানুষের মতো তিনি ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলছেন। তাঁর ঘুম ভাঙাবার জন্য আমি শব্দ করে কাশলাম। তিনি চোখ মেললেন না, তবে নড়েচড়ে বসলেন। আমি বললাম, উনি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?'

'পেয়েছে।'

'উত্তরে কী বললেন?'

'সে এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চায় না।'

'আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। মীরাকে বলবেন আমি এসেছিলাম।'

'আরেকটু বসুন, মীরা চলে আসবে। তার বান্ধবীর জন্মদিনে গিয়েছে। বলে গেছে আটটার মধ্যে চলে আসবে। আটটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, আজ মীরা আসতে অনেক দেরি করবে। বারটা–একটা বেজে যেতে পারে। কাজেই অপেক্ষা করা অর্থহীন।

আশরাফুজ্জামান সাহেব ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, দেরি করবে বলছেন কেন?

'আমার মনে হচ্ছে দেরি হবে। এক ধরনের ইনটিউশন। আমার ইনটিউশন–ক্ষমতা প্রবল।'

ভদ্রলোক অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। আমি বললাম, আপনি ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আপনি যা বলেছেন আমি বিশ্বাস করেছি। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন?

'মীরা কখনো রাত আটটার পর বাইরে থাকে না। আমার এখানে টেলিফোন নেই। দেরি হলে টেলিফোনে খবর দিয়ে সে আমার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারবে না বলেই

কখনো দেরি করবে না। আপনি আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন। কমলালেবুর খোসা দিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে দিই, খেয়ে দেখুন।'

'অন্য সময় এসে খেয়ে যাব। আমার খুব কিছু জরুরি কাজ আছে, আজ রাতের মধ্যেই সারতে হবে।'

আমি রাস্তায় নামলাম।

প্রথমে যাব মেজো ফুপুর কাছে। ছেলের বিয়েভাঙার শোক তিনি সামলে উঠেছেন কি না কে জানে! মেয়ের বিয়েভাঙার শোক সামলানো যায় না, ছেলের বিয়েভাঙার শোক ক্ষণস্থায়ী হয়। এইসব ক্ষেত্রে ছেলের মা একটু বোধহয় খুশিও হন—ছেলে আর কিছুদিন রইল তাঁর ডানার নিচে। ছেলের বিয়ে নিয়ে এত ভাবারও কিছু নেই। মেয়েদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়। ছেলেদের বিয়ের বয়স পার হয় না।

মেজো ফুপু বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার নিচে রাবার ক্লথ। তাঁর মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। বিভ্রান্ত হবার মতো কোনো দৃশ্য না। যারা মেজো ফুপুর সঙ্গে পরিচিত তারা জানে, মাথায় পানি ঢালা তার হবিবিশেষ। তিনি খুব আপসেট, মাথায় পানি ঢেলে তাঁকে ঠিক করা হচ্ছে এটা তিনি মাঝেমধ্যেই প্রমাণ করতে চান। আমি ঘরে ঢুকেই বললাম, ফুপু, কী খবর?

ফুপু ক্ষীণস্বরে বললেন, কে?

এটাও তাঁর অভিনয়ের একটা অংশ। তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে তাঁর অবস্থা এতই খারাপ যে তিনি আমাকে চিনতে পারছেন না।

'মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে, ব্যাপার কী ফুপু?'

'তুই কিছু জানিস না? আমাদের সবার তো কাপড় খুলে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিয়েছে!'

'কে?'

'বাদলের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। রাত এগারটা পর্যন্ত বসিয়ে রেখে মেয়ে দেয় নি।'

'ও, এই ব্যাপার!'

মেজো ফুপু ঝপাং করে উঠে বসলেন। যে পানি ঢালছিল তার হাতের এইম নষ্ট হওয়ায় পানি চারদিকে ছড়িয়ে গেল। মেজো ফুপু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, এটা সামান্য ব্যাপার? তোর কাছে এটা সামান্য ব্যাপার?

'ব্যাপার খুবই গুরুতর। মেয়ে মার সঙ্গে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে, এখন করা যাবে কী? আজকালকার মেয়ে, এরা কথায়–কথায় মাদের সঙ্গে রাগ করে।'

'মেয়ে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে এই গাঁজাখুরি গল্প তুই বিশ্বাস করতে বলিস? তুই ঘাস খাস বলে আমিও ঘাস খাই! মেয়েকে ওরাই লুকিয়ে রেখেছে।'

'তাই নাকি?'

'অবশ্যই তাই।'

'শুধু শুধু লুকিয়ে রাখবে কেন?'

'সেটা তুই জেনে দে।'

'আমি কীভাবে জানব?'

'তুই ওদের বাসায় যাবি। মেয়ের সঙ্গে কথা বলবি, ব্যাপার কী সব জেনে আসবি। মেয়ের বাবাকে বলবি ঝেড়ে কাশতে। আমি সব জানতে চাই।'

'জেনে লাভ কী?'

'লাভ আছে। আমি ওদের এমন শিক্ষা দেব যে তিন জন্মে ভুলবে না।'

'শিক্ষা দিয়ে কী হবে, তুমি তো আর স্কুল খুলে বস নি।'

'তোর গা-জ্বালা কথা আমার সঙ্গে বলবি না। তোকে যা করতে বলছি করবি। এক্ষুনি চলে যা।'

'ওদের গোপন কথা ওরা আমাকেই বা শুধু শুধু বলবে কেন?'

'তুই ভুজুং ভাজুং দিয়ে মানুষকে ভোলাতে পারিস। ওদের কাছ থেকে খবর বের করে আন, তারপর দেখ আমি কী করি।'

'করবেটা কী?'

'মানহানির মামলা করব। আমি সাদেককে বলে দিয়েছি—এর মধ্যে মনে হয় করা হয়েও গেছে। মেয়ের বাপ আর মামাটাকে জেলে ঢোকাব। তার আগে আমার সামনে এসে দুজনে দাঁড়াবে। কানে ধরে দশবার উঠবোস করবে।'

'তোমার বেয়াই তোমার সামনে কানে ধরে উঠবোস করবে এটা কি ঠিক হবে? বিবাহ-সম্পর্কিত আত্মীয় অনেক বড় আত্মীয়।'

'তারা আমার আত্মীয় হল কখন?'

'হয় নি, হবে।'

'হিমু, তুই কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস?'

'না, ফাজলামি করছি না—কোনো একটা সমস্যায় বিয়ে হয় নি, সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে বিয়ে হতে আপত্তি কী? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'বাদলের মন ওই মেয়ের কাছে পড়ে আছে।'

'বাদলের মন ওই মেয়ের কাছে, কী বলছিস তুই! যে-মেয়ে লাথি দিয়ে তাকে নর্দমায় ফেলে দিল, যে তাকে ন্যাংটো করে দিল এত মানুষের সামনে, তার কাছে—'

'যা পাওয়া যায় না তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়।'

'বাদল যদি কোনোদিন ওই মেয়ের নাম মুখে আনে তাকে আমি জুতাপেটা করব। জুতিয়ে আমি তার রস নামিয়ে দেব।'

'জুতাপেটা করেও লাভ হবে না ফুপু। আমি বরং দেখি জোড়াতালি দিয়ে কিছু করা যায় কি না। বাদল আঁখির টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে—যোগাযোগ করে দেখি।'

'বাদল তোকে ওই মেয়ের টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে!'

'হ্যাঁ।'

'দুধকলা দিয়ে আমি তো দেখি কালসাপ পুষেছি।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। যে-মেয়ে তোমাদের সবাইকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখছে তার জন্যে এত ব্যাকুলতা! তার টেলিফোন নাম্বার নিয়ে ছোটাছুটি!'

মেজো ফুপুর রাগ চরমে উঠে গিয়েছিল। তিনি বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে রাগ সামলালেন। থমথমে গলায় বললেন, হিমু শোন। বাদল যদি ওই মেয়ের কথা মুখে আনে তাকে আমরা ত্যাজ্যপুত্র করব। এই কথাটা তাকে তুই বলবি।

'এক্ষুনি বলছি।'

'বাদল বাসায় নেই, কোথায় যেন গেছে। তুই বসে থাক, বাদলের সঙ্গে কথা না বলে যাবি না।'

'আচ্ছা যাব না। বাদল গেছে কোথায়?'

'জানি না।'

'আঁখিদের বাসায় চলে যায় নি তো?'

মেজো ফুপু রক্তচক্ষু করে তাকাচ্ছেন। এইবার বোধহয় তাঁর ব্লাড প্রেসার সত্যি সত্যি চড়েছে। অকারণে মানুষের চোখ এমন লাল হয় না।

'ফুপু তুমি শুয়ে থাকো। তোমার মাথায় পানিটানি দেওয়া হোক। আমি বাদলের সঙ্গে কথা না বলে যাচ্ছি না। ফুপা কোথায়?'

'আর কোথায়, ছাদে।'

আমি ছাদের দিকে রওনা হলাম। আজ বুধবার—ফুপার মদ্যপান দিবস। তাঁর ছাদে থাকারই কথা। ফুপু অয়েলক্লথে মাথা রেখে আবার শুয়েছেন। বিপুল উৎসাহে তাঁর মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে।

ফুপা ছাদেই আছেন।

তাঁকে যেন আনন্দিত বলেই মন হল। জিনিস মনে হয় পেটে পড়েছে। এবং ভালো ডোজেই পড়েছে। তাঁর চোখেমুখে উদাস এবং শান্তি-শান্তি ভাব।

'কে, হিমু?'

'জি।'

'আছ কেমন হিমু?'

'জি ভালো।'

'কেমন ভালো—বেশি, কম, না মিডিয়াম?'

'মিডিয়াম।'

'আমার মনটা খুবই খারাপ হিমু।'

'কেন?'

'বাদলের বিয়েতে তো তুমি যাও নি। বিরাট অপমানের হাত থেকে বেঁচে গেছ। তারা বিয়ে দেয় নি। মেয়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে।'

'বলেন কী!'

'বানোয়াট গল্প ফেঁদেছে। মেয়ে নাকি রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? যার বিয়ে সে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি যাবে।'

'আজকালকার ছেলেমেয়ে, এদের সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না।'

'এটা তুমি অবিশ্যি ঠিক বলেছ। আমাদের সময় আর বর্তমান সময় এক না। সোসাইটি চেঞ্জ হচ্ছে। ঘরে-ঘরে এখন ভিসিআর, ডিস অ্যান্টেনা। এইসব দেখেশুনে ইয়াং ছেলেমেয়েরা নানান ধরনের ড্রামা করা শিখে যাচ্ছে। বিয়ের দিন রাগ করে

বান্ধবীর বাড়ি চলে যাওয়া সেই ড্রামারই একটা অংশ। ভালো বলেছ হিমু। Well said. এখন মনে হচ্ছে মেয়েটা আসলেই রাগ করে বান্ধবীর বাড়িতে গেছে।'

'ছেলের বিয়ে হয় নি বলে আপনারা লজ্জার মধ্যে পড়েছেন। ওদের লজ্জা তো আরো বেশি। মেয়ের বিয়ে হল না।'

'অবশ্যই, অবশ্যই! ভাগ্যিস মুসলমান পরিবারের মেয়ে। হিন্দু মেয়ে হলে তো দুপড়া হয়ে যেত। এই মেয়ের আর বিয়েই হত না। হিমু, ছেলেরা হচ্ছে হাঁসের মতো, গায়ে পানি লাগে না। আর মেয়েরা হচ্ছে মুরগির মতো, এককোঁটা পানিও ওদের গায়ে লেপটে যায়। আঁখি মেয়েটার জন্যে খুবই মায়া হচ্ছে হিমু।'

'মায়া হওয়াই স্বাভাবিক।'

'ওই দিন অবিশ্যি খুবই রাগ করেছিলাম। ভেবেছিলাম মানহানির মামলা করব।'

'আপনার মতো মানুষ মানহানির মামলা কীভাবে করে! আপনি তো গ্রামের মামলাবাজ মোড়ল না। আপনি হচ্ছেন হৃদয়বান একজন মানুষ।'

'ভালো কথা বলেছ হিমু। হৃদয়বান কথাটা খুব খাঁটি বলেছ। গাড়ি করে যখন আমি শেরাটন হোটেলের কাছে, ফুলওয়ালি মেয়েগুলি ফুল নিয়ে আসে, ধমক দিতে পারি না। কিনে ফেলি। ফুল নিয়ে আমি করব কী বলো। তোমার ফুপুকে যদি দিই সে রেগে যাবে, ভাববে আমার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়েছে। কাজেই নর্দমায় ফেলে দিই। একবার তোমার ফুপুকে ফুল দিয়েছিলাম। সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল—ঢং কর কেন?'

'তাই নাকি?'

'এইসব দুঃখের কথা বলে কী হবে! বাদ দাও।'

'জি আচ্ছা, বাদ দিচ্ছি।'

'তোমার দুই বন্ধু এখনো আসছে না কেন বলো তো?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ওদের কি আসার কথা নাকি?

'আসার কথা তো বটেই। ওদের আমার খুব পছন্দ হয়েছে। প্রতি বুধবারে আসতে বলেছি। ভেরি গুড কোম্পানি। ওরা যে আমাকে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করে সেটা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'ফুপু বলছিলেন ওরা নাকি ন্যাংটা হয়ে ছাদে নাচানাচি করছিল।'

ফুপা গ্লাসে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, তোমার ফুপু বিন্দুতে সিন্ধু দেখে। কাশির শব্দ শুনে ভাবে যক্ষ্মা। ওই রাতে কিছুই হয় নি। বেচারাদের গরম লাগছিল—আমি বললাম, শার্ট খুলে ফ্যালো। গরমে কষ্ট করার মানে কী! ওরা শার্ট খুলেছে। আমিও খুলেছি, ব্যস!'

'ও আচ্ছা।'

'হিমু, তোমার বন্ধু দুজন দেরি করছে কেন? এইসব জিনিস একা একা খাওয়া যায় না। খেতে খেতে মন খুলে কথা না বললে ভালো লাগে না। দুধ একা খাওয়া যায়, কিন্তু ড্রিংকসে বন্ধুবান্ধব লাগে।'

'আসতে যখন বলেছেন অবশ্যই আসবে।'

'তুমি বরং এক কাজ করো, ঘরের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকো। ওরা হয়তো বাসার সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। বাসা চিনতে পারছে না বলে ঢুকতে পারছে না।

গেট দিয়ে সোজা ছাদে নিয়ে আসবে। তোমার ফুপুর জানার দরকার নেই। দুটো নিতান্তই গোবেচারা ভদ্র ছেলে—অথচ তোমার ফুপু ওদের বিষদৃষ্টিতে দেখছে। I don't know why. শাস্ত্রে বলে না, নারীচরিত্র দেবা ন জানন্তি কুত্রাপি মনুষ্য—ওই ব্যাপার আর কি! হিমু—Young friend. রাস্তায় গিয়ে ওদের জন্যে একটু দাঁড়াও।'

'জি আচ্ছা।'

আমি নিচে নেমে দেখি ফুপুর মাথায় পানি ঢালাঢালি শেষ হয়েছে। তিনি গম্ভীরমুখে বসার ঘরে বসে আছেন। তাঁর সামনে তাঁর চেয়েও তিন ডাবল গম্ভীর মুখে অন্য একজন বসে আছে। আমি দরজা খুলে রাস্তায় চুপিচুপি নেমে যাব—ফুপু গম্ভীর গলায় বললেন, এই হিমু, শুনে যা। আমি পরিচয় করিয়ে দিই, এ হচ্ছে সাদেক। হাইকোর্টে প্রাকটিস করে। আমার দূর সম্পর্কের ভাই হয়। ভয়ঙ্কর কাজের ছেলে। মানহানির মামলা ঠুকতে বলেছিলাম, এখন মামলা সাজিয়েছে। কাল মামলা দায়ের করা হবে, তারপর দেখবি কত গমে কত আটা। সাদেক, তুমি হিমুকে মামলার ব্যাপারটা বলো।

সাদেক বিরক্তমুখে বললেন, ওনাকে শুনিয়ে কী হবে?

'আহা, শোনাও–না! হিমু আমাদের নিজেদের লোক। মামলাটা কী সাজানো হয়েছে সে শুনুক, কোনো সাজেশান থাকলে দিক। এই হিমু, বসে ভালো করে শোন। সাদেক, তুমি গুছিয়ে বলো।'

সাদেক সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, শুধু মানহানি মামলা তো তেমন জোরালো হয় না। সাথে আরো কিছু অ্যাড করেছি।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, কী অ্যাড করেছেন?

সাদেক সাহেব ভারী গলায় বললেন, অ্যাড করেছি—কনেপক্ষ ভাড়াটে গুণ্ডার সহায়তায় কোনোরকম পূর্ব উসকানি ছাড়া ধারালো অস্ত্রশস্ত্র, যেমন লোহার রড, কিরিচসহ বরযাত্রীদের উপর আচমকা চড়াও হয়। বরযাত্রীদের দ্রব্যসামগ্রী, যেমন মানিব্যাগ, রিষ্টওয়াচ লুণ্ঠন করে। মহিলাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পূর্বপরিকল্পিত এই আক্রমণে বরসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়। তাহারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে। বরযাত্রীদের দুটি গাড়িরও প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হয়। একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই আর কি! সব ডিটেল দেওয়া হবে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, বলেন কী!

সাদেক সাহেব তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, সাজানো মামলা অরিজিন্যালের চেয়েও কঠিন হয়। অরিজিন্যাল মামলায় আসামি প্রায়ই খালাস পেয়ে যায়। সাজানো মামলায় কখনো পায় না। কথা হল এভিডেন্স ঠিকমতো প্লেস করতে হবে।

'এভিডেন্স পাবেন কোথায়?'

'বাংলাদেশে এভিডেন্স কোনো সমস্যা না। মার খেয়ে পা ভেঙেছে চান? পা–ভাঙা লোক পাবেন। X-Ray রিপোর্ট পাবেন। রেডিওলজিস্টের সার্টিফিকেট পাবেন। টাকা খরচ করলে দুনম্বরি জিনিস সবই পাওয়া যায়।'

মেজো ফুপু বললেন, টাকা আমি খরচ করব। জোঁকের মুখে আমি নুন ছেড়ে দেব। সাদেক মামলা শক্ত করার জন্যে তোমার যা যা করা লাগে করো। দরকার হলে আমি

আমার গাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বলব ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে।

'তা লাগবে না। পুরোনো গাড়ির দোকান থেকে ভাঙা একটা গাড়ি এনে আগুন লাগিয়ে দিলেই হবে। তবে গাড়ির ব্লু বুক লাগবে। এটা অবিশ্যি কোনো ব্যাপার না।'

ফুপু তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি থাকায় ভরসা পাচ্ছি। ওদের আমি তুর্কি নাচন নাচিয়ে ছাড়ব।

সাদেক সাহেব বললেন, বাদলকে একটু দরকার। ওকে ব্যাক ডেট দিয়ে একটা ভালো ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে। মার খাবার পর মাথায় আঘাত পেয়ে আন্ডার অবজারভেশনে আছে এটা প্রমাণ করার জন্যে দরকার। কিছু এক্সরেটেক্সরে করা দরকার।'

ফুপু উজ্জ্বল মুখে বললেন, তুমি অপেক্ষা করো। বাদল আসুক। আজই তাকে ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দেব। মাছ দেখেছে বড়শি দেখে নি।

ফুপু প্রবল উৎসাহে মামলার সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে সাদেক সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমি "নাকটা ঝেড়ে আসি ফুপু" বলে বের হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে উধাও হলাম। সাদেক সাহেব ভয়াবহ ব্যক্তি! আমি উপস্থিত থাকলে পা-ভাঙা ফরিয়াদি হিসেবে আমাকেও হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে পারে। মামলা আরো পোক্ত করার জন্যে মুগুর দিয়ে পা ভেঙে ফেলাও বিচিত্র না।

পথে নেমেই মোফাজ্জল এবং জহিরুলের সঙ্গে দেখা। ওরা ঘোরাঘুরি করছে। আমাকে দেখে অকূলে কূল পাওয়ার মতো ছুটে এল—হিমু ভাইয়া না?

'হুঁ।'

'স্যারের বাসাটা ভুলে গেছি। স্যার আসতে বলেছিলেন।'

'এই বাড়ি। বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন না। গেট দিয়ে সোজা ছাদে চলে যান।'

'স্যারের শরীর কেমন হিমু ভাইয়া?'

'শরীর ভালো।'

'ফেরেশতার মতো আদমি। ওনার মতো মানুষ হয় না। স্যারের জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি।'

'খুব ভালো করেছেন। দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবেন না। চলে যান।'

তারা গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল।

রাত দশটার মতো বাজে। মীরাদের বাড়িতে একবার উঁকি দিয়ে যাব কি না ভাবছি। মীরা ফিরেছে কি না দেখে যাওয়া দরকার।

মীরার বাবা ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে আছেন। আমাকে দেখে উঠে এলেন। আমি বললাম, মীরা এখনো ফেরে নি?

তিনি হাহাকার-মেশানো গলায় বললেন, জি না।

'চিন্তা করবেন না, চলে আসবে। এখন মাত্র দশটা চল্লিশ। বারটা-সাড়ে বারটার দিকে চলে আসবে।'

ভদ্রলোক অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছেন। তিনি এখন পুরোপুরি বিভ্রান্ত। আমি আবারো পথে নামলাম।

৫

গা-ঘেঁষে কোনো গাড়ি যদি হার্ড ব্রেক করে তা হলে চমকে ওঠাই নিয়ম। শুধু চমকে ওঠা না, চমকে পেছন ফিরতে হবে। এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমি মাঝেমধ্যেই হই। রূপা এই কাণ্ডটা সবচে বেশি করে। গাড়ি নিয়ে হুট করে গা-ঘেঁষে দাঁড়াবে, এবং বিকট শব্দে হর্ন দেবে। ভেতরে ভেতরে চমকালেও বাইরে প্রকাশ করি না। কিছুই ঘটে নি ভঙ্গিতে হাঁটতে থাকি যতক্ষণ গাড়ির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে কেউ না ডাকে।

এবারো তা-ই করলাম। ঘ্যাস করে গা-ঘেঁষে গাড়ি থেমেছে। হর্ন দেওয়া হচ্ছে। আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে সামনে এগুচ্ছি।

'হিমু সাহেব! এই যে হিমু সাহেব!'

আমি তাকালাম। স্টিয়ারিং হুইল ধরে অপরিচিত একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার মাথায় ইরানি মেয়েদের মতো রঙিন ঝলমলে স্কার্ফ। মেয়েটিকে দেখাচ্ছেও ইরানিদের মতো।

'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'জি না।'

'সে কী! ভালো করে দেখুন তো!'

আমি ভালো করে দেখেও চিনতে পারলাম না। বাংলায় কথা বলে কোনো ইরানি তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

'আমি ফারজানা।'

'ও।'

'ও বলছেন তার মানে এখনো চিনতে পারেন নি। আমি ডাক্তার। আপনার চিকিৎসা করেছিলাম। ওই যে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন—।'

'এখন চিনতে পেরেছি। আপনি ড্রেস অ্যাজ য়্যু লাইক প্রতিযোগিতা করছেন নাকি? ইরানি মেয়ে সেজেছেন?'

'ডাক্তাররা সাজতে পারবে না এমন কোনো আইন আছে?'

'না, আইন নেই।'

'আপনার যদি তেমন কোনো কাজ না থাকে তা হলে উঠে আসুন।'

আমি গাড়িতে উঠলাম। ফারজানা বলল, আমি খুবই আনাড়ি ধরনের ড্রাইভার। আজই প্রথম সাহস করে একা একা বের হয়েছি। আপনার কাজ হল সামনের দিকে লক্ষ করা, যথাসময়ে আমাকে ওয়ার্নিং দেওয়া। পারবেন না?

'পারব। এক কাজ করলে কেমন হয়—ভিড়ের রাস্তা ছেড়ে ফাঁকা রাস্তায় চলে যাই।'

'ঢাকা শহরে ফাঁকা রাস্তা কোথায়?'

'হাইওয়েতে উঠবেন?'

'হাইওয়েতে কখনো উঠি নি।'

'চলুন আজ ওঠা যাক। ময়মনসিংহের দিকে যাওয়া যাক। পথে ভদ্রটাইপের একটা জঙ্গল পড়বে। গাড়ি পার্ক করে আমরা জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারি।'

'জঙ্গলে ঢুকব কেন?'

'ঢুকতে না চাইলে ঢুকবেন না। আমরা জঙ্গল পাশে ফেলে হুস করে চলে যাব।'

'আপনার পায়ে স্যান্ডেল নেই। স্যান্ডেল কি ছিঁড়ে গেছে?'

'গাড়ি চালাতে চালাতে পায়ের দিকে তাকাবেন না।' এমনিতেই আপনি আনাড়ি ড্রাইভার।'

'খুব আনাড়ি কি মনে হচ্ছে?'

'না—খুব আনাড়ি মনে হচ্ছে না।'

'আপনি কি জানেন হাসপাতাল থেকে আপনি চলে যাবার পর বেশ কয়েকবার আপনার কথা আমার মনে হয়েছে? আপনার এক আত্মীয়ের টেলিফোন নাম্বার ছিল। বোধহয় আপনার ফুপা। তাঁকে একদিন টেলিফোনও করলাম। তিনি বেশ খারাপ ব্যবহার করলেন।'

'ধমক দিলেন?'

'ধমক দেওয়ার মতোই। তিনি বললেন—আমাকে টেলিফোন করছেন কেন? হিমুর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আর কখনো টেলিফোন করে বিরক্ত করবেন না। বলেই খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।'

আমি হাসলাম।

ফারজানা বলল, হাসছেন কেন?

'আপনার গাড়ি চালানো খুব ভালো হচ্ছে—এইজন্যে হাসছি।'

'আমরা কি ময়মনসিংহের দিকে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ।'

'যে-জঙ্গলের কথা বলছেন সেখানে কি চা পাওয়া যাবে?'

'অবশ্যই পাওয়া যাবে। পোষা জঙ্গল। সবই পাওয়া যায়। যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন পিকনিক করতে আসেন নি?'

'আমি পড়াশোনা দেশে করি নি। আমার এম ডি ডিগ্রি বাইরের।'

'বাংলা তো খুব সুন্দর বলছেন।'

'আমার মা ছিলেন বাঙালি।'

'ছিলেন বলছেন কেন?'

'ছিলেন বলছি, কারণ—তিনি এখন নেই। তাঁর খুব শখ ছিল—তাঁর মেয়ে দেশে ফিরে দেশের মানুষের সেবা করবে। আমি বাংলাদেশে কাজ করতে এসেছি মার ইচ্ছাপূরণের জন্যে। আমি ভেবে রেখেছি—এদেশে পাঁচ বছর কাজ করব, তারপর ফিরে যাব।'

'ক' বছর পার করেছেন?'

'তিন বছর কয়েক মাস। দাঁড়ান, একজাক্ট ফিগার বলছি—তিন বছর চার মাস।'

'বাংলাদেশে কাজ করতে কেমন লাগছে?'

'মাঝে মাঝে ভালো লাগে। মাঝে মাঝে খুবই বিরক্ত লাগে। এদেশের কিছু মজার ব্যাপার আছে। বিনয়কে এদেশে দুর্বলতা মনে করা হয়, বদমেজাজকে ব্যক্তিত্ব ভাবা হয়। মেয়েমাত্রকেই অল্পবুদ্ধি ভাবা হয়। মেয়ে-ডাক্তার বললেই সবাই ভাবে ধাত্রী, যারা বাচ্চা ডেলিভারি ছাড়া আর কিছু জানে না।'

'বাচ্চা ডেলিভারি ছাড়া আপনি আর কী জানেন?'

'আমি একজন নিউরোলজিস্ট। আমার কাজকর্ম মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে। আপনার প্রতি আমার আগ্রহের এটাও একটা কারণ। যে কোনো কারণেই হোক আপনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জ্বরের ঘোরে আপনি প্রলাপ বকতেন। সেইসব আমি শুনেছি। কিছু ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড করাও আছে।'

'রেকর্ড করেছেন?'

'জি। রেকর্ডও করেছি। খুবই ইন্টারেস্টিং। আসলে আপনার উচিত একজন ভালো কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলা। বাংলাদেশে ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন না?'

'আছেন একজন।'

'একজন কেন? অনেক তো থাকার কথা।'

'একজনের নাম খুব শুনি। মিসির আলি সাহেব।'

'ওনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন। প্রয়োজন মনে করলে আমিও যাব।'

'আপনার এত আগ্রহ কেন?'

'আমার আগ্রহের কারণ আছে, সেটা আপনাকে বলা যাবে না। ভালো কথা, আপনার সেই বিখ্যাত জঙ্গল আর কতদূর?'

'এসে গেছি। মোড়টা পার হলেই জঙ্গল।'

'জঙ্গলে আরেকদিন গেলে কেমন হয়? আজ ইচ্ছা করছে না।'

'খুব ভালো হয়। শুধু একটা কাজ করুন, আমাকে নামিয়ে দিয়ে যান—এসেছি যখন জঙ্গল দেখে যাই।'

'সত্যি নামতে চান?'

'হ্যাঁ চাই।'

'ফিরবেন কীভাবে?'

'ফেরা কোনো সমস্যা না। বাস পাওয়া যায়।'

ফারজানা দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল।

আমি শালবনে ঢুকে পড়লাম। পিকনিক পার্টি এড়িয়ে আমি ঢুকে পড়লাম গভীর জঙ্গলে। জঙ্গল সম্পর্কে আমার বাবার দীর্ঘ উপদেশ আছে—

"যখনই সময় পাইবে তখনই বনভূমিতে যাইবার চেষ্টা করিবে। বৃক্ষের সঙ্গে মানবশ্রেণীর বন্ধন অতি প্রাচীন। আমার ধারণা আদি মানব এক পর্যায়ে বৃক্ষের সহিত কথোপকথন করিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। তবে সাধনায় ফল হয়। মন কেন্দ্রীভূত করিতে যদি সক্ষম হও—তবে বৃক্ষের সহিত যোগাযোগেও সক্ষম হইবে। বৃক্ষরাজি তোমাকে এমন অনেক জ্ঞান দিতে সক্ষম হইবে যে-জ্ঞান এমনিতে তুমি কখনো পাইবে না।"

কড়া রোদ উঠেছে। শালবনে ছায়া হয় না। তবু মোটামুটি ছায়াময় একটি বৃক্ষ দেখে তার নিচে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। শীতের রোদ আরামদায়ক। শুকনো পাতার চাদরে শুয়ে আছি। নড়াচড়া করলেই শুকনো পাতা মচমচ শব্দ করছে। যেন বলছে—নড়াচড়া করবে না। চুপচাপ শুয়ে থাক। শালগাছের যে ফুল হয় জানতাম না। পীতাভ ধরনের অনাকর্ষণীয় কিছু ফুল চোখে পড়ছে। শালের ফুলে কি গন্ধ হয়? এত

উঁচুতে যে, ছিড়ে গন্ধ শোঁকা সম্ভব না। প্রকৃতি নিশ্চয়ই এই ফুল মানুষের জন্যে বানায় নি। মানুষের জন্যে বানালে ফুল ফুটত হাতের নাগালের ভেতর।

ঘুমের ভেতর অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম—গাছ নিয়ে স্বপ্ন। গাছ আমার সঙ্গে কথা বলছে—। তবে উলটাপালটা কথা বলছে—কিংবা মিথ্যা কথা বলছে। যেমন গাছটা বলল, হিমু, তুমি কি জান এই পৃথিবীর সবচে প্রাচীন গাছটি বাংলাদেশে আছে—যার বয়স প্রায় ছয় হাজার বছর?

আমি বললাম, মিথ্যা কথা বলছ কেন? বাংলাদেশ উঠে এসেছে সমুদ্রগর্ভ থেকে। এমন প্রাচীন গাছ এদেশে থাকা সম্ভব নয়।

'তোমাদের বিজ্ঞানীরা কি সব জেনে ফেলেছেন?'

'সব না জানলেও অনেককিছুই জানেন।'

'গাছ যে একটি চিন্তাশীল জীব তা কি বিজ্ঞানীরা জানেন?'

'অবশ্যই জানেন। জগদীশচন্দ্র বসু বের করে গেছেন।'

'তা হলে বলো গাছের মস্তিষ্ক কোনটি। একটা গাছ তার চিন্তার কাজটি কীভাবে করে।'

'আমি জানি না, তবে আমি নিশ্চিত উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা জানেন।'

'কাঁচকলা! কেউ কিচ্ছু জানে না।'

'বিরক্ত করবে না, ঘুমাতে দাও।'

'সৃষ্টিরহস্য বোঝার ব্যাপারে তোমরা গাছের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর না কেন? আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেই তো আমরা সাহায্য করতে পারি।'

'তোমরা সাহায্য করতে পার?'

'অবশ্যই পারি। আমাদের পাতাগুলি অসম্ভব শক্তিশালী অ্যান্টেনা। এই অ্যান্টেনার সাহায্যে আমরা এই বিপুল সৃষ্টজগতের সব বৃক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি।'

'তাই নাকি?'

'মনে কর সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জের একটা গ্রহে গাছ আছে। আমরা সেই গাছের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। আমরা সেই গাছ থেকে তোমাদের জন্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য এনে দিতে পারি।'

'বাহ্, ভালো তো!'

'পৃথিবীর মানুষরা অমর হতে চায়। কিন্তু অমরত্বের কৌশল জানে না। এই অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জেই একটা গ্রহ আছে যার অতি উন্নত প্রাণীরা অমরত্বের কৌশল জেনে গেছে। তোমরা চাইলেই আমরা তোমাদের তা দিতে পারি।'

'শুনে অত্যন্ত প্রীত হলাম।'

'তুমি কি চাও?'

'না, আমি চাই না। আমি যথাসময়ে মরে যেতে চাই। হাজার হাজার বছর বেঁচে থেকে কী হবে?'

'তুমি চাইলে আমি তোমাকে বলতে পারি।'

'না, আমি চাচ্ছি না। স্বপ্নে প্রাপ্ত কোনো ঔষধের আমার প্রয়োজন নেই। তুমি যথেষ্ট বিরক্ত করেছ। এখন বিদেয় হও। ভালো কথা, তোমার নাম কী?''

'আমার নাম টারমেনালিয়া বেলেরিকা।'

'এমন অদ্ভুত নাম!'

'এটা বৈজ্ঞানিক নাম—সহজ নাম বহেড়া। আমরা কিন্তু অদ্ভুত গাছ। শালবনের ফাঁকে গজাই এবং লম্বায় শালগাছকেও ছাড়িয়ে যাই। আমাদের বাকলের রং কী বল তো? বলতে পারলে না। আমাদের বাকলের রং নীল। আচ্ছা যাও, আর বিরক্ত করব না। এখন ঘুমাও।'

আমার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে-আগে। জেগে উঠে দেখি সত্যি সত্যি একটা বহেড়া গাছের নিচেই শুয়ে আছি। গাছভরতি ডিমের মতো ফুল। আমি খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেলাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে—আমি শুয়েছিলাম শালগাছের নিচে। শালের ফুল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঢাকায় যেতে হবে পায়ে হেঁটে। সেটা খুব খারাপ হবে না। শীতকালে হাঁটার আলাদা আনন্দ। তবে ঢাকায় কতক্ষণে পৌঁছাব কে জানে! মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। দেখাটা আজ রাতেও হতে পারে। এক কাপ চা খাওয়া দরকার। বনের ভেতর কে আমাকে চা খাওয়াবে! আমি গলা উঁচিয়ে বললাম, আমার চারদিকে যেসব গাছ ভাইরা আছেন তাঁদের বলছি। আমার খুব চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে— আমি আপনাদের অতিথি। আপনারা কি আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন?

প্রশ্নটা করেই আমি চুপ করে গেলাম। উত্তরের জন্যে কান পেতে রইলাম। উত্তর পাওয়া গেল না, তবে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হচ্ছিল গাছরা উত্তর দেবে।

৬

দরজায় কোনো কলিংবেল নেই।

পুরোনো স্টাইলে কড়া নাড়তে হল। প্রথমবার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে শ্লেষ্মা-জড়ানো গলায় জবাব এল—কে? আমি চুপ করে রইলাম। প্রথমবারের 'কে'-তে জবাব দিতে নেই। দ্বিতীয়বারে জবাব দিতে হয়। এই তথ্য আমার মামার বাড়িতে শেখা। ছোট মামা বলেছিলেন—

'বুঝলি হিমু, প্রথম ডাকে কখনো জবাব দিবি না। খবরদার না! তুই হয়তো ঘুমাচ্ছিস, নিশুতি রাতে বাইরে থেকে কেউ ডাকল—হিমু! তুই বললি, জি? তা হলেই সর্বনাশ! মানুষ ডাকলে সর্বনাশ না। মানুষ ছাড়া অন্য কেউ ডাকলে সর্বনাশ। বাঁধা পড়ে যাবি। তোকে ডেকে বাইরে নিয়ে যাবে। এর নাম নিশির ডাক। কাজেই সহজ বুদ্ধি হচ্ছে—যে-ই ডাকুক প্রথমবারে সাড়া দিবি না। চুপ করে থাকবি। দ্বিতীয়বারে সাড়া দিবি। মনে থাকবে?'

আমার মনে আছে বলেই প্রথমবারে জবাব না দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবার কড়া নাড়লাম যাতে মিসির আলি সাহেব দ্বিতীয়বার বলেন— কে? আমি আমার পরিচয় দিতে পারি।

মিসির আলি দ্বিতীয়বার 'কে' বললেন না। দরজা খুলে বাইরে তাকালেন। খুব যে কৌতূহলী হয়ে তাকালেন তাও না। রাত একটার আগন্তুকের দিকে যতটুকু কৌতূহল নিয়ে তাকাতে হয় সে-কৌতূহলও তাঁর চোখে নেই। পরনে লুঙ্গি। খালিগায়ে শাদা চাদর জড়ানো। ভদ্রলোকের মাথাভরতি কাঁচাপাকা চুল। আমি ভেবেছিলাম টেকো মাথার কাউকে দেখব। আইনস্টাইন-মার্কা এত চুল ভাবি নি। আমি বললাম, স্যার স্লামালিকুম।

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আমার নাম হিমু।'

'আচ্ছা।'

'আপনার সঙ্গে কি কথা বলতে পারি?'

মিসির আলি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি আগের মতো কৌতূহলশূন্য। তিনি কি বিরক্ত? বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক কি ঘুম থেকে উঠে এসেছেন? না বোধহয়। ঘুমন্ত মানুষ প্রথমবার কড়া নাড়তেই কে বলে সাড়া দেবে না।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, কথা বলার জন্যে রাত দুটা খুব উপযুক্ত সময় নয়। আপনি জেগে ছিলেন তাই দরজার কড়া নেড়েছি। আপনি যদি বলেন তা হলে অন্য সময় আসব।

'আমি জেগে ছিলাম না, ঘুমাচ্ছিলাম। যাই হোক, আসুন, ভেতরে আসুন।'

আমি ভেতরে ঢুকলাম। মিসির আলি সাহেব দরজার হুক লাগালেন। দরজার হুকটা বেশ শক্ত, লাগাতে তাঁর কষ্ট হল। অন্য কেউ হলে দরজার হুক লাগাত না। যে-অতিথি কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাবে তার জন্যে এত ঝামেলা করে দরজা বন্ধ করার দরকারটা কী!

'বসুন। ওই চেয়ারটায় বসুন। হাতলের কাছে একটা পেরেক উঁচু হয়ে আছে। পাঞ্জাবিতে লাগলে পাঞ্জাবি ছিঁড়বে।'

মিসির আলি সাহেব পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি বসে বসে ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। উল্লেখ করার মতো কিছুই চোখে পড়ছে না। কয়েকটা বেতের চেয়ার। গোল একটা বেতের টেবিল। টেবিলের উপরে বাংলা ম্যাগাজিন। উপরের পাতা ছিঁড়ে গেছে বলে ম্যাগাজিনের নাম পড়া যাচ্ছে না। এক কোনায় একটা চৌকি। চৌকিতে বিছানা পাতা। এই বিছানায় কে ঘুমায়? মিসির আলি সাহেব? মনে হয় না। এই ঘরে আলো কম। বিছানায় শুয়ে বই পড়া যাবে না। মিসির আলি সাহেবের নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে বই পড়ার অভ্যাস। তাঁর শোবার ঘরটা দেখতে পারলে হত।

মিসির আলি ঢুকলেন। তাঁর দুহাতে দুটা মগ। মগভরতি চা।

'নিন, চা নিন। দুচামচ চিনি দিয়েছি—আপনি কি চিনি আরো বেশি খান?'

'জি না। যে যতটুকু চিনি দেয় আমি ততটুকুই খাই।'

তিনি আমার সামনের চেয়ারটায় বসলেন। এরকম বিশেষত্বহীন চেহারার মানুষ আমি কম দেখেছি। কে জানে বিশেষত্বহীনতাই হয়তো তাঁর বিশেষত্ব। চা খাচ্ছেন শব্দ করে। নিজের চায়ের স্বাদে মনে হয় নিজেই মুগ্ধ। আমি এত আরাম করে অনেক দিন কাউকে চা খেতে দেখি নি।

'তারপর হিমু সাহেব, বলুন আমার কাছে কেন এসেছেন।'

'আপনাকে দেখতে এসেছি স্যার।'

'ও আচ্ছা। এর আগে বলেছিলেন কথা বলতে এসেছেন। আসলে কোনটা?'

'দুটাই। চোখ বন্ধ করে তো আর কথা বলব না—আপনার দিকে তাকিয়েই কথা বলব।'

'তাও তো ঠিক। বলুন, কথা বলুন। আমি শুনছি।'

'মানুষের যে নানান ধরনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা শোনা যায় আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?'

'আমি সেরকম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ এখনো কাউকে দেখি নি, কাজেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না। আমার মন খোলা, তেমন ক্ষমতাসম্পন্ন কাউকে দেখলে অবশ্যই বিশ্বাস করব।'

'আপনি কি দেখতে চান?'

'জি না। আমার কৌতূহল কম। নানান ঝামেলা করে কোনো এক পীর সাহেবের কাছে যাব, তাঁর কেরামতি দেখব, সে ইচ্ছা আমার নেই।'

'কেউ যদি আপনার সামনে এসে আপনাকে কোনো কেরামতি দেখাতে চায় আপনি দেখবেন?'

মিসির আলি চায়ের মগ নামিয়ে রাখলেন। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন—সম্ভবত সিগারেট খুঁজছেন। এই ঘরে সিগারেট নেই। আমি ঘরটা খুব ভালমতো দেখেছি। মিসির আলি সাহেবের কাছে যেহেতু এসেছি স্বভাবটাও তাঁর মতো করার চেষ্টা করছি। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা। আমি লক্ষ করলাম, মিসির আলি সাহেবের চেহারায় সূক্ষ্ম হতাশার ছাপ পড়ল—অর্থাৎ শোবার ঘরেও সিগারেট নেই। নিকোটিনের অভাবে তিনি খানিকটা কাতর বোধ করছেন।

আমি বললাম, স্যার, আমার কাছে সিগারেট নেই।

ভেবেছিলাম তিনি আমার কথায় চমকাবেন। কিন্তু চমকালেন না। তবে তাঁর ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসির ছায়া দেখলাম। হাসিটা কি ব্যঙ্গের? কিংবা আমার ছেলেমানুষিতে তাঁর হাসি পাচ্ছে? না মনে হয়।

'স্যার, আমি নিজেও সামান্য ভবিষ্যৎ বলতে পারি। ঠিক আড়াইটার সময় কেউ একজন এসে আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট দেবে।'

মিসির আলি এবারে সহজ ভঙ্গিতে হাসলেন। চায়ের মগে চুমুক দিতে দিতে বললেন, সেই কেউ একজনটা কি আপনি?'

'জি স্যার। আড়াইটার সময় আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিয়ে যাব।'

'দোকান খোলা পাবেন?'

'ঢাকা শহরে কিছু দোকান আছে খোলেই রাত একটার পর।'

'ভালো।'

আমি মিসির আলি সাহেবের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আমি কিন্তু স্যার মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারি। সবসময় পারি না—হঠাৎ হঠাৎ পারি।

'ভালো তো!'

'আপনি কি আমার মতো কাউকে পেয়েছেন যে মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারে?'

'সব মানুষই তো মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। এটা আলাদা কোনো ব্যাপার না। ইনটিউটিভ একটা বিষয়। মাঝে মাঝে ইনটিউশন কাজে লাগে, মাঝে মাঝে লাগে না। মস্তিষ্ক ভবিষ্যৎ বলে যুক্তি দিয়ে। সেইসব যুক্তির পুরোটা আমরা বুঝতে পারি না বলে আমাদের কাছে মনে হয় আমরা আপনা-আপনি ভবিষ্যৎ বলছি।'

'আমার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা ইনটিউটিভ গেজ ওয়ার্কের চেয়েও সামান্য বেশি। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না বলে আপনার কাছে এসেছি।'

'আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা সম্পর্কে অন্যরা জানে?'

'যারা আমার কাছাকাছি থাকে, যারা আমাকে ভালোমতো চেনে তারা জানে।'

'আপনার আশপাশের মানুষদের এই ক্ষমতা দেখাতে আপনার ভালো লাগে, তাই না?'

'জি, ভালোই লাগে। একজন ম্যাজিশিয়ান সুন্দর একটি ম্যাজিক দেখাবার পর যেমন আনন্দ পায়—আমিও সেরকম আনন্দ পাই।'

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আমার ধারণা আপনি এক ধরনের ডিলিউশনে ভুগছেন। ডিলিউশন হচ্ছে নিজের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। যে-কোনো কারণেই হোক আপনার ভেতরে একটা ধারণা জন্মেছে আপনি সাধুসন্ত টাইপের মানুষ। আপনার খালি পা, হলুদ পাঞ্জাবি এইসব দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। যে-কোনো ডিলিউশন মানুষের মাথায় একবার ঢুকে গেলে তা বাড়তে থাকে। আপনারও বাড়ছে। আপনি নিজে আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা নিয়ে এক ধরনের অহঙ্কার বোধ করছেন। আপনাকে যতই লোকজন বিশ্বাস করছে আপনার ততই ভালো লাগছে। এখন রাত দুটায় আপনি আমার কাছে এসেছেন—বিশ্বাসীর তালিকাবৃদ্ধির জন্যে। রাত দুটার সময় না এসে আপনি সকাল দশটায় আসতে পারতেন। আসেন নি, কারণ, যে সাধু সেজে আছে সে যদি সকাল দশটায় আসে তা হলে তার রহস্য থাকে না। রহস্য বজায় রাখার জন্যেই আসতে হবে রাত দুটার দিকে। হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আপনি আমাকে নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন নি। তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত নিজেকে অন্যের চেয়ে আলাদা প্রমাণ করার জন্যে আপনি অদ্ভুত আচার-আচরণ করেন। যেমন আপনার পায়ের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রচুর হাঁটেন। মনে হচ্ছে রাতেই হাঁটেন। কারণ দিনে হাঁটা তো স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে পড়ে। যেহেতু আপনি রাতে হাঁটেন—বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আপনার ডিলিউশনকে পোক্ত করতে এরাও সাহায্য করে। এদের কেউ কেউ আপনাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মানেই আপনাকে সাহায্য করা। আমার ধারণা এদের কেউ কেউ আপনাকে সাধুও ভাবে। আপনার পদধূলি নেয়।'

'মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই একজনকে সাধু হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করবে?'

'হ্যাঁ, তা করবে। মানুষ খুব যুক্তিবাদী প্রাণী হলেও তার মধ্যে অনেকখানি অংশ আছে যুক্তিহীন। মানুষ যুক্তি ছাড়াই বিশ্বাস করতে ভালবাসে। প্রাণী হিসেবে মানুষ সবসময় অসহায় বোধ করে। সে সারাক্ষণ চেষ্টা করে অসহায়তা থেকে মুক্তি পেতে। পীর–ফকির, সাধু–সন্ন্যাসী হস্তরেখা, অ্যাস্ট্রলজি, নিউমারোলজির প্রতি এইসব কারণেই মানুষের বিশ্বাস।'

'আপনার ধারণা, মানুষ কোনো বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে নি?'

'অবশ্যই মানুষ বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। একদিন যে–মানুষ সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডল জয় করবে তার ক্ষমতা অসাধারণ। তবে তার মানে এই না সে ভবিষ্যৎ বলবে। দুটা বেজে গেছে—আপনার কথা ছিল না আমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেয়ার?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মিসির আলি বললেন, চলুন আপনার সঙ্গে যাই। কোন দোকানটা রাত দুটার সময় খোলা থাকে আমাকে দেখিয়ে দিন। মাঝে মাঝে সিগারেটের জন্যে খুব সমস্যায় পড়ি।

মিসির আলি তাঁর ঘরের দরজায় তালা লাগালেন না। তালা খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘর খোলা রেখে গভীর রাতে বের হচ্ছেন তার জন্যেও তাঁর মধ্যে কোনো অস্বস্তি লক্ষ করলাম না। ঘর খোলা রেখে বাইরে যাবার অভ্যাস তাঁর নতুন না এটা বোঝা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তাঁর মধ্যেও খানিকটা হিমুভাব আছে।

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনি আমার কথায় আপসেট হবেন না। আমি আপনাকে হার্ট করার জন্যে কিছু বলি নি।'

'আপনি যে এ–ধরনের কথা বলবেন তা আমি জানতাম।'

'সব জেনেশুনেই আমার কাছে এসেছেন?'

'জি স্যার।'

'আমার ধারণা আপনি আমার কাছে এসেছেন অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে—যা আপনি বলছেন না।'

'স্যার, আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

'কী জিনিস?'

'আমি কিছুদিন আগে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। যা দেখে ভয় পেয়েছিলাম, সেই জিনিসটা আপনাকে দেখাতে চাই।'

'কেন? আপনি চান যে আমিও ভয় পাই?'

'তা না।'

'তবে?'

'আমার কাছে শুনে আপনি ব্যাপারটা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন না।'

'তবু শুনি।'

আমি ভয় পাবার গল্পটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বললাম। মিসির আলি গল্পের

মাঝখানে একবারও কিছু জানতে চাইলেন না। হ্যাঁ হুঁ পর্যন্ত বললেন না। সিগারেট কিনলাম। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, আপনি একটা কাজ করুন। গল্পটা আবার বলুন।

'আবার বলব?'

'হ্যাঁ, আবার।'

'কেন?'

'দ্বিতীয়বার শুনে দেখি কেমন লাগে।'

আমি আবারো গল্প শুরু করলাম। মিসির আলি সিগারেট টানতে টানতে তাঁর বাসার দিকে যাচ্ছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি এবং গল্প বলছি। তিনি নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছেন। আমি তাঁর মুখে চাপা হাসিও লক্ষ করছি।

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনার গল্পটা ইন্টারেস্টিং, আমি আপনার সঙ্গে পরে এই নিয়ে কথা বলব।'

'আপনি যদি চান, যে-জায়গাটায় আমি ভয় পেয়েছিলাম সেখানে নিয়ে যেতে পারি।'

'আমি চাচ্ছি না।'

'তা হলে স্যার আমি যাই।'

'আচ্ছা। আবার দেখা হবে। ভালো কথা, যে-গলিতে আপনি ভয় পেয়েছিলেন—আপাতত সেই গলিতে না ঢোকা ভালো হবে।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

'হঠাৎ ব্রেইনে চাপ সৃষ্টি না করাই ভালো। মানুষের একটা অসুখের নাম "এরিকনোফোবিয়া"—মাকড়সাভীতি। এই অসুখ থেকে মানুষকে মুক্ত করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে তার গায়ে মাকড়সা ছেড়ে দেওয়া। মাকড়সা তার গায়ে কিলবিল করে হাঁটবে। এবং রোগী বুঝতে পারবে যে মাকড়সা অতি নিরীহ প্রাণী। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে মাঝে মাঝে রোগ ভালো হয়—তবে কিছু ক্ষেত্রে খুব খারাপ ফল হয়—রোগী তখন চারদিকে মাকড়সা দেখতে পায়। আমি চাই না—আপনার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটুক।'

'স্যার যাই?'

'আচ্ছা।'

আমি চলে আসছি। রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে ফিরে তাকালাম। মিসির আলি ঘরে ঢোকেন নি। এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। কী দেখছেন, তারা? আমি একটু বিস্মিত হলাম—মিসির আলি ধরনের মানুষরা মাইক্রোসকোপ টাইপ। কাছের জিনিসকে তারা সাবধানে দেখতে ভালবাসেন। ধরাছোঁয়ার বাইরের জগতের প্রতি তাঁদের আগ্রহ থাকার কথা না। তাঁরা অসীমের অনুসন্ধান করেন সীমার ভেতর থেকে।

মেসে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে রাতটা হেঁটে হেঁটেই কাটিয়ে দিই। যদিও ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। পা ভারী হয়েছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

বস্তা-ভাইয়ের পাশে গিয়ে কি শুয়ে থাকব? স্লিপিং-ব্যাগে তাদের জীবন কেমন কাটছে সেটাও দেখতে ইচ্ছা করছে। ছেলেটার নাম যেন কী? গাবুল? না গাবুল না। অন্যকিছু। নামটা কি সে আমাকে বলেছে? আচ্ছা, প্রতিটি গাছের কি মানুষের মতো নাম আছে? গাছ-মা কি তার গাছশিশুদের নাম রাখে? আমরা যেমন গাছের নামে নাম রাখি—শিমুল, পলাশ, বাবলা—ওরাও কি পছন্দের মানুষের নামে তাদের পুত্র-কন্যাদের নাম রাখে? যেমন একজনের নাম রাখল হিমু, আরেকজনের সোলায়মান।

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে—বস্তা-ভাইয়ের পুত্রের নাম সুলায়মান। সুলায়মানকে দেখতে ইচ্ছা করছে।

স্লিপিং-ব্যাগের ভেতর পিতাপুত্র দুজনই ঘুমাচ্ছিল। আমি তাদের ঘুম ভাঙালাম না। তাদের পাশে শুয়ে পড়লাম। এরা মনে হচ্ছে আমার জন্যে জায়গা রেখেছে। পাশের জায়গাটায় খবরের কাগজ বিছিয়ে রেখেছে। শুধু যে খবরের কাগজ তা না। খবরের কাগজের উপর বড় পলিথিনের চাদর। আমি শোয়ামাত্র স্লিপিং-ব্যাগের মুখ খুলে গেল। সুলায়মান তার মাথা বের করল।

'কী খবর সুলায়মান?'

সুলায়মান হাসল। তার সামনের দুটা দাঁত পড়ে গেছে।

দাঁত-পড়া সুলায়মানকে সুন্দর দেখাচ্ছে। সুলায়মান লাজুক গলায় বলল, আফনের জন্যে বাপজান জায়গা রাখছে।

'ভালো করেছে।'

'এখন থাইক্যা আফনের এই জাগা "রিজাভ"।'

'বাঁচা গেল! সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু রিজার্ভ জায়গা দরকার। তুই কি পড়তে পারিস?'

'জে না।'

'পড়াশোনা তো করা দরকার রে ব্যাটা।'

'গরিব মানুষের পড়ালেখা লাগে না।'

'কে বলেছে?'

'কেউ বলে নাই—আমি জানি।'

'এখন থেকেই নিজে নিজে জানা শুরু করেছিস?'

সুলায়মান দাঁত বের করে হাসল। চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, আফনেরে কী ডাকুম?

'যা ডাকতে ইচ্ছা হয় ডাক। কী ডাকতে ইচ্ছা করে?'

'মামা।'

'বেশ তো, মামা ডাকবি।'

'মামা—আফনে কিচ্ছা জানেন?'

'জানি—শুনবি?'

সুলায়মান হ্যাঁ না কিছুই বলল না। খুব সাবধানে স্লিপিং-ব্যাগ থেকে বের হয়ে এল। সম্ভবত সে তার বাবার ঘুম ভাঙাতে চাচ্ছে না। সুলায়মান এসে শুয়ে পড়ল আমার পাশে। আমি গল্প শুরু করলাম—আলাউদ্দিনের চেরাগের গল্প, যে-

চেরাগের ভেতর অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন দৈত্য ঘুমিয়ে থাকে। তার যদি ঘুম ভাঙানো যায় তা হলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। সব মানুষকেই একটি করে আলাউদ্দিনের চেরাগ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অল্পকিছু মানুষই চেরাগে ঘুমিয়ে থাকা দৈত্যকে জাগাতে পারে।

'সুলায়মান!'

'জি মামা?'

'তোর মনের যে–কোনো একটা ইচ্ছার কথা বল তো দেখি! তোর যে–কোনো একটা ইচ্ছা পূর্ণ হবে।'

'আমার কোনো ইচ্ছা নাই মামা।'

'আচ্ছা, তা হলে স্লিপিং–ব্যাগের ভেতর চলে যা। বাবার সঙ্গে ঘুমিয়ে থাক।'

'আমি আপনের লগে ঘুমামু।'

সুলায়মান একটা হাত আমার গায়ে তুলে দিয়েছে। আমি চলে গেছি একটা অদ্ভুত অবস্থায়, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, অথচ ঘুম আসছে না। চোখ মেলে রাখতেও পারছি না, আবার বন্ধও করতে পারছি না। বিশ্রী অবস্থা!

'হ্যালো, আঁখি কি বাসায় আছে?'

'আপনি কে বলছেন?'

'আমার নাম হিমু।'

'হিমুটা কে?'

'জি, আমি নীতুর বড় ভাই। নীতু হল আঁখির বান্ধবী।'

'তুমি আঁখির সঙ্গে কথা বলতে চাও কেন?'

'নীতুকে গতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আঁখিদের বাসায় যাচ্ছি বলে ঘর থেকে বের হয়েছে, আর ফিরে আসে নি। আমরা আঁখিদের বাসা কোথায়, টেলিফোন নাম্বার কী কিছুই জানতাম না। অনেক কষ্টে টেলিফোন নাম্বার পেয়েছি। মা খুব কান্নাকাটি করছেন। ঘন ঘন ফিট হচ্ছেন...'

'কী সর্বনাশ! ফিট হওয়ারই তো কথা। শোনো হিমু, নীতু নামে কেউ এ বাড়িতে আসে নি। নীতু কেন, কোনো মেয়েই আসে নি।'

'আপনি একটু আঁখিকে দিন। আঁখির সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত মা শান্ত হবেন না। মা কথা বলবেন।'

'তুমি ধরো, আমি আঁখিকে ডেকে দিচ্ছি। আজকালকার মেয়েদের কী যে হয়েছে! মাই গড—চিন্তাও করা যায় না!'

আমি ফোঁপানির মতো আওয়াজ করে নিজের প্রতিভায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আঁখিকে টেলিফোনে কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না—এই অভিনয়টা সেই কারণেই দরকার হয়ে পড়েছিল।

আঁখি টেলিফোন ধরল। ভীত গলায় বলল, কে?

'আমি হিমু। নীতুর বড় ভাই।'

'আমি তো নীতু বলে কাউকে চিনি না।'

'আমি নিজেও চিনি না। নীতুর গল্পটা তৈরি করা ছাড়া উপায় ছিল না। কেউ তোমাকে টেলিফোন দিচ্ছিল না।'

'আপনি কে?'

'আমি হিমু।'

'হিমু নামেও তো আমি কাউকে চিনি না!'

'আমি বাদলের দূর সম্পর্কের ভাই। ওই যে, যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছিল! তুমি পালিয়ে চলে গেলে বলে বিয়ে হয় নি।'

'আপনি কী চান?'

'আমি কিছুই চাই না—বাদলের কারণে তোমাকে টেলিফোন করেছি। ও বোকা টাইপের তো, বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় নানান ধরনের পাগলামি করছে—আমরা অস্থির হয়ে পড়েছি। তুমি ওকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভালো কাজ করেছ। বোকা স্বামীর সঙ্গে সংসার করা ভয়াবহ ব্যাপার।'

'উনি বোকা?'

'বোকা তো বটেই। ও হল বোকান্দর। বোকা যোগ বান্দর—বোকান্দর। সন্ধি করলে এই দাঁড়ায়। বোকা মানুষদের প্রতি বুদ্ধিমানদের কিছু দায়িত্ব আছে। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তুমি যদি এই দায়িত্ব পালন কর।'

'আমি বুদ্ধিমতী আপনাকে কে বলল?'

'শেষ মুহূর্তে তুমি বাদলকে বিয়ে করতে রাজি হও নি—এটি হচ্ছে তোমার বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। আঁখি শোনো—তুমি বাদলের পাগলামি কমাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

'সরি, আমি কিছু করতে পারব না।'

'ও কী সব পাগলামি করছে শুনলে তোমার মায়া হবে। একটা শুধু বলি—রাত বারটার পর ও তোমাদের বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করে। অন্য সময় করে না, কারণ অন্য সময় হাঁটাহাঁটি করলে তুমি দেখে ফেলবে। সেটা নাকি তার জন্যে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।'

'শুনুন, ভালো একটা মেয়ে দেখে আপনারা ওনার বিয়ে দিয়ে দিন—দেখবেন পাগলামি সেরে যাবে।'

'সেটাই করা হচ্ছে। মেয়ে পছন্দ করা হয়েছে। মেয়ে খুব সুন্দর। শুধু একটু শর্ট—পাঁচ ফুট। হাইহিল পরলে অবিশ্যি বোঝা যায় না। মেয়ে গান জানে—রেডিওতে বি গ্রেডের শিল্পী।'

'ভালোই তো।'

'ভালো তো বটেই। ছাত্রীও খুব ভালো—এস. এস. সি.-তে চারটা লেটার এবং স্টার পেয়েছে। চারটা লেটারের একটা আবার ইংরেজিতে। ইংরেজিতে লেটার পাওয়া সহজ না।'

'আজকাল অনেকেই পাচ্ছে।'

'যারা পাচ্ছে—তারা তো আর এমনি এমনি পাচ্ছে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে চেম্বারস ডিকশনারি পুরোটা মুখস্থ।'

'আচ্ছা শুনুন—আপনার কথা শেষ হয়েছে তো? আমি এখন রেখে দেব।'

'তুমি কোনো সাহায্য করতে পারবে না, তাই না?'

'জি না—মেয়েটার নাম কী?'

'কোন মেয়েটার নাম?'

'যার সঙ্গে আপনার ভাইয়ের বিয়ে হচ্ছে।'

'তুমি সাহায্য না করলে তো বাদলের বিয়ে হবে না। আগে বাদলের ঘাড় থেকে আঁখি-ভূতকে নামাতে হবে। ঘাড় খালি হলেই "বাঁধন" ভূত চেপে বসবে।'

'মেয়েটার নাম বাঁধন?'

'হ্যাঁ।'

'খুব কমন নাম—।'

'কমনের ভেতরই লুকিয়ে থাকে আনকমন। আঁখি নামটাও তো কমন। কিন্তু তুমি তো আর কমন মেয়ে না।'

'আমিও কমন টাইপের মেয়ে।'

'অসম্ভব! কমন টাইপের কোনো মেয়ে বিয়ের দিন বিয়ে ভেঙে দিয়ে প্রেমিকের কাছে চলে যায় না। কমন টাইপের মেয়ে প্রেমিকের কথা ভুলে গিয়ে খুশি মনে বিয়ে করে ফেলে।'

'শুনুন, আপনি খুব অশালীন কথা বলছেন। আমি কোনো প্রেমিকের কাছে যাই নি। আমার কোনো প্রেমিক নেই।'

'ও আচ্ছা।'

'মার সঙ্গে রাগ করে চলে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা শুনতে চান?'

'না।'

'না বললে হবে না, আপনাকে শুনতে হবে। আমাদের বাড়িতে খুব অদ্ভুত ব্যবস্থা। কখনোই কেউ আমার ইচ্ছায় কিছু করে না। কখনোই না। মনে করুন, ঈদের জন্যে শাড়ি কেনা হবে। আমার একটা হলুদ শাড়ি পছন্দ। আমি সেটা কিনতে পারব না। মা বলবে—হলুদ শাড়ি তোমাকে মানায় না। ছোটবেলায় খুব শখ ছিল নাচ শিখব। আমাকে শিখতে দেওয়া হয় নি। নাচ শিখে কী হবে? আমার শখ ছিল সায়েন্স পড়ব—জোর করে আমাকে হিউম্যানিটিজ গ্রুপে দেওয়া হল। ধরুন আমার যদি কোনো টেলিফোন আসে—আমাকে সে টেলিফোন ধরতে দেওয়া হবে না। দফায়-দফায় নানান প্রশ্নের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। "কে টেলিফোন করল?" "বান্ধবী?" "বান্ধবীর বাসা কোথায়?" "বাবা কী করেন?" ধরুন আমি কোনো বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছি—হুট করে একসময় মা করবে কী, হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কানে দিয়ে শুনবে আসলেই কোনো মেয়ে কথা বলছে, না কোনো ছেলে কথা বলছে। আমার গায়ে-হলুদের দিন কী হল শুনুন। আমি মাছ খেতে পারি না। গন্ধ লাগে। মাছের গন্ধে আমার বমি এসে যায়। না, তার পরেও খেতে হবে। গায়ে-হলুদের মাছ না খেলে অমঙ্গল হয়। মাছ খেলাম, তারপর বমি করে ঘর ভাসিয়ে দিলাম। তখন খুব রাগ উঠে গেল—আমি রিকশা নিয়ে পালিয়ে চলে গেলাম বান্ধবীর বাড়িতে। এই হচ্ছে ঘটনা।'

'তোমার তা হলে কোনো প্রেমিক নেই।'

'অপরিচিত কোনো ছেলের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত নেই—আর আমার থাকবে প্রেমিক! অথচ দেখুন, আমার সব বান্ধবী প্রেমবিশারদ। প্রেমিকের সঙ্গে সিনেমা দেখছে, রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছে। জয়দেবপুরে শালবনে হাঁটতে যাচ্ছে। আমার এক বান্ধবী, নাম হল শম্পা। সে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে ফেলেছে। দেখুন-না, কী রকম রোমান্টিক। আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন কী ছিল জানেন? একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম হয়ে তারপর গোপনে তাকে বিয়ে করব।'

'সেটা তো এখনো করতে পার। তবে তোমার মা-বাবা খুব কষ্ট পাবেন।'

'আমি চাই তারা কষ্ট পাক।'

'তা হলে একটা কাজ করলে হয়—তুমি বাদলকেই কোর্টে বিয়ে করে ফ্যাল। কেউ কিছু জানবে না। তোমার বাবা-মা শুরুতে প্রচণ্ড রাগ করবেন। তারপর যখন জানবেন তুমি তাদের পছন্দের পাত্রকেই বিয়ে করেছ তখন রাগ পানি হয়ে যাবে। আইডিয়া তোমার কাছে কেমন লাগছে?'

আঁখি চুপ করে আছে। আঁখি পরিকল্পনা ধুম করে ফেলে দেয় নি। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, তোমায় যা করতে হবে তা হচ্ছে—বাবা-মাকে কঠিন একটা চিঠি লেখা—মা, আমি সারাজীবন তোমাদের কথা শুনেছি। আর না। এখন আমি আমার নিজের জীবন নিজেই বেছে নিলাম। বিদায়। বিদায়টা লিখবে প্রথমে ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটার B বাংলা দায়। B দায়।

'আপনি আমাকে থ্রি ফোর-এর বাচ্চা ভাবছেন?'

'ঠাট্টা করছি। তবে তোমাকে যা অবশ্যই করতে হবে তা হচ্ছে—বাসর করতে হবে—অপরিচিত কোনো জায়গায়।'

'কোথায় সেটা?'

'আমার মেসেও হতে পারে। আমার অবিশ্যি খুবই দরিদ্র অবস্থা।'

'যাক, এই সব ছেলেমানুষি আমার ভালো লাগছে না।'

'তা হলে থাক।'

'তা ছাড়া আপনার ভাই বাদল, মিঃ রেইন। ও কি রাজি হবে? আমার কাছে আইডিয়াটা খুবই মজার লাগছে, কিন্তু তার কাছে লাগবে?'

'ও বিরাট গাধা। তুমি যা বলবে ও তাতেই রাজি হবে।'

'মানুষকে হুট করে গাধা বলবেন না।'

'সরি, আর বলব না।'

'বিয়েতে সাক্ষী লাগবে না?'

'সাক্ষী নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না। তুমি চলে এস।'

'কোথায় চলে আসব?'

'মগবাজার কাজী অফিসে চলে আস। বাদল সেখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আপনি পাগলের মতো কথা বলছেন কেন? মিঃ রেইন শুধু শুধু মগবাজার কাজী অফিসে বসে থাকবে কেন?'

'বাদল সেখানে আছে, কারণ আমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে তারপর তোমাকে

টেলিফোন করেছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বললেই তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হবে।'

'হিমু সাহেব, শুনুন। নিজের উপর এত বিশ্বাস রাখবেন না। আমি আপনার প্রতিটি কথায় তাল দিয়ে গেছি দেখার জন্যে যে আপনি কতদূর যেতে পারেন।'

'তুমি তা হলে কাজী অফিসে আসছ না?'

'অবশ্যই না। এবং আমি আপনার প্রতিটি মিথ্যা কথাও ধরে ফেলেছি।'

'কোন কোন মিথ্যা ধরলে?'

'এই যে আপনি বললেন, মিঃ রেইন মগবাজার কাজী অফিসে বসে আছে।'

'কীভাবে ধরলে?'

'এখনো ধরি নি। তবে ধরব। মগবাজার কাজী অফিস আমাদের বাসা থেকে দুমিনিটের পথ। আমি এক্ষুনি সেখানে যাচ্ছি।'

'শুধু দেখার জন্যে বাদল সেখানে আছে কি না?'

'হ্যাঁ।'

খট করে শব্দ হল। আঁখি টেলিফোন রেখে দিল। আমি মনে মনে হাসলাম। বাদলকে আমি আসলেই কাজী অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে একা না, সঙ্গে দুজন সাক্ষীও আছে। মোফাজ্জল এবং জহিরুল।

ওদের জন্যে সুন্দর একটা বাসরঘরের ব্যবস্থা করতে হয়। সবচে ভালো হত রাতটা যদি তারা দুজনে গাছের নিচে কাটাতে পারত। সেটা সম্ভব না। গল্পে-উপন্যাসে গৃহবিতাড়িত তরুণ-তরুণীর জীবন কাটানোর কথা পাওয়া যায়। বাস্তব গল্প-উপন্যাসের মতো নয়।

রাত দশটায় ফুপুর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। ঘটনা কতদূর গড়িয়েছে জানা দরকার।

বাসায় গিয়ে দেখি বিরাট গ্যাঞ্জাম। ফুপুর মাথায় আইসব্যাগ চেপে ধরা আছে। পাশেই ফুপা। তিনিও রণহুঙ্কার দিচ্ছেন। ফুপু বললেন, খবর কিছু শুনেছিস হিমু?

'কী খবর?'

'হারামজাদাটা ওই বদ মেয়েটাকে কোর্ট ম্যারেজ করেছে। ওর চামড়া ছিলে তুলে মরিচ লাগিয়ে দেওয়া দরকার।'

'কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলেছে—বাদলের মতো নিরীহ ছেলে!'

'নিরীহ ছেলে কি আর নিরীহ আছে? ডাইনির খপ্পরে পড়েছে না!'

ফুপা বললেন, আমি তো কল্পনাও করতে পারছি না। কী ইচ্ছা করছে জানিস হিমু?

'না। কী ইচ্ছা করছে?'

'ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে হারামজাদাটাকে গুলি করে মারতে।'

ফুপু কঠিনচোখে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললেন, এইসব আবার কী ধরনের কথা! নিজের ছেলের মৃত্যুকামনা!

'আহা, কথার কথা বলেছি। গাধাটার তো দোষ নেই। ডাইনির পাল্লায় পড়েছে না!'

আমি বললাম, নিজের ছেলের বউকেও ডাইনি বলা ঠিক হচ্ছে না। দুজনই ছেলেমানুষ, একটা ভুল করেছে...এখন উচিত ক্ষমাসুন্দর চোখে...

ফুপু গর্জন করে উঠলেন, হিমু, তুই দালালি করবি না। খবরদার বললাম! এই বাড়ি চিরদিনের জন্যে ওদের জন্যে নিষিদ্ধ।

'বেচারারা বাসররাতে পথে–পথে ঘুরবে!'

'কেউ যদি জায়গা না দেয় পথে–পথে ঘোরা ছাড়া গতি কী! আঁখি বাদলকে নিয়ে তার মার বাড়িতে গিয়েছিল। তিনি মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।'

'তা তো দেবেই। বদের ঝাড় না? আমার ছেলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে, এতবড় সাহস! আমি এই বাড়িতেই আমার ছেলের বাসর করব।'

'এটা মন্দ না। লাইটফাইট নিয়ে আসি।'

'লাইটফাইট কেন?'

'আলোকসজ্জা করতে হবে না?'

'আলোকসজ্জা তো পরের ব্যাপার—বাসরঘর সাজাতে হবে। ফুল আনতে হবে। এত রাতে ফুল পাবি?'

'পাব না মানে?'

ফুপু মাথার আইসব্যাগ ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন।

ফুপার চোখ চকচক করছে। মনে হয় ছেলের বিবাহ উপলক্ষে আজ তিনি বোতল খুলবেন। তাঁর সঙ্গীর অভাব হবে না। মোফাজ্জল এবং জহিরুল বাড়ির সামনেই ঘোরাঘুরি করছে। সিগন্যাল পেলেই চলে আসবে।

৭

সাদেক সাহেব শুকনোমুখে ফুপুদের বসার ঘরে বসে আছেন। তাঁর সামনে এক কাপ চা। নাশতার প্লেটে দুপিস কেক। দেখেই মনে হচ্ছে অনেক দিনের বাসি, ছাতাপড়া। আমাকে দেখে ভদ্রলোক হতাশ গলায় বললেন, বাড়ির সবাই কোথায় গেছে জানেন?

আমি বললাম, না। যদিও সুনসান নীরবতা দেখে কিছুটা আঁচ করতে পারছিলাম। বাদল এবং আঁখি হানিমুন করতে কক্সবাজারের দিকে রওনা হয়েছে। তাদের সঙ্গে এ–বাড়ির সবাইও রওনা হয়েছে। ফুপা সম্প্রতি একটা মাইক্রোবাস কিনেছেন। মাইক্রোবাস ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন সুযোগ হয়েছে। হানিমুনে স্বামী–স্ত্রী একা থাকবে এটাই নিয়ম। এ–বাড়িতে সব নিয়মই উলটো দিকে চলে।

'বাড়ির সবাই কোথায় আপনি জানেন না?'

'জি না।'

'ওরা সবাই কক্সবাজার চলে গেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'কাজের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি।'

'আপনি মনে হয় কিছুটা আপসেট হয়েছেন।'

'আপসেট হওয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়? আপনার ফুপুর ঠেলাঠেলিতে মামলার সমস্ত

ব্যবস্থা করে চারজনকে আসামি দিয়ে মামলা দায়ের করে বাসায় এসে শুনি সবাই কক্সবাজার।'

'মামলা দায়ের হয়েছে?'

'অবশ্যই হয়েছে। পাঁচজন সাক্ষী যোগাড় করেছি। এর মধ্যে মারাত্মক আহত আছে দুজন। দুজনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আসামি করেছি তিনজনকে—মেয়ের বাবা, মেয়ের বড় মামা আর মেজো মামা। আজই ওয়ারেন্ট ইস্যু হবে।'

'আপনি তো ভাই খুবই করিৎকর্মা মানুষ। ডায়নামিক পার্সেনিলিটি।'

প্রশংসায় সাদেক সাহেব খুশি হলেন না। তিনি আরো মিইয়ে গেলেন। বাসি কেক কচকচ করে খেয়ে ফেললেন।

'হিমু সাহেব।'

'জি?'

'আমার অবস্থাটা চিন্তা করুন। যাদের নামে মামলা করেছি তারা ফরিয়াদিদের সঙ্গে মিলেমিশে মেয়ে এবং মেয়ের জামাই-এর সঙ্গে হানিমুনে চলে গেছে।'

'ওই পার্টিও গেছে নাকি?'

'জি, তারাও গিয়েছে। আমি এখান থেকে টেলিফোন করে জেনেছি। তারা আরেকটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছে।'

'বাহ্‌, ভালো তো!'

সাদেক সাহেব রেগে গেলেন। হতভম্ব গলায় বললেন, ভালো তো মানে? ভালো তো বলছেন কেন?

'কিছু ভেবে বলছি না, কথার কথা বলছি।'

'আমার অবস্থাটা আপনি চিন্তা করছেন?'

'আসলে মামলার কথাতে নেচে ওঠাটা আপনার ঠিক হয় নি। সবুর করা উচিত ছিল। সবুরে "ফ্রুট" ফলে বলে একটা কথা আছে। সবুর করলে আপনাকে এই ঝামেলায় যেতে হত না। ফ্রুট ফলত, আপনিও মাইক্রোবাসে করে হানিমুন পার্টিতে শামিল হতে পারতেন।'

'রসিকতা করছেন?'

'রসিকতা করছি না।'

'দয়া করে রসিকতা করবেন না। রসিকতা আমার পছন্দ না। আমি সিরিয়াস ধরনের মানুষ।'

'চা খাবেন?'

'না, চা খাব না। আচ্ছা দিতে বলুন। আমার মাথা আউলা হয়ে গেছে, এখন করবটা কী বলুন তো?'

'সাজেশান চাচ্ছেন?'

'না, সাজেশান চাচ্ছি না। আমি অন্যের সাজেশানে চলি না।'

'না চলাই ভালো। ফুপুর সাজেশান শুনে আপনার অবস্থাটা কী হয়েছে দেখুন। পুরোপুরি ফেঁসে গেছেন।'

সাদেক সাহেব সিগারেট ধরালেন। বেচারাকে দেখে সত্যি সত্যি মায়া লাগছে।

'সাদেক সাহেব!'

'জি?'

'আপনি মন-খারাপ করবেন না। আমি আছি আপনার সঙ্গে।'

'আপনি আমার সঙ্গে আছেন মানে কী?'

'ওরা যা ইচ্ছা করুক। ওদের মিল-মহব্বতের আমরা তোয়াক্কা করি না। আমরা আমাদের মতো মামলা চালিয়ে যাব।'

'আবার রসিকতা করছেন?'

'ভাই, আমি মোটেই রসিকতা করছি না। আমি সিরিয়াস। আঁখির বাবা এবং দুই মামাকে আমরা হাজতে ঢুকিয়ে ছাড়ব। পুলিশকে দিয়ে রোলারের ডলা দেওয়াব। কানে ধরে উঠবোস করাব।'

'হিমু সাহেব। আপনার কি মাথা খারাপ? আপনি উন্মাদ?'

'আমি উন্মাদের মতো কথা বলছি?'

'অবশ্যই বলছেন।'

'তা হলে আরেকটা সাজেশান দিই। আপনি নিজেও কক্সবাজার চলে যান। আসামি ফরিয়াদি দুই পার্টিকেই একসঙ্গে ট্যাকল করুন। দুপার্টিই আপনার চোখের সামনে থাকবে। আপনি বিচক্ষণ আইনবিদ। আইনের প্যাঁচে ফেলে হালুয়া টাইট করে দিন। ওরা বুঝুক হাউ মেনি প্যাডি, হাউ মেনি রাইস।'

'শুনুন হিমু সাহেব, আপনি আপনার মাথার চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা করুন। ইউ আর এ সিক পারসন।'

'আপনার চায়ের কথা বলা হয় নি। দাঁড়ান, চায়ের কথা বলে এসে আপনার সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেব।'

সাদেক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে দ্বিতীয় বাক্য বলার সুযোগ না দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে—ঝড়ের বেগে নিষ্ক্রমণ।

ফুপুর কাজের ছেলে রশীদ আমার খুব যত্ন নিল। আমাকে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। রশীদের বয়স আঠার-উনিশ। শরীরের বাড় হয় নি বলে এখনো বালক-বালক দেখায়। ফুপার বাড়িতে সে গত দুবছর হল আছে। ফুপুর ধারণা রশীদের মতো এক্সপার্ট কাজের ছেলে বাংলাদেশে দ্বিতীয়টা নেই। সে একা এক শ না, একাই তিন শ। কথাটা মনে হয় সত্যি।

রশীদ দাঁত বের করে বলে, আইজ আর কই ঘুরবেন। শুইয়া বিশ্রাম করেন। মাথা মালিশ কইরা দিমু। দুপুরে আফনের জন্যে বিরানি পাকামু।

'বিরানি রাঁধতে পারিস?'

'আমি পারি না এমন কাম এই দুনিয়াতে পয়দা হয় নাই। সব কিসিমের কাম এই জীবনে করছি।'

'বলিস কী!'

'আমার ভাইজান আফনের মতো অবস্থা। বেশিদিন কোনো কামে মন টিকে না। চুরিধারি কইরা বিদায় হই।'

'চুরিধারি করিস?'

'পরথম করি না। শেষ সময়ে করি। বিদায় যেদিন নিমু তার একদিন আগে করি। ভাইজান, আফনের চুল বড় হইছে, চুল কাটবেন?'

'নাপিতের কাজও জানিস?'

'জানি। মডান সেলুনে এক বছর কাম করছি। কলাবাগান। ভালো সেলুন। এসি ছিল। কারিগরও ছিল ভালো।'

'নাপিতের দোকান থেকে কী চুরি করেছিলি?'

'ক্ষুর, কেঁচি, চিরুনি, দুইটা শ্যাম্পু এইসব টুকটাক....'

'খারাপ কী? ছোট থেকে বড়। টুকটাক থেকে একদিন ধুরুমধারুম হবে। দে চুল কেটে দে।'

আমি হাত-পা ছড়িয়ে বারান্দায় মোড়ায় বসলাম। রশীদ মহা উৎসাহে আমার চুল কাটতে বসল।

'মাথা কামাইবেন ভাইজান?'

'মাথা কামানোর দরকার আছে?'

'শখ হইলে বলেন। মাথা কামানিটা হইল শখের বিষয়।'

'মাথা কামাতে তোর যদি আরাম লাগে তা হলে কামিয়ে দে। সমস্যা কিছু নেই। আমার মাথায় চুল থাকাও যা, না-থাকাও তা।'

রশীদ গম্ভীরমুখে বলল, লোকের ধারণা মাথাকামানি খুব সহজ। আসলে কিন্তু ভাইজান বড়ই কঠিন কাজ।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, জগতের যাবতীয় কঠিন কাজই আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ মনে হয়। সহজ কাজকে মনে হয় কঠিন। যেমন ধর সত্য কথা বলা। মনে হয় না খুব সহজ, ইচ্ছা করলেই পারা যাবে। আসলে ভয়ঙ্কর কঠিন। যে মানুষ এক মাস কোনো মিথ্যা না বলে শুধুই সত্যি কথা বলবে, ধরে নিতে হবে সে একজন মহামানব।

'ভাইজান!'

'বল।'

'আপনার সঙ্গে আমার একটা পেরাইভেট কথা ছিল।'

'বলে ফেল।'

'আফনের কাছে আমি একটা জিনিস চাই ভাইজান—আফনে না বলতে পারবেন না।'

'কী জিনিস চাস?'

'সেইটা ভাইজান পরে বলতেছি। আগে আফনে ওয়াদা করেন দিবেন।'

'তুই চাইলেই আমি দিতে পারব এটা ভাবলি কী করে?'

'আফনে মুখ দিয়া একটা কথা বললেই সেইটা হয়—এইটা আমরা সবেই জানি।'

'তোকে বলেছে কে?'

'বলা লাগে না ভাইজান। বুঝা যায়। তারপরে বাদল ভাই বলছেন। বাদল ভাইয়ের বিবাহ গেছিল ভাইঙ্গা। বাদল ভাই আফনেরে বলল—সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক।'

'তুই চাস কী?'

'বিদেশ যাইতে খুব মন চায় ভাইজান। দেশে মন টিকে না।'

'আচ্ছা যা, হবে।'

রশীদ মাথা কামানো বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ আমার পা ছুঁয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করল। আমি সিদ্ধপুরুষদের মতোই তার শ্রদ্ধা গ্রহণ করলাম। মানুষকে ভক্তি করতে ভালো লাগে না। মানুষের ভক্তি পেতে ভালো লাগে।

আমার মাথা কামানো হল। মাথা ম্যাসেজ করা হল। গা–মালিশ করা হল। দুপুরে হেভি খানাপিনা হল। খাসির বিরিয়ানি, মুরগির রোস্ট। অতি সুস্বাদু রান্না। ভরপেট খাবার পরেও মনে হচ্ছে আরো খাই।

'রশীদ, তুই তো ভালো রান্না জানিস!'

'চিটাগাং হোটেলে বাবুর্চির হেল্পার ছিলাম ভাইজান। বাবুর্চির নাম ওস্তাদ মনা মিয়া। এক নম্বর বাবুর্চি ছিল। রান্ধনের কাজ সব শিখছি ওস্তাদের কাছে।'

'ভালো শিখেছিস। খুব ভালো শিখেছিস।'

'রাইতে ভাইজান আফনেরে চিতলমাছের পেটি খাওয়ামু। এইটা একটা জিনিস।'

'কী রকম জিনিস?'

'একবার খাইলে মিত্যুর দিনও মনে পড়ব। আজরাইল যখন জান কবচের জন্যে আসব তখন মনে হইব—আহারে, চিতলমাছের পেটি! ওস্তাদ মনা মিয়া আমারে হাতে ধইরা শিখাইছে। আমারে খুব পিয়ার করত।'

'ওস্তাদের কাছ থেকে কী চুরি করলি?'

রশীদ চুপ করে রইল। আমি আর চাপাচাপি করলাম না। দুপুরে লম্বা ঘুম দিলাম। রাতে খেলাম বিখ্যাত চিতলমাছের পেটি। সেই রান্না শিল্পকর্ম হিসেবে কতটা উত্তীর্ণ বলতে পারলাম না—কারণ শুরুতেই গলায় কাঁটা বিঁধে গেল। মাছের কাঁটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু একে অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রতিনিয়তই সে জানান দিতে থাকে। আমি আছি। আমি আছি। আমি আছি। ঢোক গেলার প্রয়োজন নেই, তার পরেও ক্রমাগত ঢোক গিলে যেতে হয়। কাঁটার প্রসঙ্গে আমার বাবার কথা মনে পড়ল। তাঁর বিখ্যাত বাণীমালায় কাঁটাসংক্রান্ত বাণীও ছিল।

কণ্টক

কাঁটা, কণ্টক, শলা, তরুনখ, সূচী, চোঁচ

বাবা হিলাময়, শৈশবে কইমাছের ঝোল খাইতে গিয়া একবার তোমার গলায় কইমাছের কাঁটা বিঁধিল। তুমি বড়ই অস্থির হইলে। মাছের কাঁটার যন্ত্রণা তেমন অসহনীয় নয়, তবে বড়ই অস্বস্তিকর। কণ্টক নীরবেই থাকে, তবে সে প্রতিনিয়তই সে তার অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়। কণ্টকের এই স্বভাব তোমাকে জানাইবার জন্যই আমি তোমার গলার কাঁটা তুলিবার কোনো ব্যবস্থা করি নাই। তুমি কিছুদিন গলায় কাঁটা নিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে। বাবা হিমালয়, তুমি কি জান যে মানুষের মনেও পরম করুণাময় কিছু কাঁটা বিধাইয়া দেন? একটি কাঁটার নাম—মন্দ কাঁটা। তুমি যখনই কোনো মন্দ কাজ করিবে তখনই এই কাঁটা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তুমি অস্বস্তি বোধ করিতে থাকিবে। ব্যথাবোধ না—অস্বস্তিবোধ।

সাধারণ মানুষদের জন্য এইসব কাঁটার প্রয়োজন আছে। সিদ্ধপুরুষদের জন্যে প্রয়োজন নাই। কাজেই কণ্টকমুক্তির একটা চেষ্টা অবশ্যই তোমার মধ্যে থাকা উচিত। যেদিন

নিজেকে সম্পূর্ণ কণ্টকমুক্ত করিতে পারিবে সেইদিন তোমার মুক্তি। বাবা হিমালয়, প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে একটা কথা বলি, মহাপাষণ্ডরাও কণ্টকমুক্ত থাকে। এই অর্থে মহাপুরুষ এবং মহাপাষণ্ডের ভিতরে তেমন কোনো প্রভেদ নাই।

গলায় কাঁটা নিয়ে রাতে আশরাফুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভদ্রলোক মনে হচ্ছে কোনো ঘোরের মধ্যে আছেন। আমার মুণ্ডিত মস্তক তাঁর নজরে এল না। তিনি হাসিমুখে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

'ভাইসাহেব, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম আজ আপনি আসবেন।'

'আজ কি বিশেষ কোনো দিন?'

'জি। আজ আমার মেয়ের পানচিনি হয়ে গেছে।'

'বলেন কী!'

'কী যে আনন্দ আমার হচ্ছে ভাই! একটু পরপরই চোখে পানি এসে যাচ্ছে।'

তিনি চোখ মুছতে লাগলেন। চোখ মনে হয় অনেকক্ষণ ধরেই মুছছেন। চোখ লাল হয়ে আছে। আমি বললাম, আপনার মেয়ে কোথায়? এত বড় উৎসব, বাসা খালি কেন?

'মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছিল। আমার কান্না দেখেই কাঁদছিল। শেষে তার মামাতো ভাইবোনরা এসে নিয়ে গেছে। আমাকেও নিতে চাচ্ছিল, আমি যাই নি।'

'যান নি কেন?'

'ইয়াসমিন একা থাকবে। তা ছাড়া মেয়ের বিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে একটু কথাবার্তাও বলব। আমার দায়িত্ব এখন শেষ।'

'ওনার দায়িত্বও তো শেষ। মেয়েকে আর চোখে চোখে রাখতে হবে না। উনি আবার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবেন না তো? জীবিত শাশুড়িকেই জামাইরা দেখতে পারে না—উনি হলেন ভূত-শাশুড়ি।

আশরাফুজ্জামান সাহেব করুণ গলায় বললেন, আমার স্ত্রী সম্পর্কে এই জাতীয় বাক্য ব্যবহার করবেন না ভাই। আমি খুব মনে কষ্ট পাই।

'আচ্ছা যান, আর করব না।'

'ভাই, আজ রাতটা আপনি আমার সঙ্গে থেকে যান। দুজনে গল্পগুজব করি।'

'আমি থাকলে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন কীভাবে?'

'ওর সঙ্গে তো সারাক্ষণ কথা বলি না। কথাবার্তা সামান্যই হয়। ওর কথা বলতে কষ্ট হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'হিমু সাহেব! ভাই আমার অনুরোধটা রাখুন। থাকুন আমার সঙ্গে। বিছানায় ধোয়া চাদর দিয়ে দিচ্ছি।'

'চাদরফাদর কিচ্ছু লাগবে না। একটা বিড়াল লাগবে। আপনার বাসায় কি বিড়াল আছে?'

'জি না, বিড়াল লাগবে কেন?'

'আমার গলায় কাঁটা ফুটেছে। বিড়ালের পা ধরলে নাকি গলার কাঁটা যায়...'

'এইসব কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। এইসব হচ্ছে কুসংস্কার। গরম লবণপানি দিয়ে গার্গল করেন, গলার কাঁটা চলে যাবে। আমি গরম পানি এনে দিচ্ছি। গলার কাঁটার খুব ভালো হোমিওপ্যাথি অষুধ আছে। কাল সকালে আমি আপনাকে যোগাড় করে দেব—অ্যাকোনাইট ৩স।'

'আপনি তা হলে হোমিওপ্যাথিও জানেন?'

'ছোট বাচ্চা মানুষ করেছি, হোমিওপ্যাথি তো জানতেই হবে। বই পড়ে পড়ে শিখেছি, স্বআহৃত জ্ঞান। আপনার যদি দীর্ঘদিনের কোনো ব্যাধি থাকে বলবেন, চিকিৎসা করব। তখন বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে একজন ভালো চিসিৎসক।'

'ভয়-পাওয়া রোগ সারাতে পারবেন?'

'ভয়-পাওয়া রোগ? আপনি ভয় পান?'

'একবার পেয়েছিলাম। সেই ভয়টা মনে গেঁথে ক্রনিক হয়ে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে—পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'এই দুটি রোগেরই হোমিওপ্যাথিতে খুব ভালো চিকিৎসা আছে। ভূত-প্রেত দেখতে পেলে স্ট্রামোনিয়াম ৬, আর যদি মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছেন তা হলে খেতে হবে প্ল্যাটিনা ৩০, দুটাই মানসিক অসুখ।'

'মনে হচ্ছে হোমিওপ্যাথিতে মানসিক রোগের ভালো চিকিৎসা আছে।'

'অবশ্যই আছে। যেমন ধরুন কেউ যদি মনে করে সব বিষয়ে তার টনটনে জ্ঞান তাকে দিতে হবে কফিয়া ৬, অনবরত কথা বলা রোগের জন্যে ল্যাকেসিস ৬, লোকের সঙ্গ বিরক্তি এলে নাক্সভমিকা ৩, উদাসীন ভাব অ্যাসিড ফস-৩, খুন করার ইচ্ছা জাগলে হায়োসায়েমাস ৩, আত্মহত্যা করার ইচ্ছা—অরাম সেট ৩০, কথা বলার সময় কান্না পেলে—পালস ৬, অতিরিক্ত ধর্মচিন্তা—নাক্সভমিকা।'

'অতিরিক্ত কথা বলার ইচ্ছা কমে কোন অষুধে বললেন?'

'ল্যাকেসিস ৬'

'ঘরে আছে না?'

'জি আছে। গলার কাঁটার অষুধটা নেই। এইটা আছে।'

'আপনার তো মনে হয় ল্যাকেসিস ৬ অষুধটা নিয়মিত খাওয়া উচিত।'

'হিমু সাহেব, আমি কিন্তু কথা কম বলি। কথা বলার মানুষই পাই না। কথা বলব কী করে? আমার মেয়ে তো আমার সঙ্গে কথা বলে না। যখন ছোট ছিল তখন বলত। এখন যতই দিন যাচ্ছে ততই সে দূরে সরে যাচ্ছে। কথা কম বলা রোগেরও ভালো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আছে—অ্যাসিড ফস ৬, উদাসীন ভাবের জন্যে অ্যাসিড ফস ৩, আর কথা কম-বলা রোগের জন্যে অ্যাসিড ফস ৬, কিন্তু আমার অষুধ খাবে না। ওর ধারণা হোমিওপ্যাথি হল চিনির দলা। কোনো একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। পরীক্ষা না করেই কেউ যদি বলে চিনির দলা, সেটা কি ঠিক?'

'জি না, ঠিক না।'

'আমাদের নিয়ম হচ্ছে পরীক্ষা ছাড়াই সিদ্ধান্ত। খারাপ না?'

'খুবই খারাপ।'

'আমি কথা বেশি বলায় বিরক্ত হবেন না। অনেক দিন পর আপনাকে পেয়েছি বলে

এত কথা বলছি। আপনি তো আর সাধারণ মানুষের মতো না যে আপনার সঙ্গে মেপে মেপে কথা বলতে হবে।'

'আমি সাধারণ মানুষের মতো না?'

'অবশ্যই না। ওইদিন আপনি আমার কন্যার বাড়ি ফেরা সম্পর্কে যে-সময় বলে গিয়েছিলেন, সে ঠিক সেই সময় ফিরেছে। আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। অ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট আমার বিস্ময়ভাব এখনো যায় নি। প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ তো আর আজকাল পাওয়া যায় না। যাঁদের এই ক্ষমতা আছে তাঁরা তা প্রকাশ করেন না। তাঁরা আড়ালে থাকতেই পছন্দ করেন। আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকের যোগাযোগ আছে। আপনি যদি দয়া করে এমন লোকের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দেন তা হলে খুব খুশি হব। আছে এমন কেউ?'

'আছে একজন—ময়লা বাবা। গায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন।'

'ময়লা মেখে বসে থাকেন কেন?'

'বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করি নি।'

'জিজ্ঞেস করেন নি কেন?'

'জিজ্ঞেস করি নি কারণ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তাঁর ঠিকানা যোগাড় করেছি। একদিন যাব।'

'হিমু সাহেব, ভাই, যেদিন যাবেন অবশ্যই আমাকে নিয়ে যাবেন। ওনার ক্ষমতা কেমন?'

'লোকমুখে শুনেছি ভালো ক্ষমতা। মনের কথা হড়বড় করে বলে দেন। আপনার মনে কোনো খারাপ কথা থাকলে ওনার সঙ্গে দেখা না করাই ভালো। হড়বড় করে বলে দেবেন, আপনি পড়বেন লজ্জায়।'

'ওনার নাম কী বললেন, ময়লা বাবা?'

'জি, ময়লা বাবা।'

'কী ধরনের ময়লা গায়ে মাখেন?'

'এক-তৃতীয়াংশ নর্দমার পানির সঙ্গে এক-তৃতীয়াংশ ডাস্টবিনের ময়লা, এক-ষষ্ঠমাংশ টাটকা গু প্লাস আরো কিছু হাবিজাবি দিয়ে সেমি সলিড একটা মিকশ্চার তৈরি করে তেলের মতো গায়ে মেখে ফেলেন।'

'সত্যি?'

'ভাই আমি রসিকতা করছি। সত্যি কি না এখনো জানি না। দেখা হলে জানব। ময়লার ফর্মুলা নিয়ে আসব। ইচ্ছা করলে আপনিও গায়ে মাখতে পারেন।'

একজন মানুষ যে অন্য একজনকে কী পরিমাণ বিরক্ত করতে পারে আমি আশরাফুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে রাত কাটিয়ে এই তথ্য জেনে গেলাম।

আমি পা গুটিয়ে বিছানায় বসে আছি। তিনি বসে আছেন আমার সামনে একটা বেতের চেয়ারে। তিনি ননস্টপ কথা বলে যাচ্ছেন। ঢাকা-চিটাগাং আন্তঃনগর ট্রেনও কিছু স্টেশনে থামে। উনি কোনো স্টেশনই ধরছেন না। ছুটে চলছে তুফান মেইল। তাঁর সব গল্পই তাঁর কন্যা এবং ভূত-স্ত্রী প্রসঙ্গে। আমি শুনে যাচ্ছি—মন দিয়েই শুনছি। অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার বিদ্যা আমার ভালোই আয়ত্ত হয়েছে।

'বুঝলেন হিমু ভাই, আজ আমি একজন মুক্ত মানুষ। এ ফ্রি ম্যান। মানে এখনো ফ্রি না, তবে হয়ে যাচ্ছি। যেদিন আমার মেয়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা হবে, সেদিনই আমি হব একজন স্বাধীন মানুষ। মেয়েটা সুন্দর হওয়ায় নানান সমস্যা হচ্ছিল। কলেজে ওঠার পর থেকে শুধু বিয়ের সম্বন্ধ আসে। শুধু সম্বন্ধ এলে ক্ষতি ছিল না। তারা নানানভাবে চাপাচাপি করে। ভয় পর্যন্ত দেখায় এমন অবস্থা! বিয়ে না দিলে মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাব এই জাতীয় কথাবার্তা পর্যন্ত বলে। শুধু যে ওরা চাপাচাপি করেছে তাই না, আমার আত্মীয়স্বজনরাও চাপাচাপি করেছে। আমি একা মানুষ, মেয়ে মানুষ করতে পারছি না—এইসব উদ্ভট যুক্তি। যখন বিয়ে দিতে মন ঠিক করলাম তখন অন্য সমস্যা। বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়, ছেলে পছন্দ হয়, কথাবার্তা পাকা হয়, তখন বিয়ে ভেঙে যায়। কবার এরকম হল জানেন? পাঁচবার। এর মধ্যে তিনবার বিয়ের কার্ড পর্যন্ত ছাপা হয়ে গিয়েছিল। আপনাকে কার্ড দেখাব। সব যত্ন করে রেখে দিয়েছি।'

'বিয়ে ভেঙে যায় কেন?'

'দুষ্ট লোক কানভাঙানি দেয়। আমার মেয়ের নামে আজেবাজে কথা বলে, উড়ো চিঠি দেয়। টেলিফোন করে। সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আজেবাজে ধরনের কথা মানুষ খুব সহজে বিশ্বাস করে। বিয়ে ভেঙে যায়। আমার মেয়ে এতে খুব কষ্ট পায়। আমি তেমন পাই না, কারণ আমার স্ত্রী আগেই আমাকে জানিয়ে দেন বিয়ে ভেঙে যাবে। আমার ভেতর একধরনের মানসিক প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু আমার মেয়ের ভেতর থাকে না বলে সে খুব কষ্ট পায়। বিয়ে হচ্ছে না এই জন্যে কষ্ট না, অপমানের কষ্ট।'

'কষ্ট হবারই কথা।'

'তারপর সে ঠিক করল কোনোদিন বিয়েই করবে না। কঠিনভাবে আমাদের সবাইকে বলল—তার বিয়ে নিয়ে আর একটি কথাও যেন না বলা হয়। আমার মেয়ে আবার খুব কঠিন ধরনের—একবার যা বলবে তা-ই। এর কোনো নড়চড় হবে না। আমরা বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা দীর্ঘদিন বলি নি। এতদিন পর হঠাৎ আবার কথা উঠল। অতি দ্রুত সব ফাইন্যাল হয়ে গেল।'

'ভালো তো।'

'ভালো তো বটেই। কী যে আনন্দ আমার হচ্ছে তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'আপনার স্ত্রী? তিনিও কি আপনার মতোই আনন্দিত?'

'হ্যাঁ, সেও খুশি। খুব খুশি।'

'আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'জি, কথা হয়েছে।'

'তিনি আবার বলেন নি তো যে এবারো বিয়ে ভেঙে যাবে?'

'না, বলে নি। অবিশ্যি সে ভবিষ্যতের কথা খুব আগেভাগে বলতে পারে না। শেষমুহূর্তে বলে। কে জানে এইবারও শেষমুহূর্তে কিছু বলে কি না!'

'শেষমুহূর্তে কিছু বলার সুযোগ না দিলেই হয়। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবে, সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে। ধরো তক্তা মারো পেরেক অবস্থা। কেউ ভাঙানি দেবার সুযোগ পাবে না।'

'তা কি আর হয়! মেয়ের বিয়ে বলে কথা। এ তো আর চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ডিনার খাওয়ার মতো ঘটনা না যে রাত আটটায় ঠিক করা হবে রাত নটায় খেতে যাওয়া হবে!'

'তাও ঠিক।'

'মেয়ের ছবি দেখবেন?'

'নিশ্চয়ই দেখব।'

'সব ছবি দেখতে সময় লাগবে। শত শত ছবি আমি তুলেছি। একসময় ফটোগ্রাফির শখ ছিল। এখনো আছে। নিয়ে আসব?'

'আনুন।'

'সব মিলিয়ে পঁচিশটা অ্যালবাম।'

'পঁচিশটা অ্যালবাম?'

'জি, একেক বছরের জন্যে একেকটা। আসুন অ্যালবাম দেখি। আমি মেয়েকে বলেছি, মা শোন, এই বাড়ি থেকে তুই সবকিছু নিয়ে যা, শুধু অ্যালবামগুলি নিতে পারবি না।'

আমরা অ্যালবাম দেখা শুরু করলাম। ছবির উপর দিয়ে শুধু যে চোখ বুলিয়ে যাব সে উপায় নেই—প্রতিটি ছবি আশরাফুজ্জামান সাহেব ব্যাখ্যা করছেন—

'যে-ফ্রকটা পরা দেখছেন, তার একটা সাইড ছেঁড়া আছে। মীরার খুব প্রিয় ফ্রক। ছিঁড়ে গেছে, তার পরেও পরবে। থুতনিতে কাটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন না? বাথরুমে পা পিছলে পড়ে ব্যথা পেয়েছিল। রক্তারক্তি কাণ্ড। বাসায় গাঁদাফুল ছিল। সেই ফুল কচলে দিয়ে রক্ত বন্ধ করেছি।'

আমরা ভোর চারটা পর্যন্ত সাতটা অ্যালবাম শেষ করলাম। অষ্টম অ্যালবাম হাতে নিয়ে বললাম, আশরাফুজ্জামান সাহেব, কাপড় পরুন তো!

তিনি চমকে উঠে বললেন, কেন?

আমি বললাম, আমার ধারণা আপনার কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে।

'কী বলছেন এসব?'

'মাঝে মাঝে আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন।

আমরা ভোর পাঁচটায় ধানমন্ডিতে মেয়ের মামার বাড়িতে পৌছলাম। দেখা গেল আসলেই মীরার বিয়ে হয়ে গেছে। রাত দশটায় কাজী এনে বিয়ে পড়ানো হয়েছে।

আমি বললাম, মেয়ের বাবাকে না জানিয়ে বিয়ে, ব্যাপারটা কী?

মেয়ের মামা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি বাইরের মানুষ, আপনাকে কী বলব, না বলেও পারছি না—মেয়ের বিয়ে ভেঙে যেত তার বাবার কারণে। উনিই পাত্রপক্ষকে উড়ো চিঠি দিতেন। টেলিফোনে নিজের মেয়ের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে বিয়ে ভাঙতেন। বিয়ের পর মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাবে এটা সহ্য করতে পারতেন না। উনি খানিকটা অসুস্থ। আমরা যা করেছি উপায় না দেখেই করেছি।

আশরাফুজ্জামান সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। আমি তাঁকে রেখে নিঃশব্দে চলে এলাম। সকালবেলায় হাঁটার অন্যরকম আনন্দ।

৮

ময়লা বাবার আস্তানা কুড়াইল গ্রামে। বুড়িগঙ্গা পার হয়ে রিকশায় দু কিলোমিটার যেতে হয়। তারপর হণ্টন। কাঁচা রাস্তা ক্ষেতের আইল সব মিলিয়ে আরো পাঁচ কিলোমিটার। মহাপুরুষদের দেখা পাওয়া সহজ ব্যাপার না।

'বাবা' হিসেবে তাঁর খ্যাতি এখনো বোধহয় তেমন ছড়ায় নি। অল্পকিছু ভক্ত উঠোনে শুকনোমুখে বসে আছে। উঠোনে চাটাই পাতা, বসার ব্যবস্থা। উঠোন এবং টিনের বারান্দা সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যে-বাবা সারা গায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন তাঁর ঘর-দুয়ার এমন ঝকঝকে কেন—এই প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই মনে আসে।

আমার পাশে একজন হাঁপানির রোগী। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। দেখে মনে হয় সময় হয়ে এসেছে, চোখ মুখ উলটে এক্ষুনি ভিরমি খাবে। আমি তাতে বিভ্রান্ত হলাম না। হাঁপানি রোগীকে যত সিরিয়াসই দেখাক এরা এত সহজে ভিরমি খায় না। রোগী আমার দিকে চোখ-ইশারা করে বললেন, বাবার কাছে আইছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'আপনার সমস্যা কী?'

'সমস্যা কিছু না, ময়লা বাবাকে দেখতে এসেছি। আপনি রোগ সারাতে এসেছেন?'

'জি।'

'বাবার কাছে এই প্রথম এসেছেন?'

'জি।'

'আর কোনো বাবার কাছে যান নি? বাংলাদেশে তো বাবার অভাব নেই।'

'কেরামতগঞ্জের ন্যাংটা বাবার কাছে গিয়েছিলাম।'

'লাভ হয় নি?'

'বাবা আমার চিকিৎসা করেন নাই।'

'ইনি করবেন?'

'দেখি, আল্লাহ্‌পাকের কী ইচ্ছা।'

রোগীর হাঁপানির টান বৃদ্ধি পেল। আমি চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলাম। মানুষের কষ্ট দেখাও কষ্টের। হাঁপানি রোগীর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সুস্থ মানুষেরও নিশ্বাসের কষ্ট হয়।

সকাল এগারটার মতো বাজে। বাবার দেখা নেই। উঠোনে রোদ এসে পড়েছে। গা চিড়বিড় করছে। ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে। বাবার খাদেমদের তৎপরতা চোখে পড়ছে। তারা ছেলেদের এক জায়গায় বসাচ্ছে, মেয়েদের এক জায়গায় বসাচ্ছে। সবারই উঠোনে চাটাইয়ে বসতে হচ্ছে, তবে চাটাইয়ের মাঝামাঝি চুনের দাগ দেওয়া। এই দাগ আগে চোখে পড়ে নি। চোখে সুরমা দেওয়া মেয়ে-মেয়ে চেহারার এক খাদেমকে নিচু গলায় বললাম, ময়লা বাবা টাকাপয়সা কী নেন?

খাদেম বিরক্তমুখে বলল, বাবা টাকাপয়সা নেন না।

'টাকাপয়সা না নিলে ওনার চলে কীভাবে?'

'ওনার কীভাবে চলে সেটা নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না।'

'আপনাদেরও তো খরচাপাতি আছে। এই যে চোখে সুরমা দিয়েছেন, সেই সুরমাও তো নগদ পয়সায় কিনতে হয়। বাবার জন্যে কিছু পয়সাকড়ি নিয়ে এসেছি, কার কাছে দেব বলেন।'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন।'

'উনি দর্শন দেবেন কখন?'

'জানি না। যখন সময় হবে উনি একজন একজন করে ডাকবেন।'

'সিরিয়ালি ডাকবেন? যে আগে এসেছে সে আগে যাবে?'

'বাবার কাছে কোনো সিরিয়াল নাই। যাকে ইচ্ছা বাবা তাকে আগে ডাকেন। অনেকে আসে বাবা ডাকেনও না।'

'আমার ডাক তো তা হলে নাও পড়তে পারে। অনেক দূর থেকে এসেছি ভাই–সাহেব।'

'বাবার কাছে নিকট–দূর কোনো ব্যাপার না।'

'তা তো বটেই, নিকট–দূর হল আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যে। বাবাদের জন্যে না।'

'আপনি বেশি প্যাচাল পাড়তেছেন। প্যাচাল পাড়বেন না, বাবা প্যাচাল পছন্দ করেন না। ঝিম ধরে বসে থাকেন। ভাগ্য ভালো হলে ডাক পাবেন।'

আমি ঝিম ধরে বসে রইলাম। আমার ভাগ্য ভালো, বাবার ডাক পেলাম। খাদেম আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, বাবার হুজরাখানা থেকে বের হবার সময় বাবার দিকে পিঠ দিয়ে বের হবেন না। এতে বাবার প্রতি অসম্মান হয়। আপনার এতে বিরাট ক্ষতি হবে।

বাবাদের হুজরাখানা অন্ধকার ধরনের হয়। ধূপটুপ জ্বলে। ধূপের ধোঁয়ায় ঘর বোঝাই থাকে। দরজা–জানালা থাকে বন্ধ। ভক্তকে এক ধরনের আধিভৌতিক পরিবেশে ফেলে দিয়ে হকচকিয়ে দেওয়া হয়। এটাই নিয়ম। ময়লা বাবার ক্ষেত্রে এই নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম দেখা গেল। তাঁর হুজরাখানায় দরজা–জানালা সবই খোলা। প্রচুর বাতাস। বাবা খালিগায়ে বসে আছেন। আসলেই গাভরতি ময়লা। মনে হচ্ছে ডাস্টবিন উপুড় করে গায়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। উৎকট গন্ধে আমার বমি আসার উপক্রম হল। এ কী কাণ্ড! বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে বাবার চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, এবং তাঁর মুখ হাসিহাসি। কুটিল ধরনের হাসি না, সরল ধরনের হাসি। তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে টানাটানা গলায় সুর করে বললেন, কেমন আছেন গো?

আমি বললাম, ভালো।

'দুর্গন্ধ সহ্য হচ্ছে না?'

'জি না।'

'কিছুক্ষণ বসে থাকেন—সহ্য হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ কষ্ট করেন।'

'গায়ে ময়লা মেখে বসে আছেন কেন?'

'কী করব বলেন, নাম হয়েছে ময়লা বাবা। নামের কারণে ময়লা মাখি। গু মেখে বসে থাকলে ভালো হত। লোকে বলত গু–বাবা। হি হি হি।'

তিনি হাসতে শুরু করলেন। এই হাসি স্বাভাবিক মানুষের হাসি না। অস্বাভাবিক হাসি। এবং খানিকটা ভয়-ধরানো হাসি।

'আপনার নাম কী গো বাবা?'

'হিমু।'

'বাহ্, ভালো নাম—সুন্দর নাম। পিতা রেখেছেন?'

'জি।'

'ভালো অতি ভালো। গন্ধ কি এখনো নাকে লাগছে বাবা?'

'এখনো লাগছে।'

'সহ্য হয়ে যাবে। সব খারাপ জিনিসই মানুষের সহ্য হয়ে যায়। আপনার কি অসুখবিসুখ আছে?'

'না।'

'এত চট করে না বলবেন না। মানুষের অনেক অসুখ আছে যা ধরা যায় না। জ্বর হয় না, মাথা বিষ করে না—তার পরেও অসুখ থাকে। ভয়ঙ্কর অসুখ। এই যে আমি ময়লা মেখে বসে আছি এটা অসুখ না?'

'জি, অসুখ।'

'মনের ভেতরে আমরা যখন ময়লা নিয়ে বসে থাকি তখন সেটা অসুখ না, কারণ সেই ময়লা দেখা যায় না, সেই ময়লার দুর্গন্ধ নাই। তাই না বাবা?'

'জি।'

'বাইরের ময়লা পরিষ্কার করা যায়। এখন আমি যদি গরম পানি দিয়া গোসল দেই, শরীরে সাবান দিয়া ডলা দেই—ময়লা দূর হবে। হবে না?'

'হবে।'

'মনের ময়লা দূর করার জন্যে গোসলও নাই, সাবানও নাই।'

'ঠিক বলেছেন।'

'আপনি আমার কাছে কী জন্যে এসেছেন বলেন।'

'শুনেছি আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। আপনি মানুষের মনের কথা ধরতে পারেন। সত্যি পারেন কি না দেখতে এসেছি।'

'পরীক্ষা করতে এসেছেন?'

'পরীক্ষা না। কৌতূহল।'

'শুনেন বাবা, আমার কোনো ক্ষমতা নাই। ময়লা মেখে বসে থাকি বলে লোকে নানান কথা ভাবে। কেউ কেউ কী করে জানেন? আমার গা থেকে ময়লা নিয়ে যায়। তাবিজ করে গলায় পরে—এতে নাকি তাদের রোগ আরোগ্য হয়—

ডাক্তার কবিরাজ গেল তল
ময়লা বলে কত জল?

হি হি হি ...।'

ময়লা বাবা আবারো অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসতে শুরু করলেন। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম, শুধু শুধু পরিশ্রম করেছি। মানসিক দিক দিয়ে অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষ। এর কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা ঠিক না। জ্ঞানগর্ভ কিছু কথা এরা বলে।

কিংবা সাধারণ কথাই বলে—পরিবেশের কারণে সেই সাধারণ কথা জ্ঞানগর্ভ কথা বলে মনে হয়।

'ময়লা নিবেন বাবা?'

'জি না।'

'ঢাকা শহর থেকে কষ্ট করে এসেছেন—কিছু ময়লা নিয়ে যান। সপ্তধাতুর কবচে ময়লা ভরবেন। কোমরে কালো ঘুনশি দিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা শরীরে ধারণ করবেন—এতে উপকার হবে।'

'কী উপকার হবে?'

'রাতে-বিরাতে যে ভয় পান সেই ভয় কমতে পারে।'

আমি মনে মনে খানিকটা চমকালাম। পাগলা বাবা কি থট রিডিং করছেন? আমার ভয় পাবার ব্যাপারটা তিনি ধরতে পেরেছেন? নাকি কাকতালীয়ভাবে কাছাকাছি চলে এসেছেন? বিস্তৃত ফাঁদ পাতা হয়েছে। আমি সেই ফাঁদে পা দিয়েছি—তিনি সেই ফাঁদ এখন গুটিয়ে আনবেন।

'ভয়ের কথা কেন বলছেন? আমি তো ভয় পাই না।'

'রাতে কোনোদিন ভয় পান নাই বাবা?'

'জি না।'

'উনারে তো একবার দেখলেন। ভয় তো পাওনের কথা।'

'কাকে দেখেছি?'

'সেটা তো বলব না। তাঁর হাতে লাঠি ছিল, ছিল না?'

আমি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হলাম ময়লা বাবা থট রিডিং জানেন। কোনো একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তিনি আমার মনের কথা পড়তে পারছেন। এটি কি কোনো গোপন বিদ্যা—যে-বিদ্যার চর্চা শুধুই অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ময়লা বাবাকে প্রশ্ন করলে কি জবাব পাওয়া যাবে? মনে হয় না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ময়লা বাবা বললেন, বাবা কি চলে যাচ্ছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'পরীক্ষায় কি আমি পাস করেছি?'

'মনে হয় করেছেন। বুঝতে পারছি না।'

'বুঝেছেন বাবা, আমি নিজেও বুঝতে পারি না। খুব কষ্টে আছি। দুর্গন্ধ কি এখনো পাচ্ছেন বাবা?'

'জি না।'

'সুগন্ধ একটা পাচ্ছেন না? সুগন্ধ পাবার কথা। অনেকেই পায়।'

আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম—সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমার প্রিয় একটা ফুলের গন্ধ। বেলি ফুলের গন্ধ। গন্ধে কোনো অস্পষ্টতা নেই—নির্মল গন্ধ। এটা কি কোনো ম্যাজিক? আড়কের শিশি গোপনে ঢেলে দেওয়া হয়েছে?

'গন্ধ পাচ্ছেন না বাবা?'

'জি পাচ্ছি।'

'ভালো। এখন বলেন দেখি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি?'

ময়লা বাবা আবার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাচ্ছেন। ম্যাজিশিয়ান ভালো কোনো খেলা দেখানোর পর যে-ভঙ্গিতে দর্শকের বিস্ময় উপভোগ করে—অবিকল সেই ভঙ্গি। আমি বললাম, আমার ধারণা আপনার কিছু ক্ষমতা আছে।

'কিছু ক্ষমতা তো সবারই আছে। আপনারও আছে।'

'আমি যদি ঢাকা শহরে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই আপনি যাবেন?'

'না।'

'না কেন?'

'অসুবিধা আছে। আপনি বুঝবেন না।'

'তা হলে আজ উঠি।'

'আচ্ছা যান। আপনারে যে খেলা দেখালাম তার জন্যে নজরানা দিবেন না? এক শ টাকার নোটটা রেখে যান।'

'শুনেছিলাম আপনি টাকাপয়সা নেন না।'

'সবার কাছ থেকে নেই না। আপনার কাছ থেকে নিব।'

'কেন?'

'সেটা বলব না। সবেরে সবকিছু বলতে নাই। আচ্ছা এখন যান। একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি—আর না।'

'আমি যদি কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি, তাঁকে কি আপনি আপনার খেলা দেখাবেন?'

ময়লা বাবা আবারো অপ্রকৃতিস্থের হাসি হাসতে শুরু করলেন। আমি এক শ টাকার নোটটা তাঁর পায়ের কাছে রেখে চলে এলাম। ময়লা বাবার ব্যাপারটা নিয়ে মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সবচে ভালো হত যদি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা যেত। সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না। মিসির আলি টাইপের মানুষ সহজে কৌতূহলী হন না। এরা নিজেদের চারপাশে শক্ত পাঁচিল তুলে রাখেন। পাঁচিলের ভেতর কাউকে প্রবেশ করতে দেন না। এ ধরনের মানুষদের কৌতূহলী করতে হলে পাঁচিল ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হয়—সেই ক্ষমতা বোধহয় আমার নেই।

তবু একটা চেষ্টা তো চালাতে হবে। ময়লা বাবার ক্ষমতাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলে দেখা যেতে পারে। লাভ হবে বলে মনে হয় না। অনেক সময় নিয়ে মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি বিভ্রান্ত হবার মানুষ না, তবুও চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

৯

'কে?'

আমি জবাব দিচ্ছি না, চুপ করে আছি। দ্বিতীয়বার 'কে' বললে জবাব দেব। মিসির আলি দ্বিতীয়বার কে বলবেন কি না বুঝতে পারছি না। আগের বার বলেন নি—সরাসরি দরজা খুলেছেন। আজ আমি মিসির আলি সাহেবের জন্যে কিছু উপহার নিয়ে এসেছি।

একপট ব্রাজিলিয়ান কফি। ইভাপোরেটেড মিল্কের একটা কৌটা এবং এক বাক্স সুগার কিউবস। কফি বানিয়ে চায়ের চামচে মেপে মেপে চিনি দিতে হবে না। সুগার কিউব ফেলে দিলেই হবে। একটা সুগার কিউব মানে এক চামচ চিনি। দুটা মানে দু-চামচ।

উপহার আনার পেছনের ইতিহাসটা বলা যাক। শতাব্দী স্টোরে আমি গিয়েছিলাম টেলিফোন করতে। এমনিতে শতাব্দী স্টোরের লোকজনের ব্যবহার খুব ভালো, শুধু টেলিফোন করতে গেলে খারাপ ব্যবহার করে। টেলিফোন নষ্ট, মালিকের নিষেধ আছে, চাবি নেই—নানান টালবাহানা করে। শেষ পর্যন্ত দেয় তবে টেলিফোন শেষ হওয়ামাত্র বলে, পাঁচটা টাকা দেন। কল চার্জ। আজো তা-ই হল। আমি হাতের মুঠা থেকে পাঁচ শ টাকার একটা নোট বের করলাম।

'ভাংতি দেন।'

'ভাংতি নেই। আর শুনুন, আপনাকে টাকা ফেরত দিতে হবে না। এখন যে-কলটা করেছি সেটা পাঁচ শ টাকা দামের কল। আমার বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলেছি, ওর নাম রূপা। আরেকটা কথা শুনুন ভাই—আমি যতবার আপনাদের এখান থেকে রূপার সঙ্গে কথা বলব ততবারই আপনাদের পাঁচ শ করে টাকা দেব। তবে অন্য কলে আগের মতো পাঁচ টাকা। ভাই যাই?'

বলে আমি হনহন করে পথে চলে এসেছি—দোকানেরর এক কর্মচারী এসে আমাকে ধরল। শতাব্দী স্টোরের মালিক ডেকেছেন। আমাকে যেতেই হবে, না গেলে তার চাকরি থাকবে না।

আমি মালিকের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ফিরে গেলাম। নিতান্ত অল্পবয়েসি একটা ছেলে। গোলাপি রঙের হাওয়াই শার্ট পরে বসে আছে। সুন্দর চেহারা। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক হিসেবে তাকে মানাচ্ছে না। তাকে সবচে মানাত যদি টিভি সেটের সামনে বসে ক্রিকেট খেলা দেখত এবং কোনো ব্যাটসম্যান ছক্কা মারলে লাফিয়ে উঠত।

শতাব্দী স্টোরের মালিক আমাকে অতি যত্নে বসাল। কফি খাওয়াল। আমি কফি খেয়ে বললাম, অসাধারণ! জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতোই অসাধারণ।

সে বলল, কোন কবিতা?

আমি আবৃত্তি করলাম—

"পুরানো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের পরে,
সবুজ ধানের নিচে—মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চলে গেছে—আঁটির ভিতর থেকে চলে গেছে চাষা,
শস্যের ক্ষেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা!"

শতাব্দী স্টোরের মালিক তার এক কর্মচারীকে ডেকে বলল, উনাকে সবচে ভালো কফি এক টিন দাও, ইভাপোরেটেড দুধের একটা টিন, সুগার কিউব দাও।

আমি থ্যাংকস বলে উপহার গ্রহণ করলাম। তারপর ছেলেটা বলল, এখন থেকে দোকানে উনি এলে প্রথম জিজ্ঞেস করবে ওনার কী লাগবে। যা লাগবে দেবে। কোনো

বিল করতে পারবে না। উনি ঢোকামাত্র আমার ঘরে নিয়ে যাবে। সেখানে টেলিফোন আছে। উনি যত ইচ্ছা টেলিফোন করতে পারবেন।

ব্যবসায়ী মানুষ (তার বয়স যত অল্পই হোক) এমন ফ্রি পাস দেয় না। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। ছেলেটা বলল, আমি আপনাকে চিনি। আপনি হিমু। দোকানের লোকজন আপনাকে চিনতে পারে নি—ওদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। এখন বলুন আপনি কোথায় যাবেন। ড্রাইভার আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

ড্রাইভার আমাকে মিসির আলি সাহেবের বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছে। আমি কড়া নেড়ে অপেক্ষা করছি কখন মিসির আলি সাহেব দরজা খোলেন। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তে ইচ্ছা করছে না। সাধারণ মানুষের বাসা হলে কড়া নাড়তাম, এই বাসায় থাকেন মিসির আলি। কিংবদন্তি পুরুষ। প্রথম কড়া নাড়ার শব্দেই তাঁর বুঝে যাবার কথা কে এসেছে, কেন এসেছে।

দরজা খুলল। মিসির আলি সাহেব বললেন, কে? হিমু সাহেব?

'জি স্যার।'

'মাথা কামিয়েছেন। আপনাকে ঋষি-ঋষি লাগছে।'

আমি ঋষিসুলভ হাসি হাসলাম। তিনি সহজ গলায় বললেন, আজ এত সকাল-সকাল এসেছেন, ব্যাপার কী? রাত মোটে নটা বাজে। হাতে কী?

'আপনার জন্যে সামান্য উপহার। কফি, দুধ, চিনি।'

মিসির আলি সাহেবের চোখে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমি বললাম, স্যার, আপনার রাতের খাওয়া কি হয়ে গেছে?

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'তা হলে আমাকে রান্নাঘরে যাবার অনুমতি দিন, আমি আপনার জন্যে কফি বানিয়ে নিয়ে আসি।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকলাম। রান্নাঘরটা আমার পছন্দ হল। মনে হচ্ছে রান্নাঘরটাই আসলে তাঁর লাইব্রেরি। তিনটা উঁচু বেতের চেয়ার, শেলফভরতি বই। রান্না করতে করতে হাত বাড়ালেই বই পাওয়া যায়। রান্নাঘরে একটা ইজিচেয়ারও আছে। ইজিচেয়ারের পায়ের কাছে ফুটরেস্ট। বোঝাই যাচ্ছে ফুটরেস্টে পা রেখে আরাম করে বই পড়ার ব্যবস্থা।

মিসির আলি চুলা ধরাতে ধরাতে বললেন, রান্নাঘরে এত বইপত্র দেখে আপনি কি অবাক হচ্ছেন?

'জি না। আমি কোনোকিছুতেই অবাক হই না।'

'আসলে কী হয় জানেন? হয়তো চা খাবার ইচ্ছা হল। চুলায় কেতলি বসালাম। পানি ফুটতে অনেক সময় লাগছে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে খুব খারাপ লাগে। তখন বই পড়া শুরু করি। চুলায় কেতলি বসিয়ে আমি একুশ পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে পানি ফুটে যায়। এই থেকে আপনি আমার বই পড়ার স্পিড সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন।'

আমরা কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে বসার ঘরে এসে বসলাম। মিসির আলি বললেন, আপনার গলায় কি মাছের কাঁটা ফুটেছে? লক্ষ করলাম অকারণে ঢোক গিলছেন।

আমি বললাম, জি।

'শুধু শুধু কষ্ট করছেন কেন? কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করেন—মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সিতে গেলেই ওরা চিমটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলবে।'

'আমি কাঁটার যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছি। মানুষ তো ক্যানসারের মতো ব্যাধিও শরীরে নিয়ে বাস করে, আমি সামান্য কাঁটা নিয়ে পারব না?'

মিসির আলি হাসলেন। ছেলেমানুষি যুক্তি শুনে বয়স্করা যে-ভঙ্গিতে হাসে সেই ভঙ্গির হাসি। দেখতে ভালো লাগে।

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আমি আপনার ভয় পাবার ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি।'

'রহস্যের সমাধান হয়েছে?'

'ভয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। এইটিই সঠিক ব্যাখ্যা কি না তা প্রমাণসাপেক্ষ। ব্যাখ্যা শুনতে চান?'

'বলুন।'

মিসির আলি কফির কাপ নামিয়ে সিগারেট ধরালেন। সামান্য হাসলেন। সেই হাসি অতি দ্রুত মুছেও ফেললেন। কথা বলতে শুরু করলেন শান্ত গলায়। যেন তিনি নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন, অন্য কারোর সঙ্গে নয়। যেন তিনি যুক্তি দিয়ে নিজেকেই বোঝানোর চেষ্টা করছেন—

'হিমু সাহেব, আমার ধারণা যে-ভয়ের কথা আপনি বলছেন—এই ভয় অতি শৈশবেই আপনার ভেতর বাসা বেধেছে। কেউ একজন হয়তো এই ভয়ের বীজ আপনার ভেতর পুঁতে রেখেছিল যাতে পরবর্তী কোনো এক সময় বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়। তীব্র ভয় আপনাকে আচ্ছন্ন করে।

অতি শৈশবের তীব্র ভয় অনেক অনেক কাল পরে ফিরে আসে। এটা একটা রিকারিং ফেনোমেনা। মনে করুন তিন বছরের কোনো শিশু পানিতে ডুবে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেল। তাকে শেষমুহূর্তে পানি থেকে উদ্ধার করা হল। সে বেঁচে গেল। পানিতে ডোবার ভয়ঙ্কর স্মৃতি তার থাকবে না। সে স্বাভাবিকভাবে বড় হবে। কিন্তু ভয়ের এই অংশটি কিন্তু তার মাথা থেকে যাবে না। মস্তিষ্কের স্মৃতি-লাইব্রেরিতে সেই স্মৃতি জমা থাকবে। কোনো কারণে যদি হঠাৎ সেই স্মৃতি বের হয়ে আসে তা হলে তার সমগ্র চেতনা প্রচণ্ড নাড়া খাবে। সে ভেবেই পাবে না, ব্যাপারটা কী। আপনি কি শৈশবে কখনো পানিতে ডুবেছেন?'

'হ্যাঁ, চৌবাচ্চায় ডুবে গিয়েছিলাম।'

'ঘটনাটা বলুন তো!'

'ঘটনা আমার মনে নেই। বাবার ডায়েরি পড়ে জেনেছি। আমার বাবা আমাকে নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। মৃত্যুভয় কী এটা আমাকে বোঝানোর জন্যে তিনি একটা ভয়ঙ্কর পরীক্ষা করেছিলেন। চৌবাচ্চায় পানি ভরতি করে আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল স্টপওয়াচ। তিনি স্টপওয়াচ দেখে পঁচাত্তর সেকেন্ড আমাকে পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।'

'আপনার বাবা কি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন?'

'একসময় আমার মনে হত তিনি মানসিক রোগী। এখন তা মনে হয় না। বাবার কথা থাক। আপনি আমার সম্পর্কে বলুন। আমি মানসিক রোগী কি না সেটা জানা আমার পক্ষে জরুরি।'

'অতি শৈশবের একটা তীব্র ভয় আপনার ভেতর বাসা বেঁধে ছিল। আমার ধারণা সেই ভয়ের সঙ্গে আরো ভয় যুক্ত হয়েছে। মস্তিষ্কের মেমোরি সেলে ভয়ের ফাইল ভারী হয়েছে। একসময় আপনি সেই ভয় থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছেন। তখনই ভয়টা মূর্তিমান হয়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছে। সে চাচ্ছে না আপনি তাকে অস্বীকার করুন।'

'স্যার, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন—ওই রাতে আমি যা দেখেছি সবই আমার কল্পনা?'

'না। বেশির ভাগই সত্যি। তবে সেই সত্যটাকে কল্পনা ঢেকে রেখেছে।'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। ওই রাতে আপনি ছিলেন খুব ক্লান্ত। আপনার স্নায়ু ছিল অবসন্ন।'

'খুব ক্লান্ত ছিলাম, স্নায়ু অবসন্ন ছিল বলছেন কেন?'

'আপনার কাছ থেকে শুনেই বলছি। সারারাত আপনি হেঁটেছেন। জোছনা দেখেছেন। তারপর ঢুকলেন গলিতে। দীর্ঘ সময় কোনো একটি বিশেষ জিনিস দেখায় ক্লান্তি আসে। স্নায়ু অবসন্ন হয়।'

'ঠিক আছে বলুন।'

'আপনাকে দেখে কুকুররা সব দাঁড়িয়ে গেল। একটি এগিয়ে এল সামনে, তাই না?'

'জি।'

'কুকুরদের দলপতি। আবার ওই ভয়ঙ্কর মূর্তি যখন এল তখন কুকুররা তার দিকে ফিরল। দলপতি এগিয়ে গেল সামনে। দেখুন হিমু সাহেব, কুকুররা যা করেছে তা হচ্ছে কুকুরদের জন্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড। তারা উদ্ভট কিছু করে নি। অথচ তাদের এই স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডই আপনার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। কারণ আপনি নিজে স্বাভাবিক ছিলেন না। আপনার মধ্যে এক ধরনের ঘোর কাজ করা শুরু করেছে। শৈশবের সমস্ত ভয় বাক্স ভেঙে বের হয়ে আসা শুরু করেছে।'

'তারপর?'

'আপনি শুনলেন লাঠি ঠকঠক করে কে যেন আসছে। আপনি যদি স্বাভাবিক থাকতেন তা হলে কিন্তু লাঠির ঠকঠক শব্দ শুনে ভয়ে অস্থির হতেন না। লাঠি ঠকঠক করে কেউ আসতেই পারে। আপনি খুবই অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন বলেই এই কাণ্ডটা ঘটেছে। আপনার মস্তিষ্ক অসম্ভব উত্তেজিত। সে বিচিত্র খেলা শুরু করেছে। আপনার স্বাভাবিক দৃষ্টি সে এলোমেলো করতে শুরু করেছে। আপনি মানুষটা দেখলেন। চাদর-গায়ে একজন মানুষ যার চোখ নেই, মুখ নেই। ঠিক না?'

'জি।'

'আমার ধারণা আপনি অ্যাসিডে ঝলসে যাওয়া একজন অন্ধকে দেখেছেন। অন্ধ বলেই সে লাঠি-হাতে হাঁটাচলা করে। আপনাকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাঠি উঁচু

করল আপনার দিকে। একজন অন্ধের পক্ষে আপনার উপস্থিতি বুঝতে পারা কোনো ব্যাপার না। অন্ধদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ থাকে। অবিশ্যি অন্ধ না হয়ে একজন কুষ্ঠরোগীও হতে পারে। কুষ্ঠরোগীও এমন বিকৃত হতে পারে। আমি নিজে কয়েকজনকে দেখেছি।'

আমি বললাম, স্যার একটা কথা, আমি দেখেছি মানুষটা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তাকে খুব লম্বা দেখাচ্ছিল।

'আপনি যা দেখেছেন তা আর কিছুই না, লাইট অ্যান্ড শেডের একটা ব্যাপার। গলিতে একটা মানুষকে দাঁড় করিয়ে আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে আলো তার গায়ে ফেলে পরীক্ষাটা করতে পারেন। দেখবেন আলো কোথে কে ফেলছেন, এবং সেই আলো ফেলার জন্যে তার ছায়া কত বড় হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে তাকে কত লম্বা মনে হচ্ছে। একে বলে 'optical illusion'—ম্যাজিশিয়ানরা optical illusion-এর সাহায্যে অনেক মজার মজার খেলা দেখান।'

'পুরো ব্যাপারটা আপনার কাছে এত সহজ মনে হচ্ছে?'

'জি মনে হচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত জটিল সূত্রগুলির মূল কথা খুব সহজ। আপনি যে আপনার মাথার ভেতর শুনলেন কে বলছে ফিরে যাও, ফিরে যাও—তার ব্যাখ্যাও খুব সহজ ব্যাখ্যা। আপনার অবচেতন মন আপনাকে ফিরে যেতে বলছিল।'

'আমি কি আপনার সব ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নেব, না নিজে পরীক্ষা করে দেখব?'

'সেটা আপনার ব্যাপার।'

'আমার কেন জানি মনে হয় ওই জিনিসটার মুখোমুখি দাঁড়ানো মানে আমার মৃত্যু—সে আমাকে ছাড়বে না।'

'তা হলে তো আপনাকে অবশ্যই ওই জিনিসটার মুখোমুখি হতে হবে।'

'যদি না হই?'

'তা হলে সে আপনাকে খুঁজে বেড়াবে। আজ একটা গলিতে সে আছে। কাল চলে আসবে রাজপথে। একটি গলি যেমন আপনার জন্যে নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি শুরুতে একটা রাজপথও আপনার জন্যে নিষিদ্ধ হবে, তারপর আরো একটা। তারপর একসময় দেখবেন শহরের সমস্ত পথঘাট নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আপনাকে শেষ পর্যন্ত ঘরে আশ্রয় নিতে হবে। সেখানেও যে স্বস্তি পাবেন তা না—মাঝরাতে হঠাৎ মনে হবে দরজার বাইরে ওই অশরীরী দাঁড়িয়ে, দরজা খুললেই সে ঢুকবে....'

আমি চুপ করে রইলাম।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, আপনার বাবা বেঁচে থাকলে তিনি আপনাকে কী উপদেশ দিতেন?

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললাম, আপনি যে-উপদেশ দিচ্ছেন সেই উপদেশই দিতেন। আচ্ছা স্যার, আজ উঠি।

'উঠবেন? আচ্ছা—কফির জন্যে ধন্যবাদ।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মানুষের কি থট রিডিং ক্ষমতা আছে?'

'থাকতে পারে। পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের এই ক্ষমতা সম্ভবত আছে। ডিউক ইউনিভার্সিটিতে একবার একটা গবেষণা করা

হয়েছিল। পঞ্চাশটা ইঁদুরকে দুটা থালায় করে খাবার দেওয়া হত। একটা থালার নাম্বার ১ এবং অন্যটার নাম্বার শূন্য। খাবার দেবার সময় মনে মনে ভাবা হত শূন্য নাম্বার থালার খাবার যে-ইঁদুর খাবে তাকে মেরে ফেলা হবে। দেখা গেল শূন্য নাম্বার থালার খাবার কোনো ইঁদুর স্পর্শ করছে না। অথচ একই খাবার।'

'আপনার ধারণা ইঁদুর মানুষের মনের কথা বুঝত বলেই এটা করত?'

'হতে পারে।'

'আপনি থট রিডিং-এর ক্ষমতা আছে এমন কোনো মানুষের দেখা পান নি?'

'পেয়েছি। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারি নি। নিশ্চিত হতে ইচ্ছাও করে নি। থাকুক-না কিছু রহস্য!'

'স্যার যাই।'

'আচ্ছা।'

মিসির আলি সাহেব আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

আমি রাস্তায় নেমে দেখলাম সুন্দর জোছনা হয়েছে—

কোথায় যাওয়া যায়?

কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। পথে-পথে হাঁটতেও ভালো লাগছে না। ভ্রমণের নেশায় মাতাল ভূপর্যটকও কি একসময় ক্লান্ত হয়ে বলেন হাঁটতে ভালো লাগছে না। পরম শ্রদ্ধেয় সাধু যিনি প্রতি সন্ধ্যায় মুণ্ডিত মস্তকে বৎসদের নানান জ্ঞানের কথা বলেন তিনিও কি একসময় ক্লান্ত হয়ে বলেন, আর ভালো লাগছে না। মানুষের শরীরযন্ত্রের দুটি তার। একটিতে ক্রমাগতই বাজে—"ভালো লাগছে" "ভালো লাগছে"। অন্যটিতে বাজে "ভালো লাগছে না" "ভালো লাগছে না"। দুটি তার একসঙ্গেই বাজতে থাকে। একটি উঁচুস্বরে তারায় অন্যটি মন্দ্রসপ্তকে। কারো কারো কোনো একটি তার ছিঁড়ে যায়। আমার বেলায় কী হচ্ছে? 'ভালো লাগছে' তারটি কি ছিঁড়ে গেছে?

ঘরে ফিরে যাব? চারদেয়ালে নিজেকে বন্দি করে ফেলব? সেই ইচ্ছাও করছে না। আমি আশরাফুজ্জামান সাহেবের সন্ধানে রওনা হলাম। তিনি কি কন্যার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছেন? মনে হয় না। অতি আদরের মানুষের অবহেলা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষ বড়ই অভিমানী প্রাণী।

আশরাফুজ্জামান সাহেব বাসাতেই ছিলেন। আমাকে দেখে যন্ত্রের মতো গলায় বললেন, কেমন আছেন?

আমি বললাম, ভালো আছি। আপনি কী করছেন?

'কিছু করছি না। শুয়ে ছিলাম।'

'শরীর খারাপ?'

'জি না, শরীর খারাপ না। শরীর ভালো।'

'খাওয়াদাওয়া করেছেন?'

'জি না। রান্না করি নি।'

'আপনার কন্যার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?'

'জি না। ওরা চিটাগাং গেছে। ওর শ্বশুরবাড়ি চিটাগাং।'

'যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যায় নি?'

'আমাকে নেবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল, আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না।'

'আমি আপনাকে নিতে এসেছি।'

'কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'তেমন কোথাও না। পথে-পথে হাঁটব। জোছনারাতে পথে হাঁটতে অন্যরকম লাগে, যাবেন?'

'জি না।'

'পথে হাঁটতে হাঁটতে আপনি আপনার মেয়ের গল্প করবেন, আমি শুনব। তার সব গল্প শোনা হয় নি। যাবেন?'

'আচ্ছা চলুন।'

আমরা পথে নামলাম। ঠিক করে ফেললাম তাঁকে নিয়ে প্রচুর হাঁটব। হাঁটতে হাঁটতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন—শরীর যতই অবসাদগ্রস্ত হবে মন ততই হালকা হবে।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনি বোধহয় ভাবছেন আমি মেয়ের উপর খুব রাগ করেছি। আসলে রাগ করি নি। কারণ রাগ করব কেন বলুন, আমি তো আসলেই তার বিয়ে ভেঙেছি। উড়োচিঠি দিয়েছি, টেলিফোনে খবর দিয়েছি।'

'নিজের ইচ্ছায় তো করেন নি। আপনার স্ত্রী আপনাকে করতে বলেছেন, আপনি করেছেন।'

'খুবই সত্যি কথা, কিন্তু আমার মেয়ে বিশ্বাস করে না। তার মার সঙ্গে যে আমার কথাবার্তা হয় এটাও বিশ্বাস করে না।'

'অল্প বয়সে সবকিছু অবিশ্বাস করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। বয়স বাড়লে ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার মেয়ের কোনো দোষ নেই। আমার আত্মীয়স্বজনরা ক্রমাগত তার কানে মন্ত্রণা দেয়। আমি যে কী ধরনের মন্দলোক এটা শুনতে শুনতে সেও বিশ্বাস করে ফেলেছে।'

'আপনি মন্দলোক?'

'ওদের কাছে মন্দলোক। মেয়ে অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে নিই না। নিজে নিজে হোমিওপ্যাথি করি। এইসব আর কী....'

'ওরা তো জানে না, আপনি যা করেন স্ত্রীর পরামর্শে করেন।'

'জানে। ওদের বলেছি, কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে না।'

'মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?'

'জি না।'

'আশ্চর্য তো!'

'আমি নিজেও খুব আশ্চর্য হয়েছি। আজ সন্ধ্যা থেকে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে ছিলাম। সে থাকলে অবশ্যই কথা বলত। সে নেই।'

'আশরাফুজ্জামান সাহেব, এমনও তো হতে পারে যে তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। আপনার অবচেতন মন তাঁকে তৈরি করেছে। হতে পারে না?'

আশরাফুজ্জামান সাহেব জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন।

'আশরাফুজ্জামান সাহেব!'

'জি?'

'খিদে লেগেছে?'

'জি।'

'আসুন খাওয়াদাওয়া করি।'

'আপনি খান। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। আমি এখন বাসায় চলে যাব। আপনার সঙ্গে ঘুরতে ভালো লাগছে না। আপনাকে আমি পছন্দ করতাম কারণ আমার ধারণা ছিল আপনি আমার স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করেন।'

'আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করি বা না-করি—আপনাকে তো করি। সেটাই কি যথেষ্ট না?'

'না।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব হনহন করে এগুচ্ছেন। আমার খুব মায়া লাগছে। রাগ ভাঙিয়ে ভদ্রলোককে রাতের ট্রেনে তুলে দেওয়া যায় না? তূর্ণা নিশিথায় তুলে দেব। সেই ট্রেন চিটাগাং পৌঁছায় ভোররাতে। আশরাফুজ্জামান সাহেব ট্রেন থেকে নেমে দেখবেন স্টেশনে তাকে নিতে মেয়ে এবং মেয়ে-জামাই দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তবের সব গল্পের সুন্দর সুন্দর সমাপ্তি থাকলে ভালো হয়। বাস্তবের গল্পগুলির সমাপ্তি ভালো না। বাস্তবের অভিমানী বাবারা নিজেদের অভিমান এত সহজে ভাঙে না। রূপকথার মতো সমাপ্তি বাস্তবে হয় না।

'আশরাফুজ্জামান সাহেব! এক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়ান তো!'

আশরাফুজ্জামান সাহেব দাঁড়ালেন। আমি দৌড়ে তাঁকে ধরলাম।

'চলুন আপনাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিই।'

'দরকার নেই। আমি বাসা চিনে যেতে পারব।'

'আপনার জন্যে বলছি না। আমি আমার নিজের জন্যে বলছি। আমার একটা সমস্যা হয়েছে, আমি একা একা রাতে হাঁটতে পারি না। ভয় পাই।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব শান্তগলায় বললেন, চলুন যাই।

আমরা হেঁটে হেঁটে ফিরছি, কেউ কোনো কথা বলছি না। আশরাফুজ্জামান সাহেবের গাল চকচক করছে। তিনি কাঁদছেন। কান্নাভেজা গালে চাঁদের ছায়া পড়েছে।

চোখের জলে চাঁদের ছায়া আমি এই প্রথম দেখছি। অদ্ভুত তো! ভেজা গালে চাঁদের আলো নিয়ে কি কোনো কবিতা লেখা হয়েছে? কোনো গান?

'আশরাফুজ্জামান সাহেব!'

'জি।'

'মেয়ের উপর রাগ কমেছে?'

'ওর উপর আমার কখনো রাগ ছিল না। আচ্ছা হিমু সাহেব, আজ কি পূর্ণিমা?'

'জি না। আজ পূর্ণিমা না। পূর্ণিমার জন্যে আপনাকে আরো তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, একা একা জীবনটা কীভাবে কাটাব বুঝতে পারছি না। বিষ খেয়ে মরে গেলে কেমন হয় বলুন তো!

'মন্দ হয় না।'

'মেয়েটা কষ্ট পাবে। মেয়েটা ভাববে তার উপর রাগ করে বিষ খেয়েছি।'

'তাকে সুন্দর করে গুছিয়ে একটা চিঠি লিখে যাবেন। ভালোমতো সব ব্যাখ্যা করবেন, তা হলেই হবে। তার পরেও কষ্ট পাবে। সেই কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হবে না।'

'দীর্ঘস্থায়ী হবে না কেন?'

'আপনার মেয়ে তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তার সংসারে ছেলেপুলে আসবে। কারও হাম হবে, কারোর হবে কাশি। ওদের বড় করা, স্কুলে ভর্তি করানো, হোমওয়ার্ক করানো, ঈদে নতুন জামা কেনা, অনেক ঝামেলা। দোকানের পর দোকান দেখা হবে, ফ্রকের ডিজাইন পছন্দ হবে না। এত সমস্যার মধ্যে কে আর বাবার মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামাবে!'

আশরাফুজ্জামান সাহেব হেসে ফেললেন। সহজ স্বাভাবিক হাসি। মনে হচ্ছে তাঁর মন থেকে কষ্টবোধ পুরোপুরি চলে গেছে।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনি মানুষটা খুব মজার।'

'মজার মানুষ হিসেবে আপনাকে মজার একটা সাজেশান দেব?'

'দিন।'

'চলুন আমরা কমলাপুর রেল স্টেশনে চলে যাই। আপনি তূর্ণা নিশিথায় চেপে বসুন। অন্ধকার থাকতে থাকতে চিটাগাং রেলস্টেশনে নামবেন। নেমেই দেখবেন আপনার মেয়ে এবং মেয়ে-জামাই দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ের চোখভরতি জল। সে ছুটে এসে আপনাকে জড়িয়ে ধরবে।'

আশরাফুজ্জামান শব্দ করে হাসলেন। আমি বললাম, হাসছেন কেন?

'আপনার উদ্ভট কথাবার্তা শুনে হাসছি।'

'পৃথিবীটা ভয়ঙ্কর উদ্ভট। কাজেই উদ্ভট কাণ্ডকারখানা—মাঝেমধ্যে করা যায়।'

'সবচে বড় কথা কী জানেন হিমু সাহেব? এখন বাজছে রাত বারটা! তূর্ণা নিশিথা চলে গেছে।'

'আমার মনে হচ্ছে যায় নি। লেট করছে।'

'শুধু শুধু লেট করবে কেন?'

'লেট করবে—কারণ এই ট্রেনে চেপে এক অভিমানী পিতা আজ রাতে তাঁর কন্যার কাছে যাবেন। আমি নিশ্চিত আজ ট্রেন লেট।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। কারণ আমি হচ্ছি হিমু। পৃথিবীর রহস্যময়তা আমি জানি। ট্রেন যে আজ লেট হবে এই বিষয়ে আপনি বাজি ধরতে চান?'

'হ্যাঁ চাই। বলুন কী বাজি?'

'ট্রেন যদি সত্যি সত্যি লেট হয় তা হলে আপনি সেই ট্রেনে চেপে বসবেন।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না কী করবেন। আমি বেবিট্যাক্সির সন্ধানে বের হলাম। দেরি করা যাবে না—

অতি দ্রুত কমলাপুর রেলস্টেশনে পৌঁছতে হবে। আন্তঃনগর ট্রেন অনন্তকাল কারোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে না।

ট্রেন লেট ছিল।

আমরা যাবার পনের মিনিট পর ট্রেন ছাড়ল। চলন্ত ট্রেনের জানালা থেকে প্রায় পুরো শরীর বের করে আশরাফুজ্জামান সাহেব আমার দিকে হাত নাড়ছেন। তাঁর মুখভরতি হাসি, কিন্তু গাল আবারো ভিজে গেছে। ভেজা গালে স্টেশনের সরকারি ল্যাম্পের আলো পড়েছে। মনে হচ্ছে চাঁদের আলো।

১০

ঘুম ভাঙতেই প্রথম যে-কথাটা আমার মনে হল তা হচ্ছে—'আজ পূর্ণিমা'। ভোরের আলোয় পূর্ণিমার কথা মনে হয় না। সূর্য ডোবার পরই মনে হয়—রাতটা কেমন হবে? শুক্লপক্ষ, না কৃষ্ণপক্ষ? আমি অন্যদের মতোই দিনের আলোয় চাঁদের পক্ষ নিয়ে ভাবি না। কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার। আজ রাতের চাঁদের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ মধ্যরাতে আমি সেই বিশেষ গলিটার সামনে দাঁড়াব। লাঠিহাতের ওই মানুষটার মুখোমুখি হব। মিসির আলির ধারণা—সে আর কিছুই না সাধারণ রোগগ্রস্ত একজন মানুষ। কিংবা এক অন্ধ। চাঁদের আলোয় লাঠি হাতে যে বের হয়ে আসে। চাঁদের আলো তাকে স্পর্শ করে না।

আমার ধারণা তা না। আমার ধারণা সে অন্যকিছু। তার জন্ম এই ভুবনে না, অন্য কোনো ভুবনে। যে-ভুবনের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তার জন্ম আলোতে নয়—আদি অন্ধকারে।

জানালার কাছে একটা কাক এসে বসেছে। মাথা ঘুরিয়ে সে আমাকে দেখছে। তার চোখে রাজ্যের কৌতূহল। আমি দিনের শুরু করলাম কাকের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

'হ্যালো মিস্টার ক্রো, হাউ আর ইউ?'

কাক বলল—কা কা।

তার ধ্বনির অনুবাদ আমি মনে মনে করে নিলাম। সে বলছে, ভাল আছি। তুমি আজ এত ভোরে উঠেছ কেন? কাঁথাগায়ে শুয়ে থাকো। মানব সম্প্রদায়ে তোমার জন্ম। তুমি মহাসুখিজনদের একজন। খাবারের সন্ধানে সকাল থেকে তোমাকে উড়তে হয় না।

আমি বললাম, মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক দুঃখ আছে রে পাখি! অনেক দুঃখ।

'দুঃখের চেয়ে সুখ বেশি।'

'জানি না। আমার মনে হয় না।'

'আমার মনে হয়—এই যে তুমি এখন উঠবে, এক কাপ গরম চা খাবে, একটা সিগারেট ধরাবে—এই আনন্দ আমরা কোথায় পাব! আমাদেরও তো মাঝে মাঝে চা খেতে ইচ্ছে করে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই।'

আমি বিছানা থেকে নামলাম। দুকাপ চায়ের কথা বলে বাথরুমে ঢুকলাম। হাতমুখ ধুয়ে নতুন একটা দিনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা। আজকের দিনটা আমার জন্যে একটা বিশেষ দিন। সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত আমি পরিচিত সবার সঙ্গে কথা বলব। দিনটা খুব আনন্দে কাটাব। সন্ধ্যার পর দিঘির পানিতে গোসল করে নিজেকে পবিত্র করব—তারপর চাঁদের আলোয় তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। হাতে-মুখে পানি দিতে দিতে দ্রুত চিন্তা করলাম—কাদের সঙ্গে আমি কথা বলব—

রূপা

আজ তার সঙ্গে কথা বলব প্রেমিকের মতো। তাকে নিয়ে চন্দ্রিমা উদ্যানে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটিও করা যেতে পারে। একগাদা ফুল কিনে তার বাড়িতে উপস্থিত হব। রক্তের মতো লাল রঙের গোলাপ।

ফুপা-ফুপু

তাঁরা কি কক্সবাজার থেকে ফিরেছেন? না ফিরে থাকলে টেলিফোনে কথা বলতে হবে। কক্সবাজারে কোন হোটেলে উঠেছেন তাও তো জানি না। বড় বড় হোটেল সব কটায় টেলিফোন করে দেখা যেতে পারে।

মিসির আলি

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। দুপুরের খাওয়াটা তাঁর সঙ্গে খেতে পারি। তাঁকে আজ রাতের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাটা বলা যেতে পারে...

আচ্ছা, দিঘি কোথায় পাব? ঢাকা শহরে সুন্দর দিঘি আছে না? কাকের চোখের মতো টলটলে পানি।

'স্যার চা আনছি।'

আমি চায়ের কাপ নিয়ে বসলাম। এক কাপ চা জানালার পাশে রেখে দিলাম—মি. ক্রো যদি খেতে চান খাবেন।

আশ্চর্য, কাকটা ঠোঁট ডোবাচ্ছে গরম চায়ে। কক কক করে কী যেন বলল। ধন্যবাদ দিল বলে মনে হচ্ছে। পশুপাখির ভাষাটা জানা থাকলে খুব ভালো হত। মজার মজার তথ্য অনেক কিছু জানা যেত। পশুপাখির ভাষা জানাটা খুব কি অসম্ভব? আমাদের এক নবী ছিলেন না যিনি পশুপাখির কথা বুঝতেন? হযরত সুলাইমান আলায়হেস সালাম। তিনি পাখিদের সঙ্গে কথা বলতেন। কোরান শরীফে আছে—পিঁপড়েরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। একটা পাখিও তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল, পাখির নাম হুদ হুদ। সূরা সাদে তার সুন্দর বর্ণনা আছে।

হুদ হুদ পাখি এসে বলল, "আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি, যা আপনার জানা নেই। আর আমি 'সেবা' থেকে আসল খবর নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে

দেখলাম যে জাতির উপর রাজত্ব করছে। তার সবই আছে, এবং আছে এক বিরাট সিংহাসন।'

হুদ হুদ পাখি বলেছিল সেবার রানীর কথা। কুইন অব সেবা—'বিলকিস'।

হুদ হুদ পাখিটা দেখতে কেমন? কাক নয় তো?

কাকটা চায়ের কাপ উলটে ফেলেছে। তার ভাবভঙ্গিতে অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ করছি। কেমন আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে—যেন বলার চেষ্টা করছে, Sir I am sorry, extremely sorry, I have broken the cup. না, Broken the cup হবে না, কাপ ভাঙে নি, শুধু উলটে ফেলেছে। চায়ের কাপ উলটে ফেলার ইংরেজি কী হবে? রূপাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে। শতাব্দী স্টোর থেকে কিছু টেলিফোন করে দিনের শুরুটা করা যাক।

শতাব্দী স্টোরের লোকজন আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তিনজন এসে জিজ্ঞেস করল, স্যার কেমন আছেন? একজন এসে অতি যত্নে মালিকের ঘরে নিয়ে বসাল। টেলিফোনের চাবি খুলে দিল। আমি বসতে বসতেই কফি চলে এল, সিগারেট চলে এল। পীর-ফকিররা যে কত আরামে জীবনযাপন করেন তা বুঝতে পারছি। শতাব্দী স্টোরের মালিক উপস্থিত নেই, কিন্তু আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

'হ্যালো, এটা কি রূপাদের বাড়ি?'

'কে কথা বলছেন?'

'আমার নাম হিমু।'

'রূপা বাড়িতে নেই। বান্ধবীর বাসায় গেছে।'

'এত সকালে বান্ধবীর বাড়িতে যাবে কীভাবে? এখনো নটা বাজে নি। রূপা তো আটটার আগে ঘুম থেকেই ওঠে না।'

'বলেছি তো ও বাসায় নেই।'

'আপনি তো মিথ্যা বলছেন। আপনার গলা শুনেই বুঝতে পারছি আপনি একজন দায়িত্বশীল বয়স্ক মানুষ—আপনি দিনের শুরু করেছেন মিথ্যা দিয়ে—এটা কি ঠিক হচ্ছে? আপনি চাচ্ছেন না, রূপা আমার সঙ্গে কথা বলুক—সেটা বললেই হয়—শুধু শুধু মিথ্যা বলার প্রয়োজন ছিল না।'

'স্টপ ইট।'

'ঠিক আছে স্যার, স্টপ করছি। রূপাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম—আমার মনে হয় আপনাকে জিজ্ঞেস করলেও হবে। আচ্ছা স্যার, চায়ের কাপ উলটে ফেলার ইংরেজি কী?'

খট করে শব্দ হল। ভদ্রলোক টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তিনি এখন যা করবেন তা হচ্ছে টেলিফোনের প্লাগ খুলে রাখবেন। এবং হয়তো বা মেয়েকে কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। ভদ্রলোককে প্রচুর মিথ্যা কথা আজ সারাদিনে বলতে হবে। মিথ্যা দিয়ে যিনি দিনের শুরু করেন, তাঁকে দিনের শেষেও মিথ্যা বলতে হয়।

আমি ফুপুর বাসায় টেলিফোন করলাম। ফুপুকে পাওয়া গেল। তিনি রাগে চিড়বিড় করে জ্বলছেন।

'কে, হিমু! আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেছে, শুনেছিস কিছু?'

'না, কী হয়েছে?'

'রশীদ হারামজাদাটাকে বাসায় রেখে গিয়েছিলাম, সে টিভি, ভিসিআর সব নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। আমার আলমিরাও খুলেছে। সেখান থেকে কী নিয়েছে এখনো বুঝতে পারছি না।'

'মনে হয় গয়নাটয়না নিয়েছে।'

'না, গয়না নিতে পারবে না। সব গয়না ব্যাংকের লকারে। ক্যাশ টাকা নিয়েছে। তোর ফুপার একটা বোতলও নিয়েছে। খুব দামি জিনিস নাকি ছিল। তোর ফুপা হায়-হায় করছে।'

'এই দ্যাখো ফুপু, সব খারাপ দিকের একটা ভালো দিকও আছে। রশীদ তোমার চক্ষুশূল একটা জিনিসও নিয়ে গেছে।'

'ফাজলামি করিস না—পয়সা দিয়ে একটা জিনিস কেনা।'

'ফ্রিজে তোমাদের জন্যে চিতল মাছের পেটি রান্না করা ছিল না?'

'হ্যাঁ, ছিল। তুই জানলি কী করে?'

'সে এক বিরাট ইতিহাস। পরে বলব, এখন বলো কক্সবাজারে কেমন কাটল।'

'ভালোই কাটছিল, মাঝখানে সাদেক গিয়ে উপস্থিত হল।'

'মামলা-বিষয়ক সাদেক?'

'হ্যাঁ। দেখ-না যন্ত্রণা! তাকে ঠাট্টা করে কী না কী বলেছি—সে সত্যি সত্যি মামলাটামলা করে বিশ্রী অবস্থা করেছে। বেয়াই বেয়ানের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না। ছি ছি!'

'তোমার বেয়াই বেয়ান কেমন হয়েছে?'

'বেয়াই সাহেব তো খুবই ভালো মানুষ। অসম্ভব রসিক। কথায়-কথায় হাসছিলেন। তোর ফুপার সঙ্গে তাঁর খুবই খাতির হয়েছে। চারজনে মিলে নরক গুলজার করেছে।'

'চারজন পেলে কোথায়? ফুপা আর তাঁর বেয়াই দুজন হবে না?

'এদের সাথে দুই ছাগলাও তো আছে—মোফাজ্জল আর জহিরুল।'

'এই দুইজন এখনো ঝুলে আছে?'

'আছে তো বটেই। তবে শোন, ছেলে দুটাকে যত খারাপ ভেবেছিলাম তত খারাপ না।'

'ভালো কাজ কী করেছে?'

'সাদেককে শিক্ষা দিয়েছে। আমি তাতে খুব খুশি হয়েছি। সাদেক সবার সামনে মামলা নিয়ে হইচই শুরু করল, ওয়ারেন্ট নাকি বের হয়ে গেছে এইসব। আমি লজ্জায় বাঁচি না। কী বলব কিছু বুঝতেও পারছি না, তখন মোফাজ্জল এসে ঠাস্ করে সাদেকের গালে এক চড় বসিয়ে দিল।'

'সে কী!'

'খুবই আকস্মিক ঘটনা, আমি খুব খুশি হয়েছি। উচিত শিক্ষা হয়েছে। ছোটলোকের বাচ্চা! আমাকে মামলা শেখায়!'

'মোফাজ্জল আর জহিরুল মনে হচ্ছে তোমাদের পরিবারে এন্ট্রি পেয়ে গেছে?'

'এন্ট্রি পাওয়ার কী আছে! সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, মায়া পড়ে গেছে এটা বলতে পারিস।'

'আমাদের সর্বনাশ করল এই মায়া। আমরা বাস করি মায়ার ভেতর আর চেঁচিয়ে বলি আমাদেরকে মায়া থেকে মুক্ত করো।'

'জ্ঞানের কথা বলবি না হিমু। চড় খাবি।'

'জ্ঞানের কথা না ফুপু। আমার সহজ কথা হচ্ছে মায়া সর্বগ্রাসী। এই যে রশীদ তোমার এত বড় ক্ষতি করল তার পরেও সে যখন মিডিল ইস্ট থেকে ফিরবে, জায়নামায, তসবি এবং মিষ্টি তেঁতুল নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে, তুমি কিন্তু খুশিই হবে। তুমি হাসিমুখে বলবে—কেমন আছিস রে রশীদ?'

'ওই হারামজাদা কি মিডিল ইস্ট যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুই এতসব জানলি কী করে?'

'কী আশ্চর্য, আমি জানব না! আমি হচ্ছি হিমু।'

'তুই ফাজিল বেশি হয়েছিস। তোকে ধরে চাবকানো উচিত, হাসছিস কেন?'

'বাদল এবং আঁখি এরা কেমন আছে?'

'ভালোই আছে। কক্সবাজারে ওরা যে-কাণ্ডটা করেছে—আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাবার অবস্থা!'

'কী করেছে?'

'আরে, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা হোটেলের দরজা বন্ধ করে বসা। আমরা এতগুলি মানুষ এসেছি সেদিকে কোনো লক্ষই নেই। ডাইনিং হলে সবাই খেতে বসি, ও খবর পাঠায়—জ্বরজ্বর লাগছে। আসতে পারবে না। খাবার যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমার পেটের ছেলে যে এত নির্লজ্জ হবে ভাবতেই পারি না!'

'ফুপু!'

'বল কী বলবি?'

'সত্যি করে বলো তো ওদের এই ভালবাসা দেখে আনন্দে তোমার মন ভরে গেছে না? কী কথা বলছ না কেন? তোমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল—তুমি এবং ফুপা—তোমরা কি একই কাণ্ড কর নি?'

'আমরা এত বেহায়া ছিলাম না।'

'আমার তো ধারণা তোমরাও ছিলে।'

'তোর ফুপা অনেক বেহায়াপনা করেছে। বুদ্ধিকম মানুষ তো, বাদ দে ওইসব।'

'না, বাদ দেব না। তোমরা কী ধরনের বেহায়াপনা করেছ তার একটা উদাহরণ দিতেই হবে। জাস্ট ওয়ান।'

'হিমু!'

'জি ফুপু?'

'তুই এত ভালো ছেলে হয়েছিস কেন বল তো?'

'আমি কি ভালো ছেলে?'

'অবশ্যই ভালো ছেলে। তুই আমার একটা কথা শোন—ভালো দেখে একটা

মেয়েকে বিয়ে কর। তারপর তুই বৌমাকে নিয়ে নানান ধরনের বেহায়াপনা করবি—আমরা সবাই দূর থেকে দেখে হাসব।'

'ফুপু রাখি?' বলে আমি খট করে রিসিভার রেখে দিলাম। কারণ কথা বলতে বলতে ফুপু কেঁদে ফেলেছেন, এটা আমি বুঝতে পারছি—মাতৃশ্রেণীর মানুষের কান্নাভেজা গলার আহ্বান অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয় নি। সেই আহ্বান এই কারণেই শোনা ঠিক না।

মিসির আলি বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ?

আমি বললাম, জি না।

'দেখে মনে হচ্ছে খুব শরীর খারাপ। আপনি কি কোনো কারণে টেনশান বোধ করছেন?'

'স্যার, আজ পূর্ণিমা।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আপনি তা হলে ভয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন?'

'জি স্যার।'

'আপনি যদি চান—আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।'

'না, আমি চাচ্ছি না।'

'দুপুরে খাওয়াদাওয়া করেছেন?'

'জি না।'

'আমার সঙ্গে চারটা খান। খাবার অবিশ্যি খুবই সামান্য। খিচুড়ি আর ডিমভাজা। খাবেন?'

'জি খাব।'

'হাতমুখ ধুয়ে আসুন। আমি খাবার সাজাই।'

'দুজনের মতো খাবার কি আছে?'

'হ্যাঁ আছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আজ সকালে ঘুম ভেঙেই মনে হল—দুপুরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আপনি আমার এখানে আসবেন। এইসব টেলিপ্যাথিক ব্যাপারের কোনো গুরুত্ব আমি দিই না—তার পরেও দুজনের খাবার রান্না করেছি। কেন বলুন তো?'

'বলতে পারছি না।'

'আমাদের মনের একটা অংশ রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। আমরা অনেক কিছুই জানি—তার পরেও অনেক কিছু জানি না। বিজ্ঞান বলছে—"Out of nothing, nothing can be created " তার পরেও আমরা জানি শূন্য থেকেই এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি তৈরি হয়েছে—যা একদিন হয়তো-বা শূন্যেই মিলিয়ে যাবে। ভাবলে ভয়াবহ লাগে বলে ভাবি না।'

'স্যার, আপনার খিচুড়ি খুব ভালো হয়েছে।'

'ধন্যবাদ। হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনি যদি মনে করেন ওই জিনিসটার মুখোমুখি হওয়া ঠিক হবে না তা হলে বাদ দিন।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

'বুঝতে পারছি না কেন বলছি। আমার লজিক বলছে—আপনার উচিত ভয়ের মুখোমুখি হওয়া, আবার এই মুহূর্তে কেন জানি মন সায় দিচ্ছে না। মনে হচ্ছে মস্ত কোনো বিপদ আপনার সামনে।'

আমি হাসিমুখে বললাম, এরকম মনে হচ্ছে কারণ আপনি আমার প্রতি এক ধরনের মায়া অনুভব করছেন। যখন কেউ কারো প্রতি মমতাবোধ করতে থাকে তখনই সে লজিক থেকে সরে আসতে থাকে। মায়া, মমতা, ভালবাসা যুক্তির বাইরের ব্যাপার।'

'ভালো বলেছেন।'

'এটা আমার কথা না। আমার বাবার কথা। বাবার বাণী। তিনি তাঁর বিখ্যাত বাণীগুচ্ছে তাঁর পুত্রের জন্যে লিখে রেখে গেছেন।'

'আমি কি সেগুলি পড়ে দেখতে পারি?'

'হ্যাঁ পারেন। আমি বাবার খাতাটা নিয়ে এসেছি। আপনাকে দিয়ে যাব। তবে একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'আমি যদি কোনোদিন ফিরে না আসি আপনি খাতার লেখাগুলি পড়বেন। আর যদি কাল ভোরে ফিরে আসি, আপনি খাতা না পড়েই আমাকে ফেরত দেবেন।'

'খুব জটিল শর্ত তো না।'

'না, শর্ত আপনার জন্যে জটিল না। আমার জন্যে জটিল।'

মিসির আলি হাসলেন। নরম গলায় বললেন, ঠিক আছে।

আমি খাওয়া শেষ করে, খাতা তাঁর হাতে দিয়ে বের হলাম। ঘুম পাচ্ছে। পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে লম্বা ঘুম দেব। যখন জেগে উঠব তখন যেন দেখি চাঁদ উঠে গেছে।

১১

ঘুম ভেঙে একটু হকচকিয়ে গেলাম। আমি কোথায় শুয়ে আছি? সবকিছু খুব অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে গহীন কোনো অরণ্যে শুয়ে আছি। চারদিকে সুনসান নীরবতা। খুব হাওয়া হচ্ছে—হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপছে। অসংখ্য পাতা একসঙ্গে কেঁপে উঠলে যে-অস্বাভাবিক শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয় সেরকম শব্দ। ব্যাপারটা কী? আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তাকালাম চারদিকে। না, যা ভাবছিলাম তা না।

আমি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের একটা পরিচিত বেঞ্চিতেই শুয়ে ছিলাম। গাছের পাতার শব্দ বলে যা ভাবছিলাম তা আসলে গাড়ি চলাচলের শব্দ। এতবড় ভ্রান্তিও মানুষের হয়?

আকাশে চাঁদ থাকার কথা না? কই, চাঁদ দেখা যাচ্ছে না তো! পার্ক অন্ধকার। পার্কের বাতি কখন জ্বলবে? ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি পূর্ণিমার রাতে শহরের সব বাতি জ্বালায় না। চাঁদই তো আছে—সব বাতি জ্বালানোর দরকার কী? এরকম্ ভাব।

পূর্ণিমার প্রথম চাঁদ হলুদ বর্ণের থাকে। আকারেও সেই হলুদ চাঁদটাকে খুব বড় লাগে। যতই সময় যায় হলুদ রং ততই কমতে থাকে। একসময় চাঁদটা ধবধবে সাদা হয়ে আবারও হলুদ হতে থাকে। দ্বিতীয়বার হলুদ হবার প্রক্রিয়া শুরু হয় মধ্যরাতের পর। আজ আমার যাত্রা মধ্যরাতে। আমি আবারো চাঁদ দেখার চেষ্টা করলাম।

'কী দেহেন?'

আমি চমকে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালাম। ঝুপড়ির মতো জায়গায় মেয়েটা বসে আছে। নিশিকন্যাদের একজন। যে-গাছের গুঁড়িতে সে হেলান দিয়ে আছে সেটা একটা কদমগাছ। আমার প্রিয় গাছের একটি। রুবিয়েসি পরিবারের গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম—এনথোসেফালাস কাদাম্বা। গাছটা দেখলেই গানের লাইন মনে পড়ে—বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান।

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, কী নাম?

সে 'থু' করে থুতু ফেলে বলল, কদম।

আসলেই কি তার নাম কদম? না সে রসিকতা করছে, কদমগাছের নিচে বসেছে বলে নিজের নাম বলছে কদম? বিচিত্র কারণে এ ধরনের মেয়েরা রসিকতা করতে পছন্দ করে। পৃথিবী তাদের সঙ্গে রসিকতা করে বলেই বোধহয় খানিকটা রসিকতা তারা পৃথিবীর মানুষদের ফেরত দেয়।

'তোমার নাম কদম?'

'হ।'

'যখন নারিকেল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বস তখন তোমার নাম কী হয়? নারকেল?'

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। এখন আর তাকে নিশিকন্যাদের একজন বলে মনে হচ্ছে না। পনের-ষোল বছরের কিশোরীর মতো লাগছে, যে সন্ধ্যাবেলা একা একা বনে বেড়াতে এসেছে। হাসি খুব অদ্ভুত জিনিস। হাসি মানুষের সব গ্লানি উড়িয়ে নিয়ে যায়।

'আমার নাম ছফুরা।'

'ছফুরার চেয়ে তো কদম নামটাই ভালো।'

'আচ্ছা যান, আফনের জন্যে কদম।'

'একেক জনের জন্যে একেক নাম? ভালো তো!'

'আফনের ভালো লাগলেই আমার ভালো।'

মেয়েটা গাছের নিচ থেকে উঠে এসে আমার পাশে বেঞ্চিতে বসে হাই তুলল। মেয়েটার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তার পরেও মনে হচ্ছে দেখতে মায়াকাড়া। কৈশোরের মায়া মেয়েটি এখনো ধরে আছে। বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না। কদম শাড়ি পরে আছে। শাড়ির আঁচলে বাদাম। সে বাদাম ভেঙে ভেঙে মুখে দিচ্ছে।

'এট্টু পরে পরে আসমানের দিকে চাইয়া কী দেহেন?'

'চাঁদ উঠেছে কি না দেখি।'

'চাঁদের খোঁজ নিতাছেন ক্যান? আফনে কি চাঁদ সওদাগর?'

কদম আবারো খিলখিল করে হাসল। আমি মেয়েটির কথার পিঠে কথা বলার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলাম।

'রাগ হইছেন?'

'রাগ হব কেন?'

'এই যে আফনেরে নিয়া তামশা করতেছি।'

'না, রাগ হই নি।'

'আমার ভিজিট পঞ্চাশ টেকা।'

'পঞ্চাশ টাকা ভিজিট?'

'হ।'

'ভিজিট দেবার সামর্থ্য আমার নেই। এই দ্যাখো পাঞ্জাবির পকেট পর্যন্ত নেই।'

'পঞ্চাশ টেকা আফনের কাছে বেশি লাগতেছে?'

'না। পঞ্চাশ টাকা বরং কম মনে হচ্ছে—
রমণীর মন সহস্র বৎসরের সখা সাধনার ধন।'

'আফনের কাছে আসলেই টেকা নাই?'

'না।'

'সত্য বলতেছেন?'

'হ্যাঁ। আর থাকলেও লাভ হত না।'

'ক্যান, মেয়েমানুষ আফনের পছন্দ হয় না?'

'হয়। হবে না কেন?'

'আমার চেহারাছবি কিন্তু ভালো। আন্ধাইর বইল্যা বুঝতেছেন না। যখন চাঁদ উঠব—তহন দেখবেন।'

'তা হলে বসো, অপেক্ষা করো। চাঁদ উঠুক।'

'আফনের কাছে ভিজিটের টেকা নাই। বইস্যা থাইক্যা ফয়দা কী?'

'কোনো ফয়দা নেই।'

'আফনে এইখানে কতক্ষণ থাকবেন?'

'বুঝতে পারছি না, ভালোমতো চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত হয়তো থাকব।'

'তাইলে আমি এট্টু ঘুরান দিয়া আসি?'

'আসার দরকার কী?'

'আচ্ছা যান আসব না। আমার *ঠেকা* নাই।'

'*ঠেকা* না থাকাই ভালো।'

'বাদাম খাইবেন?'

'না।'

'ধরেন খান। ভালো বাদাম। নাকি খারাপ মেয়ের হাতের জিনিস খান না?'

কদম আঁচলের বাদাম বেঞ্চিতে ঢেলে দ্রুতপায়ে চলে গেল। আমি বসে বসে বাদাম খাচ্ছি। একটা হিসাবনিকাশ করতে পারলে ভালো হত—আমি আমার একজীবনে কত মানুষের অকারণে মমতা পেয়েছি, এবং কতজনকে সেই মমতা ফেরত দিতে পেরেছি। মমতা ফেরত দেবার অংশগুলি মনে থাকে। মমতা পাবার অংশগুলি মনে থাকে না। কিছুদিন পর মনেই থাকবে না কদম নামের একটি পথের মেয়ে নিজের অতি কষ্টের টাকায় কেনা বাদাম আমাকে খেতে দিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন পথে নামব, ফুটপাতে

শুয়ে থাকা মানুষের দিকে তাকাব, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে—বস্তা-ভাই এবং বস্তা-ভাইয়ের পুত্রকে আমি একবার একটা স্লিপিং-ব্যাগ উপহার দিয়েছিলাম।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। হলুদ রঙের কুৎসিত একটা চাঁদ। চাঁদটাকে সাজবার সময় দিতে হবে। তার সাজ সম্পন্ন হোক, তারপর আমি বের হব। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছি তার পরেও চোখ থেকে ঘুম যাচ্ছে না। বেঞ্চিতে আবার শুয়ে থাকা যাক। আমি শুয়ে পড়লাম। মশা খুব উৎপাত করছে, তবে কামড়াচ্ছে না। বনের মশারা কামড়ায় না। পার্কের সব বাতি জ্বলে উঠেছে। গাছপালার সঙ্গে ইলেকট্রিকের আলো একেবারেই যায় না। ইলেকট্রিকের আলোয় মনে হচ্ছে গাছগুলির অসুখ করেছে। খারাপ ধরনের কোনো অসুখ।

আমি অপেক্ষা করছি।

কিসের অপেক্ষা? আশ্চর্যের ব্যাপার, আমি অপেক্ষা করছি কদম নামের মেয়েটার জন্যে। সে আসবে, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। আলোর অভাবে তার মুখ ভালো করে দেখা হয় নি। এইবার দেখা হবে। সে কোথায় থাকে সেই জায়গাটাও তো দেখে আসা যায়। মেয়েটার নিজের কি কোনো সংসার আছে? পাইপের ভেতরের একার এক সংসার। যে-সংসার সে খুব গুছিয়ে সাজিয়েছে। পুরোনো ক্যালেন্ডারের ছবি দিয়ে চারদিকে সাজানো। ছোট্ট ধবধবে সাদা একটা বালিশ। বালিশে ফুল তোলা। অবসরে সে নিজেই সুই সুতা দিয়ে ফুল তুলে নিজের নাম সই করেছে—কদম।

না, কদম না। মেয়েটার নাম হল ছফুরা। নামটা কি আমার মনে থাকবে? আজ মধ্যরাতের পর আবারো যদি ফিরে আসি ছফুরা মেয়েটিকে খুঁজে বের করব। তাকে নিয়ে তার সংসার দেখে আসব। কথাগুলি মেয়েটাকে বলে যেতে পারলে ভালো হত। রাত বাড়ছে, মেয়েটা আসছে না। সে হয়তো আর আসবে না।

কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। কুয়াশা ক্রমেই ঘন হচ্ছে। আমি বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালাম।

এখন মধ্যরাত।

আমি দাঁড়িয়ে আছি গলির সামনে। ওই তো কুকুরগুলি শুয়ে আছে। ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি দৃশ্যই আগের মতো। কোনো বেশকম নেই। যেন আমি সিনেমা হলে বসে আছি। দেখা ছবি দ্বিতীয়বার আমাকে দেখানো হচ্ছে। ওই রাতে কুকুরগুলির সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। কী কথা বলেছিলাম মনে পড়ছে না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

পড়েছে। মনে পড়েছে। আমি বলেছিলাম—তারপর তোমাদের খবর কী? জোছনা কুকুরদের খুব প্রিয় হয় বলে শুনেছি, তোমাদের এই অবস্থা কেন? মনমরা হয়ে শুয়ে আছ।

না, এই বাক্যগুলি বলা যাবে না। কুকুররা এখন আর শুয়ে নেই। ওরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শরীর শক্ত হয়ে আছে। তারা কেউ লেজ নাড়ছে না। তারা হঠাৎ চমকে উলটো দিকে ফিরল। এখন আর এদের কুকুর বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে পাথরের মূর্তি। আমি যেন হঠাৎ প্রবেশ করেছি—প্রাণহীন পাথরের দেশে, যে-দেশে সময় থেমে গেছে। লাঠির ঠকঠক শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আসছে, সে আসছে।

মাথার ভেতরটা টালমাটাল করছে। ফিসফিস করে কে যেন কথা বলছে। গলার স্বর খুব পরিচিত, কিন্তু অনেক দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে বলে চিনতে পারছি না। চাপা ও গম্ভীর গলায় কে যেন ডাকছে, হিমু হিমু!

'বলুন, শুনতে পাচ্ছি।'

'আমি কে বল দেখি!'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমি তোর বাবা।'

'আপনি আমার বাবা নন। আপনি আমার অসুস্থ মনের কল্পনা। আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি বলেই আমার মন আপনাকে তৈরি করেছে। আমাকে সাহস দেবার চেষ্টা করছে।'

'এইগুলি তো তোর কথা না রে ব্যাটা! এগুলি মিসির আলির হাবিজাবি। তুই চলে আয়। চলে আয় বলছি।'

'না।'

'শোন হিমু। তুই তোর মার সঙ্গে কথা বল। এইবার আমি একা আসি নি। তোর মাকে নিয়ে এসেছি।'

'কেমন আছ মা?'

অদ্ভুত করুণ এবং বিষণ্ন গলায় কেউ একজন বলল, ভালো আছি।

'মা শোনো—তোমার চেহারা কেমন আমি জানি না। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে তুমি দেখতে কেমন। তুমি কি জান আমার জন্মের পরপর বাবা তোমার সব ছবি নষ্ট করে ফেলেন যাতে কোনোদিনই আমি জানতে না পারি তুমি দেখতে কেমন ছিলে?

'এতে একটা লাভ হয়েছে না? তুই যে-কোনো মেয়ের দিকে তাকাবি তার ভেতর আমার ছায়া দেখবি।'

'মা, তুমি দেখতে কেমন?'

'অনেকটা কদম মেয়েটার মতো।'

'ওকে আমি দেখতে পাই নি।'

'জানি। হিমু শোন—তুই ঘরে ফিরে যা।'

'না।'

'তোর বাবা তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে—তার সব স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাবে।'

লাঠির ঠকঠক আরো স্পষ্ট হল। মার কথাবার্তা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। লাঠির শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে এখন আর কোনো শব্দ নেই। দেখা যাচ্ছে—কুৎসিত ওই জিনিসটাকে দেখা যাচ্ছে। সেও আমাকে দেখতে পেয়েছে—ওই তো সে লাঠি উঁচু করল। চাঁদের আলোয় তার ছায়া পড়ে নি। একজন ছায়াশূন্য মানুষ।

আমি পা বাড়ালাম। কুকুররা সরে গিয়ে আমার যাবার পথ করে দিল। আমি এগুচ্ছি। আর মাত্র কিছুক্ষণ, তার পরই আমি তার মুখোমুখি হব। আচ্ছা, শেষবারের মতো কি চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখব—আজ রাতের জোছনাটা কেমন?

আমিই মিসির আলি

১

আপনিই মিসির আলি?

হ্যাঁ।

মেয়েটা এমনভাবে তাকাল যেন সে নিজের চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। বিশ্বাস–অবিশ্বাসের দোলা থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে নরম গলায় বলল, আমি ভীষণ জরুরি একটা চিঠি নিয়ে এসেছি। চিঠিটা এই মুহূর্তে আপনাকে না দিয়ে একটু পরে দেই? নিজেকে সামলে নেই। আমি মনে মনে আপনার চেহারা যেমন হবে ভেবেছিলাম, অবিকল সে রকম হয়েছে।

মিসির আলি মেয়েটির দিকে তাকালেন। সরল ধরনের মুখ। যে মুখ অল্পতেই বিস্মিত হয়। বারান্দায় চড়ুই বসলে অবাক হয়ে বলে, ও মাগো কী অদ্ভুত একটা চড়ুই!

মেয়েটার সুন্দর চেহারা। মাথার চুল লালচে এবং কোঁকড়ানো না হলে আরো সুন্দর লাগত। বয়স কত হবে—পঁচিশ ছাব্বিশ। নাকি আরো কম? কপালে টিপ দিয়েছে, টিপটা ঠিক মাঝখানে হয় নি। বাঁ দিকে সরে আছে। মেয়েরা সাধারণত টিপ দেওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধানী হয়। টিপ এক পাশে হলে কপালে সতীন জোটে—তাই বাড়তি সাবধানতা। এই মেয়েটা হয়তো তেমন সাবধানী নয়, কিংবা এই গ্রাম্য কুসংস্কারটা জানে না। মেয়েটা চোখে কাজল দিয়েছে। গায়ের রঙ অতিরিক্ত সাদা বলেই চোখের কাজলটা ফুটে বের হয়েছে। শ্যামলা মেয়েদের চোখেই কাজল মানায়, ফর্সা মেয়েদের মানায় না। তার পরেও এই মেয়েটিকে কেন জানি মানিয়ে গেছে।

সে পরেছে সবুজ রঙের শাড়ি। এখনকার মেয়েরা কি সবুজ রঙটা বেশি পরছে? প্রায়ই তিনি সবুজ রঙের শাড়ি পরা তরুণীদের দেখেন। আগে শহরের মেয়েরা সবুজ শাড়ি এত পরত না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের রঙের পছন্দ কি বদলাচ্ছে? রঙ নিয়ে কোনো গবেষণা কি হয়েছে? র‍্যানডম স্যাম্পলিং করা যেতে পারে। প্রতিদিন পঞ্চাশটা করে মেয়ের শাড়ির রঙ দেখা হবে। একেক দিন একেক জায়গায়। আজ নিউমার্কেটে, কাল গুলিস্তানে, পরশু ধানমণ্ডি। পরীক্ষাটা একমাস ধরে করা হবে। তারপর করা হবে গসিয়ান কার্ভ।

মিসির আলি ভুরু কুঁচকালেন। পরীক্ষাটা যতটা সহজ মনে হচ্ছে তত সহজ হবে না। স্ট্যাটিসটিক্যাল মডেল দাঁড় করানো কঠিন হবে। মূল গ্রুপের ভেতর থাকবে সাব

গ্রুপ। বিবাহিত মেয়ে, অবিবাহিত মেয়ে। উনিশ বছরের কম বয়সী মেয়ে, উনিশ বছরের চেয়ে বেশি বয়সের মেয়ে, ডিভোর্সড মেয়ে, বিধবা মেয়ে।

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, মনে হচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনি খুব দুশ্চিন্তা করছেন? কী নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন?

মিসির আলি বললেন, দুশ্চিন্তা করছি না তো।

আপনি অবশ্যই দুশ্চিন্তা করছেন। দুশ্চিন্তা না করলেও চিন্তা করছেন। কেউ যখন গভীর কিছু নিয়ে চিন্তা করে—তখন বোঝা যায়।

তুমি বুঝতে পার?

হ্যাঁ পারি। ও আচ্ছা, আমি তো পরিচয়ই দেই নি। আপনি বসতে বলার আগেই বসে পড়েছি। আমার ডাক নাম লিলি। ভালো নামটা আপনাকে বলব না। ভালো নামটা খুবই পুরোনো টাইপ। দাদি নানিদের সময়কার নাম। এখন বলতে লজ্জা লাগছে।

মিসির আলি বললেন, পুরোনো জিনিস তো আবার ফিরে আসছে। পুরোনো প্যাটার্নের গয়নাকে এখন খুব আধুনিক ভাবা হচ্ছে।

যত আধুনিকই ভাবা হোক, আমার ভালো নামটাকে কেউ কখনো আধুনিক ভাববে না। আচ্ছা আপনাকে বলে ফেলি, আপনি কিন্তু হাসতে পারবেন না।

আমি হাসব না। আমি খুব সহজে হাসতে পারি না।

আমার ভালো নাম হল মারহাবা খাতুন। নামটার একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাসটা আরেকদিন বলব। ইতিহাসটা শুনলে এখন নামটা আপনার কাছে যতটা খারাপ লাগছে—তত খারাপ লাগবে না। তখন মনে হবে এই নামও চলতে পারে।

এখনো যে নামটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে তা না।

আপনার খারাপ লাগছে তো বটেই আপনি ভদ্রতা করে বলছেন খারাপ না। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে মানুষ হিসেবে আপনি অত্যন্ত ভদ্র। কাউকে মনে আঘাত দিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন না।

কীভাবে বুঝলে?

এই যে আমি বকবক করে যাচ্ছি, আপনি মনে মনে খুবই বিরক্ত হচ্ছেন কিন্তু কিছুতেই সেটা প্রকাশ করছেন না। আপনি নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে অন্য কিছু ভাবছেন। আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি আমার বকবকানিতে বিরক্ত হচ্ছেন না?

মিসির আলি জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন। তিনি যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছেন।

একটা বয়স পর্যন্ত হয়তো মেয়েদের অকারণ অর্থহীন কথা শুনতে ভালো লাগে, তারপর আর লাগে না। এই মেয়েটি অকারণে কথা বলেই যাচ্ছে। মেয়েটার মনে গোপন কোনো টেনশন কি আছে? টেনশনের সময় ছেলেরা কম কথা বলে, মেয়েরা বলে বেশি। একটা ভালো দিক হচ্ছে মেয়েটার গলার স্বর অস্বাভাবিক মিষ্টি। কথা শুনতে ভালো লাগে। এর গলার স্বর একঘেয়ে হলে এতক্ষণে মাথা ধরে যেত।

বেলা বারোটার মতো বাজে। মিসির আলিকে নিউমার্কেট যেতে হবে। একটা কেরোসিনের চুলা সেই সঙ্গে আরো কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনবেন। সমুদ্রতীরে নিরিবিলিতে কিছুদিন থাকার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। তাঁর এক ছাত্র বিনোদ

চক্রবর্তী টেকনাফে কী একটা এনজিওতে কাজ করে। সে দিন পনের সমুদ্রের পাড়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জায়গাটার নাম কাদাডাঙ্গা। এমন একটা জায়গা যার আশেপাশের দু'তিন মাইলের ভেতর কোনো লোকালয় নেই। সামনে সমুদ্র, পেছনে জঙ্গল। দিনরাত সমুদ্র দেখা, নিজে রান্না করে খাওয়া। ভাবতেই অন্য রকম লাগছে। সমুদ্র দর্শন উপলক্ষে কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। আজই তা শুরু করার কথা। মেয়েটির জন্যে সম্ভব হচ্ছে না। কারো মুখের উপর বলা যায় না, তুমি চলে যাও, আমার জরুরি কাজ আছে। মিসির আলির কাজটা তেমন জরুরিও না। কেরোসিনের চুলা বিকেলেও কেনা যায়। সন্ধ্যার পরেও কেনা যায়।

আপনাকে কি আমি চাচা ডাকতে পারি?

মিসির আলি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, ডাকতে পার।

যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি করেছেন, সবাই বোধ হয় আপনাকে স্যার ডাকে।

সবাই ডাকে না, তবে অনেকেই ডাকে।

লিলি ঝুঁকে এসে বলল, আমি অনেকের মতো হতে চাই না। আমি অনেকের চেয়ে আলাদা থাকতে চাই। আমি এখন থেকে আপনাকে চাচা ডাকব।

আচ্ছা।

না চাচা ডাকব না, চাচাজী ডাকব। চাচাজী ডাকের মধ্যে আন্তরিকতা আছে। চাচা ডাকের মধ্যে নেই। তাই না?

হুঁ।

লিলি ঝুঁকে এসে বলল, জী লাগালেই যে আন্তরিক হয়ে যায় তা কিন্তু না। যেমন ধরুন বাবাজী, বাবাজী শুনতে ফাজলামির মতো লাগে না?

লিলি মুখ টিপে টিপে হাসছে। মেয়েটাকে এখন খুবই সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে বেতের চেয়ারে একটা পরী বসে আছে। হঠাৎ মেয়েটাকে এত সুন্দর লাগছে কেন মিসির আলি বুঝতে পারলেন না। মানুষের চেহারাও কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়? বদলাতে পারে। দিনের একেক সময় তার মুখে একেক রকম আলো পড়ে। সেই আলোর কারণেই চেহারা বদলায়। এনসেল আডামে'র একটা ফটোগ্রাফির বইতে পড়েছিলেন—তিনটা স্পট লাইট দিয়ে যে কোনো মানুষের চেহারা নিয়ে খেলা করা যায়।

চাচাজী পান মসলা খাবেন?

না।

একটু খেয়ে দেখুন খুব ভালো। আমি নিজে বানিয়েছি। আমার নিজের ফর্মুলা। আমি এই ফর্মুলার নাম দিয়েছি—লিলি'স পান পাউডার। কারণ আমার জিনিসটা পাউডারের মতো। মুখে দিয়ে কুটুর কুটুর করে চাবাতে হয় না। বুড়ো মানুষ যাদের দাঁতের অবস্থা ভালো না—তাদের জন্যে খুব সুবিধা। চাবাতে হবে না।

লিলি পান পাউডারের কৌটা বাড়িয়ে দিল। হাতের মুঠোর ভেতর রাখা যায় এমন কৌটা। দেখতে খুবই সুন্দর। কৌটার গায়ে ময়ূরের পালকের ডিজাইন। মনে হয় ছোট্ট একটা ময়ূর হাতের মুঠোয় শুয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, তোমার কৌটাটা খুব সুন্দর।

আপনার পছন্দ হয়েছে?

হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে।

কৌটাটা আমি আপনাকে দিয়ে দিতাম, কিন্তু দেওয়া ঠিক হবে না। আপনার কাছে এই কৌটা দেখলে সবাই হাসাহাসি করবে।

কেন বল তো?

কারণ কৌটাটা মেয়েদের। মেয়েরা এই ধরনের কৌটায় পিল রাখে। কোন ধরনের পিল বুঝতে পারছেন তো? বার্থ কনট্রোল পিল।

ও আচ্ছা।

আপনি কি আমার কথায় লজ্জা পেয়েছেন? প্লিজ লজ্জা পাবেন না। আমার স্বভাব হচ্ছে—মুখে যা আসে বলে ফেলি। চিন্তাভাবনা করে কিছু বলি না। আপনি নিশ্চয়ই আমার মতো না। আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রতিটি কথা খুব চিন্তাভাবনা করে বলেন। ছাঁকনি দিয়ে কথাগুলি ছাঁকেন।

মিসির আলি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, লিলি তুমি তোমার জরুরি চিঠিটা আমাকে দিয়ে দাও। আমার আজ একটু বের হতে হবে। আমার কিছু কেনাকাটা আছে।

কেরোসিনের চুলা কিনবেন?

মিসির আলি খুবই চমকালেন, কিন্তু মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ করলেন না। তিনি কেরোসিনের চুলা ঠিকই কিনবেন, কিন্তু এই তথ্য মেয়েটির জানার কথা না। টেবিলের উপর কোনো কাগজের টুকরাও নেই, যেখানে কেরোসিনের চুলা লেখা। থট রিডিং জাতীয় কিছু? সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ইএসপির কথা খুব শোনা যায়। বাস্তবে দেখা যায় না।

মিসির আলি মনের বিস্ময় চেপে রেখে বললেন, হ্যাঁ একটা কেরোসিনের চুলা কিনব।

আমি যে বলে দিতে পারলাম এতে অবাক হন নি?

প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। এখন অবাক হচ্ছি না।

এখন অবাক হচ্ছেন না কেন? আমি কীভাবে কেরোসিনের চুলার ব্যাপারটা বলে ফেলেছি তা ধরে ফেলেছেন—এই জন্যে অবাক হচ্ছেন না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা বলুন, আমি কীভাবে বলতে পারলাম কেরোসিনের চুলা?

আমি লক্ষ করেছি তুমি কথা বলার সময় যতটা না আমার চোখের দিকে তাকাও তারচেয়ে বেশি তাকাও আমার ঠোঁটের দিকে। কথা বলার সময় ঠোঁটের দিকে তাকানোর প্রয়োজন পড়ে না, কারণ শব্দটা আমরা কানে শুনতে পাই। তুমি ঠোঁটের দিকে তাকাচ্ছ তার মানে তুমি লিপ রিডিং জান। আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় বিড়বিড় করে 'কেরোসিনের চুলা' বলেছি। তুমি ঠোঁট নাড়া দেখে বুঝে ফেলেছ।

লিলি হাসতে হাসতে বলল, আপনাকে আমি দশে সাড়ে নয় দিলাম। আসলেই আপনার বুদ্ধি আছে।

তোমার কি ধারণা হয়েছিল বুদ্ধি নেই?

আপনাকে তো আমি খুব ভালোমতো জানি না। যা জানি বইপত্র পড়ে জানি। বইপত্রে সব সময় বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখা হয়। তাছাড়া চাচাজী আপনি কিছু মনে করবেন

না। আপনার চেহারায় হালকা বোকা ভাব আছে। আপনি নিজে তো নিজেকে আয়নায় দেখেন। ঠিক বলছি না চাচাজী?

হ্যাঁ ঠিক বলছ।

আমি বুঝতে পারছি আমাকে বিদায় করতে পারলে আপনি খুশি হন। আমি আর মাত্র বারো মিনিট থাকব। তারপর চলে যাব।

হিসাব করে বারো মিনিট কেন?

লিলি হাসিমুখে বলল, একটা বাজার ঠিক দশ মিনিট পরে আপনাকে আমি চিঠিটা দেব। এই চিঠি আগেও দেওয়া যাবে না, পরেও দেওয়া যাবে না। একটা বাজার ঠিক দশ মিনিট পরেই দিতে হবে। কারণটা হচ্ছে আজ মে মাসের ছয় তারিখ। এই তারিখে সূর্য ঠিক মাথার উপর আসবে একটা বেজে দশ মিনিটে। যিনি চিঠিটা আমার কাছে দিয়েছেন, তিনি এইসব বিষয় খুব ভালো জানেন। সূর্য মাথার উপর আসার ব্যাপারটা আমি তাঁর কাছ থেকে জেনেছি।

চিঠিটা কে দিয়েছে তোমার হাজবেন্ড?

জী।

তাঁর শখ কি আকাশের তারা দেখা? যারা আকাশের তারা দেখে এইসব ব্যাপার তারাই খুব ভালো জানে।

হ্যাঁ তিনি আকাশের তারা দেখেন। তাঁর তিন-চারটা টেলিস্কোপ আছে। আচ্ছা চাচাজী বইপত্রে পড়ি আপনার অবজারভেশন ক্ষমতা অস্বাভাবিক। দেখি তো কেমন? আমাকে দেখে আমার হাজবেন্ড সম্পর্কে বলুন। বলা কি সম্ভব?

না সম্ভব না।

কিছু নিশ্চয়ই বলা সম্ভব। এই যে আমি বললাম—তিনি আকাশের তারা দেখেন। এই বাক্যটায় আমি সম্মানসূচক 'তিনি' ব্যবহার করেছি। এখান থেকেই তো আপনি বলতে পারবেন যে, আমার স্বামীর বয়স বেশি। সমবয়সী হলে বলতাম, ও আকাশের তারা দেখে।

মিসির আলি নড়েচড়ে বসলেন। এই মেয়েটির সহজ সরল চোখের ভেতরে তীক্ষ্ণ চোখ লুকিয়ে আছে। এই চোখকে অগ্রাহ্য করা ঠিক না।

কেরোসিনের চুলা কিনতে চাচ্ছেন কেন?

আমি কয়েক দিনের জন্যে বাইরে যাব। নিজে রান্নাবান্না করে খেতে হবে। তার প্রস্তুতি।

শুধু কেরোসিনের চুলা কিনলে হবে না। এর সঙ্গে আরো অনেককিছু কিনতে হবে। কী কী কিনতে হবে আসুন তার একটা লিস্ট করে ফেলি। এতে দ্রুত সময় কেটে যাবে।

লিলি তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে কাগজ কলম বের করল। মিসির আলিকে অবাক করে দিয়েই টেবিলে ঝুঁকে দ্রুত লিখে ফেলল—

১. কেরোসিনের চুলা
২. চুলার ফিতা
৩. কেরোসিন
৪. ছুরি

৫. কাঠের বোর্ড (মাছ গোশত কাটার জন্যে)
৬. কেতলি
৭. সসপ্যান
৮. দুটি হাঁড়ি (ভাতের এবং তরকারির)
৯. চায়ের কাপ
১০. চামচ
১১. কনডেন্সড মিল্ক
১২. চা
১৩. কফি

মেয়েটা এমনভাবে লিখছে যেন মিসির আলি চেয়ারে বসে পড়তে পারেন। মেয়েটার এই ভঙ্গিটা ভালো লাগছে। কাজের ভঙ্গি। কাজটা সে হেলাফেলার সঙ্গে করছে না, গুরুত্বের সঙ্গে করছে।

আপনি একা যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আমারও মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছা করে একা কোথাও গিয়ে থাকতে। রবিনসন ক্রুশোর মতো একা কোনো দ্বীপে বাস করা। কী করব না করব কেউ দেখবে না। আমার মনে হয় আমি একা একা সারা জীবন কাটাতে পারব। আচ্ছা চাচাজী আপনি কি পারবেন?

বুঝতে পারছি না। আমি কখনো ভেবে দেখি নি।

কোনো পুরুষ মানুষের পক্ষে একা একা সারা জীবন কাটানো সম্ভব না। পুরুষদের নানান ধরনের চাহিদা আছে। ভদ্র চাহিদা, অভদ্র চাহিদা। ওদের চাহিদার শেষ নেই।

মেয়েরা কি তার থেকে মুক্ত?

মেয়েরাও তার থেকে মুক্ত না। তবে মেয়েরা ব্যক্তিগত চাহিদার কাছে কখনো পরাজিত হয় না। পুরুষরা হয়।

লিলি লেখা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসতে বসতে বলল, সব মিলিয়ে আটত্রিশটা আইটেম লিখেছি। এই আটত্রিশটা আইটেম সঙ্গে নিয়ে গেলে আপনি একা একা থাকতে পারবেন। এর মধ্যে অষুধও আছে। চট করে অসুখবিসুখ হলে ডাক্তারখানা পাবেন না।

থ্যাংক য়্যু।

আমি কাল আবার আসব। এর মধ্যে যদি আরো নতুন কোনো আইটেমের নাম মনে আসে আপনাকে বলব।

আচ্ছা।

লিলি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, এখন একটা বেজে দশ মিনিট। এই নিন চিঠি। দয়া করে ঝুড়িতে ফেলে দেবেন না। পড়বেন। তবে আমার সামনে পড়বেন না। আমি চলে যাবার পর পড়বেন।

অবশ্যই পড়ব।

আমি বাজার করতে খুব পছন্দ করি। আপনি যদি রাজি হন তাহলে কাল যখন আসব তখন আপনাকে নিয়ে কেরোসিনের চুলাটুলা কিনে দেব। আপনি যে দামে কিনবেন, আমি তার অর্ধেক দামে কিনে দেব। আর কিছু আইটেম আছে যা দোকানে

গেলে মনে পড়বে। কাগজ কলম নিয়ে বসলে মনে পড়বে না। এই তো এখন একটা জরুরি আইটেম মনে পড়ল, ন্যাকড়া।

ন্যাকড়া?

হ্যাঁ ন্যাকড়া। ন্যাকড়াকে মোটেই তুচ্ছ মনে করবেন না। চুলা থেকে গরম চায়ের কেতলি নামাবেন কীভাবে? হাতের কাছে ন্যাকড়া না থাকলে হয়তো গায়ের শার্টের একটা অংশ দিয়ে নামাতে যাবেন—তারপর এ্যাকসিডেন্ট। সারা গা গেল পুড়ে। ভালো কথা অষুধের লিস্টে আমি বার্নল লিখে দিয়েছি। নিতে কিন্তু ভুলবেন না।

আচ্ছা ভুলব না।

চাচাজী বাজার করার সময় আমাকে কি আপনি সঙ্গে নেবেন?

তুমি কাল আস তখন দেখা যাবে। আমার সমস্যা কি জান? আমি আমার নিজের কাজগুলি নিজেই করতে ভালবাসি। কেউ আমাকে কোনো ব্যাপারে সাহায্য করছে এটা ভাবতেই আমার কাছে খারাপ লাগে।

এই জন্যেই কি বিয়ে করেন নি?

বিয়ে না করার পেছনে এটা কারণ হিসেবে কাজ করে নি। বউকে দিয়ে কাজ করাব—এই ভেবে তো আর কেউ বিয়ে করে না।

কাল আমি ঠিক এগারটার সময় আসব।

আচ্ছা।

আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। আরো কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করছে। বসব?

না। আমি একনাগাড়ে কারো সঙ্গেই পঞ্চাশ মিনিটের বেশি গল্প করতে পারি না। দীর্ঘদিন মাস্টারি করেছি তো। মাস্টারদের ক্লাসগুলি হয় পঞ্চাশ মিনিটের। যে সব শিক্ষক দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন তারা কখনো পঞ্চাশ মিনিটের বেশি কোনো সিটিং দিতে পারেন না।

আমার নাম কি আপনার মনে আছে?

মনে আছে। ডাক নাম লিলি। ভালো নাম মারহাবা খাতুন।

আমার ভালো নাম আসলে মারহাবা খাতুন না। মাহাবা বেগম। আমি 'মা'র পরে একটা 'র' বসিয়ে মাহাবাকে মারহাবা করেছি।

মাহাবা তো বেশ আধুনিক নাম। তুমি কেন বললে খুব পুরোনো ধরনের নাম?

মিথ্যা করে বললাম। ছোট্ট একটা পরীক্ষা করলাম। মিথ্যা কথা বললে আপনি ধরতে পারেন কি না সেই পরীক্ষা। আমি আপনাকে নিয়ে লেখা একটা বইয়ে পড়েছি কেউ মিথ্যা কথা বললে আপনি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেন। আসলে আপনি পারেন না।

তুমি নাম নিয়ে মিথ্যা বলতে পার এটা মাথায় আসে নি। কাজেই আমি সেইভাবে তোমাকে লক্ষ করি নি।

মেয়েদের সম্পর্কে আপনি আসলে খুব কম জানেন। নিজের নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বলতে মেয়েরা খুব পছন্দ করে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ধরুন কোনো মেয়ে টেলিফোন ধরেছে। অপরিচিত একজন পুরুষ জিজ্ঞেস

করল, আপনি কে বলছেন? মেয়েটা তখন নিজের নাম না বলে ফট করে তার বান্ধবীর নাম বলে দেবে। আচ্ছা আমি যাই, আপনি তো আবার পঞ্চাশ মিনিটের বেশি কথা বলেন না। আমি যে বাড়তি কিছুক্ষণ কথা বললাম—কেন বললাম জানেন? পঞ্চাশ মিনিট পুরো করার জন্যে বললাম। আমি আপনার কাছে এসেছি সাড়ে বারোটায়। এখন বাজছে একটা বিশ। পঞ্চাশ মিনিট হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

আপনি আমাকে দ্রুত বিদায় করতে চাচ্ছিলেন। আমি চলেই যেতাম কিন্তু পঞ্চাশ মিনিটের কথা বলে আপনি নিজেই নিজের ফাঁদে আটকে গেলেন। খুব বুদ্ধিমান মানুষদের এটা একটা সমস্যা। নিজেদের তৈরি করা ছোট ছোট ফাঁদে তারা নিজেরা ধরা পড়ে। চাচাজী যাই?

আচ্ছা যাও।

মিসির আলি মেয়েটিকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। এই কাজটা তিনি সচরাচর করেন না।

লিলি গেট পার হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লজ্জিত গলায় বলল, চাচাজী আমি খুব দুঃখিত।

মিসির আলি বললেন, কেন বল তো?

আমি বুঝতে পারছিলাম আপনি আমার উপর খুব বিরক্ত হচ্ছেন, তারপরেও আমি চলে যাই নি। বরং আপনি যেন আরো বিরক্ত হন সেই চেষ্টা করেছি। আসলে আপনার সামনে থেকে চলে যেতে ইচ্ছা করছিল না।

মিসির আলি বললেন, আমি যতটা বিরক্ত হয়েছি বলে তুমি ভাবছ, তত বিরক্ত কিন্তু আমি হই নি। বরং তোমাকে আমার ইন্টারেস্টিং একটি মেয়ে বলে মনে হয়েছে।

তাহলে চলুন আবার ঘরে ফিরে যাই। কিছুক্ষণ গল্প করি।

বলতে বলতে লিলি হেসে ফেলল। মিসির আলিও হাসলেন। লিলি বলল, আপনাকে ভয় দেখাবার জন্যে বললাম, আপনি কি ভেবেছিলেন আমি আরো ঘণ্টাদুই আপনার সঙ্গে বকবক করব? আপনার মাইগ্রেনের ব্যথা তুলে তারপর বিদেয় নেব?

লিলি হাসছে। এই মেয়েটার হাসি একটু অন্যরকম। সে যখন হাসে তার চোখে পানি জমে। এই হাসির একটা নামও আছে—অশ্রু হাসি।

২

জনাব মিসির আলি

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার স্ত্রী লিলি নিশ্চয়ই অনেক নাটকীয়তা করে এই চিঠি আপনার হাতে দিয়েছে। সে এমন এক মেয়ে যে কোনো রকম নাটকীয়তা ছাড়া কিছু করতে পারে না। খুব সহজ কথাও সে সহজে বলবে না। দু'তিন জায়গায় প্যাঁচ দিয়ে বলবে। সহজ কথাটাকেই

তখন মনে হবে ভয়ঙ্কর জটিল। আপনি খুব বড় সাইকিয়াট্রিস্ট, আপনার কাছে হয়তো এর ব্যাখ্যা আছে, আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই।

যাই হোক মূল প্রসঙ্গে আসি। আমি এবং আমার স্ত্রী আমরা দু জনই আপনার মহাভক্ত। আপনার বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থ আমার স্ত্রী কয়েকবার করে পড়েছে, এবং আমাকেও পড়তে বাধ্য করেছে। আমি আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে কিছু কথা বলার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহী। সবচেয়ে ভালো হত আমি যদি লিলির সঙ্গে ঢাকায় চলে আসতে পারতাম। তা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ আমি বন্দি জীবনযাপন করছি। গত সাত বছর ধরেই আমি হুইল চেয়ারে আছি। রোড এ্যাকসিডেন্টে স্পাইনাল কর্ড জখম হয়েছিল। আপনি তো জানেন স্পাইনাল কর্ডের জীবকোষ কখনো রিজেনারেট করে না। আমাকে আমার ভাগ্য মেনে নিতে হয়েছে। চাকার জীবনে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করছি। অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কখনো হবে তাও মনে হয় না। নিজেকে এখন আর আমার মানুষ বলে মনে হয় না। মনে হয় আমি একটা দু'চাকার রিকশা।

আপনাকে ভুলিয়েভালিয়ে এখানে আনার একটি পরিকল্পনা আমি এবং আমার স্ত্রী দু জনে মিলে করেছি। জানি না আপনাকে কনভিন্স করতে পারব কি না। চেষ্টা করে দেখা যাক। আমার এখানে আসার জন্যে তিনটি টোপ আমি ফেলছি। কেন জানি আমার মনে হচ্ছে প্রথম দুটি টোপ কাজ না করলেও শেষটি করবে। টোপ দিয়ে মাছের মতো মানুষও ধরা যায়।

টোপ নাম্বার এক

আমাদের বসতবাড়িটা মেঘনার পাড়ে। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দোতলা পাকা দালান। দোতলায় প্রশস্ত টানা বারান্দা। বারান্দা থেকে মেঘনা দেখা যায়। না দেখা গেলেই ভালো হত। কারণ এই মেঘনা জমি গ্রাস করতে করতে দ্রুত এগিয়ে আসছে। যে কোনো সময় (হয়তো এ বছরই) আমাদের এই অতি চমৎকার বাগানবাড়িটা গ্রাস করবে। আমাদের বাড়িটা চমৎকার। বাড়ির সামনের বাগান চমৎকার। আমি নিশ্চিত একবার আপনি এসে উপস্থিত হলে অবাক বিস্ময়ে বলবেন—বাকি জীবনটা এখানে কাটিয়ে দিতে পারলে কী ভালোই না হত! আমাদের বাড়ির পেছনে কিছু অদ্ভুত গাছ বাড়ির আদি মালিক বাবু অশ্বিনী রায় (আমার দাদাজান এই বাড়ি পরে তাঁর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন।) লাগিয়েছিলেন। গাছগুলির নাম এখানে কেউ জানে না। এর মধ্যে

একটা গাছের গা থেকে নীল বর্ণের কষ বের হয়। দু বছর পরপর মরিচের ফুলের মতো নীল রঙের ফুল ফোটে। আমার স্ত্রী এই গাছটির নাম দিয়েছে—নীল মরিচ গাছ। আমার এখানে যে-ই আসে সে-ই এই গাছটার একটা নাম দেয়। আপনিও হয়তো একটা নাম দেবেন।

টোপ নাম্বার দুই

আপনার বিষয়ে একটা বইয়ে পড়েছি আপনার সারা জীবনের শখের বস্তু হল ভালো একটা টেলিস্কোপ। যে টেলিস্কোপে আপনি বৃহস্পতির চাঁদ দেখতে পারবেন, শনির বলয় দেখতে পারবেন। আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, টেলিস্কোপ চোখে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা বর্তমানে আমার একমাত্র শখ। বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদ দেখা বা শনির বলয় দেখার চেয়েও বিস্ময়কর দৃশ্য এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা। নক্ষত্রপুঞ্জের স্পাইর‍্যালে শত শত নক্ষত্র ঝলমল করছে। এই দৃশ্য একবার দেখলে সারা জীবনের জন্যে আকাশের গায়ে আটকে থাকতে হবে। আমি সর্বশেষ যে টেলিস্কোপটি এনেছি তার সঙ্গে ট্রেকার যুক্ত। পৃথিবীর ঘূর্ণনের সঙ্গে টেলিস্কোপও ঘুরবে, কাজেই আকাশে যে বস্তুটিকে ফোকাস করা হয়েছে সেই বস্তু কখনো দৃষ্টির আড়াল হবে না। আপনি যদি আসেন দু জনে মিলে আকাশের তারা দেখব। দু জনে মিলে দেখব কারণ লিলির তারা দেখার বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই। আমি ঠিক করে রেখেছি আমার চারটা টেলিস্কোপের একটা আমি আপনাকে উপহার দেব। চারটা টেলিস্কোপই আমার অত্যন্ত প্রিয়। সেখান থেকে আপনাকে একটা উপহার হিসেবে দিতে আমার কষ্ট যে হবে না তা না। কষ্ট হবে তবে আপনি এই টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে গাঢ় আনন্দ পাবেন এটা ভেবেই সেই কষ্ট দূর করব।

টোপ নাম্বার তিন

এইটিই শেষ টোপ। আমি নিশ্চিত এই টোপে আপনি কাবু হবেন। ইএসপি ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে আপনার প্রবল কৌতূহল। সালমা নামের একটি ১৪/১৫ বছরের মেয়ে আমাদের সন্ধানে আছে। গ্রামেরই মেয়ে।

মেয়েটি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন। আমি নানাভাবে পরীক্ষা করেছি। এবং নিশ্চিত হয়েছি। একটি পরীক্ষা হল বিখ্যাত জেনার টেস্ট। তার ক্ষমতা কোন পর্যায়ের সেটা এখন আর ব্যাখ্যা করলাম না। কিছুটা রহস্য রেখে দিলাম।

টোপ নাম্বার চার

যদিও তিনটা টোপ ব্যবহার করার কথা ছিল, তারপরেও আমি চতুর্থ টোপটি ব্যবহার করছি। অনেকের ব্যাপারে এই টোপ কাজ করলেও আপনার ব্যাপারে করবে বলে মনে হচ্ছে না। এটা হল লিলির রান্না। রান্নার উপর নোবেল পুরস্কার দেবার ব্যাপার থাকলে প্রতি বছরই সে একটা করে নোবেল পুরস্কার পেত। সামান্য আলু ভাজাও যে অমৃতসম খাদ্য হতে পারে লিলির আলু ভাজা না খেলে বুঝতে পারবেন না।

টোপ নাম্বার পাঁচ

ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক আরো একটি টোপ। এটি আপনাকে কাবু করে ফেলবে বলে আমার ধারণা। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির কথা বলছি। বইয়ের মোট সংখ্যা আঠার হাজারের বেশি। আপনার পছন্দের বিষয়ে (সাইকোলজি, বিহেভিয়ারেল সায়েন্স) প্রচুর বই আছে। শুধু একটি নাম উল্লেখ করছি Asmond-এর The Other Mind.

মিসির আলি সাহেব, কয়েকটা দিনের জন্যে আপনি কি আসতে পারেন না? আমার শরীর পঙ্গু কিন্তু মনটা পঙ্গু না। আপনি নিজে একজন সতেজ মনের মানুষ। আপনার সঙ্গে মানসিক যোগাযোগের জন্যে গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

বিনীত
এস. সুলতান হক

পুনশ্চ : আকাশ দেখার জন্যে এই সময়টা খুব ভালো। কুয়াশা থাকে না। এবং চারদিন পরই অমাবস্যা। আকাশ ভর্তি হয়ে যাবে তারায়। শুক্লপক্ষ তারা দেখার জন্যে ভালো না। চাঁদের আলোয় তারাদের ঔজ্জ্বল্য কমে যায়। কাজেই এখনি সময়।

মিসির আলি যে কোনো চিঠি তিনবার পড়েন। চিঠির ভেতরে কিছু কথা থাকে যা একবার পড়ে ধরা যায় না। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বারে ধরা পড়ে। এটিও তিনবার পড়লেন। সুন্দর চিঠি। সুন্দর হাতের লেখা। প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট। কাটাকুটি যে নেই তা না। তবে কাটা অংশগুলি হোয়াইট ইঙ্ক দিয়ে মুছে দেওয়া। ভদ্রলোকের বাগানবাড়িতে

যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু সম্ভব না। মিসির আলি তাঁর ছাত্রকে কুরিয়ারে চিঠি দিয়েছেন। সে সব কাজ ফেলে টেকনাফে এসে বসে থাকবে। তিনি না পৌঁছলে খুব অস্থির বোধ করবে। দুশ্চিন্তা করবে। তিনি কাউকে অকারণ দুশ্চিন্তায় ফেলতে চান না।

৩

লিলিকে দেখে মিসির আলি চিনতে পারলেন না। চিনতে পারার কথাও না—দরজা ধরে যে দাঁড়িয়ে আছে সে আগের দিনের লিলি না, অন্য কেউ। মাথার চুল নীল রঙের স্কার্ফ দিয়ে ঢাকা। চোখে কালো চশমা। ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক। জাপানি কিমানোর মতো একটা পোশাক পরেছে। তার রঙ দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। উঁচু হিলের জুতা পরেছে বলে তাকে দেখাচ্ছেও অনেক লম্বা।

চাচাজী আমাকে চিনতে পারছেন না, আমি লিলি। মাহাবা বেগম।

মিসির আলি বিড়বিড় করে বললেন, ও আচ্ছা আচ্ছা।

সত্যি করে বলুন তো আমাকে চিনতে পেরেছিলেন?

না চিনতে পারি নি।

মানুষের চেহারা মনে রাখা কত কঠিন দেখলেন?

দেখলাম।

আমি কী করেছি জানেন? লম্বা করে লিপস্টিক দিয়ে ঠোঁট লম্বা করেছি। মানুষকে চেনা যায় ঠোঁট দিয়ে আর চোখ দিয়ে। যে দুটা জিনিস দিয়ে চেনা যায়, সে দুটা জিনিস আমি বদলে দিয়েছি। চশমা দিয়ে চোখ ঢেকেছি আর ঠোঁট বদলে দিয়েছি।

মিসির আলি বললেন, লিলি বোস। তোমাকে সুন্দর লাগছে।

সুন্দর দেখাবার জন্যে আমি সাজ করি নি। নিজেকে বদলে দেবার জন্যে করেছি। ভালো কথা চাচাজী, আপনি কি কেরোসিনের চুলা এইসব কিনে ফেলেছেন?

না কেনা হয় নি।

লিলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচলাম। কারণ আমি সব কিনে ফেলেছি। এমন অনেক কিছু কিনেছি যা লিস্টে ছিল না, যেমন হারিকেন, টর্চ, ব্যাটারি। হাফ কেজি সুতলি কিনেছি।

সুতলি কেন?

এখন আপনার কাছে মনে হচ্ছে সুতলি কী জন্যে? কিন্তু একা থাকতে গিয়ে দেখুন সুতলি কত কাজে লাগবে। মশারি খাটাবার জন্যে লাগবে। ভেজা জামা কাপড় শুকুতে দেবেন—তার জন্যে দড়ি টানাতে হবে। আরো অনেক কিছুর জন্যে লাগবে। শলার ঝাড়ুও কিনেছি।

কত টাকা খরচ হয়েছে?

আপনার বাজেটের চেয়ে কম লেগেছে।

তুমি তো জান না আমার বাজেট কত?

বাজেট যতই হোক, তারচেয়ে কম। কারণ বাংলাদেশে আমার চেয়ে দরাদরি আর

কেউ করতে পারে না। চাচাজী শুনুন এই যে বাজারটাজার করে ফেলেছি তার জন্যে রাগ করেন নি তো?

না।

প্লিজ রাগ করবেন না। আরেকটা কথা জিনিসগুলির দাম দেবারও চেষ্টা করবেন না। কোনো লাভ হবে না। কারণ কিছুতেই দাম দিতে পারবেন না। আমার হাজবেন্ডের চিঠিটা পড়েছেন?

হ্যাঁ।

আপনি টোপ গেলেন নি। তাই না? আপনি নিশ্চয় সমুদ্র ফেলে তারা দেখতে যাচ্ছেন না? সমুদ্র হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। আকাশের তারা যত সুন্দরই হোক হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না।

তারা দেখার ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারছি না। আমার এক ছাত্রের সঙ্গে সবকিছু ঠিক করা। সে আবার আমাকে অতিরিক্ত রকমের শ্রদ্ধাভক্তি করে। সে টেকনাফে এসে বসে থাকবে।

লিলি হাসিমুখে বলল, আপনাকে টেকনাফে না দেখলে তার মাথা খারাপের মতো হয়ে যাবে। সে ভাববে আমাদের স্যার ভোলা টাইপ মানুষ, না জানি তাঁর কী হয়েছে!

ঠিক বলেছ লিলি।

আমার কোনো ইএসপি ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমি জানতাম আপনি আমাদের এখানে আসবেন না। আমি আমার হাজবেন্ডকে সেটা বলেছি। সে বিশ্বাস করে নি। তার ধারণা সে এমন গুছিয়ে চিঠিটা লিখেছে যে চিঠি পড়েই আপনি হোল্ডঅল বেঁধে রওনা দিয়ে দেবেন। উত্তর দক্ষিণে তাকাবেন না।

মিসির আলি বললেন, চিঠিটা খুবই গুছিয়ে লেখা।

লিলি বলল, আপনার জন্যে চিঠিটা গুছিয়ে লেখা না। আবেগ আছে এমন সব মানুষদের জন্যে চিঠিটা গুছিয়ে লেখা। আপনি তাদের দলে পড়েন না।

তোমার ধারণা আমার আবেগ নেই?

আছে তবে তা সাধারণ মানুষের আবেগ না। অন্য ধরনের আবেগ। আপনাকে যদি লেখা হত—আমি মহাবিপদে পড়েছি। মারা যাচ্ছি। একমাত্র আপনি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। তাহলে আপনি চলে যেতেন। কিন্তু সেটা তো আর লেখা যাবে না কারণ ও মারা যাচ্ছে না।

মিসির আলি বললেন, লিলি তুমি এক কাজ কর। তোমাদের ঠিকানাটা লিখে রেখে যাও। সমুদ্র দেখা শেষ হলে তোমাদের ওখানে চলে যাব।

আপনি একা একা খুঁজে বের করতে পারবেন না। যাওয়াও খুব ঝামেলা, ট্রেন, বাস—রিকশা—হাঁটা।

একটু ঝামেলা না হয় করলাম।

লিলি হেসে ফেলে বলল, থাক দরকার নেই। চাচাজী শুনুন আমি কিন্তু আজও পঞ্চাশ মিনিট থাকব। আমাকে আগেভাগে বিদায় করে দিতে চাইলেও আমি যাব না। তবে আজ যে গতদিনের মতো শুধু বকবক করব তা না। আপনাকে কফি বানিয়ে খওয়াব। আমি কফি নিয়ে এসেছি। আপনি কফি পছন্দ করেন তো?

করি।

মিসির আলি দেখলেন লিলি তার কাঁধে ঝোলানো পাটের ব্যাগ থেকে কফির কৌটা, মগ, চায়ের চামচ এবং ফ্লাস্ক বের করছে। বোঝা যাচ্ছে কফি বানানো হবে। মেয়েটা কফির সব সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে এসেছে। গরম পানিও এনেছে। ফ্লাস্কে নিশ্চয়ই গরম পানি।

লিলি বলল, মেশিন ছাড়া এক্সপ্রেসো কফি বানানো যায় না, কিন্তু আমি বানাতে পারি। আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। আপনি প্রতিটি স্টেপ খুব ভালোভাবে লক্ষ করুন। এই দেখুন কী করছি—এক চামচের চেয়ে সামান্য বেশি নিলাম কফি। চিনি নিলাম তিন চামচ। এখন চিনি আর কফি মিক্স করছি। চামচ দিয়ে ঘষে ঘষে মেশানো। এই মেশানোর কাজটা অনেকক্ষণ করতে হবে। যত ভালোমতো মেশাবেন কফি তত ভালো হবে।

এত যন্ত্রণা?

যন্ত্রণা ভাবলে যন্ত্রণা। আমি কখনো যন্ত্রণা ভাবি না। যে লেখক লেখাকে যন্ত্রণা মনে করেন তিনি কখনো লেখক হতে পারেন না। ঠিক তেমনি যে রাঁধুনি রান্নাকে যন্ত্রণা মনে করেন তিনি রাঁধুনি হতে পারেন না। চাচাজী আপনার কাছে কি আলু আছে?

না।

থাকলে ভালো হত। আমি আপনাকে আলু ভাজা কী করে করতে হয় শিখিয়ে দিতাম। যেসব রান্না খুব সহজ মনে হয় সেসব রান্না আসলে খুব কঠিন। আমার মতে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন রান্না হল চা বানানো, আর দ্বিতীয় কঠিন রান্না হল আলু ভাজা।

লিলি চিনির সঙ্গে কফি মিশিয়েই যাচ্ছে। ক্লান্তিহীন আঙুল নাড়াচাড়া করছে। তার মুখ উজ্জ্বল। যেন কোনো বিশেষ কারণে সে আনন্দিত। আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। মিসির আলি ভুরু কুঁচকালেন। সেই বিশেষ কারণটা কী? তিনি তাদের বাগানবাড়িতে যাচ্ছেন না এটাই কি বিশেষ কারণ?

লিলি বলল, চাচাজী আপনি কি লক্ষ করছেন কফির কাপ থেকে এখন চমৎকার কফির গন্ধ আসতে শুরু করেছে?

হ্যাঁ লক্ষ করছি।

তার মানে হল এখন আমরা তৈরি পানি ঢালার জন্যে। এখন আমি ওয়ান থার্ড কাপ পানি ঢেলে, চামচ নেড়ে নেড়ে ফেনা করব। ফেনায় যখন কাপ ভর্তি হয়ে যাবে তখন বাকি পানিটা ঢালব।

তৈরি হয়ে যাবে এক্সপ্রেসো কফি?

হ্যাঁ। আগে তো আর কফি বানানোর মেশিন ছিল না। এইভাবেই কফি বানানো হত। এখন আর কেউ কষ্ট করতে চায় না। ফট করে মেশিন কিনে ফেলে।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, লিলি তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব আনন্দিত। তোমার মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা ছিল। দুশ্চিন্তা হঠাৎ কেটে গেছে।

লিলি বলল, কফি বানাচ্ছি তো এই জন্যেই আমাকে আনন্দিত মনে হচ্ছে। যে কোনো রান্নাবান্নার সময় আমি খুব আনন্দে থাকি।

মিসির আলি বললেন, ব্যাপারটা তা না। যেই মুহূর্তে আমি বললাম—আমি

তোমাদের বাগানবাড়িতে যেতে পারছি না, সেই মুহূর্তেই তোমার চোখ–মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। কারণ ব্যাখ্যা কর তো।

আমি আমার হাজবেন্ডের সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম যে আপনি যাবেন না। আপনি না যাওয়াতে আমি বাজি জিতেছি তো এই জন্যেই হয়তো আমার চোখেমুখে আনন্দ চলে এসেছে। পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রীদের একটা চেষ্টা থাকে কোনো না কোনোভাবে তাদের স্বামীদের হারিয়ে দেওয়া। যেহেতু আপনি বিয়ে করেন নি—আপনি এই ব্যাপারটা জানেন না।

লিলির কফি বানানো শেষ হয়েছে। ফেনা–ওঠা কফির কাপ মিসির আলির সামনে রাখতে রাখতে সে বলল, চাচাজী চুমুক দিয়ে দেখুন। মিষ্টি একটু বেশি লাগবে। উপায় নেই, এক্সপ্রেসো কফি কড়া মিষ্টি না হলে ভালো লাগে না।

মিসির আলি কফির কাপ হাতে নিতে নিতে বললেন, লিলি আমি সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। তোমাদের বাগানবাড়িতে যাব। শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার স্বামীর কাছে বাজিতে হারলে।

লিলি বলল, কফিতে চুমুক দিন। এত কষ্ট করে বানালাম আর আপনি কাপ হাতে নিয়ে বসে আছেন?

মিসির আলি কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, এখন যদি আমরা রওনা দেই কতক্ষণে পৌঁছব?

পৌঁছতে পৌঁছতে রাত ন'টা দশটা বেজে যাবে।

তাতে কোনো সমস্যা নেই তো?

জি না সমস্যা নেই।

তাহলে চল কফি শেষ করে রওনা দিয়ে দেই।

কফি খেতে কেমন হয়েছে আপনি কিন্তু এখনো বলেন নি।

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, এত ভালো কফি আমি আমার জীবনে খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

লিলি ক্লান্ত গলায় বলল, থ্যাংক য়্যু।

সে তার মাথার নীল স্কার্ফ খুলে বিশেষ কায়দায় মাথা ঝাঁকি দিয়েছে। তার চুল ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। চেহারা আবার পাল্টে গেছে।

মিসির আলির মনে হল মেয়েটা কখন কী করবে সব আগে থেকে ঠিক করা। সে যে একটানে মাথা থেকে স্কার্ফ খুলে মাথা ঝাঁকাবে এটাও সে আগে থেকেই ঠিক করে এসেছে।

৪

মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ করলেন তার গা ছমছম করছে। যেন অশুভ কিছু তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। ভয়ঙ্কর কিছু। লৌকিক কিছু না, অলৌকিক কিছু। অনেককাল আগে তার একবার এ রকম অনুভূতি হয়েছিল। শ্যামগঞ্জ রেলস্টেশনে অপেক্ষা করছেন। গভীর

রাত। তিনি এগারো সিন্ধুর এক্সপ্রেসে ভৈরব যাবেন। ট্রেন আসবে ভোররাতে। পৌষ মাসের মাঝামাঝি। প্রচণ্ড শীত। ওয়েটিং রুমে বসে সময় কাটানোর জন্যে ঢুকতে যাবেন হঠাৎ তার পা জমে গেল। বুক ধকধক করতে লাগল। মনে হল ওয়েটিং রুমে অশুভ কিছু আছে। ভয়ঙ্কর কিছু। যে ভয়ঙ্করের কোনো ব্যাখ্যা নেই। তার উচিত কিছুতেই ওয়েটিং রুমে না ঢোকা। একবার ঢুকলে আর বের হতে পারবেন না।

কৌতূহল সব সময় ভয়কে অতিক্রম করে। তাঁর বেলাতেও তাই হল। তিনি কৌতূহলী হয়েই উঁকি দিলেন। ওয়েটিং রুমের ইজি চেয়ারে একজন বৃদ্ধ হলুদ কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। বৃদ্ধের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানছে। মিসির আলি ঘরে ঢুকলেন। বৃদ্ধ চোখ মেলল না, তবে তার ঠোঁটের কোনায় সামান্য হাসি দেখা গেল। শরীর জমিয়ে দেওয়া তীব্র ভয় মিসির আলিকে আবারো আচ্ছন্ন করল। তিনি প্রায় ছিটকে বের হয়ে এলেন। বাকি রাতটা কাটালেন প্ল্যাটফরমে পায়চারি করে। এগার সিন্ধুর এক্সপ্রেস ভোর চারটা চল্লিশে প্ল্যাটফরমে ইন করল। মিসির আলি ট্রেনে ওঠার আগে আরেকবার ওয়েটিং রুমে উঁকি দিলেন। বৃদ্ধ যাত্রী ঠিক আগের জায়গাতেই আছে। মাথা নিচু এবং চোখ বন্ধ করে আগের মতোই সিগারেট টানছে। ঠোঁটের কোনায় আগের মতোই অস্পষ্ট হাসি।

মিসির আলি তাঁর জীবনের এই ভয় পাওয়া ঘটনাকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। সবচেয়ে কাছাকাছি ব্যাখ্যা যেটা দাঁড় করিয়েছিলেন সেটা হল কিশোর বয়সে তিনি নিশ্চয়ই নির্জন স্টেশনের ওয়েটিং রুমের কোনো ভূতের গল্প পড়ে ভয় পেয়েছিলেন। ভয়টা এতই তীব্র ছিল যে, মস্তিষ্কের নিউরোন সেই স্মৃতি মূল্যবান কোনো স্মৃতি মনে করে যত্ন করে মেমোরি-সেলে ঢুকিয়ে রেখেছে। নষ্ট হতে দেয় নি। অনেককাল পরে আরেকটি নির্জন স্টেশন দেখামাত্র মস্তিষ্ক মনে করল এ রকম একটা স্মৃতি তো আছে। স্মৃতিটা বের করে বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক। যেহেতু অনেকদিনের স্মৃতি, বের করতে গিয়ে সমস্যা হল। স্মৃতির কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেল। কিছু অন্য রকম হয়ে গেল। মস্তিষ্ক শুধু যে স্মৃতি বের করে আনল তা না, স্মৃতির মনে জড়িত ভয়ঙ্কর ভীতিও বের করে আনল। এ রকম কাণ্ডকারখানা মস্তিষ্ক মাঝে মাঝে করে। এর যেমন মন্দ দিক আছে, ভালো দিকও আছে। মস্তিষ্কের ভেতর হঠাৎ নিউরোনের প্রবল ঝড় সৃষ্টি হয়। এতে ক্ষতিকারক স্মৃতি উড়ে চলে যায়। স্মৃতি জমা করে রাখা মেমরি-সেল খালি হয়।

আজ যে ভয়টা পাচ্ছেন তার পেছনের কারণটা কী? তিনি দাঁড়িয়ে আছেন পাঁচিল-ঘেরা প্রকাণ্ড একটা বাড়ির গেটের কাছে। অন্ধকারে পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটাকে জেলখানার মতো লাগছে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একা। এতক্ষণ লিলি তার সঙ্গে ছিল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করে সে দারোয়ান শ্রেণীর কাউকে দিয়ে গেট খুলিয়েছে।

তাও পুরো গেট না। গেটের অংশ যার ভেতর ছোটখাটো মানুষ হয়তো বা কষ্ট করে ঢুকতে পারে। গেট খুলতেই লিলি তাঁর দিকে ফিরে বলল, স্যার আপনি দাঁড়ান। পাঁচ-ছয় মিনিট লাগবে। আমি কুকুর বেঁধে আসি। আমাদের তিনটা কুকুর আছে। খুবই উগ্র স্বভাব, অপরিচিত কাউকে দেখলে কী করবে কে জানে? আমাকেই একবার কামড়ে দিয়েছিল।

মিসির আলি তারপর থেকে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঘড়ি দেখেন নি কিন্তু তাঁর কাছে মনে হচ্ছে পাঁচ-ছ মিনিটের অনেক বেশি সময় পার হয়েছে। কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বিশাল বাড়ি কিন্তু পুরোপুরি নিঃশব্দ। তিনটা ভয়ঙ্কর কুকুর অথচ তারা একবারও শব্দ করবে না এটা কেমন কথা? তাছাড়া বাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে। বিশাল এই বাড়ির একটি ঘরেও বাতি জ্বলবে না, এটাইবা কেমন কথা! এমন তো না যে, এই বাড়িতে মানুষজন থাকে না। রাত তো বেশি হয় নি। খুব বেশি হলে দশটা। যে দারোয়ান গেট খুলেছে তার হাতে কি একটা টর্চ থাকবে না?

এমন গাঢ় অন্ধকার মিসির আলি অনেকদিন দেখেন নি। নক্ষত্রের আলো পর্যন্ত নেই। আকাশ মেঘে ঢাকা। প্রবল অন্ধকারে জোনাকি বের হয়। জোনাকিও নেই। অনেকদিন তিনি জোনাকি দেখেন নি। জোনাকি দেখতে পেলে ভালো লাগত।

নদীর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। স্রোতের শব্দ। হঠাৎ করেই কি নদী সাড়াশব্দ শুরু করল? এতক্ষণ এই নদী ছিল কোথায়? বকুল ফুলের গন্ধ আসছে। এটা কি বকুল ফুলের সময়? শহরবাসী হয়ে ছোটখাটো ব্যাপারগুলি ভুলতে বসেছেন। গন্ধটা হয়তো বকুল ফুলের না। অন্য কোনো বুনো ফুলের। জায়গাটা বন তো বটেই। আশপাশে লোকালয় নেই।

ঘড়ঘড় শব্দ হল। মিসির আলির চোখ হঠাৎ ধাঁধিয়ে গেল। গেট খুলেছে। গেটের ওপাশে জাহাজি লণ্ঠন হাতে লিলি দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে দারোয়ান। দারোয়ানের হাতে লম্বা টর্চ। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ নিশ্চয়ই। এই টর্চে আলো ফেলে দেখতে ইচ্ছা করছে—আলো কেমন হয়।

লিলি বলল, স্যার আসুন। ওর শরীরটা খারাপ বলে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। আর আমি খুঁজে পাচ্ছি না হারিকেন। বরকতকে দেখুন এত লম্বা টর্চ নিয়ে ঘুরছে। টর্চে নেই ব্যাটারি। ব্যাটারি ছাড়া টর্চ হাতে নিয়ে ঘোরার দরকারটা কী স্যার আপনিই বলুন। আপনাকে ব্যাগ হাতে নিতে হবে না। বরকত নেবে।

মিসির আলি বললেন, তোমার কুকুর কি বাঁধা হয়েছে?

হ্যাঁ বাঁধা হয়েছে। সকালে কুকুরগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তখন আর আপনাকে কিছু বলবে না। আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছি দোতলার সবচেয়ে দক্ষিণের ঘরে। ঘরটা তেমন ভালো না, তবে খুব বড় ঘর। এই ঘরের খাটটা সুন্দর। অন্য ঘরগুলিতে এত সুন্দর রেলিং দেওয়া খাট নেই।

লণ্ঠনের আলোয় বাড়িঘর কিছু দেখা যাচ্ছে না। লণ্ঠন তাঁর চারপাশ আলো করছে। দূরে আলো ফেলতে পারছে না। লণ্ঠন এবং টর্চের এই হল তফাত—লণ্ঠন নিজেকে আলোকিত করে। নিজেকে দেখায়। টর্চ অন্যকে আলোকিত করে।

সিঁড়িটা সাবধানে উঠবেন স্যার। শ্যাওলা জমে কেমন পিছল হয়ে গেছে। রেলিং ধরে উঠুন। আপনার নিশ্চয়ই খুব ক্ষিধে লেগেছে। ক্ষিধে লেগেছে না স্যার?

হুঁ লেগেছে।

আপনি হাত-মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি খাবার রেডি করে ফেলব। এর মধ্যে কোনো কিছুর দরকার হলে দোতলার বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়াবেন। মাথা নিচু

করে বরকত বরকত করে ডাক দেবেন। আমাদের একটাই কাজের লোক বরকত। একের ভেতর চার। সে-ই দারোয়ান, সে-ই কেয়ারটেকার, সে-ই মালি, সে-ই কুকুর-পালক। ভাত খাবার আগে চা-কফি কিছু খাবেন?

খেতে পারি।

আমি এক্ষুনি বরকতকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তোমার হাজবেন্ডের সঙ্গে কি রাতে দেখা হবে?

অবশ্যই হবে।

অসুস্থ বলছিলে।

অসুস্থ হোক যাই হোক গেস্টের সঙ্গে দেখা করবে না?

মিসির আলির ঘর পছন্দ হল। পুরোনো বাড়ির একটা সুন্দর ব্যাপার হল—ঘরগুলি প্রকাণ্ড। ছোটখাটো ফুটবল খেলার মাঠ। কড়ি বর্গার ছাদ অনেক উঁচুতে। ছাদ থেকে লম্বা লম্বা লোহার রড নেমে এসেছে। রডের মাথায় ফ্যান। এক শোবার ঘরেই চারটা ফ্যান। ইলেক্ট্রিসিটি ছাড়া এই ফ্যান চলার কথা না। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে এদের জেনারেটর আছে। ফ্যানগুলি পুরোনো আমলের ডিসি ফ্যান না। আধুনিক কালের ফ্যান। ফ্যানের পাখায় জমে থাকা ময়লা থেকে বোঝা যায় যে ফ্যানগুলি ব্যবহার করা হয়।

ঘরে শোবার খাট দুটা। চারপাশে রেলিং দেওয়া প্রকাণ্ড খাটটা ঘরের মাঝামাঝি রাখা। এই খাটে ওঠার জন্যে দুই ধাপ সিঁড়ি আছে। জানালার পাশে খাটের সাইজেরই একটা টেবিল। বিশাল টেবিলের সঙ্গে বেমানান ছোট একটা চেয়ার। চেয়ার টেবিলের উল্টোদিকে দুটা আলমিরা। কাঠের আলমিরা তালাবন্ধ। চারটা সোফার চেয়ার। চেয়ারে সবুজ মখমলের গদি। চেয়ারের পাশে পুরোনো ডিজাইনের দুটা আলনা। তারপরেও মনে হচ্ছে ঘরটা ফাঁকা। দুটা খাটেই বিছানা করা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। একটায় বিছানো হয়েছে ধবধবে সাদা চাদর। সাদা বালিশের ওয়ার। রেলিং দেওয়া খাটে সবকিছুই রঙিন। তবে দুটো খাটেই কোলবালিশ আছে। মিসির আলি বাথরুমে উঁকি দিলেন। বাথরুমও প্রায় শোবার ঘরের মতোই বড়। খুবই আধুনিক বাথরুম। এই বাথরুম অবশ্যই পরে বানানো হয়েছে। যে সময়ের বাড়ি সে সময়ে টাইলস নামক বস্তু বাজারে আসে নি।

বাথরুমটা শুধু যে ঝকঝক করছে তা না, বড় বড় হোটেলের মতো করে গোছানো। বেসিনের উপর সাবান, টুথপেস্ট এবং একটা মোড়ক-না-খোলা টুথব্রাশ। তোয়ালে রাখার জায়গায় তোয়ালে ঝুলছে। ময়লা নয়—মনে হচ্ছে এইমাত্র ধোপাখানা থেকে নিয়ে আসা।

মিসির আলি বেসিনের কলে পানি আশা করেন নি। দোতলায় পানি আসতে হলে ছাদে পানির ট্যাংক থাকতে হবে। সেই ট্যাংকে পানি তোলার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ট্যাপ খুলতেই পানি পাওয়া গেল। অনেকদিন অব্যবহারের পর হঠাৎ কল খুললে লাল পানি বের হয়—সে রকম পানি না। পরিষ্কার পানি। মিসির আলি মুখে পানি ছিটালেন।

সিঁড়িতে থপথপ শব্দ করতে করতে কেউ-একজন আসছে। বাড়ির মালিক নিশ্চয় নন। তিনি হুইল চেয়ারে থাকেন। তাহলে কে আসছে—দারোয়ান? একেকটা সিঁড়ি ভাঙতে এত সময় নিচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই ভারী কিছু নিয়ে আসছে। সেই ভারী বস্তুটা কী হতে পারে? চেয়ার-টেবিল কাঁধে করে আনবে না। তাঁর ঘরে চেয়ার-টেবিল আছে। বালতিতে করে গরম পানি কি আনছে? রাতের বেলার অতিথিদের গরম পানি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। অতিথি গরম পানিতে গোসল করবেন, কিংবা হাত-মুখ ধোবেন। তাঁর প্রতি যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে তাতে সেটা প্রকাশ পাবে।

না বালতি নিয়ে কেউ আসছে না। বালতি হলে মাঝে মাঝে সিঁড়িতে নামিয়ে রাখত। তার শব্দ পাওয়া যেত। সেই শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মিসির আলি ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় চলে এলেন।

দারোয়ান বরকত আসছে। তার কোমরে মাটির কলসি। কলসির মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে, তার মানে কলসিতে করে গরম পানিই আনা হচ্ছে। মিসির আলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যাক লজিক শেষ পর্যন্ত কাজ করেছে। সিদ্ধান্তে আসার পরই টেনশান বোধ করা শুরু করছেন। লজিকের যে সিঁড়িগুলি গাঁথা হয়েছে সেই সিঁড়িগুলি কি ঠিক আছে? সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যাবে তো?

মিসির আলি জানেন এই সবই হচ্ছে বয়সের লক্ষণ। বয়স মানুষের সবচেয়ে বড় ক্ষতি যা করে—তা হল আস্থা কমিয়ে দেয়। যা-ই করা হয় মনে হয় ঠিকমতো বুঝি করা হল না। ভুল থেকে গেল।

স্যার গরম জল।

বুঝতে পারছি।

সিনান করলে করেন।

গোসল করব না।

বড় সাব সিনান করতে বলেছেন।

তোমার বড় সাহেব বললে তো হবে না। আমার গোসল করতে ইচ্ছে করছে না।

আর কিছু লাগবে?

না আর কিছু লাগবে না। ভালো কথা—তুমি গরম পানি না বলে গরম জল বলছ কেন? তোমাদের এদিকে কি পানিকে জল বলা হয়? এটা কি হিন্দুপ্রধান অঞ্চল?

বরকত জবাব দিল না। সরু চোখে তাকিয়ে রইল। মিসির আলি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও।

যাও বলার পরেও সে যাচ্ছে না। আগের মতোই সরু চোখে তাকিয়ে আছে। বলশালী একজন মানুষ। বয়স কত হবে ত্রিশ কিংবা পঁয়ত্রিশ। বেশিও হতে পারে। চুলে পাক ধরেছে। মানুষটার বুদ্ধি কেমন? চট করে মানুষের বুদ্ধি বের করার কোনো উপায় এখনো বের করা যায় নি। সাইকোলজিস্টরা নানান ধরনের পরীক্ষা অবিশ্যি বের করেছেন। কোনো পরীক্ষাই মিসির আলির কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। আসলে বুদ্ধি পরীক্ষার ব্যবস্থা না থেকে থাকা উচিত ছিল বোকামি পরীক্ষার ব্যবস্থা। প্রথম শ্রেণীর বোকাদের জন্যে এক রকম পরীক্ষা। দ্বিতীয় শ্রেণীর বোকাদের জন্যে আরেক রকম পরীক্ষা।

বরকত চলে যাচ্ছে। যেতে যেতেও দু বার ফিরে তাকাল। সিঁড়ির কাছে অন্ধকার। কাজেই তার চোখের দৃষ্টিতে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে। নয়তো এতবার করে তাকাত না।

মিসির আলি নিজের ঘরে ঢুকলেন। ঘরটা নিজের মতো করে সাজিয়ে নেওয়া দরকার। নিজের গায়ের গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে দিতে হবে। গন্ধ যত ছড়াবে ঘর হবে তত আপন। নিম্নশ্রেণীর পশুরা তাই করে। নিজের গায়ের গন্ধ দিয়ে সীমানা ঠিক করে দেয়। অদৃশ্য সাইনবোর্ড গন্ধ দিয়ে বলে—এই আমার সীমানা। এর ভেতর আর কেউ আসবে না। যদি ভুলে চলেও আস, বেশিক্ষণ থাকবে না। থাকলে সমূহ বিপদ।

মিসির আলি সুটকেস খুলে বই বের করলেন। চারটা বইয়ের মধ্যে একটা হল ক্লোজআপ ম্যাজিকের বই। দড়িকাটার খেলা, পিংপং বল অদৃশ্য করে দেবার খেলার মতো ছোট ছোট ম্যাজিকের কৌশল দেওয়া আছে। পড়তে ভালো লাগে। তিনি বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে রাখলেন। এত বড় টেবিলে চারটা মাত্র বই দেখতে হাস্যকর লাগছে। মিসির আলি ঠিক করে রাখলেন—এ বাড়ির লাইব্রেরি থেকে বেশ কিছু বই এনে টেবিল ভর্তি করে রাখবেন। চোখের সামনে প্রচুর বই থাকলে ভালো লাগে।

আবারো সিঁড়িতে থপথপ শব্দ হচ্ছে। বরকত কি আবারো ভারী কিছু নিয়ে উঠছে? ব্যাপারটা কী? এবার সে কী আনছে? মিসির আলি দ্রুত বারান্দায় চলে এলেন। বরকত ভারী কিছু তুলছে না। তার হাতে ছোট্ট তেলের শিশির মতো শিশি। অথচ এমনভাবে সে উঠছে যেন তার উঠতে কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে বিশ্রামও করে নিচ্ছে বলে মনে হয়। এমন স্বাস্থ্যবান একজন মানুষের সিঁড়ি ভাঙতে কোনো কষ্ট হবার কথা না। অথচ তার যে কষ্ট হচ্ছে এটা পরিষ্কার। হার্টের কোনো অসুখ কি আছে? কিংবা আর্থরাইটিস? ওঠার সময় হাঁটুতে ব্যথা করে?

বরকত মিসির আলির সামনে এসে বলল, ওষুধ নিয়া আসছি।

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, কীসের অষুধ?

সাপের অষুধ। আপনের ঘরের চারদিকে দিয়া দিব।

ঘরের চারদিকে সাপের অষুধ দেবে মানে কী? দোতলায় সাপ আসবে কীভাবে?

বরকত প্রশ্নের জবাব দিল না। ঘরে ঢুকে গেল। মিসির আলি বারান্দায় দাঁড়িয়েই তীব্র কার্বলিক এসিডের গন্ধ পেলেন। তাঁর গন্ধ বিষয়ক সমস্যা আছে। কিছু কিছু গন্ধ মনে হয় তাঁর স্নায়ুতে সরাসরি আক্রমণ করে। চট করে মাথা ধরে যায়। কার্বলিক এসিডেও তাই হয়েছে। মিসির আলি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, শুধু সাপ না, আমি নিজেও আর এই ঘরে ঢুকতে পারব না। এই গন্ধ নিয়ে বাস করার চাইতে ঘরে দু তিনটা সাপ নিয়ে বাস করা অনেক সহজ। মশারি ভালোমতো গুঁজে দিয়ে রাখলে সাপ ঢুকতে পারবে না। সাপকে খাটে উঠতে হলে খাটের পা বেয়ে উঠতে হবে। সাপের জন্যে এই প্রক্রিয়া খুবই কষ্টকর হবার কথা। সাপ শুধু শুধু এত কষ্ট করবে না।

বরকত নেমে যাচ্ছে। শিশিটা নিশ্চয়ই ঘরে কোথাও রেখে এসেছে। বোতল থেকে গন্ধ বের হচ্ছে। আচ্ছা বোতলটা সে কোথায় রেখেছে? খাটের নিচে রেখেছে নিশ্চয়ই। মশার কয়েল জ্বালিয়ে আমরা বেশির ভাগ সময় জ্বলন্ত কয়েলটা খাটের নিচে রেখে দেই।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে বরকতের তেমন কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হলো না। বেশ দ্রুতই নামছে। বরকতের আর্থরাইটিস নেই, এটা নিশ্চিত।

সিঁড়ির শেষ মাথায় ছোট একটা শব্দ হল। জায়গাটা গাঢ় অন্ধকার। তারপরেও মিসির আলির মনে হল কে যেন সেখানে বসে আছে। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাঁকে দেখছে। মিসির আলির মনে হল তাঁর হাতে একটা টর্চ থাকলে ভালো হত। টর্চের আলো ফেলে দেখা যেত কে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তিনি সিঁড়ি বেয়ে দু ধাপ নামলেন। উঁচু গলায় বললেন, কে? কে ওখানে?

কেউ জবাব দিল না। মিসির আলি আরো কয়েকটা সিঁড়ি টপকালেন আর তখনি শান্ত গম্ভীর পুরুষ গলায় কেউ একজন বলল, স্যার রেলিং ধরে ধরে নামুন। খুব খেয়াল রাখবেন যতবার ওঠানামা করবেন। রেলিং ধরে ধরে করবেন। আমার নাম সুলতান। ওয়েলকাম টু মাই 'ধ্বংসস্তূপ'। ধ্বংসস্তূপের ইংরেজিটা মনে পড়ছে না বলে বাংলা বললাম। স্যার কেমন আছেন?

হুইল চেয়ারে বসে যে মানুষটি হাত বাড়িয়েছে মিসির আলি কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না। কাছাকাছি আসায় মানুষটাকে এখন দেখা যাচ্ছে। কেউ একজন একতলার দরজাও মনে হয় খুলেছে। আলো এসে পড়েছে মানুষটার মুখে। অত্যন্ত সুপুরুষ একজন মানুষ। অতিথিকে স্বাগতম বলার জন্যে যিনি বিশেষভাবে পোশাক পরেছেন। ইস্ত্রি করা ধবধবে সাদা প্যান্টের সঙ্গে, হালকা নীল ফুল হাফ শার্ট। পোশাকটায় স্কুল-ড্রেস স্কুল-ড্রেস ভাব আছে। কিন্তু এই মানুষটাকে খুব মানিয়েছে। ভদ্রলোক চশমা পরেন, নাকের কাছে চশমার দাগ আছে, কিন্তু এখন চোখে চশমা নেই। তাঁর বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ, বুদ্ধিতে ঝিকমিক করছে। বয়স পঞ্চাশের বেশি। মাথা ভর্তি কাঁচা-পাকা চুল। কাঁচা-পাকা চুলের যে আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে, তা এই মানুষটার চুলের দিকে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যায়।

স্যার আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি। আপনি কেমন আছেন?

আমি ভালো আছি।

ঘরটা পছন্দ হয়েছে?

কার্বলিক এসিড দেওয়ার আগ পর্যন্ত পছন্দ ছিল। আমার কিছু গন্ধবিষয়ক সমস্যা আছে।

আপনি এসেছেন আমি অসম্ভব খুশি হয়েছি। খুশির প্রকাশটা অবিশ্যি করতে পারছি না। আপনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ, আপনি নিশ্চয়ই আমার খুশি ধরতে পারছেন।

মিসির আলি কিছু বললেন না। মানুষটা যে খুশি হয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে। আনন্দিত মানুষের ভেতর অস্থিরতা থাকে। ব্যথিত মানুষ চুপচাপ হয়ে যায়। এই মানুষটা অস্থির। হুইল চেয়ার নিয়ে এদিক-ওদিক করছে।

আমি আপনাকে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে সিঁড়ির গোড়ায় বসে আছি। আপনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি নিচ থেকে আপনাকে লক্ষ করছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করছিলেন। দুশ্চিন্তার বিষয়টা ধরার চেষ্টা করছিলাম।

দুশ্চিন্তা করছিলাম না। আপনার স্ত্রী লিলি কোথায়?

ও রান্না শেষ করে ঘুমুতে চলে গেছে। ভুল বললাম, সে চলে যায় নি। আমি তাকে জোর করে পাঠিয়েছি। ওর কিছু মানসিক সমস্যা আছে। সমস্যাগুলি হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়। আপনাকে নানান কৌশল করে এখানে আনার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটা কারণ হল লিলির ব্যাপারটি নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করা।

ও আচ্ছা।

স্যার আসুন। খেতে আসুন। খাবার ঘরটা একতলায়। একতলায় থাকায় রক্ষা। আমি যেতে পারছি। দোতলায় হলে যেতে পারতাম না।

মিসির আলি ভেবেছিলেন বিশাল একটা খাবার ঘর দেখবেন। তা দেখলেন না। ছোট ঘর। খাবার টেবিলটাও ছোট। টেবিলের পাশে একটামাত্র চেয়ার। মনে হচ্ছে একজনের জন্যেই খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ঘরের প্রধান আকর্ষণ মোমদানি। রূপার তৈরি মোমদানিতে এক সঙ্গে একুশটা মোম জ্বলছে। ঘর আলো হয়ে আছে। মোমদানিটা খাবার টেবিলে রাখা।

মিসির আলি চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আপনি খাবেন না?

জি না। সন্ধ্যার পর আমি কিছু খাই না। আগে পানি, চা-কফি খেতাম। এখন তাও না। সূর্য ডুবল মানে আমার খাওয়ার পর্ব শেষ।

মিসির আলি একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন—সূর্য ডোবার পর কেন খান না? শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করলেন না। সূর্য ডোবার পর খাদ্য গ্রহণ না করার পেছনে ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই কিছু যুক্তি আছে। সেইসব যুক্তি তিনি যদি অন্যদের জানাতে চান—প্রশ্ন না করলেও জানাবেন।

সূর্য ডোবার পর আমি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি কেন জানেন?

না জানি না।

সরি, আমি আপনাকে খুবই বোকার মতো প্রশ্নটা করলাম। সন্ধ্যার পর আমি কেন কোনো খাদ্য গ্রহণ করি না সেটা তো আপনার জানার কথা না। তবে আপনার লজিকেল ডিডাকসানের যে ক্ষমতা আপনি নিশ্চয়ই বের করে ফেলেছেন?

আমি কিছু বের করি নি।

স্যার আপনি খাওয়া শুরু করুন। সব টেবিলে দেওয়া আছে। আপনি খেতে থাকুন। আমি গল্পটা বলি। এক রাতে খেতে বসেছি; হঠাৎ মনে হল—পৃথিবীর পশুপাখি কীটপতঙ্গ কোনো কিছুই রাতে খাদ্য গ্রহণ করে না। জীব জগতের নিয়মই হল রাতে খাদ্য গ্রহণ না করা। এমনকি উদ্ভিদও সূর্যের আলো নিয়ে খাদ্য তৈরি করে দিনে, রাতে না। আর আমরা মানুষরা জীব জগতের সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে রাতে খাদ্য গ্রহণ করছি। এটা তো ঠিক হচ্ছে না। তারপর থেকে সূর্য ডোবার পর ফুড ইনটেক পুরোপুরি বন্ধ করে দিলাম। প্রথম কিছুদিন কষ্ট হয়েছে। এখন আর হচ্ছে না। এখন ভালো আছি। শরীর খুবই ফিট। যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই গল্প বলার ছলে বলতে চেষ্টা করি—সূর্য ডোবার পর খাদ্য গ্রহণ করা ঠিক না।

মিসির আলি প্লেটে ভাত নিতে নিতে বললেন, জীব জগতের কেউই রাতে খাবার খায় না?

বাদুড় আর পেঁচা খায়। এরা নিশাচর—এদেরটা হিসেবে ধরছি না। আমি যে বকবক করছি আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো?

বিরক্ত হচ্ছি না।

প্রথম দফাতে অনেক বিরক্ত করে ফেলেছি। আর করব না। আপনি খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিশ্রাম করুন। আমি বইয়ে পড়েছি আপনি একা খেতে পছন্দ করেন। সবকিছু দেওয়া আছে। আপনি খান। আমি পাশের ঘরেই থাকব। কোনো দরকার হলে ডাকবেন।

মিসির আলি বিব্রত গলায় বললেন, আমার একা খাওয়াটা কোনো নিয়মের কারণে না। একা থাকি বলেই একা খাই।

একা খেয়ে আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে। হঠাৎ করে এই অভ্যাস ভাঙানো ঠিক হবে না। আপনি খাওয়া শেষ করুন—তখন শুভরাত্রি জানানোর জন্য আসব। আপনাকে খুব স্পেশাল ডেজার্টও খাওয়াব।

খাবার আয়োজন বেশি না। আলু ভাজা, মুগের ডাল, করলা ভাজি, বেগুন ভাজি, সজনের ঝোল, পটোলের ঝোল এবং ডাল। সবই নিরামিষ। একটা বাটিতে ঘি, অন্য একটা বাটিতে তেঁতুলের আচার। মিসির আলি অত্যন্ত তৃপ্তি করে খেলেন। লিলি মেয়েটির রান্নার হাত যে অসাধারণ—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। এত অল্প সময়ে এতগুলি পদ সামনে দেওয়া সহজ ব্যাপার না। মেয়েটার অসুস্থতার ব্যাপারটি এখনো মিসির আলির কাছে পরিষ্কার হয় নি। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে মেয়েটাকে যে কোনো কারণেই হোক তার সামনে আসতে দেওয়া হচ্ছে না, কিংবা সে নিজেই আসছে না। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে না।

মিসির আলি খাওয়া শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সুলতান ঢুকল। তাঁর হাতে কাচের মুখ খোলা বয়াম এবং একটা চামচ। সে কি আড়াল থেকে মিসির আলির খাওয়া দেখছিল? তা না হলে খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র তার উপস্থিত হওয়াটা সম্ভব না।

স্যার আপনার ডেজার্ট। অনেক রকম ডেজার্ট খেয়েছেন, এটাও খেয়ে দেখুন। আপনাকে মেপে মেপে দু চামচ দেব। দু চামচের বেশি খাওয়া ঠিক হবে না। তবে আপনার যদি আরো খেতে ইচ্ছে করে, তাহলে খাবেন। সাধারণত দু চামচের বেশি খেতে ইচ্ছা করে না।

সোনালি রঙের ঘন তরল পদার্থ। হারিকেনের আলোয় ঝিকঝিক করে জ্বলছে। সুলতান বলল, তর্জনীতে মাখিয়ে মাখিয়ে মুখে দিল। এইভাবেই খাওয়ার নিয়ম।

মিসির আলি বললেন, জিনিসটা কি মধু?

জি মধু।

বিশেষ কোনো মধু?

অবশ্যই বিশেষ মধু। 'চাকভাঙা মধু' এই বাক্যটা নিশ্চয়ই শুনেছেন। এটা হল চাকভাঙা মধু। সুন্দরবনের মধুয়ালীরা মার্চ–এপ্রিল মাসে এই মধু সংগ্রহ করে। এই সময় খলসা ফুল ফুটে। মৌমাছিরা খলসা ফুল থেকে মধু জমা করে। কেওড়া ফুলের মধুও আছে। সেটাও খারাপ না। তবে খলসা ফুলের মতো ভালো মধু পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে আমি মনে করি না।

মিসির আলি আঙুলে মধু মাখিয়ে মুখে দিলেন। তিনি বিশেষ কোনো পার্থক্য অনুভব করতে পারলেন না। ঘন মিষ্টি সিরাপে হালকা ফুলের গন্ধ।

অন্য মধুর সঙ্গে পার্থক্য বুঝতে পারছেন?

না। মধু আমি খাই না। যারা নিয়মিত খায় তারা হয়তো পার্থক্যটা ধরতে পারবে। আমি পারব না।

আপনিও পারবেন। আমার কাছে এই মুহূর্তে আট রকমের মধু আছে। অস্ট্রেলিয়ান মধু, কানাডার মধু, আয়ারল্যান্ডের মধু এবং পাঁচ রকমের সুন্দরবনের মধু। সব আপনাকে খাওয়াব। আপনি নিজেই পার্থক্য ধরতে পারবেন। আপনি যখন এ বাড়ি থেকে বিদায় নেবেন তখন আপনি মোটামুটিভাবে একজন মধু বিশেষজ্ঞ।

মিসির আলি মধু শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।

সুলতান বলল, যান শুয়ে পড়ুন। সকালবেলা নাশতা খেতে খেতে আগামী কয়েক দিনের প্রোগ্রাম সেট করে ফেলব।

আচ্ছা।

পান খাবার অভ্যাস আছে?

না।

কাঁচা সুপারি দিয়ে একটা পান খেয়ে দেখুন। কাঁচা সুপারিতে এলকালয়েড আছে। এই এলকালয়েড স্নায়ুর উপর কাজ করে। শরীরে হালকা ঝিমঝিম ভাব নিয়ে আসে। ইন্টারেস্টিং সেনসেশন।

মিসির আলি কাঁচা সুপারির একটা পান মুখে দিলেন। সুলতান বলল, আপনার ঘর পাল্টে দিয়েছি। কার্বলিক এসিডের গন্ধ আপনার কাছে বিরক্তিকর এটা জানতাম না। এই ঘরটায় কার্বলিক এসিড দেওয়া হয় নি।

দোতলায় সাপ কি সত্যি আছে?

থাকার কোনোই কারণ নেই। তবে সাপ দেখা গেছে। আমি নিজেই দেখেছি। আমি সাপ চিনি না। যেটাকে দেখেছি তার ফণা আছে। কাজেই বিষ থাকার কথা।

বলেন কী?

আপনার খাটটা ঠিক ঘরের মাঝখানে দিতে বলেছি। খাটের নিচে জ্বলন্ত হারিকেন থাকবে। সাপ কার্বলিক এসিডের চেয়েও বেশি ভয় পায় আলো। মশা নেই, তবু মশারি খাটিয়ে ঘুমাবেন। বাথরুমে যাবার প্রয়োজন হলে ভালোমতো মেঝে দেখে তারপর নামবেন। আপনার কি ভয় লাগছে?

সামান্য লাগছে। সাপ আমার পছন্দের প্রাণী না।

আমার নিজেরও না। আমি এই পৃথিবীতে একটা জিনিসই ভয় পাই। তার নাম সাপ। মানুষ নানান রকম দুঃস্বপ্ন দেখে, আমি একটা দুঃস্বপ্নই দেখি—আমি সাপের সঙ্গে শুয়ে আছি। বেশ স্বাভাবিকভাবেই শুয়ে আছি। স্বপ্নটা দেখার সময় ভয় লাগে না। স্বপ্নটা যখন ভেঙে যায় তখন প্রচণ্ড ভয় লাগে। গা ঘিনঘিন করতে থাকে। বারবার গোসল করি, তারপরেও মনে হয় সাপের স্পর্শ শরীরে লেগে আছে। আপনার সঙ্গে এই বিষয়টা নিয়ে পরে কথা বলব।

আচ্ছা।

আমি দোতলা পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিতে পারছি না। ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব না। হুইল চেয়ার দোতলায় ওঠাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। বরকত আপনাকে নতুন ঘর দেখিয়ে দেবে।

এত বড় বাড়িতে আপনারা তিন জন মাত্র মানুষ!

আমরা ছয় জন ছিলাম। এখন তিন জন। জার্নি করে এসেছেন আপনি ক্লান্ত। শুয়ে পড়ুন। কাল আপনার সঙ্গে কথা হবে। আমার উচিত ছিল ঘর পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দেওয়া, সেটা সম্ভব না। বরকত এগিয়ে দেবে।

কোনো অসুবিধা নেই।

বরকতের অনিদ্রা রোগ আছে। সে কুকুরগুলির সঙ্গে সারারাত জেগে থাকে। আপনার যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়—সিঁড়ির কাছে এসে ওকে ডাকলেই হবে।

থ্যাংক য়্যু।

নতুন জায়গায় ঘুম যদি না আসে তার জন্যে আপনার ঘরে ফ্রিজিয়াম জাতীয় কিছু ট্যাবলেট দিতে বলেছি। লিলি নিশ্চয়ই দিয়েছে। রাত জেগে যদি বই পড়তে চান তার ব্যবস্থাও করেছি। The Other Mind বইটাও আপনার বিছানার কাছে আছে। বইটা কি পড়েছেন?

না।

পাঁচ জন সিরিয়াল কিলারের মানসিকতা ব্যাখ্যা করে বইটা লেখা হয়েছে। আমি নিজে খুবই আগ্রহ করে বইটা পড়েছি। আপনার অনেক বেশি ভালো লাগবে বলে আমার ধারণা।

বরকত এক গাদা জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়েছে। ফ্লাস্ক আছে, চায়ের কাপ আছে, পানির বোতল আছে। মিসির আলির চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ফ্লাস্ক ভর্তি চা থাকলেও তিনি যে রাত জাগবেন এবং চা খাবেন তা মনে হচ্ছে না। বরকত পাশে পাশে হাঁটছে। মনে হচ্ছে তার হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।

নতুন যে ঘরে মিসির আলিকে থাকতে দেয়া হয়েছে সে ঘরটাও প্রায় আগেরটার মতোই বড়। তবে আসবাবপত্র নেই। ঘরের মাঝখানে কালো রঙের খাট। খাটের পাশেই ছোট্ট টেবিল। টেবিলে হারিকেন আছে, একটা কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প আছে, দেয়াশলাই এবং মোমবাতিও রাখা আছে। ঘুমের অষুধ রাখা হয়েছে, এক ধরনের নয়—বেশ কয়েক ধরনের। The Other Mind বইটি রাখা হয়েছে বিছানায় বালিশের উপর।

শোবার আগে বই পড়া মিসির আলির অনেক দিনের অভ্যাস। পড়ার বই তিনি সঙ্গে এনেছেন। বাইরে বেড়াতে গেলে হালকা ধরনের বইপত্র পড়তেই ভালো লাগে। সাইকোলজির কঠিন বই না। কিন্তু এ বাড়ির কর্তা যে কোনো কারণেই হোক চাচ্ছে যেন তিনি The Other Mind বইটি পড়েন। আজ পড়া যাবে না, কারণ ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

মিসির আলি দরজার ছিটকিনি লাগাতে গেলেন। জং ধরে ছিটকিনি আটকে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও ছিটকিনি লাগাতে পারলেন না। লাভের মধ্যে লাভ এই হল যে ঘুম কেটে গেল। মিসির আলি ডায়েরি বের করলেন—কয়েক পৃষ্ঠা লিখবেন। এতে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হবে। তারপর বই নিয়ে বসবেন। সাইকোলজির কঠিন বই না, জেরোম কে জেরোমের এক নায়ে তিনজন।

টেবিলে যদিও দু টা বাতি তারপরেও এই আলো লেখার জন্যে যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। মিসির আলি লিখে আরাম পাচ্ছেন না। এক সময় তাঁর মনে হল শুধু যে আলোর

অভাবেই তিনি লিখে আরাম পাচ্ছেন না, তা না। যে বিষয় নিয়ে লিখছেন সেই বিষয়টি লিখতেও ভালো লাগছে না। মনের ভেতরে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

'এখন রাত একটা কুড়ি। আমার অনেকদিনের অভ্যাস ঘুমুতে যাবার আগে হয় কিছুক্ষণ লিখি, নয় বই পড়ি। লাল মলাটের এই ডায়েরিটা আমি কিনেছিলাম নির্জন সমুদ্রবাসের অভিজ্ঞতা লেখার জন্যে। সমুদ্রবাস এই মুহূর্তে করতে না পারলেও নির্জনবাস ঠিকই করছি। যাদের বাড়িতে আমি আছি তারা আমাকে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে কিন্তু আমি কেন যেন ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না। আমার শুধুই মনে হচ্ছে— কোথাও একটা সমস্যা আছে। আমি সমস্যা ধরতে পারছি না। সমস্যার নিয়ম হল— সমস্যাটা যদি এমন হয় যে খুবই স্পষ্ট তাহলে সেই সমস্যা ধরা যায় না। ধরতে সময় লাগে।

এরা খুব আগ্রহ করে আমাকে এই বাড়িতে এনেছে। আগ্রহের পেছনের কারণটা কী? আমাকে আকাশের তারা দেখানোর জন্যে কিংবা ভালো ভালো খাবার রান্না করে খাওয়াবার জন্যে নিশ্চয়ই আনে নি। আমি অতি বিখ্যাত কোনো ব্যক্তি না যে এ বাড়িতে কিছুদিন থেকে গেলে এদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এরা বলতে পারবে— আমাদের সঙ্গে মিসির আলি কিছুদিন ছিলেন। তিনি আমাদের অতি বন্ধু মানুষ। প্রায়ই আসেন। আগামী সামারে আবার আসবেন। এই দেখুন মিসির আলির সঙ্গে আমাদের ছবি।

সুলতান বা তার স্ত্রী আমার কাছ থেকে ঠিক কী চাচ্ছে তা এখনো ধরতে পারছি না বলে আমার অস্বস্তিটা কাটছে না। তারা কোনো বিপদে আছে বলে আমার মনে হয় না। বিপদে থাকলে প্রথম রাতেই বিপদের কথা জানতে পারতাম। এদের আচার-আচরণে সামান্য অস্বাভাবিকতা আছে এটা থাকবেই। একটা বিশাল পাঁচিল ঘেরা বাড়িতে দিনের পর দিন যদি তিনটি মানুষ বাস করে তাহলে তাদের চরিত্রে পরিবেশের প্রভাব প্রবলভাবে পড়বে। পরিবারের প্রধান মানুষটি হুইল চেয়ারে জীবন যাপন করছেন। এর প্রভাবও বাকিদের উপর পড়বে। আফ্রিকার আদিবাসি এক জনগোষ্ঠীর উপর একবার একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। দেখা গেল এরা সবাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। কারণ অনুসন্ধান করে পাওয়া গেল এদের দলপতি বাঁ পায়ে ব্যথা পেয়েছিল। ব্যথার কারণে সারাজীবন তাকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়েছে। তাই সংক্রমিত হয়েছে পুরো দলের উপর।

আমি এ বাড়ির তিন সদস্যকে আলাদা আলাদাভাবে দেখার চেষ্টা করছি, আবার দলবদ্ধভাবেও দেখার চেষ্টা করছি। সুলতানকে আমার মনে হয়েছে আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ। আমি যা করছি ঠিক করছি, আমি যা ভাবছি ঠিক ভাবছি গোত্রের একজন। একই ব্যাপার লিলির মধ্যে এবং বরকতের মধ্যেও দেখলাম। দীর্ঘদিন কিছু মানুষ যদি একটি গণ্ডিতে বাস করে তাহলে একটা পর্যায়ে তারা তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। এদের ক্ষেত্রেও কি তাই হতে যাচ্ছে?

সুলতানের আট ধরনের মধু এবং মধু নিয়ে তার বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাসের কারণটা ধরতে পারছি না। যারা মধ্যপান করেন এবং ভালো মদের ব্যাপারে যাদের আগ্রহ আছে তাদের মধ্যে এই উচ্ছ্বাস দেখা যায়। নানান ধরনের মদ সংগ্রহ করতে এবং অতিথিদের তা

দেখাতে এরা পছন্দ করেন। সুলতানের মধুর ব্যাপারটা শুরুতে আমি সে রকম কিছুই ভেবেছিলাম। পরে লক্ষ করলাম ব্যাপারটা সে রকম না। আমি নিশ্চিত যে সুলতান মধু খায় না। কারণ সে যখন আমাকে মধু দিচ্ছিল তখন তার নাক এবং ভুরু সামান্য কুঞ্চিত হল। যে শুঁটকি কখনো খায় না তার সামনে এক বাটি শুঁটকির ঝোল দিলে সে এই ভঙ্গিতেই নাক কুঁচকাবে। আমি একবার ভেবেছিলাম তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করি সে মধু খায় কি না। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করি নি। আমি যে চোখ খোলা রেখে সব দেখছি তা ঠিক এই মুহূর্তে এদের জানতে দিতে চাচ্ছি না। বরকত নামের দারোয়ানের একটা বিষয় আমার চোখে লাগছে। আমি লক্ষ করেছি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে তার খুবই কষ্ট হয়। দেখে মনে হয় কষ্টটা শারীরিক। আমার ধারণা তা না। আমার ধারণা কষ্টটা মানসিক। দোতলার কোনো ভয়ঙ্কর স্মৃতি কি তার মাথায় আছে? যে কারণে দোতলায় ওঠার ব্যাপারে তার অনাগ্রহ আছে?

লিলি মেয়েটি নিজের চারদিকে এক ধরনের রহস্য তৈরি করার জন্যে ব্যস্ত। এটি অস্বাভাবিক না। মেয়ে মাত্রই নিজেকে রহস্যময়ী হিসেবে উপস্থিত করতে চায়। মেয়েটি বুদ্ধিমতী। সে নানানভাবে আমার বুদ্ধির হিসেব নিতে চাচ্ছে। দাঁড়িপাল্লায় বুদ্ধি মাপতে চাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আমার বুদ্ধির ব্যাপারটা তার কাছে জরুরি। কেন জরুরি? সে কি আমার বুদ্ধি ব্যবহার করতে চায়? কোথায় ব্যবহার করবে...

এই পর্যন্ত লিখে মিসির আলি হাই তুললেন। তাঁর ঘুম পাচ্ছে। এখন ঘুমানো যায়।

৫

মিসির আলি বিড়বিড় করে বললেন, This is a dream. Nothing but a dream. যে বিস্ময়কর ঘটনা এই মুহূর্তে তাঁর চোখের সামনে ঘটছে সেটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। স্বপ্নে বিস্ময়কর ঘটনা খুব স্বাভাবিকভাবে ঘটে। এখানেও তাই ঘটছে। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তাঁর মশারির ছাদে একটা সাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। কুণ্ডলি ভেঙে সাপটা মাথা বের করল। এই তো এখন মশারি বেয়ে নিচে নামছে। সাপের গায়ে লম্বা লম্বা দাগ থাকে—এর গায়ে ফুটি ফুটি। অনেকটা চিত্রা হরিণের মতো।

তিনি আবারো বিড়বিড় করে বললেন, This is a dream. Nothing but a dream. স্বপ্নের নানান স্তর আছে। তিনি নিশ্চয়ই গভীর কোনো স্তরের স্বপ্ন দেখছেন। এ ধরনের স্বপ্ন চট করে ভাঙে না। মানুষের মস্তিষ্ক স্বপ্নটা পুরোপুরি দেখানোর ব্যবস্থা করে। তার বেলাতেও এই ব্যাপারটিই হচ্ছে। স্বপ্নটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেখতে হবে। তাঁর মস্তিষ্ক দেখাবে। তিনি না চাইলেও দেখাবে।

যদি ঘটনাটা স্বপ্ন হয়ে থাকে তাহলে তাঁর চুপচাপ শুয়ে সাপটার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। চোখ বন্ধ করলেও সাপটা চলে যাবে না। তাঁর চোখ বন্ধ না করার সঙ্গে স্বপ্নের কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি স্বপ্ন না হয়ে থাকে তাহলে অনেক কিছুই করার আছে। শুয়ে না থেকে তাঁর উঠে বসা দরকার। হাততালি দেওয়া দরকার। সাপ শব্দ পছন্দ করে না। যেকোনো ধরনের কম্পন তার কাছে বিরক্তিকর। খাটটা

দোলানো যেতে পারে। বালিশের নিচে সিগারেট আছে। সিগারেট ধরানো যেতে পারে। সিগারেটের ধোঁয়াও নিশ্চয়ই সাপটা পছন্দ করবে না।

মিসির আলি উঠে বসার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বসতে পারলেন না। এর দুটা কারণ হতে পারে। স্বপ্নে নিজের ইচ্ছায় কিছু করা যায় না। তিনি উঠে বসার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। কাজেই এটা স্বপ্ন। আর স্বপ্ন না হয়ে ঘটনাটা যদি সত্যি হয় তাহলে তিনি উঠে বসতে পারছেন না, কারণ তিনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন। ভয়ে স্নায়ুতে স্থবিরতা চলে এসেছে। মস্তিষ্ক উঠে বসার সিগন্যালটা ঠিকমতো দিতে পারছে না। যে সব রাসায়নিক বস্তু নিউরনের বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের ভেতরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বালিশের নিচে হাত দিয়ে সিগারেট নিলেন। সিগারেট ধরালেন। তামাকের গন্ধ পাওয়া গেল। তাহলে কি এটা স্বপ্ন না, সত্যি? স্বপ্ন হল সিনেমার পর্দায় ছবি দেখার মতো—ছবি দেখা যাবে, শব্দ শোনা যাবে তবে কোনো গন্ধ পাওয়া যাবে না। স্বপ্ন গন্ধ এবং বর্ণহীন।

তিনি গন্ধ পাচ্ছেন এবং রঙও দেখছেন। সাপের গায়ের হলুদ ফুটি স্পষ্ট দেখেছেন। এই তো এখন তাঁর হাতে বেনসন এন্ড হেজেস-এর সোনালি প্যাকেট। গাঢ় লাল রঙের উপর লেখা Special filter.

তবে এখানেও কথা আছে, গভীর স্তরের স্বপ্নে বর্ণ গন্ধ সবই থাকে। আচ্ছা এমন কি হতে পারে তিনি যা দেখছেন তা স্বপ্ন না, বাস্তব ঘটনা। তাঁকে তো আগেই বলা হয়েছে এই বাড়ির দোতলায় সাপ আছে। যদি সাপ থেকেই থাকে তাহলে ঘরে সাপ আসতেই পারে। কারণ এই ঘরটায় কার্বলিক এসিড দেওয়া হয় নি।

ধরে নেওয়া যায় একটা সাপ ঘরে ঢুকেছে। আলো সমস্ত প্রাণীকুলকে কৌতূহলী করে, সাপটাকেও করেছে। সে এগিয়ে এসেছে খাটের নিচে রাখা হারিকেনের দিকে। এখানে এসে সে শুনতে পেল নিশ্বাস ফেলার শব্দ। খাট থেকে শব্দটা আসছে। সাপটা আবারো কৌতূহলী হল। সে দেখতে গেল ব্যাপারটা কী? কীসের শব্দ? শব্দটা কোথেকে আসছে? দেখতে গিয়ে সে চলে গেল মশারির ছাদে। তার কৌতূহল মিটেছে বলে সে এখন চলে যাচ্ছে। কিংবা তার কৌতূহল মেটে নি। সে চলে যাচ্ছে কারণ সে বুঝতে পারছে কৌতূহল মেটার কোনো সম্ভাবনা নেই।

মিসির আলি বিছানায় উঠে বসলেন। বালিশের কাছে হাত বাড়ালেন। টর্চ লাইটটা আছে। তিনি টর্চের আলো ফেললেন। সাপটা দেখা যাচ্ছে না। খাট বেয়ে নিশ্চয়ই নেমে গেছে। তিনি কয়েকবার কাশলেন। টর্চ লাইটে টোকা দিলেন। বসে বসেই খাট নাড়ালেন। তিনি এখন বিছানা থেকে নামবেন। তাঁকে একটা কাজ করতে হবে। ছোটখাটো একটা পরীক্ষা। তাঁকে যেতে হবে বড় টেবিলটার কাছে। টেবিলের উপর ডায়েরি আছে। ডায়েরির পাতায় কিছু একটা লেখে নাম সই করতে হবে।

এই মুহূর্তে যা ঘটছে তা স্বপ্ন না সত্যি তা প্রমাণ হবে ডায়েরির লেখা থেকে। সকালে ঘুম ভেঙে যদি দেখেন ডায়েরিতে কিছু লেখা নেই তাহলে বুঝতে হবে পুরো ব্যাপারটা স্বপ্ন। আর যদি দেখেন লেখা আছে তাহলে বুঝতে হবে যা দেখেছেন সবই সত্যি। মিসির আলি খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামলেন। সাপটাকে প্রথমবার দেখে যে ভয় পেয়েছিলেন, সেই ভয়টা এখন আর লাগছে না। তবে গা ছমছম করছে।

মেঝেতে কোথাও সাপটাকে দেখা গেল না। মিসির আলি টেবিলের কাছে গেলেন। ডায়েরিতে লিখলেন—"আজ সাত তারিখ। আমি আমার মশারির উপর একটা সাপ দেখেছি।" লিখে নাম সই করলেন। ডায়েরি উল্টে এমনভাবে টেবিলে রাখলেন যেন সকালে ঘুম ভাঙতেই চোখে পড়ে ডায়েরিটা উল্টানো। কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াবেন। ঘরের ভেতর দমবন্ধ লাগছে।

তিনি দরজায় ছিটকিনি না দিয়েই শুয়েছিলেন। পুরোনো আমলের বাড়ি ছিটকিনি জং ধরে আটকে গিয়েছিল। যেহেতু ছিটকিনি লাগানো নেই, আংটা ধরে টানলেই দরজা খুলে যাবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য দরজা খুলতে পারলেন না। প্রাণপণে টেনেও দরজা নাড়ানো গেল না। মনে হচ্ছে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। তিনি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলেন। কোনো লাভ হল না। মিসির আলি খাটে এসে উঠলেন। হই চই চিৎকার করার কোনোই মানে হয় না। পুরো ব্যাপারটা স্বপ্ন হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কাজেই তাঁর যা করণীয় তা হল বিছানায় চলে যাওয়া। ঘুমিয়ে পড়া এবং ঘুম ভাঙার জন্যে অপেক্ষা করা।

মিসির আলি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শীত শীত লাগছে। পায়ের কাছে রাখা চাদর বুক পর্যন্ত টেনে দিলেন। একটা হাত রাখলেন কোলবালিশের উপর। তিনি চোখ বন্ধ করে আছেন। মাথার ভেতরে সমুদ্র গর্জনের মতো শব্দ হচ্ছে। এ রকম শব্দ কেন হচ্ছে কে জানে? প্রচণ্ড ভয় পাবার পরে কি মানুষের শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ড খানিকটা এলোমেলো হয়ে যায়?

তাঁর ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। ঘর ভর্তি আলো। পাখপাখালি চারদিকে কিচকিচ করছে। খাটের পাশে লিলি দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে চায়ের কাপ। আজ মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে তার বয়স কিছুতেই সতের আঠার বছরের বেশি হবে না। লিলি হাসিমুখে বলল, চাচাজী আপনি দরজার ছিটকিনি না লাগিয়েই ঘুমিয়েছেন?

মিসির আলি উঠে বসতে বসতে বললেন, ছিটকিনি লাগাতে পারি নি।

লিলি বলল, আমি তো আর সেটা জানি না। এর আগেও দুবার এসে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেছি। এইবার কী মনে করে দরজা ধাক্কা দিলাম। ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। চাচাজী রাতে ঘুম কেমন হয়েছে?

ভালো।

নিন চা নিন। আমি বইয়ে পড়েছি আপনি বাসিমুখে দিনের প্রথম চা খান। নাশতা তৈরি আছে। হাত মুখ ধুয়ে নিচে নামলেই নাশতা দিয়ে দেব।

তোমার শরীর এখন ভালো?

শরীর খুব ভালো। কাল রাতেও ভালো ছিল। ওর সঙ্গে রাগারাগি করে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। ও আপনাকে কী বলেছে? আমার মাথা খারাপ? আমার চিকিৎসা দরকার?

এই ধরনেরই কিছু।

লিলি হাসতে হাসতে বলল, ওর কোনো দোষ নেই। রাগারাগির এক পর্যায়ে আমি মাথা খারাপের অভিনয় করেছি। ও আমার অভিনয় ধরতে পারে না। চাচাজী আমার চা কেমন হয়েছে?

ভালো হয়েছে।

কাল রাতের খাবারটা কেমন ছিল?

ভালো ছিল। আমি খুব তৃপ্তি করে খেয়েছি।

আজ আপনাকে কই মাছের পাতুড়ি খাওয়াব। পুঁই শাকের পাতা আনতে পাঠিয়েছি। পাওয়া গেলে হয়। এমন জংলা জায়গায় বাস করি। আশপাশের দুতিন মাইলের মধ্যে হাটবাজার নেই।

মিসির আলি কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, লিলি একটা কাজ কর তো—টেবিলের উপর দেখ আমার ডায়েরিটা উল্টো করে রাখা আছে। পাতাটা খুলে দেখ কী লেখা।

লিলি টেবিলের কাছে গেল। ডায়েরি উল্টো করে রাখা নেই। বইগুলির উপর রাখা। লিলি বলল, চাচাজী টেবিলের উপর কোনো ডায়েরি উল্টো করে রাখা নেই।

লাল মলাটের বইটি ডায়েরি। সাত তারিখ বের করে দেখ তো কিছু লেখা আছে কি না।

লিলি অবাক হয়ে বলল, কিছু লেখা নেই। কী লেখা থাকবে?

মিসির আলি হালকা গলায় বললেন, রেখে দাও। কিছু লেখা থাকবে না। তোমার স্বামীর ঘুম কি ভেঙেছে?

ওর ঘুম একটার আগে ভাঙবে না। সারা রাত জেগে তারা দেখেছে। আপনাকে কী কী দেখাবে সব ঠিকঠাক করেছে। আজ আপনাকে কী দেখানো হবে জানেন?

না।

শনির বলয়। এইসব দেখে কী হয় কে জানে! আমার খুবই ফালতু লাগে। চাচাজী আমি নিচে যাচ্ছি। হাতমুখ ধুয়ে আপনি নেমে আসুন। আজ আপনি নাশতা খাবেন চুলার পাশে বসে। গরম গরম লুচি ভেজে পাতে তুলে দেব।

তোমার লুচিগুলিও কি স্পেশাল?

অবশ্যই। অর্ধেক ময়দা আর অর্ধেক সুজিদানা মিশিয়ে কাই তৈরি করা হয়। দশ বারো ঘণ্টা এই কাই ভেজা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রেখে দিতে হয়। লুচির কাই আমি কাল রাতেই তৈরি করে রেখেছি।

ভালো।

শুধু ভালো বললে হবে না। আপনি চলে যাবার আগে আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে যাবেন। রান্নার সার্টিফিকেট। সেই সার্টিফিকেট আমি বাঁধিয়ে রাখব।

অবশ্যই দিয়ে যাব। তুমি চাইলে এখনি দিয়ে দিতে পারি।

ওমা এখন কেন দেবেন? আমি তো এখনো আপনার জন্যে রান্নাই করি নি। চাচাজী যাই।

লিলি চলে যাবার পর মিসির আলি টেবিলের কাছে গেলেন। ডায়েরি হাতে নিলেন। সেখানে স্বপ্নের কথা কিছু লেখা নেই। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? গত রাতে যা দেখেছেন সবই স্বপ্ন? গভীর গাঢ় স্বপ্ন?

মিসির আলি হাত মুখ ধুয়ে নিচে নামলেন। লুচি বেগুনভাজা খেলেন। চা খেলেন। লিলি বলল, চাচাজী আপনি ঘুরে ফিরে বাড়ি দেখুন। বাগান দেখুন। লাইব্রেরি ঘর খুলে রেখেছি। লাইব্রেরির বইপত্র দেখতে পারেন।

তোমার কুকুরগুলি কি বাঁধা আছে?

হ্যাঁ কুকুর বাঁধা। বরকতকে পুঁই পাতার খোঁজে পাঠিয়েছি। বড় বড় পুঁই পাতা ছাড়া পাতুড়ি হয় না। বরকত এলেই কুকুরগুলির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। তখন আপনার কুকুরভীতি থাকবে না।

নীল ফুল ফোটে ঐ গাছটা কোথায়?

পেছনের বাগানে। বিশাল গাছ আপনি দেখলেই চিনতে পারবেন। গাছের গুঁড়িটা বাঁধানো। পেছনের বাগানে একটা ভাঙা মন্দির আছে। মন্দিরে ঢুকবেন না। সাপের আড্ডা।

কী মন্দির?

কালী মন্দির। হিন্দু বাড়ি ছিল। বাড়ির মালিক অশ্বিনী রায় শাক্ত মতের মানুষ ছিলেন। স্বপ্নে দেখে তিনি কালী প্রতিষ্ঠা করেন। খুবই ইন্টারেস্টিং গল্প। আমি ভাসা ভাসা জানি। সুলতানকে জিজ্ঞেস করলেই আপনাকে বলবে।

আচ্ছা তাঁকে জিজ্ঞেস করব।

লিলি বলল, আমি ঐ দিনের মতো এক্সপ্রেসো কফি বানিয়ে আপনার জন্যে নিয়ে আসছি। ঠিক আছে চাচাজী?

ঠিক আছে।

মিসির আলি বাড়ি দেখতে বের হলেন। রাতে বাড়িটা যত প্রকাণ্ড মনে হয়েছিল দিনের আলোয় মনে হচ্ছে তার চেয়েও প্রকাণ্ড। তবে প্রকাণ্ড হলেও ধ্বংসস্তূপ। বাড়িটা যেন অপেক্ষা করছে কখন হুমড়ি খেয়ে পড়বে। বাড়িটার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। ভয় ভয় করে। মনে হয় বাড়িটাও কৌতূহলী চোখে তাঁকে দেখছে। চিন্তা ভাবনা করছে। চিন্তা ভাবনা শেষ হলেই বাড়ি গম্ভীর গলায় ডাকবে, এই যে ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে, দয়া করে শুনে যান।

মিসির আলি বাড়ির পেছনে চলে গেলেন। তিনি বৃক্ষপ্রেমিক না। গাছপালা নিয়ে তাঁর বাড়াবাড়ি কৌতূহল নেই, কিন্তু নীল মরিচ ফুল গাছটা দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

বাড়ির পেছনের জায়গাটা আশ্চর্যরকমভাবে পরিষ্কার। ঝোপঝাড় নেই, বড় বড় ঘাস নেই, গাছের নিচে শুকনো পাতা পড়ে নেই। মনে হচ্ছে এই কিছুক্ষণ আগে ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। নীল মরিচ ফুল গাছটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। এমন কিছু বিস্ময়কর গাছ বলে মনে হচ্ছে না। তবে মরিচ ফুল গাছের পাশেই চেরী গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। পাতাশূন্য গাছ সাদা ফুলে ঢেকে আছে। মিসির আলি বিস্মিত গলায় বললেন, বাহ্ সুন্দর তো!

চেরী গাছের পাতা শীতকালে ঝরে যায়। এখন শীত না, তারপরেও গাছে একটা পাতা নেই কেন? জন্মভূমি ছেড়ে অন্যদেশে এসে গাছের জিনে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? নাকি এটা চেরী গাছ না, অন্য কোনো গাছ। তিনি নাম জানেন না।

ভাঙা মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের অংশটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা। বড় বড় কয়েকটা আম গাছ জায়গাটা অন্ধকার করে রেখেছে। উইয়ের ঢিবির মতো কিছু উঁচু মাটি দেখা গেল। মন্দিরের ঠিক সামনে সারি করে লাগানো জবা গাছ। জবা গাছ এত বড় হতে

মিসির আলি দেখেন নি। গাছগুলি আম কাঁঠালের গাছের মতোই প্রকাণ্ড। একটা গাছেই শুধু ফুল ফুটেছে। কালচে লাল রঙের ফুল। দেখতে ভালো লাগে না। জবা ফুল ছাড়া কালী পূজা হয় না। পূজার ফুলের জন্যই কি এই গাছগুলি লাগানো? এত প্রাচীন গাছ? মিসির আলি মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মন্দিরের গায়ে শ্বেত পাথরের ফলকে কী সব লেখা। পড়তে ইচ্ছা করছে।

বাবু অশ্বিনী কুমার রায়
কর্তৃক
অদ্য শনিবার বঙ্গাব্দ ১২০৮ গৌর কালীমূর্তি অধিষ্ঠিত হইল।

মিসির আলি নামফলকের দিকে তাকিয়ে আছেন। গৌর কালীমূর্তি ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। কালী কৃষ্ণবর্ণ, গৌরবর্ণ না।

চাচাজী আপনার কফি। আপনাকে বলা হয়েছে মন্দিরের কাছে না আসতে আর আপনি সোজাসুজি মন্দিরে চলে এসেছেন। আপনি দেখি একেবারে বাচ্চাদের মতো। যেটা করতে না করা সেটাই করেন।

মিসির আলি কফির মগ হাতে নিতে নিতে বললেন, গৌর কালী ব্যাপারটা কী?

গৌর কালী হল যে কালীর গায়ের রঙ গৌর। ধবধবে সাদা। বাবু অশ্বিনী রায় স্বপ্নে দেখেছিলেন মা কালী তাঁকে বলছেন—তুই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। তবে গায়ের রঙ কালো করিস না বাবা। গৌর বর্ণ করবি। অশ্বিনী কুমার রায় বললেন, ঠিক আছে মা করব। দেবী তখন বললেন, আমি তোর এখানে থাকব নগ্ন অবস্থায়। আমার গায়ে যেন কোনো কাপড় না থাকে। অশ্বিনী কুমার রায় বললেন, সেটা কি ঠিক হবে মা? কত ভক্তরা তোমাকে দেখতে আসবে! দেবী বললেন, কেউ আমাকে দেখতে আসবে না। তোকে যা করতে বললাম তুই কর।

মিসির আলি বললেন, অশ্বিনী কুমার নগ্ন গৌরবর্ণের কালী প্রতিষ্ঠা করলেন?

লিলি বলল, হ্যাঁ।

মন্দিরে কি মূর্তি আছে?

না। অশ্বিনী কুমার রায় নিজেই মূর্তিটা মেঘনায় ফেলে দিয়েছিলেন।

কেন?

গল্পটা আমি পুরোপুরি জানি না। ভাসা ভাসা জানি। দূরবীনওয়ালা, অর্থাৎ সুলতান সাহেব ভালোমতো জানে। ও আপনাকে গুছিয়ে বলবে।

আগে তোমার কাছ থেকে অগোছালোভাবে শুনি। অগোছালো গল্প শুনতেই আমার বেশি ভালো লাগে।

ঘটনাটা হল এ রকম—যেদিন দেবী প্রতিষ্ঠিত হল সেই রাতেই অশ্বিনী বাবুকে দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, এই বোকা ছেলে! নরবলি ছাড়া শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়? তুই এক কাজ কর, আগামী অমাবস্যায় নরবলি দে। অশ্বিনী বাবু বললেন, এইটা পারব না মা। আমি মহাপাতক হব। দেবী বললেন, পাপ-পুণ্যের তুই বুঝিস কী? তোকে যা করতে বললাম কর। নয়তো মহাবিপদে পড়বি। অশ্বিনী বাবু স্বপ্নের মধ্যেই কাঁদতে

কাঁদতে বললেন, এই কাজটা পারব না মা। নরবলি ছাড়া তুমি যা করতে বলবে তাই করব। দেবী তখন বললেন, তুই যখন পারবি না তখন আমার ব্যবস্থা আমিই করব। তখন তোর দুঃখের সীমা থাকবে না। অশ্বিনী বাবুর ঘুম ভেঙে গেল। দুশ্চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। খুবই কান্নাকাটি শুরু করলেন। আগামী অমাবস্যায় না জানি কী হয়!

কিছু হয়েছিল?

হ্যাঁ হয়েছিল। অশ্বিনী বাবুর বড় মেয়েকে মন্দিরের ভেতর পাওয়া গেল। বড় মেয়ের নাম শ্বেতা। বয়স আঠার উনিশ। বিয়ের কথা চলছিল। সকালে মন্দিরে ঢুকে অশ্বিনী বাবু দেখেন, মেয়ের মাথা একদিকে ধড় আরেক দিকে। দেবীর খাঁড়ায় চাপ চাপ রক্ত।

কী সর্বনাশ!

অশ্বিনী বাবুর মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল। তিনি সেই রাতেই দেবীমূর্তি মেঘনা নদীর মাঝখানে ফেলে দিয়ে এলেন।

উনার কি একটাই মেয়ে ছিল?

ওনার চার মেয়ে ছিল। দুমাসের মাথায় দ্বিতীয় মেয়েটিরও একই অবস্থা হল। মন্দিরের ভেতর তাকে পাওয়া গেল মাথা একদিকে ধড় আরেক দিকে। অশ্বিনী বাবু বাড়িঘর বিক্রি করে বাকি দুই মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে প্রথমে গেলেন ডিব্রুগরে, সেখান থেকে শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়িতে তাঁর তৃতীয় মেয়েটির একই অবস্থা হল। তখন তাঁর স্ত্রী সীতাদেবী মামলা করলেন স্বামীর বিরুদ্ধে। সীতাদেবী বললেন, হত্যার ঘটনাগুলি তাঁর স্বামী ঘটাচ্ছেন। দোষ দিচ্ছেন মা কালীর। ছোট মেয়েটাও বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল।

মামলার রায় কী হয়েছিল?

ওনার ফাঁসি হয়েছিল।

তুমি এতসব জানলে কী করে?

এই মামলা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। আমাদের দূরবীনওয়ালা সেইসব লেখা সবই যোগাড় করেছিল। আপনি চাইলে আপনাকে খুঁজে বের করে দেবে। আপনি কি চান?

না আমি চাই না।

লিলি বলল, আমাকে দেখে কি বুঝতে পারছেন যে আমার মনটা খুব খারাপ?

না বুঝতে পারছি না।

আমার মনটা খুবই খারাপ কারণ পুঁই পাতা পাওয়া যায় নি। বড় বড় পুঁই পাতা দিয়ে পেঁচিয়ে পাতুড়ি করতে হয়। কলাপাতা দিয়েও হয়। তবে ভালো হয় না।

মিসির আলি হেসে ফেলে বললেন, মন খারাপের কারণটা তো মনে হয় খুবই গুরুতর।

আপনার কাছে গুরুতর মনে না হতে পারে আমার কাছে গুরুতর। ও যেমন তারা দেখে, আমি করি রান্না। কোনো রাতে যদি আকাশ মেঘে ঢেকে যায় ওর প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ হয়। ঠিক সে রকম আমি যখন রান্নার জিনিসপত্র পাই না, আমার মেজাজ খারাপ হয়। এটা কি দোষের?

না দোষের না। এত সুন্দর বাগান তুমি এখানে বেড়াতে আস না?

লিলি বলল, কখনো না। নেংটা দেবীর আশপাশে আমি থাকব? পাগল হয়েছেন? তাছাড়া গাছপালা আমার ভালোও লাগে না। চাচাজী শুনুন আমি চলে যাচ্ছি। খবরদার আপনি কিন্তু মন্দিরের ভেতর ঢুকবেন না।

আচ্ছা ঢুকব না। তোমার স্বামীর ঘুম ভেঙেছে?

হুঁ ভেঙেছে।

তার নাশতা খাওয়া শেষ?

সে নাশতা খাবে না। দুপুরে ভাত খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম না এলে ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমাবে।

কেন?

রাত জাগবে। আজ সে আপনাকে নিয়ে তারা দেখবে।

আজ কি অমাবস্যা?

আগামীকাল অমাবস্যা।

মিসির আলি বললেন, কদিন ধরেই যেমন মেঘলা যাচ্ছে—অমাবস্যার রাতে যদি আকাশে মেঘ থাকে তাহলে তো সমস্যা।

লিলি নিচুগলায় বলল, আপনার আর কী সমস্যা। সমস্যা আমার। আকাশে মেঘ দেখলে ও প্রচণ্ড রেগে যায়। হই চই করে। অমাবস্যা হল বৃষ্টির সময়। অন্যদিন বৃষ্টি না হলেও অমাবস্যায় বৃষ্টি হবেই। চাঁদের আকর্ষণ বিকর্ষণের কিছু ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। আমি জানি না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

আমিও জানি না।

কফির মগটা দিন আমি নিয়ে চলে যাই। দুপুরের রান্না হলে খবর দেব চলে আসবেন। এখন নিজের মনে ঘুরে বেড়ান। শুধু দয়া করে মন্দিরে ঢুকবেন না।

মিসির আলি নীল মরিচ গাছের নিচে বসলেন। কালো সিমেন্টে বাঁধানো বেদি, বসার জন্যে সুন্দর। সঙ্গে বই নিয়ে এলে পড়া যেত। দোতলায় উঠে বই আনতে ইচ্ছা করছে না। আচ্ছা গতরাতের ঘটনাটা নিয়ে কি কিছু ভাববেন! না থাক এখনো সময় হয় নি। মন্দিরের ভেতরটা একবার উঁকি দিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। মেয়েটা যদিও নিষেধ করেছে। নিষেধ অগ্রাহ্য করার একটা প্রবণতা হয়তো মানুষের ডিএনএর ভেতরই আছে। মানুষকে যেটাই নিষেধ করা হয়েছে সেটাই সে করেছে। ব্যাপারটা শুরু করেছিলেন আদি মানব আদম। তাঁকে কোনো ব্যাপারে নিষেধ করা হয় নি, শুধু বলা হয়েছিল—গন্ধম ফলটা খেও না। আদম প্রথম যে কাজটা করলেন সেটা হল গন্ধম ফল খাওয়া।

এডমন্ড হিলারির মা'র ছিল উচ্চতা ভীতি। তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন, তুমি আর যা-ই কর বাড়ির ছাদে উঠবে না। সেই হিলারি এভারেস্টের চূড়ায় উঠে বসে থাকলেন।

মিসির আলি মন্দিরের দিকে রওনা হলেন। ভেতরে ঢোকার দরকার নেই—তিনি শুধু উঁকি দিয়ে চলে আসবেন। পরিত্যক্ত মন্দিরে সাপ থাকা স্বাভাবিক, তবে কাল রাতের ঘটনার পর দিনের সাপ তত ভয়ঙ্কর হবে বলে মনে হয় না।

মন্দিরে ঢোকার দরজাটা কাঠের। দরজায় হুক আছে। তালা লাগানোর ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু দরজায় তালা নেই। মিসির আলি ধাক্কা দিতেই দরজা খুলল। মেঝে শ্বেত পাথরের, ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছে এই মাত্র কেউ এসে সাবান পানি দিয়ে ধুইয়ে দিয়ে গেছে। তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা হল মন্দিরে মূর্তি আছে। গৌর কালীর নগ্ন মূর্তি।

এখানেই বিস্ময়কর সমাপ্তি না। এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার হল মূর্তিটি দেখতে অবিকল লিলির মতো। যেন কোনো ভাস্কর এসে লিলিকে দেখে পাথর কেটে কেটে মূর্তি বানিয়েছে। কাকতালীয়ভাবে একটা মানুষের চেহারার সঙ্গে পুরোনো মূর্তির চেহারা মিলে যাবে এটা বিশ্বাসযোগ্য না। এটা খুবই অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা।

মিসির আলি মন্দির থেকে বের হলেন। চেরী গাছটার নিচে বরকত দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে শলার ঝাড়ু, বাগান ঝাঁট দিয়ে এসেছে। তবে সে এই মুহূর্তে বাগান ঝাঁট দিচ্ছে না, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিসির আলির দিকে। সেই দৃষ্টিতে কৌতূহল, বিস্ময়, আনন্দ কোনো কিছুই নেই। সে তাকিয়ে আছে মাছের মতো ভাবলেশহীন চোখে।

মিসির আলি মন্দির থেকে বের হয়ে মন্দিরের পেছনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। বরকত চোখের দৃষ্টিতে এখনো তাঁকে অনুসরণ করছে। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে যাবার জন্যেই মন্দিরের পেছনে চলে যাওয়া দরকার।

মন্দিরের পেছনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। একটা কুয়া আছে। কুয়ার পাড় পাথর দিয়ে বাঁধানো। কুয়ার উপরে তারের জাফরি। সেখানে বাগান বিলাস গাছ। গাছ ভর্তি ফুল। অন্ধকার কুয়া, ফুলের কারণে আলো হয়ে আছে। নদীর কাছের বাড়িতে কখনো কুয়া থাকে না। এই কুয়াটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে একসময় নদী অনেক দূরে ছিল। মিসির আলি কুয়ার পাড়ে উঠলেন। পানি আছে কি না দেখতে হবে। পাথর নিয়ে ফেলতে হবে।

মিসির আলি কুয়াতে পাথর ফেলতে পারলেন না। তার আগেই তাঁকে চমকে উঠতে হল, কারণ ঝাঁটা হাতে বরকত এসে দাঁড়িয়েছে। মিসির আলি বললেন, কিছু বলবে?

বরকত জবাব দিল না। চোখও নামিয়ে নিল না।

মিসির আলি বললেন, বাগান ঝাঁট দিতে এসেছ?

বরকত বলল, না।

মিসির আলি বললেন, তোমার কুকুরগুলির সঙ্গে এখনো পরিচয় হয় নি। চল যাই কুকুরগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসি।

বরকত বলল, আপনেরে ডাকে।

কে ডাকে?

বরকত এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাড়ির দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাল। মিসির আলি বললেন, কে ডাকছে? লিলি?

বরকত জবাব দিল না। আঙুল উঁচিয়ে রাখল। মিসির আলি আঙুল লক্ষ করে এগুলেন। বরকত এখনো হাত নামাচ্ছে না। তীর চিহ্ন আঁকা সাইনবোর্ডের মতো হাত স্থির করে রেখেছে। তাকে দেখাচ্ছে কাকতাড়ুয়ার মতো।

হাতের আঙুল লক্ষ করে মিসির আলি উপস্থিত হলেন লাইব্রেরি ঘরে। বিরাট ঘর। সাধারণত লাইব্রেরি ঘরের চারদিকেই বই থাকে। এই ঘরের একদিকের দেওয়ালে বই রাখা। কোনো আলমিরা নেই। সব বই র‍্যাকে রাখা। র‍্যাকের উচ্চতা এমন যে হুইল চেয়ারে বসেই হাত বাড়িয়ে বই নেওয়া যায়।

লাইব্রেরি ঘরের ঠিক মাঝখানে হুইল চেয়ারে সুলতান বসে আছে। সুলতানের সামনে টি টেবিলের মতো ছোট্ট টেবিল। সুলতানের উল্টোদিকে আরেকটা হুইল চেয়ার।

সুলতান হাসি মুখে বলল, স্যার কেমন আছেন? মিসির আলি বললেন, ভালো।

আপনার বসার জন্যে একটা হুইল চেয়ার রেখে দিয়েছি।

তাই তো দেখছি।

সুলতান গলার স্বর গম্ভীর করে মাথা সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়ে বলল, সাধারণ চেয়ার না রেখে আপনার জন্যে হুইল চেয়ার কেন রেখেছি বলতে পারবেন?

না, বলতে পারব না।

আপনি কি বিস্মিত হচ্ছেন?

সামান্য হচ্ছি।

স্যার বিস্মিত হবার কিচ্ছু নেই। আমি ব্যাখ্যা করলেই বুঝবেন আপনার জন্যে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করাটা খুবই যুক্তিযুক্ত। আপনি চেয়ারটায় আরাম করে বসুন, আমি ব্যাখ্যা করছি।

মিসির আলি বসলেন। সুলতান বলল, চেয়ারের কনট্রোলগুলি দেখে নিন। পায়ের এখন আর আপনার কোনো ব্যবহার নেই। চেয়ার ঘোরানো, সামনে পেছনে যাওয়া, সবই এখন থেকে করবেন হাতে। কাজটা এক হাতেও করতে পারেন তবে দুটা হাত ব্যবহার করলে পরিশ্রম কম হবে।

মিসির আলি বললেন, আমার তো আর এই চেয়ারে বসে অভ্যস্ত হবার দরকার নেই। আমি বসলাম আমার মতো। আপনি হুইল চেয়ারের রহস্যটা ব্যাখ্যা করুন।

সুলতান বলল, স্যার লিলি আপনাকে চাচাজী ডাকে। সেই সূত্রে আপনি অবশ্যই আমাকে তুমি করে বলবেন।

আচ্ছা বলব।

এখন বলি কেন আপনার জন্যে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করলাম। আমি আকাশের বিশেষ বিশেষ দিকে টেলিস্কোপ ফিট করি। তারপর আসে ফোকাসের ব্যাপারটা। টেলিস্কোপ স্ট্যান্ডে বসিয়ে এই কাজটা আমাকে করতে হয় হুইল চেয়ারে বসে। একবার টেলিস্কোপ সেট করা হয়ে গেলে সেখানে আর হাত দেওয়া যাবে না। সেটিং বদলানো যাবে না। স্যার বুঝতে পারছেন?

পারছি।

হুইল চেয়ারে বসে আমি টেলিস্কোপ সেট করলাম। তারপর হুইল চেয়ার নিয়ে সরে গেলাম—আপনি আরেকটা হুইল চেয়ার নিয়ে টেলিস্কোপের কাছে চলে এলেন। আপনাকে কষ্ট করতে হল না। আপনাকে আর দাঁড়িয়ে, হাঁটু গেড়ে কিংবা কুঁজো হয়ে টেলিস্কোপে চোখ রাখতে হবে না। হুইল চেয়ারের লজিকটা কি এখন আপনার কাছে পরিষ্কার হয়েছে?

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ পরিষ্কার হয়েছে। খুবই যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাটা চট করে মাথায় আসে না বলে শুরুতে হুইল চেয়ার দেখে একটা ধাক্কার মতো খেয়েছিলাম।

সুলতান হাসতে হাসতে বলল, আজ যেমন মন্দিরে ঢুকে আপনি একটা ধাক্কার মতো খেলেন। মন্দিরে ঢুকে দেখলেন গৌর কালীর মূর্তি দেখতে অবিকল লিলির মতো। এরও কিন্তু অত্যন্ত সরল ব্যাখ্যা আছে।

কী ব্যাখ্যা?

গৌর কালীর মূর্তি বাবু অশ্বিনী কুমার অনেক আগেই নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন। এই মূর্তিই পরে আমি বানিয়েছি। হুইল চেয়ারে বসে জীবন কাটে না। নানান ধরনের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে গিয়ে মাইকেল এঞ্জেলো হবার হাস্যকর চেষ্টা। ছেনি হাতুড়ি নিয়ে পাথর কাটাকাটি।

মূর্তিটা সুন্দর হয়েছে।

মোটেও সুন্দর হয় নি। মুখের আদলটা শুধু এসেছে। আর কিছু আসে নি। নগ্ন মূর্তি বলে আপনি লজ্জায় ভালোমতো তাকান নি। ভালোমতো তাকালে ক্রটিগুলি ধরতে পারতেন। মূর্তির একটা হাত বড়, একটা ছোট। পায়ের প্রোপরশন ঠিক হয় নি। হাঁটু যেখানে থাকার কথা তারচেয়ে উঁচুতে হয়েছে। আপনি এখন যদি দেখেন তাহলে ক্রটিগুলি চোখে পড়বে। মূর্তিটা নগ্ন কেন বানিয়েছি সেই ব্যাখ্যা শুনতে চান? তারও ব্যাখ্যা আছে।

না। এর ব্যাখ্যা আমার কাছে আছে। গৌর কালীর মূর্তিটা ছিল নগ্ন। তুমি মন্দিরে গৌর কালী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছ। অতীত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা। ইংরেজিতে সহজভাবে বলা যায় An attempt to recreate the past.

ব্যাপারটা তাই বাবু অশ্বিনী রায়ের ঘটনাটা আমাকে খুবই আলোড়িত করে। আমার মূর্তি বানানোতেও তার একটা ছায়া পড়েছে।

মিসির আলি বললেন, তোমার কি মাঝে মাঝে নিজেকে বাবু অশ্বিনী কুমার মনে হয়?

সুলতানকে দেখে মনে হল মিসির আলির এই কথায় সে একটা ধাক্কার মতো খেয়েছে। নিজেকে সামলাতে তার সময় লাগছে। তার ভুরু কুঁচকে আছে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, এই কথাটা কেন বললেন স্যার?

এমনি বললাম, মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা থেকে এটা মনে হল। কোনো মানুষকে খুব বেশি পছন্দ হয়ে গেলে জীবনযাত্রায় সেই মানুষটার ছায়া পড়ে।

সুলতান কঠিন গলায় বলল, অশ্বিনী কুমার একজন সিরিয়াল কিলার। সে ঠাণ্ডা মাথায় একের পর এক মানুষ খুন করেছে। খুনগুলি করেছে অতি প্রিয়জনদের। নিজের কন্যা। তাকে আমার পছন্দ হবে কেন?

মানুষের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা অত্যন্ত বিচিত্র। মানুষ সুন্দর যেমন পছন্দ করে, অসুন্দরও করে।

সবাই করে না। কেউ কেউ হয়তো করে।

সুন্দরের পূজাও সবাই করে না। কেউ কেউ করে।

সুলতান অসহিষ্ণু গলায় বলল, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন পরিষ্কার করে বলুন।

মিসির আলি শান্ত গলায় বললেন, আমার ধারণা অশ্বিনী বাবুর ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢুকে গেছে। তুমি তার মতো করে জীবন যাপন করতে চাচ্ছ। তুমি আকাশের তারা দেখ কারণ অশ্বিনী বাবু দেখতেন।

সুলতান কঠিন গলায় বলল, আপনাকে কে বলল অশ্বিনী বাবু তারা দেখতেন?

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, আমাকে কেউ বলে নি। আমি অনুমান করছি। এই অনুমানের পেছনে ভিত্তি আছে। তোমার সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে আমি লাইব্রেরিতে সাজানো বইগুলির উপর চোখ বুলিয়েছি। চামড়ায় বাঁধানো, সোনার জলে নাম লেখা বেশ কিছু পুরোনো বই দেখলাম। আকাশের তারা নিয়ে লেখা দুটা বই চোখে পড়েছে। একটার নাম তারা পরিচিতি, আরেকটার নাম—আকাশ পর্যবেক্ষণ। একটা ইংরেজি বই আছে Western Hemisphere Stars. এখন তুমি বল এই বইগুলি কি অশ্বিনী বাবুর?

হ্যাঁ।

উনি কি আকাশ দেখতেন?

হ্যাঁ দেখতেন। তাঁর একটা দূরবীন ছিল। ম্যাক এলেস্টার কোম্পানির চোঙ দূরবীন।

উনি তারা দেখতেন বলেই কি তুমি এখন তারা দেখছ?

সুলতান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু গলায় বলল, না ব্যাপারটা সে রকম না। আকাশের বিষয়ে আমার কৌতূহল ছোটবেলা থেকেই ছিল। তবে অশ্বিনী বাবুর লেখা ডায়েরি পড়ে আমি টেলিস্কোপ কিনতে আগ্রহী হই এটা ঠিক। তিনি আকাশ দেখতেন এবং কী দেখলেন তা খুব গুছিয়ে লিখে রাখতেন। পড়তে ভালো লাগে। তার মানে এই না যে আমি তাঁর জীবনযাত্রা অনুসরণ করছি। আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না—মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এখন আমি মানুষ বলি দেয়া শুরু করব?

মিসির আলি বললেন, অশ্বিনী বাবুর লেখা ডায়েরিটা কি আমি পড়তে পারি?

অবশ্যই পড়তে পারেন। আপনি কিন্তু স্যার আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি।

প্রশ্নটা যেন কী?

প্রশ্নটা হল—আপনার কি ধারণা আমিও মানুষ বলি দিচ্ছি? গ্রাম থেকে মানুষ ধরে এনে গোপনে বলি দিয়ে মন্দিরের পেছনের কুয়ায় ফেলে দিচ্ছি? আমাকে কি অসুস্থ মানুষ বলে মনে হচ্ছে?

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ছোটখাটো অসুখগুলি চট করে ধরা যায়। কিন্তু ভয়ঙ্কর অসুখগুলি মানুষের মস্তিষ্কের গভীরে বাস করে। এদের চট করে ধরা যায় না। যেমন অশ্বিনী বাবুর কথাই ধরা যাক—তাঁর ভয়ঙ্কর অসুখ ধরতে অনেক সময় লেগেছিল। অশ্বিনী বাবুর সবচেয়ে কাছের মানুষ তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত ধরতে পারেন নি। তিনটি মেয়ের মৃত্যুর পর ধরতে পারলেন।

সুলতান হতভম্ব গলায় বলল, স্যার আপনি তো দেখি সত্যি সত্যি আমাকে অশ্বিনী বাবুর দলে ফেলে দিয়েছেন। ঠিক করে বলুন তো আপনি আমার সম্পর্কে কী ভাবছেন?

এখন পর্যন্ত আমি কিছুই ভাবছি না। তবে আমার অবচেতন মন নিশ্চয়ই ভাবছে। অবচেতন মনের কর্মকাণ্ড খুব অদ্ভুত। অবচেতন মনকে মাঝে মাঝে আমার কাছে আত্মভোলা শিশুর মতো মনে হয়। যে শিশু নিজের মনে খেলছে। জিগ স পাজলের খেলা। একটা টুকরার সঙ্গে আরেকটা টুকরা জোড়া দিয়ে ছবি বানাচ্ছে। ছবি ভেঙে ফেলছে। আবার বানাচ্ছে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত কোনো ছবি তৈরি হয়ে গেলে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে আবার সেই ছবিও নষ্ট করে ফেলছে।

সুলতান শান্ত গলায় বলল, স্যার শুনুন, আমার কোনো ছবি দাঁড় করাতে হলে সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। আমি জবাব দেব। অনুমানের উপর কিছু দাঁড় করানোর প্রয়োজন নেই।

মিসির আলি বললেন, অবচেতন মন কাউকে জিজ্ঞেস করে কাজ করে না। জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়টি চেতন মনের, অবচেতন মনের না। তবে চেতন মন থেকে সে যে তথ্য নেয় না, তা না। তথ্য নেয়। যেটা তার পছন্দ তাই নেয়, সব তথ্য নেয় না।

সুলতান ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, স্যার আমার নিজের ধারণা এই বাড়িটা আপনার উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বিরাট বাড়ি। গেট সব সময় তালাবন্ধ। তিনটা কুকুর বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। আপনার ধারণা হয়েছে আপনি বন্দি হয়ে গেছেন। যেই মুহূর্তে মানুষ নিজেকে বন্দি ভাবে সেই মুহূর্ত থেকে তার চিন্তার ধারা বদলে যায়। আমি যখন মুক্ত মানুষ ছিলাম তখন একভাবে চিন্তা করতাম। যেই মুহূর্তে হুইল চেয়ারে বন্দি হয়েছি সেই মুহূর্ত থেকে অন্যভাবে চিন্তা করা শুরু করেছি। আপনার বেলাতেও তাই হচ্ছে। আপনি আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করতেই পারছেন না। আপনি ধরেই নিয়েছেন আমি হচ্ছি হুইল চেয়ারে বসা অশ্বিনী বাবু।

মিসির আলি কিছু বললেন না। সুলতান বলল, আপনি খেতে যান। আপনার খাবার দেয়া হয়েছে।

তুমি খাবে না?

না। আমার মেজাজ খুবই খারাপ। আপনার কারণে মেজাজ খারাপ না। আকাশ মেঘে ঢাকা, তারা দেখা যাবে না। এই জন্যে মেজাজ খারাপ। মেজাজ খারাপ নিয়ে আমি খেতে পারি না। আপনি খেতে যান, আমি অশ্বিনী বাবুর ডায়েরিটা খুঁজে বের করি। তাঁর অনেক খাতাপত্রের সঙ্গে ডায়েরিটা আছে। খুঁজে বের করতে সময় লাগবে।

পুঁই পাতা পাওয়া যায় নি কথাটা সত্যি না। পাতা পাওয়া গেছে। সেই পাতায় কৈ মাছের পাতুড়ি রান্না হয়েছে। লিলি মিসির আলির পাতে মাছ তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল—দেখলেন কেমন বোকা বানালাম!

আয়োজন প্রচুর। মাছই আছে তিন রকমের। চিংড়ি মাছ, মলা মাছ আর কৈ মাছ। নানান ধরনের ভর্তা, ভাজি। কুচকুচে কালো রঙের একটা ভর্তা দেখা গেল। আরেকটার বর্ণ গাঢ় লাল। পাশাপাশি দুটা বাটিতে লাল এবং কালো ভর্তা রাখা হয়েছে যার থেকে ধারণা করা যায় যে শুধু রান্না না, খাবার সাজানোর একটা ব্যাপারও মেয়েটার মধ্যে

আছে। লিলি বলল, চাচাজী এই দেখুন কালো রঙের এই বস্তু হল কালিজিরা ভর্তা। কৈ মাছের পাতুড়ি আপনার পাতে তুলে দিয়েছি বলেই এটা দিয়ে খাওয়া শুরু করবেন না। কালিজিরা দিয়ে কয়েক নলা ভাত খেলে মুখে রুচি চলে আসবে। তখন যাই খাবেন, তাই ভালো লাগবে।

মিসির আলি বললেন, আমার রুচির কোনো সমস্যা নেই। তারপরেও তুমি যেভাবে খেতে বলবে আমি সেইভাবেই খাব। লাল রঙের বস্তুটা কী?

মরিচ ভর্তা। শুকনো মরিচের ভর্তা।

আমি ঝাল খেতে পারি না।

এই মরিচ ভর্তার বিশেষত্ব হচ্ছে ঝাল নেই বললেই হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুকনো মরিচ থেকে ঝাল দূর করা হয়েছে। বিশেষ প্রক্রিয়াটা শুনতে চান?

শুনে আমার কোনো লাভ নেই, তবু বল।

শুকনো মরিচ লেবু পানিতে ডুবিয়ে রাখলে মরিচের ঝাল চলে যায়। ভিনিগারে ডুবিয়ে রাখলেও হয়। আমি ঝাল দূর করেছি লেবু পানিতে ডুবিয়ে।

বিচিত্র ধরনের রান্নাবান্না তুমি কি কারো কাছ থেকে শিখেছ? না নিজে মাথা খাটিয়ে বের করেছ?

বেশির ভাগ রান্নাই আমি আমার নানির কাছ থেকে শিখেছি। নানি আমাকে রান্না শিখিয়েছেন, তার চেয়েও বড় কথা রান্নার মন্ত্র শিখিয়েছেন। আমি প্রায় কুড়িটার মতো রান্নার মন্ত্র জানি।

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, রান্নার কি মন্ত্র আছে নাকি?

লিলি সহজ ভঙ্গিতে বলল, হ্যাঁ মন্ত্র আছে। এই মন্ত্র কাউকে শেখানো নিষেধ। মন্ত্র শেখালে তার পাওয়ার চলে যায়। কিন্তু আপনি চাইলে আপনাকে শেখাব।

আমি রান্না শিখতে চাচ্ছি না। কিন্তু মন্ত্রটা শিখব।

মন্ত্রটা সত্যি শিখতে চান?

শিখতে চাই না, শুধু শুনতে চাই। যেকোনো একটা মন্ত্র বললেই হবে।

লিলি বলল, একেক রান্নার একেক মন্ত্র। ছোট মাছ রান্নার মন্ত্রটা বলি। ছোট মাছের সঙ্গে তেল মশলা মাখাতে হয়। চুলায় হাঁড়ি দিয়ে আগুন দিতে হয়। হাঁড়ি পুরোপুরি গরম হবার পর তেল-মশলা মাখা মাছটা হাঁড়িতে দিয়ে মন্ত্রটা পড়তে হয় দশবার। তারপর পানি দিতে হয়। পানি এমনভাবে দিতে হয় যেন মাছের উপর দু আঙুল পানি থাকে। এই মন্ত্রের দাম দশ-দুই মন্ত্র। পানি ফুটতে শুরু করলেই রান্না শেষ। আরেকবার মন্ত্রটা পড়ে ফুঁ দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে হাঁড়ি নামিয়ে ফেলতে হবে। তরকারি বাটিতে ঢালার আগে আর ঢাকনা নামানো যাবে না।

এখন মন্ত্রটা বল।

লিলি বলল, মন্ত্রটা অনেক লম্বা। শুরুটা এরকম—

উত্তরে হিমালয় পর্বত
দক্ষিণে সাগর
নদীতে সপ্ত ডিঙ্গায়
চাঁদ সদাগর।

আমি চুলার ধারে
        ধোঁয়া বেশুমার
অগ্নিবিনা রন্ধন হবে
        প্রতিজ্ঞা আমার।
অগ্নি আমার ভাই
        জল আমার বোন
আমি কন্যা চম্পাবতী
        শোন মন্ত্র শোন।
আশ্বিনে আশ্বিনা বৃষ্টি
        কার্তিকে হিম
শরীরে দিয়াছি বন্ধন
        আলিফ লাম মিম।

.....

মিসির আলি মন্ত্র শুনে হাসলেন। লিলি বলল, চাচাজী হাসবেন না। এই মন্ত্র পড়ে একবার ছোট মাছ রান্না করে দেখুন। দশবার মন্ত্র পড়ার পর দু আঙুল পানি। আর কিছু লাগবে না।

মিসির আলি বললেন, লিলি আমার ধারণা মন্ত্রটা হল—টাইমিং। সেই সময় তো গ্রামেগঞ্জে ঘড়ি ছিল না। রান্নার মতো তুচ্ছ বিষয়ে ঘড়ির ব্যবহারের প্রশ্নই আসে না। আমার ধারণা তখন মন্ত্র পড়ে সময়ের হিসাব রাখা হত। তুমি যে মন্ত্রটা বললে এই মন্ত্র দশবার বলতে যত সময় লাগে ততটা সময় তেল-মশলা মাখানো মাছ গরম চুলায় রাখলেই হবে। তুমি এক কাজ কর। ঘড়ি দেখে দশবার মন্ত্র পড়তে কত সময় লাগে সেটা বের কর। তারপর মন্ত্র ছাড়া সময় দেখে রান্না কর। দেখবে রান্না ঠিকই হয়েছে।

লিলি বলল, আপনার আসলেই অনেক বুদ্ধি। মন্ত্র যে কিছুই না, সময়ের হিসাব এটা আমিও টের পেয়েছি। কিন্তু আমার অনেক সময় লেগেছে। আপনি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছেন। আপনি কি যেকোনো সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলেন? এই ক্ষমতা কি সত্যি আপনার আছে?

মিসির আলি কিছু বললেন না। তিনি লক্ষ করলেন লিলি তীক্ষ্ণ চোখে তাঁকে দেখছে। সে কি কিছু বলার চেষ্টা করছে? প্রশ্নের ভেতরেও লুকানো প্রশ্ন থাকে। মেয়েটির এই প্রশ্নের ভেতর লুকানো কোনো প্রশ্ন কি আছে?

লিলি বলল, মিষ্টি জাতীয় কিছু রান্না করি নি। আপনি কি মধু খাবেন? মধু এনে দেব? ঐ দিন খলসা ফুলের মধু খেয়েছেন, আজ কেওড়া ফুলের মধু খান।

না।

লিলি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি কি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান? জিজ্ঞেস করতে চাইলে করতে পারেন।

মিসির আলি বললেন, সুলতান চিঠিতে একটা মেয়ের কথা বলেছিল ঐ

মেয়েটি সত্যি আছে? সালমা নাম, পনের ষোল বছর বয়স। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন মেয়ে।

লিলি সহজ গলায় বলল, থাকবে না কেন আছে। দূরবীনওয়ালাকে বললেই সে আপনাকে দেখাবে।

মিসির আলি বললেন, মেয়েটা থাকে কোথায়?

লিলি বলল, মেয়েটা কোথায় থাকে তা দিয়ে কী করবেন? মেয়েটার সত্যি কোনো ক্ষমতা আছে কিনা এটা জানা জরুরি তাই না?

মেয়েটার সত্যি কি ক্ষমতা আছে?

মেয়েটার শুধু যে ক্ষমতা আছে তা না, ভয়াবহ ক্ষমতা আছে।

তুমি নিজে দেখেছ?

হ্যাঁ। আপনি তাকে দেখে খুবই অবাক হবেন। প্রথমে আপনার বিশ্বাস হবে না। ভাববেন ঠাট্টা করা হচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, তুমিই কি সেই মেয়ে?

লিলি হ্যাঁ–সূচক মাথা নেড়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, চাচাজী শুনুন মধু আপনাকে খেতেই হবে। ইচ্ছা না করলেও খেতে হবে। দূরবীনওয়ালা যদি শোনে আপনাকে মধু দেওয়া হয় নি তাহলে খুব রাগ করবে। আমাকে বলা হয়েছে আজ যেন কেওড়া ফুলের মধু দেওয়া হয়।

মধু না খেলে সুলতান রাগ করবে?

রাগের চেয়েও যেটা করবে তা হল মেজাজ খারাপ।

মিসির আলি বললেন, নিয়ে এস তোমার মধু।

লিলি বলল, সুন্দরবনের বানররা মধু কীভাবে খায় এই গল্প কি আপনি জানেন?

না জানি না।

আপনি আঙুলে মধু মাখিয়ে খেতে শুরু করুন। আমি গল্পটা করি। ছোট বাচ্চাদের যেমন গল্প বলে বলে খাবার খাওয়াতে হয় আপনাকেও সে রকম গল্প বলে বলে মধু খাওয়াব।

ঠিক আছে, শুরু কর তোমার গল্প।

কোনো বানরের যখন মধু খেতে ইচ্ছা করে সে তখন নদীর পাড়ে চলে যায়। সারা গায়ে কাদা মাখে। তারপর রোদে বসে এই কাদা শুকায়। আবার যায় কাদায়। আবারো কাদায় হুটোপুটি করে গায়ে কাদা মাখে। আবারো রোদে শুকায়। এই প্রক্রিয়াটি কয়েকবার করার পর বানরের গায়ে শক্ত কাদার একটা স্তর পড়ে যায়। তখন সে মহানন্দে চাক ভেঙে মধু খায়। মৌমাছিরা কাদার স্তরের জন্যে তার গায়ে হুল ফুটাতে পারে না। বুলেট প্রুফ জ্যাকেটের মতো মৌমাছি প্রুফ কর্দম জামা। চাচাজী ঘটনাটা কি আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে?

হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং তো বটেই।

সুন্দরবনের মধু নিয়ে আমি এর চেয়েও এক শ গুণ ইন্টারেস্টিং একটা গল্প জানি। সেটা আজ বলব না। অন্য একদিন বলব।

৬

সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টি যে মুষলধারে পড়ছে তা না, তবে বাতাস প্রবল বেগে বইছে। বাড়ির চারদিকে প্রচুর গাছপালা বলে ঝড়ের মতো শব্দ হচ্ছে। এমন ঝড়বৃষ্টির রাতে আকাশ দেখার প্রশ্নই আসে না। মিসির আলি দোতলায় তাঁর ঘরে আধশোয়া হয়ে আছেন। কিছুক্ষণ আগেই রাতের খাবারের পর্ব শেষ করে এসেছেন। বিছানা থেকে আর নামতে হবে না; এটা ভেবেই শান্তি শান্তি লাগছে। ঝড়বৃষ্টি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবহাওয়া শীতল হয়েছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। যতই সময় যাচ্ছে ততই ঠাণ্ডা বাড়ছে। মিসির আলি তাঁর গায়ে পাতলা চাদর দিয়েছেন। কোলবালিশ আড়াআড়ি রেখে তার উপর পা তুলে দিয়েছেন। মোটামুটি আরামদায়ক অবস্থান। তাঁর মাথার কাছে টেবিলের উপর একটা হারিকেন এবং কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প। তাতেও ঘরে তেমন আলো হচ্ছে না। মিসির আলির হাতে অশ্বিনী কুমার বাবুর হাতে লেখা ডায়েরি। লেখা খুব স্পষ্ট নয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্যাঁচানো। এই আলোয় পড়তে কষ্ট হচ্ছে তারপরেও স্বস্তির কারণ আছে—হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে ঘর অন্ধকার হবে না। ঢাকা শহরে ঝড়বৃষ্টি মানেই টেনশন—এই বুঝি ইলেকট্রিসিটি চলে গেল!

বরকত এসে টেবিলে চায়ের ফ্লাস্ক এবং কাপ রেখে গেছে। দরজার ছিটকিনি ঠিক করে দিয়ে গেছে। মিসির আলি বরকতের সঙ্গে টুকটাক আলাপ চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। লাভ হয় নি। মিসির আলির ধারণা কোনো এক বিচিত্র কারণে বরকত তাকে পছন্দ করছে না।

ভালো দুর্যোগ শুরু হয়েছে। মিসির আলি গাছের ডাল ভাঙার শব্দ শুনলেন। ঝড়বৃষ্টির সময় গাছের পাখিরা কোনো ডাকাডাকি করে না। তারা একেবারেই চুপ হয়ে যায়। অথচ তাদেরই সবচেয়ে বেশি ডাকাডাকি করার কথা। কুকুররা মনে হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ পছন্দ করে না। মাঝে মাঝেই তাদের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যাচ্ছে। তারা কেউ আলাদা আলাদা ডাকছে না, যখন ডাকছে তিনজন এক সঙ্গেই ডাকছে।

মিসির আলি খুব মন দিয়েই ডায়েরি পড়ার চেষ্টা করছেন। শুধু কুকুররা যখন ডেকে উঠছে তখন মনোসংযোগ কেটে যাচ্ছে। কেন জানি কুকুরের ডাকটা শুনতে ভালো লাগছে না।

অশ্বিনী কুমারের ডায়েরিটি ঠিক ডায়েরির আকারে লেখা না। অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস লেখা আছে। কিছু কিছু লেখাতে দিনক্ষণ স্থানকাল উল্লেখ করা। বেশির ভাগ লেখাতেই তারিখ নেই। বাজারের হিসাব আছে। চিঠির খসড়া আছে। আয়ুর্বেদ অষুধের বর্ণনা আছে। ডায়েরির শুরুই হয়েছে আয়ুর্বেদ অষুধের বর্ণনায়।

গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল এবং গৌর করিবার অব্যর্থ উপায়

> পুন্নাগের কচি ফল দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। উক্ত ক্বাথ জ্বাল দিয়া ভাসমান তৈল পাওয়া যাইবে। উক্ত তৈল সর্বাঙ্গে মাখিতে হয়। পুন্নাগের আরেক নাম রাজচম্পক।
>
> রামায়ণ মহাকাব্যে পুন্নাগের সুন্দর বর্ণনা আছে। রাবণ সীতাকে

হরণ করিবার পরের অংশে আছে, রাম ভ্রাতা লক্ষণকে নিয়া বিষণ্ন মনে হাঁটিতেছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়িল পুন্নাগ পুষ্পের মেলা—

তিল্লকাশোক পুন্নাগ বকুলোদ্দাল কামিনীম্
রম্যোপবন সম্বাধীং পদ্মসম্পীড়িতো কাম॥

নোট : আমি পুন্নাগ তৈল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ক্বাথ জ্বাল দিলে তৈল প্রস্তুত হয় না। নিশ্চয়ই অন্য কোনো প্রক্রিয়া আছে।

বৈদ্যদের নথিতে গাত্রবর্ণ ঔজ্জ্বল্যের নিমিত্ত রক্তচন্দন, অনন্তমূল এবং মঞ্জিষ্ঠার উল্লেখ আছে। তবে পুন্নাগের সমকক্ষ কেহ নাই ইহা বারংবার বলা হইয়াছে।

পুন্নাগ প্রসঙ্গে আরো কোনো কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাইলে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

এই পর্যন্ত লেখার পর দুটি পাতা খালি। কিছুই লেখা নেই। তৃতীয় পাতায় দিনক্ষণ দিয়ে তারা দর্শনের বর্ণনা।

অদ্য ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরেজি ২০শে মে মধ্যরজনী।

বিভূতিবাবুর হিসাব অনুযায়ী অদ্য রজনী দশ ঘটিকায় সারমেয় যুগল মধ্যগগনে অবস্থান করিবে। সারমেয় যুগল দর্শনের সমস্ত ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিয়াছি। কন্যাদের মাতাকে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিবার জন্যে বলিয়াছিলাম। তিনি শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া অপারগতা প্রদর্শন করিলেন। কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়াছি। জগতের কোনো মনোমুগ্ধকর দৃশ্য একা উপভোগ করা যায় না।

আকাশ পরিষ্কার আছে। সন্ধ্যাকালে মেঘ ছিল—এখন মেঘ দূরীভূত হইয়াছে। ঈশ্বরের অসীম কৃপা।

বিভূতিবাবুর পত্রানুযায়ী সারমেয় যুগলের একটির গলায় এই মণ্ডলের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারকাটি অবস্থিত। এই তারকাটির প্রভা তৃতীয় মাত্রার। তারকাটির নাম চার্লসের হৃদয়। সম্রাট প্রথম চার্লসের স্মৃতির উদ্দেশে এই নামকরণ।

সারমেয় যুগলের উল্লেখ বেদে আছে। ইহাদের বলা হইয়াছে যমের দুয়ারের প্রহরী। এই মণ্ডলের দুইটি উজ্জ্বল তারকার একটির ভারতীয় নাম জ্যেষ্ঠ কালকঞ্জ আরেকটির নাম কনিষ্ঠ কালকঞ্জ। জ্যেষ্ঠ কালকঞ্জ একটি বিষম তারা এবং অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত। যে চারটি তারা দিয়া কন্যার হীরক নামক বিখ্যাত চিত্রটি গঠিত জ্যেষ্ঠ কলকঞ্জ তার একটি।

আজ সারমেয় যুগল দেখিবার সৌভাগ্য যেন হয় তার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছি।

মিসির আলি দ্রুত পাতা উল্টালেন। ডায়েরিতে বিচিত্র সব বিষয়ে লেখা আছে। জ্যামিতিক চিহ্ন আছে। তার ব্যাখ্যা আছে। জায়গায় জায়গায় টীকা-টিপ্পনি আছে।

যেমন জ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে—

জ্ঞান

জ্ঞান দুই প্রকার। পবিত্র জ্ঞান এবং অপবিত্র জ্ঞান। অপবিত্র জ্ঞান ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত। আদি মানব আদমের পতন হইয়াছিল ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত জ্ঞান আহরণের জন্যে। অনুমোদিত জ্ঞান অতীব রহস্যময় জ্ঞান। যদিও পরিত্যাগ লাভের জন্যে এই জ্ঞানের প্রয়োজন নাই।

পুন্নাগ ফুলের কথা কয়েক পাতা পরেই আবার পাওয়া গেল।

পুন্নাগ

সৌরভ্যং ভুবন এয়েহপি বিদিতং পুষ্পেষু লোকোত্তরং
কীর্ত্তিঃ কিঞ্চ দিগঙ্গনাঙ্গনগতা কিন্ত্বতদেকংশৃনু।
সর্বান্যেব গুণানি যন্নিগিরতি পুন্নাগে তে সুন্দরান্
উজ্ঝণ্ডি খলু কোটরেষু গরল জ্বালান্দ্বিজিহ্বালী।

অর্থ : হে পুন্নাগ, তোমার সুগন্ধ ত্রিভুবন খ্যাত। তোমার যশ ও খ্যাতি দিগাঙ্গনারা নিজ অঙ্গনে ছড়াইয়া রাখে। তবু তোমার একটি অখ্যাতি। তোমার শরীরের কোটরে বাস করে বিষধর সর্প।

নোট : পুন্নাগ বৃক্ষের কোটরে বিষধর সর্প বাস করে এই তথ্য জানা ছিল না। হায় এই বিপুল বসুধার কত অল্পই না আমি জানি!

দরজায় খট খট শব্দ হচ্ছে। বই নামিয়ে মিসির আলি বললেন, কে?

চাচাজী আমি লিলি। আপনার কিছু লাগবে?

না আমার কিছু লাগবে না।

আপনার ঘরের ছিটকিনি বরকতকে ঠিক করতে বলেছিলাম। বরকত কি ঠিক করেছে?

হ্যাঁ ঠিক করেছে।

ছিটকিনি লাগিয়েছেন?

না।

ছিটকিনি লাগিয়ে ঘুমুবেন। ভুলবেন না যেন। কুকুরগুলি মাঝে মাঝে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠে এই জন্যে বলছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যদি দেখেন আপনার মাথার কাছে এলশেশিয়ান তাহলে ভয়েই হার্টফেল করবেন।

অবশ্যই ছিটকিনি লাগিয়ে ঘুমাব। তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন? ভেতরে এস।

আপনি আসতে বলছেন না, এই জন্যে আসতে পারছি না। আমি আপনার জন্যে পান নিয়ে এসেছি।

এস ভেতরে এস।

লিলি পানের বাটা হাতে ঘরে ঢুকল। হাসিমুখে বলল, আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে দূরবীনওয়ালা। আমার দায়িত্ব হল আপনাকে জাগিয়ে রাখা।

কেন বল তো?

দূরবীনওয়ালার ধারণা হয়েছে কিছুক্ষণ বৃষ্টি হবার পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন তারা দেখা যাবে। বৃষ্টির পর আকাশ নাকি ঝকঝকে হয়ে যায়। তখনই তারা দেখার আসল মজা।

ও আচ্ছা।

আপনি একবার ঘুমিয়ে পড়লে তো আর আপনাকে জাগানো ঠিক হবে না। তাই আপনাকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা। এখন বলুন কী করলে আপনি জেগে থাকবেন?

জেগে থাকা আমার জন্যে কোনো সমস্যা না। আমি অনেক রাত জাগি। তুমি আমাকে জেগে থাকতে বলেছ আমি জেগে থাকব।

অশ্বিনী বাবুর ডায়েরি পড়ছেন?

হুঁ।

মরা মানুষের ডায়েরি পড়ে লাভ কী বলুন তো? মানুষটা তো মরেই গেছে। এরচেয়ে জীবিত মানুষের ডায়েরি পড়া ভালো। আপনি এত আগ্রহ করে পুরোনো ডায়েরি পড়েন জানলে আমি ডায়েরি লেখার অভ্যাস করতাম। চাচাজী নিন পান খান।

মিসির আলি পান হাতে নিলেন। লিলি চেয়ার টেনে খাটের পাশে বসেছে। তাকে ক্লান্ত লাগছে। পরপর দুবার হাই তুলল। মিসির আলি বললেন, তোমার ঘুম পাচ্ছে তুমি ঘুমিয়ে পড়। সুলতানকে বলে রেখো বৃষ্টি কমলে যেন আমাকে খবর দেয় আমি জেগে থাকব।

আমার সঙ্গে গল্প করতে আপনার ভালো লাগছে না তাই না? আপনার মন পড়ে আছে অশ্বিনী বাবুর লেখাতে। ঠিক বলছি না চাচাজী?

মিসির আলি বললেন, ডায়েরিটা পড়ে শেষ করতে ইচ্ছা হচ্ছে এটা ঠিক। তার মানে এই না যে তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। তুমি খুব গুছিয়ে কথা বল।

লিলি বলল, অশ্বিনী বাবুর ডায়েরি পড়ে কী তথ্য বের করলেন বলুন শুনি।

মাত্র তো পড়া শুরু করেছি।

যা পড়েছেন সেখান থেকে এখনো ইন্টারেস্টিং কিছু বের করতে পারেন নি?

পুন্নাগ ফুলের কথা লেখা আছে। খুব আগ্রহ করে লেখা। এই ফুল বেটে গায়ে মাখলে গায়ের রঙ উজ্জ্বল হয় বলে তিনি লিখেছেন। এর থেকে ধারণা করা যায় যে গায়ের রঙ নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। আমার ধারণা তাঁর মেয়েগুলির গায়ের রঙ ছিল কালো। তিনি মন্দিরে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন যে কালী হল গৌর কালী অর্থাৎ সেই কালীর গায়ের রঙও সাদা। তার মানে গায়ের রঙের প্রতি অশ্বিনী বাবুর মনে অবসেসন তৈরি হয়েছিল।

লিলি মুগ্ধ গলায় বলল, বাহ্ আপনি তো চট করে একটা ব্যাপার ধরে ফেলেছেন!

মিসির আলি বললেন, আমি একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছি। হাইপোথিসিসটা সত্যি কি না তার এখনো প্রমাণ হয় নি।

লিলি একটু ঝুঁকে এসে গলা নামিয়ে বলল, আচ্ছা চাচাজী মাঝে মাঝে কিছু বাড়ি যে অভিশপ্ত হয়ে যায় এটা কি আপনি জনেন?

মিসির আলি সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, অভিশপ্ত বাড়ি বলে কিছু নেই। বাড়ি হল বাড়ি, ইট পাথরের একটা স্ট্রাকচার। এর বেশি কিছু না।

লিলি বলল, চাচাজী আমার কথা শুনুন, এমন অনেক বাড়ি আছে যেখানে বিশেষ কিছু ঘটনা বার বার ঘটতে থাকে। একটা চক্রের মতো ব্যাপার। চক্র ঘুরতে থাকে। এই বাড়িটাও সে রকম একটা বাড়ি।

তার মানে?

এই বাড়িটাও একটা চক্রের মধ্যে পড়ে গেছে। আপনি এমন বুদ্ধিমান একজন মানুষ—আপনার চোখে চক্রটা পড়ছে না কেন?

মিসির আলি বললেন, চক্র বলে কিছু নেই লিলি।

লিলি চাপা গলায় বলল, চক্র অবশ্যই আছে। অশ্বিনী বাবু তাঁর বাড়িতে গৌর কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুলতানও কি তাই করে নি? মন্দিরে সে কি একটি মূর্তি রাখে নি? চাচাজী আমার ভালো লাগছে না। আমি যাচ্ছি। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। আজ রাতে বৃষ্টি থামবে না। সারারাত বৃষ্টি হবে। কালও বৃষ্টি হবে। বিছানা থেকে নেমে ছিটকিনি লাগান। শেষে দেখা যাবে ছিটকিনি না লাগিয়েই আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এ বাড়িতে কখনো ছিটকিনি না লাগিয়ে ঘুমুবেন না। কখনো না।

মিসির আলি বিছানা থেকে নামলেন, দরজার ছিটকিনি লাগালেন। বিছানায় এসে বসলেন। অশ্বিনী বাবুর ডায়েরি এখন আর তাঁর পড়তে ইচ্ছা করছে না। বৃষ্টির বেগ আরো বাড়ছে। গাছের পাতায় শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। মিসির আলি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তাঁর খুবই অস্থির লাগছে। চক্রের ব্যাপারটা মাথা থেকে দূর করতে পারছেন না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চক্র তো আছেই। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। প্রতিবারই একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে আসছে। ঘুরছে গ্যালাক্সি। অতি ক্ষুদ্র যে ইলেকট্রন সেও ঘুরপাক খাচ্ছে নিউক্লিয়াসের চারদিকে। পদার্থের সর্বশেষ অবস্থা ল্যাপটনস—এর ভর নেই, চার্জ নেই— অস্তিত্বই নেই, শুধু আছে ঘূর্ণন। স্পিন। জন্মের পর মৃত্যু—জীবন চক্র। বিগ ব্যাং-এ মহাবিশ্ব তৈরি হল। মহাবিশ্ব ছড়িয়ে পড়ছে। কোনো এক সময় আবার তা সংকুচিত হতে শুরু করবে। আবার এক বিন্দুতে মিলিত হবে। আবার বিগ ব্যাং— আবারো মহাবিশ্ব ছড়াবে— The expanding Universe ...

মিসির আলি কখন ঘুমিয়ে পড়লেন নিজেই জানেন না।

তাঁর ঘুম ভাঙল নিশ্বাসের শব্দে। কে যেন তাঁর গায়ে গরম নিশ্বাস ফেলছে! খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরের কারো ঢোকার কোনো পথ নেই। মিসির আলি চোখ মেললেন—হারিকেনের আলোয় স্পষ্ট দেখলেন বিশাল একটা কুকুর। কুকুরটার মুখ তাঁর মাথার কাছে, তার গরম নিশ্বাস চোখেমুখে এসে লাগছে। পশুদের চোখ অন্ধকারে সবুজ দেখায়। এর চোখও সবুজ। এ তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। মিসির আলি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। ব্যাপারটা স্বপ্ন তো বটেই। অত্যন্ত জটিল স্বপ্ন যা মস্তিষ্কের অতল গহ্বর থেকে উঠে এসেছে।

কুকুরটা চাপা শব্দ করছে। এই শব্দও স্বপ্নের অংশ। কুকুরটা এখন খাট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই তো এখন ফিরে আসছে। আবার যাচ্ছে। এখন সে খাটের চারদিকে

পাক খেতে শুরু করেছে। কুকুরটা ঘুরছে চক্রাকারে। আবারো সেই চক্র চলে এল। চক্রের হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। মিসির আলি চোখ মেললেন। অতি সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন দরজার দিকে। দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাতাসও হচ্ছে না।

দরজা খুলল কীভাবে? বাইরে থেকে দরজা খোলার কোনো ব্যবস্থা কি আছে? এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো অর্থ আছে? কোনোই অর্থ নেই। স্বপ্নে বন্ধ দরজা, খোলা দরজা বলে কিছু নেই। স্বপ্নের লজিক খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। রাত কত হয়েছে? টেবিলের উপর হাতঘড়িটা রাখা আছে। ঘড়ি দেখতে হলে তাঁকে উঠে বসতে হবে। তাতে শব্দ হবে। কুকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। এই কাজটা এখন কিছুতেই করা যাবে না। ভয়ঙ্কর এলশেশিয়ান কুকুর। তার মনে কোনো রকম সন্দেহ উপস্থিত হলেই সে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। মিসির আলির হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। খুব পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

এই তৃষ্ণাবোধ মিথ্যা। কারণ পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যা। তিনি স্বপ্ন দেখছেন। এর বেশি কিছু না। কুকুরটা যদি তার উপর ঝাঁপ দিয়েও পড়ে তাতে তাঁর কিছু হবে না। বরং লাভ হবে—দুঃস্বপ্ন ভেঙে যাবে। তিনি মিথ্যামিথ্যি জাগবেন না। সত্যিকার অর্থেই জাগবেন। তখনো যদি তৃষ্ণা থাকে তাহলে পানি খাবেন। তৃষ্ণা না থাকলে চা খাবেন। চা খাবার পর একটা সিগারেট।

মিসির আলি খুব সাবধানে বিছানায় উঠে বসলেন। কুকুরটা হাঁটা বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার লেজ নড়ছে। এর মানে কি এই যে সে ঝাঁপ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে? মিসির আলি এখন মনেপ্রাণে চাচ্ছেন কুকুরটা তার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ুক। স্বপ্ন ভেঙে যাক। কুকুর ঝাঁপ দিচ্ছে না। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আচ্ছা অশ্বিনী বাবুর কি কুকুর ছিল? জিজ্ঞেস করে জানতে হবে।

দরজায় শব্দ হল। টকটক করে মোর্সকোডের মতো শব্দ করছে। যেন কেউ কোনো সংকেত দিচ্ছে। মিসির আলি দরজার দিকে তাকালেন। খোলা দরজার ওপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে কেউ যে আছে তা বোঝা যাচ্ছে। যে আছে তাকে মিসির আলি চেনেন না। কিন্তু কুকুরটা চেনে। সে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কুকুরটা সিঁড়ি বেয়ে নামছে। তার নেমে যাবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

মিসির আলি দ্রুত বিছানা থেকে নামলেন। দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি টেনে দিলেন। টেবিলের কাছে এসে ঘড়ি দেখলেন। রাত তিনটা পঁচিশ। তিনি পরপর দুগ্লাস পানি খেলেন। তারপরেও তৃষ্ণা কমছে না। তিনি খুব যে নিশ্চিন্ত বোধ করছেন তাও না। স্বপ্নে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু ঘটতে পারে। স্বপ্ন ফিজিক্সের সূত্র মেনে চলে না। হয়তো এক্ষুনি দেখা যাবে কুকুরটা বন্ধ দরজা ভেদ করে চলে এসেছে। সে একা আসে নি, সঙ্গী দুজনকেও নিয়ে এসেছে। মানুষের মতো কথা বলাও শুরু করতে পারে। না তা করবে না। স্বপ্ন ফিজিক্সের সূত্র না মানলেও সাধারণ কিছু নিয়ম মানে। আট ন বছরের বাচ্চা যদি কুকুর স্বপ্ন দেখে তাহলে সেই কুকুর তার সঙ্গে কথা বললেও বলতে পারে। মিসির আলি যে কুকুর দেখবেন সে কুকুর কথা বলবে না।

তিনি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। বিছানায় উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করবেন? নাকি হাঁটহাঁটি করবেন? মিসির আলি জানালার কাছে চলে গেলেন। যদি কুকুরটাকে দেখা যায়। চেরী গাছের নিচে কেউ কি আছে? হ্যাঁ আছে তো বটেই। ঐ তো হুইল চেয়ারটা দেখা যাচ্ছে। হুইল চেয়ারের পেছনে আছে বরকত। রাত তিনটা পঁচিশ মিনিটে ওরা দুজন কী করছে? তারা দেখার প্রস্তুতি?

হঠাৎ মিসির আলির বুকে একটা ধাক্কার মতো লাগল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন হুইল চেয়ারে বসা মানুষটা উঠে দাঁড়িয়েছে। এই তো হাঁটতে শুরু করেছে। মন্দিরের দিকে কি যাচ্ছে? হ্যাঁ ঐ দিকে যাচ্ছে। এখন সিগারেট ধরিয়েছে। আবার ফিরে আসছে। হাতের জ্বলন্ত সিগারেট এখন ফেলে দিল। এই মানুষটা যে সুলতান তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? না কোনো সন্দেহ নেই। মানুষটা আবার হাঁটতে শুরু করেছে। মিসির আলি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। না মানুষটা মন্দিরের দিকে যাচ্ছে না। সে মন্দিরের পেছনে যাচ্ছে। মন্দিরের পেছনে আছে কুয়া। এখান থেকে কুয়া দেখা সম্ভব না। কিন্তু স্বপ্নে সম্ভব। মিসির আলি কুয়া দেখার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কুয়া দেখা গেল না। মানুষটা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন।

মিসির আলির মাথায় সমুদ্র গর্জনের মতো শব্দ হচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ। মনে হচ্ছে কাছেই কোথাও সমুদ্র আছে। বড় বড় ঢেউ উঠছে। ঢেউয়ের মাথায় সমুদ্র ফেনা। মাথা এলোমেলো লাগছে। কেউ কি ভরাট গলায় কবিতা আবৃত্তি করছে?

I let myself in at the kitchen door.
'It is you', she said, 'I can't get up. Forgive me.
Not answering your knock. I can no more
Let people in than I can keep them out.'

এটা কার কবিতা? মিসির আলি কিছুতেই মনে করতেন পারলেন না। ঘুমে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মাথার ভেতর কবিতাটা ভাঙা রেকর্ডের গানের মতো বেজে যাচ্ছে—

I let myself in at the kitchen door.
'It is you', she said, 'I can't get up. Forgive me.

আমাকে ক্ষমা কর, আমি উঠতে পারছি না। আমাকে ক্ষমা কর, আমি উঠতে পারছি না। I can't get up. Forgive me.

৭

সূর্য ওঠার আগেই মিসির আলির ঘুম ভাঙল। অন্ধকার মাত্র কাটতে শুরু করেছে। টেবিলে রাখা হারিকেন নিভে গেছে। টেবিল ল্যাম্প দপদপ করছে। যেকোনো মুহূর্তেই নিভবে। মনে হচ্ছে হিসাব করে তেল দেওয়া। সূর্যের আলো ফুটবে আর এরা নিভে যাবে। মিসির আলি প্রথমেই তাকালেন দরজার দিকে— ছিটকিনি লাগানো আছে, দরজা বন্ধ। তিনি বিছানায় উঠে বসে মেঝের দিকে তাকালেন—মেঝে ঝকঝক করছে।

ঝড়বৃষ্টির রাতে কোনো কুকুর উঠে এলে মেঝেতে তার পায়ের দাগ থাকত। মেঝেতে কোনো দাগ নেই। গত রাতে মোটামুটি ভয়াবহ একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কারণ নেই, তবু সন্দেহটা যাচ্ছে না।

তিনি বিছানা থেকে নামলেন। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সকালের প্রথম আলোয় নদী দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল নদীটা পাঁচিল ঘেরা বাড়ির সঙ্গে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ওই বাড়িটার সঙ্গে নদীর কোনো যোগ নেই। নদী দেখতে ভালো লাগছে না।

ভেতরের উঠোনে একটা জলচৌকির উপর বরকত দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে পেতলের বদনা। সে মিসির আলিকে দেখতে পায় নি। মিসির আলি ডাকলেন, 'এই বরকত।' বরকত ভয়াবহভাবে চমকে উঠল। হাত থেকে বদনা জলচৌকিতে পড়ে ঝনঝন শব্দ হল। এতটা চমকানোর কোনো কারণ নেই। মিসির আলি বললেন, কী করছ?

নামাজের অজু করি। ফজরের নামাজ।

মিসির আলি বিস্মিত হলেন। এত দীর্ঘ বাক্য বরকত তাঁর সঙ্গে এর আগে ব্যবহার করে নি।

তোমার কুকুর কি বাঁধা আছে?

জি বান্দা। আসেন নিচে আসেন।

মিসির আলি নিচে নেমে এলেন। বরকত বলল, চা খাইবেন?

মিসির আলি বললেন, গরম চা খেতে পারলে ভালো হত।

নামাজ শেষ কইরা চা দিতাছি।

তোমার কুকুরগুলি কোথায় একটু দেখি।

বরকত আঙুল উঁচিয়ে পেয়ারা গাছের সঙ্গে বাঁধা কুকুরগুলি দেখাল। গলা নামিয়ে বলল, কাছে যান। শইলে হাত দেন। আপনেরে কিছু বলব না।

কিছু বলবে না কেন?

বরকত চাপা গলায় বলল, একটা ঘটনা ঘটাইছি। আপনের জুতা আর কাপড় শুকাইয়া দিছি। অখন এরা আপনের শইল্যের গন্ধ চিনে।

মিসির আলি বললেন, কাজটা তুমি নিজ থেকে করো নি। কেউ তোমাকে করতে বলেছে। কে বলেছে?

বরকত জবাব দিল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মিসির আলির মনে হল বরকত তার আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। এখন আর কথা বলবে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকবে।

মিসির আলি বললেন, গেট খুলে দাও নদীর পাড়ে বেড়াতে যাব। এত কাছে নদী, অথচ নদীই দেখা হয় নি।

বরকত বলল, গেইট খুলন যাইব না। বড় সাবের নিষেধ আছে।

নিষেধ?

জি নিষেধ। আমি খুলতে চাইলেও খুলতে পারব না। চাবি থাকে বড় সাবের কাছে।

চাবি সব সময় বড় সাহেবের কাছে থাকে?

বরকত শীতল গলায় বলল, সব সময় চাবি উনার কাছে থাকে না। যখন আপনের মতো কেউ বেড়াইতে আসে তখন চাবি উনার কাছে থাকে।

মিসির আলি বললেন, যাতে অতিথিরা পালিয়ে যেতে না পারে সেই জন্যে?

কী জন্যে সেইটা আমি জানি না বড় সাহেব জানে।

আচ্ছা ঠিক আছে তুমি নামাজ পড়তে যাও। তোমার নামাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে। শেষে নামাজ কাজা হবে।

বরকত গম্ভীর মুখে বলল, ফজরের নামাজ দুপুর পর্যন্ত কাজা হয় না। এর একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাসটা শুনবেন?

বল শুনি।

নবীয়ে করিম একবার দেরি কইরা ঘুম থাইকা উঠছিলেন। নবীয়ে করিমের জন্যে আমরা মাফ পাইছি।

এটা জানতাম না।

ভদ্রলোকরা সব বিষয় জানে, ধর্মকর্ম বিষয়ে জানে না। এইটা একটা আফসোস।

আফসোস তো বটেই। বরকত তোমার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগল। আমি বাগানের দিকে যাচ্ছি তুমি নামাজ শেষ করে চা নিয়ে এসো। দুকাপ চা আনবে। আমার জন্যে এক কাপ তোমার জন্যে এক কাপ। আমরা চা খেতে খেতে গল্প করব। ভালো কথা আমি যখন তোমাকে ডাকলাম তুমি এত ভয় পেলে কেন? ভয়ে হাত থেকে একেবারে বদনা পড়ে গেল।

বরকত জবাব দিল না, তার ঠোঁটের কোনায় অস্পষ্ট হাসির রেখা দেখা গেল। মিসির আলি হাঁটতে শুরু করলেন, চেরী গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি মাটির দিকে। হুইল চেয়ারের কোনো দাগ কি মাটিতে আছে? থাকার কোনোই কারণ নেই। কাল রাতে যা দেখেছেন তার পুরোটাই স্বপ্ন। এই সত্য সন্দেহাতীতভাবে সত্য। তারপরেও দেখা। মানুষের মন এমন যে একবার কোনো বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হলে সেই সন্দেহ আর যেতেই চায় না। কাপড়ে ময়লা লেগে যাবার মতো। যত ভালো করেই ধোয়া হোক অস্পষ্ট দাগ থেকেই যায়। সেই দাগ বারবার ধুতে ইচ্ছা করে।

হুইল চেয়ারের পায়ের রেখা ভেজা মাটিতে আছে। মিসির আলির ভুরু কুঞ্চিত হল। স্বপ্নের একটি অংশ কি সত্যি? মানুষ যেমন মিথ্যা কথা বলার সময় মিথ্যার সঙ্গে কিছু সত্য মিশিয়ে দেয়, স্বপ্নেও কি সে রকম কিছু ঘটে? মস্তিষ্ক স্বপ্নের সঙ্গে সামান্য বাস্তব মিশায়। মিসির আলি হুইল চেয়ারের দাগ ধরে এগুতে লাগলেন। তাঁকে বেশিদূর যেতে হল না, তার আগেই থমকে দাঁড়াতে হল। লাইব্রেরি ঘরের বারান্দা থেকে সুলতান বলল, স্যার কী করছেন? সুলতানের গলায় চাপা কৌতূহল।

মিসির আলি বললেন, কিছু করছি না। হাঁটছি, প্রাতঃভ্রমণ বলতে পার।

আমার কাছে মনে হচ্ছে মাটিতে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে এগুচ্ছেন। কী খুঁজছেন? হুইল চেয়ারের পায়ের দাগ?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ। তুমি কাল রাতে হুইল চেয়ার নিয়ে বাগানে ঘুরেছ। কোথায় কোথায় গিয়েছিলে তাই দেখছিলাম।

এই অনুসন্ধানের আপনার বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?

না তেমন কোনো কারণ নেই।

শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি থামল। আকাশ পরিষ্কার হল। আমি বাগানে ঘুরছিলাম, এবং আকাশ দেখছিলাম।

সুলতান হুইল চেয়ার নিয়ে লাইব্রেরি ঘরের বারান্দা থেকে নিচে নামতে শুরু করল। হুইল চেয়ারে বারান্দা থেকে বাগানে নামার জন্যে ব্যবস্থা করা আছে। তার পরেও তাকে নামতে হচ্ছে সাবধানে। সুলতান সহজ গলায় বলল, পঙ্গু মানুষেরও মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করে। বাগানে যেতে ইচ্ছা করে। শীতের সময় বাগানে ঘুরে বেড়ানো সহজ। বর্ষার সময় বেশ কঠিন। কাদায় চাকা ডেবে যায়। তখন পেছন থেকে কাউকে ঠেলতে হয়। স্যার আপনার রাতের ঘুম ভালো হয়েছিল?

হ্যাঁ ভালো হয়েছে।

বেশ ভালো, নাকি মোটামুটি ভালো?

বেশ ভালো।

আপনি কি আর্লি রাইজার?

না আজ কীভাবে কীভাবে যেন ঘুম ভেঙে গেছে। আমার কপালে সূর্যোদয় দৃশ্য নেই। শুধুই সূর্যাস্তের দৃশ্য।

সুলতান হালকা গলায় বলল, আমার কপালে সূর্যোদয় দৃশ্য প্রচুর পরিমাণে আছে। আমি রাতে ঘুমাই না। সকালে সূর্য দেখে ঘুমাতে যাই। আমার কপালে সূর্যাস্ত নেই।

মিসির আলি বললেন, আমি তোমাকে ঘুম থেকে বঞ্চিত করছি, যাও শুয়ে পড়।

সুলতান বলল, না, আজ আমি আপনার সঙ্গে গল্প করব। চলুন নীল মরিচ ফুল গাছটার কাছে যাই। আপনি বেদিতে বসবেন। আমি বসব হুইল চেয়ারে। আমাদের আই লেভেল ঠিক থাকবে।

মিসির আলি বললেন, বরকতকে চা নিয়ে আসতে বলেছিলাম। তুমি চা খাবে?

খেতে পারি।

চায়ে চিনি কতটুক খাও?

কেন জানতে চান বলুন তো?

বিশেষ কোনো কারণ নেই। এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

দুচামচ।

আমার ধারণা ছিল তুমি চায়ে চিনি খাও না।

এ রকম ধারণা হবার কারণ কী?

মধু খাও না তো তাই ভাবলাম মিষ্টি জাতীয় কিছুই খাও না।

সুলতান শীতল গলায় বলল, মধু খাই না আপনাকে কে বলল?

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, কেউ বলে নি। আমার ধারণা তুমি খাও না। অন্যদের আগ্রহ করে খাওয়াও। আমার ধারণাটা কি ঠিক?

হ্যাঁ আপনার ধারণা ঠিক। আমি মধু খাই না এই ধারণা আপনার কেন হল এটা বুঝতে পারছি না। ব্যাখ্যা করবেন?

আমার সিক্সথ সেন্স এ রকম বলছিল।

সুলতান কঠিন গলায় বলল, সিক্সথ সেন্স বলে কিছু নেই। এটা আপনি যেমন জানেন, আমিও জানি। আমি মধু খাই না এটা কেন বললেন?

সুলতান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে। তার হাতের মুঠি বন্ধ। প্রতিটি লক্ষণ বলে দিচ্ছে সে রেগে গেছে। রাগ সামলাতে পারছে না। মিসির আলি সুলতানের রাগটাকে তেমন গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হল না। যেন তিনি ধরেই নিয়েছেন সুলতান রাগবে। মিসির আলি গাছের বেদিতে পা তুলে বসলেন। স্বাভাবিক গলায় বললেন, সুলতান তোমার কাছে কি সিগারেট আছে? দিনের প্রথম চা-টা সিগারেট দিয়ে খেতে হয়। আমি আমার প্যাকেট ভুলে উপরে রেখে এসেছি। সিগারেট হাতে নিয়ে বসে থাকি। এর মধ্যে চা চলে আসবে। সিগারেট হাতে বসে থাকার মধ্যেও আনন্দ আছে। যারা ধূমপান করে না তারা সুস্বাস্থ্যের আনন্দ পায়, সিগারেট হাতে বসে থাকার আনন্দটা পায় না।

বরকত চা নিয়ে এসেছে। দুজনের জন্যেই চা এনেছে। সুন্দর কাপে করে মিসির আলির জন্যে চা আর তার নিজের জন্যে গ্লাস ভর্তি চা। মিসির আলি বললেন, বরকত তুমি কাপটা তোমার বড় সাহেবকে দাও। আর আমি তোমার গ্লাসে করে চা খাব। গ্লাস ভর্তি চা খাওয়ায় আলাদা আনন্দ আছে। কাপের চা বাইরে থেকে দেখা যায় না। গ্লাসের চা দেখা যায়।

সুলতান সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, 'আমি মধু খাই না' এই ধারণার পেছনে আপনার ব্যাখ্যাটা এখন শুনি। আমি ব্যাখ্যাটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

আমার ব্যাখ্যা খুবই সহজ। তুমি আমাকে মধু দেবার সময় নাক-মুখ কুঁচকে ফেলেছিলে। রিফ্লেক্স একশান। সেখান থেকেই বুঝলাম তুমি মধু খাও না। খেলেও যে মধুটা আমাকে খেতে দিয়েছ সেটা খাও না।

তাহলে শুধু শুধু সিক্সথ সেন্সের কথা কেন বললেন?

আমি একটা ছোট্ট পরীক্ষা করলাম। আমি দেখলাম সিক্সথ সেন্সের কথা শুনে তুমি চমকে গেলে, খানিকটা রেগেও গেলে। চমকাও কি না এটাই ছিল আমার পরীক্ষা। বরকত দেখি চা ভালো বানায়।

সুলতান তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে অপেক্ষা করছে মিসির আলি কী বলেন তা শোনার জন্যে। মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, তুমি যখন বললে সুন্দরবনে নানান ধরনের ফুলের মধু পাওয়া যায়—খলিসা ফুলের মধু, কেওড়া ফুলের মধু, গড়ান ফুলের মধু, তখন হঠাৎ করে আমার মনে হল—অনেক বিষাক্ত ফুলও তো প্রকৃতিতে আছে। যেমন ধুতরা ফুল। এমন কি হতে পারে না যে কিছু মৌমাছি ধুতরা ফুল থেকে মধু নেয়। সেই সব ফুলে ধুতরার ভয়ঙ্কর বিষ মিশবে। সেই বিষ হল a very powerful halucinating drug যা মানুষের চিন্তায় কাজ করে। চেতনাকে পাল্টে দেয়। রিয়েলিটির ভুল ব্যাখ্যা করে। সুন্দরবন হল একটা ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন। সেখানে ধুতরা ফুল থাকারই কথা। তুমি বল থাকবে না?

হ্যাঁ থাকবে। এবং আছে। সুন্দরবনের ভেতর মাঝে মাঝে হঠাৎ কিছু ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায়। সেখানে প্রচুর ধুতরা ফুল ফোটে।

সেই ফুল থেকে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করে?

সব মৌমাছি করে না। বিশেষ এক ধরনের মৌমাছি করে। এদের মৌমাছিও বলে না। বলে মৌ পোকা।

মিসির আলি বললেন, যেকোনোভাবেই হোক বিশেষ ধরনের এই মধু তোমার সংগ্রহে আছে। তার খানিকটা তুমি আমাকে দুদফায় খাইয়েছ যে কারণে আমি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দুঃস্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব মিশে ছিল। প্রথম রাতে সাপ নিয়ে কথা হল—আমি স্বপ্নে দেখলাম সাপ। দ্বিতীয় রাতে কুকুর নিয়ে কথা হল। লিলি আমাকে বলল দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে ঘুমুতে—মাঝে মাঝে কুকুর দোতলায় উঠে আসে। সেই রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম কুকুর। কুকুরটা ঘরে ঢুকে আমার বিছানার চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

সুলতান বলল, আপনার ডিডাকটিভ লজিক যে ভালো, আমি জানতাম। এতটা ভালো বুঝতে পারি নি। I am impressed.

মিসির আলি চায়ের গ্লাস নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, এখন তুমি কি আমাকে বলবে, কেন আমাকে এখানে এনেছ? তারা দেখানোর জন্যে নিশ্চয়ই আন নি। চিঠিতে তুমি টোপ ফেলার কথা বলেছ। সেটা কথার কথা ছিল না। আসলেই টোপ ফেলে এনেছ। কেন এনেছ? খোলাখুলি বলতে অসুবিধা আছে?

না অসুবিধা নেই। আপনার সঙ্গে অনেক লুকোচুরি খেলা হয়েছে। আর খেলার প্রয়োজন দেখছি না।

তাহলে তোমার উদ্দেশ্যটা বলে ফেল। তুমি কিছু মনে কোরো না—আমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। আমি আজ চলে যাব। দুপুরের পর রওনা হতে চাই।

সুলতান বলল, আজ অমাবস্যা। আকাশে মেঘ নেই। আমি নিশ্চিত যে আজ রাতে আকাশ পরিষ্কার থাকবে। আপনাকে আজ রাতে একটা স্পাইরাল গ্যালাক্সি দেখাব। দেখার পর মনে হবে আপনার মানব জীবন ধন্য।

আমার গ্যালাক্সি দেখার শখ এখন নেই। আমি চলে যেতে চাচ্ছি। আকাশ দেখতে ইচ্ছা করছে না।

সুলতান শীতল গলায় বলল, স্যার শুনুন। আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ভুলে যান। আমি আপনাকে এখান থেকে বের হতে দেব না।

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, বের হতে দেবে না?

সুলতান বলল, না। এবং তার জন্যে কোনো সমস্যাও হবে না। কেউ জানবেও না আপনি কোথায় আছেন। আপনার পরিচিতজনরা জানে আপনার স্বভাব হচ্ছে মাঝে মধ্যে বাইরে কোথাও চলে যাওয়া। সবাই ভাববে এবারো তাই হয়েছে। আপনার এক ছাত্র আপনার জন্য টেকনাফে অপেক্ষা করছে। সে যখন দেখবে আপনি এসে পৌঁছান নি তখন সে খানিকটা খোঁজ করবে। সবাই জানবে টেকনাফ যাবার পথে আপনি হারিয়ে গেছেন। কিছুদিন পর মানুষ আপনাকে ভুলে যাবে। মানুষ বিস্মৃতিপরায়ণ জীব।

আমাকে এখানে আটকে রেখে তোমার লাভ কী?

লাভ আছে। সাইকোলজি বিশেষ করে প্যারাসাইকোলজির উপর আপনার দখল অসাধারণ। আপনি আমার উপর গবেষণা করবেন। আমার মাথার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখবেন সেখানে কী আছে। কেন আমি এ রকম?

তুমি কী রকম?

আপনার অনুমান শক্তি তো ভালো, আপনি অনুমান করুন। আপনাকে সামান্য সাহায্য করছি। আমার তুলনায় অশ্বিনী কুমার রায় একজন মহাপুরুষ। হা হা হা।

মিসির আলি তাকিয়ে আছেন। সুলতানও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সে এখন আর হাসছে না। কিন্তু হাসিটা শরীরের ভেতর আছে। কারণ তার শরীর কাঁপছে। মনের ছায়া চোখে নাকি পড়ে। চোখ হচ্ছে মনের জানালা। মিসির আলির মনে হল না—সুলতানের চোখে মনের কোনো ছায়া পড়েছে। শান্ত স্থির চোখ। যে চোখ বুদ্ধিতে ঝকমক করছে।

সুলতান বলল, স্যার আপনার কি ভয় লাগছে?

মিসির আলি বললেন, না।

সুলতান বলল, ভয় লাগছে না কেন?

বুঝতে পারছি না কেন।

সুলতান বলল, আপনি যে ভয় পাচ্ছেন না সেটা আপনাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে। ভয় পাবেন না জানলে আগেই আপনাকে বলতাম। যাই হোক আপনার উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া।

কেন বল তো?

সুলতান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আপনাকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম গবেষণার সুযোগটা আমি করে দিচ্ছি। একজন অতি ভয়ঙ্কর মানুষকে আপনি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। যে আপনার গবেষণায় আপনাকে সাহায্য করবে। আপনিও আমাকে কিছুটা সাহায্য করবেন।

আমি কী সাহায্য করব?

আমাকে সঙ্গ দেবেন। আপনার সঙ্গে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা নিয়ে আলাপ করব। আকাশের তারা দেখব। তাছাড়া আমি নিজেও ছোটখাটো কিছু পরীক্ষা করছি। মানসিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষাতেও আপনি সাহায্য করবেন। মনোজগতের যে পড়াশোনা আপনার আছে আমার তা নেই। পরীক্ষাটা ঠিকমতো হচ্ছে কি না আপনি দেখে দেবেন।

কী পরীক্ষা?

সালমা নামের একটা মেয়ের কথা আপনাকে চিঠিতে লিখেছিলাম। তাকে নিয়েই পরীক্ষা। আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে, সব মানুষের ভেতরই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে। মানুষের মনে ভয়ঙ্কর চাপ দিয়ে সেই ক্ষমতা বের করে আনা যায়। আমি সালমার উপর এই চাপটাই দিচ্ছি।

মেয়েটা কোথায়?

মেয়েটা এ বাড়িতেই আছে। রাতে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

লিলি বলছিল সালমা বলে আলাদা কেউ নেই। লিলিই সালমা।

লিলির সব কথা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করার কিছু নেই। আমি এখন ঘুমুতে যাব। আপনার কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে জিজ্ঞেস করুন।

হুইল চেয়ারের কি তোমার প্রয়োজন আছে?

না, হুইল চেয়ারের আমার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি শারীরিকভাবে সুস্থ একজন মানুষ। ইচ্ছা করেই হুইল চেয়ারে সময় কাটাই যাতে বাইরের লোকজন জানে

এ বড়িতে পঙ্গু একজন মানুষ থাকে। পঙ্গু বলেই সে শহর ছেড়ে নির্জন বাস করে। এই কাজটা না করলে কথা উঠত সম্পূর্ণ সুস্থ একজন মানুষ দিনের পর দিন এই নির্জনে স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে আছে কেন? অবিশ্যি হুইল চেয়ারের একটা ভালো ব্যবহারও আছে। টেলিস্কোপ ফিট করে তারা দেখার সময় এটা খুব কাজে লাগে।

তুমি যে আমাকে এখানে আটকে রাখার জন্যে এনেছ তা কি এ বাড়ির লোকজন জানে?

জানবে না কেন? জানে। লিলি জানে, বরকত জানে। আপনার মতো অনেকেই এ বাড়িতে আসে। কেউ ফিরে যায় না। বুঝতেই পারছেন এ বাড়ি থেকে কাউকে জীবিত ফেরত পাঠানো আমার জন্যে সম্ভব না। কোনো ভয়ঙ্কর মানুষ যদি তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে সাবধানী হতে হবে। সিরিয়াল কিলারদের কথাই ধরুন—সব সিরিয়াল কিলারই চিতাবাঘের চেয়েও সাবধানী। তাকে একের পর এক মানুষ মারতে হবে। সাবধানী না হলে এই কাজটা সে করতে পারবে না। স্যার আমি ঠিক বলছি?

হ্যাঁ ঠিক বলছ।

থ্যাঙ্ক য়্যু। আমি সালমা মেয়েটিকে নিয়ে গবেষণাধর্মী যে কাজটা করেছি তা লেখার চেষ্টা করেছি। আমি পাঠিয়ে দেব। পড়ে দেখুন। লেখাটা গবেষণাধর্মী হয় নি। সায়েন্টিফিক পেপার কী করে লিখতে হয় জানি না। এই দায়িত্বটা আপনার। আমরা এই জঙ্গলে বসে একের পর এক রিসার্চ পেপার বিদেশী জার্নালে পাঠাব। মূল অথার আপনি আমি কো-অথার।

সুলতান হাসল। সেই হাসি যা চট করে মুখ থেকে মুছে যায় কিন্তু শরীরে থেকে যায়। বেশ কিছুক্ষণ শরীর দুলতে থাকে। এই প্রথম মিসির আলির শরীর গুলিয়ে উঠল। তাঁর কাছে মনে হল ঘেন্নাকর কিছু তার সামনে বসে আছে।

সুলতান বলল, স্যার এখন আপনি আমাকে সামান্য ভয় পাচ্ছেন। আপনার চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে। কোম্পেনি হিসেবে আমি খারাপ হব না। আমি শিক্ষিত একজন মানুষ। অংকশাস্ত্রের মতো একটা জটিল বিষয়ে আপার পিএইচ. ডি. ডিগ্রি আছে। আপনি যদি অংকের ছাত্র হতেন তাহলে আমাকে চেনার সামান্য সম্ভাবনা ছিল—আমার পিএইচ. ডি.'র কাজ খুব ভালো হয়েছিল। গ্রুপ থিওরির সব বইতেই সুলতান ফাংশান বলে একটা ফাংশানের উল্লেখ আছে। আমার নামে তার নাম। যৌবনে এই দিকে কিছু মেধা ব্যয় করেছিলাম। পরে এইসব অর্থহীন মনে হয়েছে। স্যার আমি কী বলছি আপনি কি শুনছেন?

হ্যাঁ শুনছি।

এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে আসল রহস্য পদার্থবিদ্যা বা অংকে না—আসল রহস্য মানুষের মনে। আকাশ যেমন অন্তহীন, মানুষের মনও তাই। পৃথিবীর বেশির ভাগ অংকবিদ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। আমিও ভালবাসি। আকাশের দিকে তাকালে জাগতিক সব কিছু তুচ্ছ মনে হয়। We are so insignificant. আমাদের জন্ম-মৃত্যু সবই অর্থহীন।

মিসির আলি বললেন, তুমি কি মানুষ খুন করেছ?

সুলতান জবাব দিল না।

মিসির আলি বসে স্তব্ধ হয়ে আছেন। সুলতান হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। পেয়ারা গাছের নিচে বরকতকে দেখা যাচ্ছে সে কুকুরকে গোসল দিচ্ছে।

রোদ উঠেছে। আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম। চেরী গাছ থেকে একটা দুটা করে ফুল পড়ছে। ফুলগুলি গাছে যত সুন্দর দেখাচ্ছে—হাতে নেওয়ার পর তত সুন্দর লাগছে না। কিছু সৌন্দর্য দূর থেকে দেখতে হয়, কাছ থেকে দেখতে হয় না।

৮

আমার নাম সুলতান।

সাধারণত গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের এ জাতীয় নাম থাকে। সুলতান, সম্রাট, বাদশাহ্। বাবা মা ভাবেন বড় হয়ে ছেলে রাজা বাদশাহ্ হবে। আমি কোনো গরিব ঘরের সন্তান ছিলাম না। বিত্তশালী পরিবারর সন্তান ছিলাম। আমার বাবা মার সন্তানদের নামকরণের মতো তুচ্ছ বিষয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না। আমরা অনেকগুলি ভাই-বোন ছিলাম। মা প্রতিবছর একটি করে সন্তান প্রসব করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জ্ঞান হবার পর থেকেই মাকে বিছানায় শোয়া পেয়েছি। নিজের সন্তানদের দিকে তাকানোর মতো অবস্থা তাঁর ছিল না। তাঁর মন এবং শরীর দুইই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শেষের দিকে তিনি মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা শুরু করলেন।

আমরা থাকতাম পুরোনো ঢাকার একটা বাড়িতে। সেই বাড়িটিও বিশাল। সেই বাড়িও উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। আমাদের পড়াশোনার জন্যে ঢাকায় এনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেই দিকে কারো নজর ছিল বলে মনে হয় না। বাবা ব্যস্ত তাঁর ব্যবসা নিয়ে। আজ ঢাকা, কাল নারায়ণগঞ্জ, পরশু খুলনা এই অবস্থা। মা বিছানায়। বাড়ি ভর্তি কাজের লোক। এরা পান খেয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা ছাড়া কিছু করে না। সন্ধ্যার পর দুজন প্রাইভেট টিউটর আসেন। তাঁরা চা পানি খান। বেত নিয়ে হাম্বিতাম্বি করেন। সপ্তাহে তিন দিন আসেন একজন মওলানা। তাঁর বিরাট দাড়ি, চোখে সুরমা। তিনি আমাদের কোরান শরীফ পাঠ করা শেখান। বিরাট বিশৃঙ্খলার ভেতরে আমরা বড় হচ্ছি। তবে বিশৃঙ্খলারও নিজস্ব ছন্দ আছে। কোথাও ছন্দ পতন হচ্ছে না। একদিন হল—আমার বড় বোন মারা গেল, ভালো মানুষ—সারাদিন কাজকর্ম করেছে। মওলানা সাহেবের কাছে সিপারা পড়েছে। রাতে এশার নামাজ পড়ে ঘুমুতে গিয়েছে, সেই ঘুম আর ভাঙল না।

বাবা তখন চিটগাং-এ। তিনি খবর পেয়ে কাজকর্ম ফেলে চলে এলেন। তাঁকে কন্যা শোকে অধীর বলে মনে হল না, তিনি শুধু বারান্দার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাঁটতে লাগলেন আর বারবার বলতে লাগলেন—সমস্যাটা কী? ঘটনাটা কী?

বড় বোনের মৃত্যুর পেছনে কোনো সমস্যা বা ঘটনা হয়তো ছিল, আমি নিতান্তই শিশু বলে বুঝতে পারি নি। আমার বড় বোনের নাম মীরু। তার তখন আঠার উনিশ বছর। সমস্যারই সময়। আমার ধারণা ভালো কোনো সমস্যাই ছিল।

বড় বোনের মৃত্যুর ঠিক ছমাসের মাথায় মারা গেল আমার মেজো ভাই। তার নাম ইজাজত। স্কুল থেকে ফেরার পথে রিকশার ধাক্কা খেয়ে নর্দমায় পড়ে গিয়ে মাথায় ব্যথা পেল। বাসায় এসে কয়েকবার বমি করে চোখ উল্টে দিল। বাবা শোকে যে অভিভূত হলেন তা না, চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, সমস্যাটা কী? ট্রাকের নিচে পড়ে মারা যায় এটা ঠিক আছে। কিন্তু রিকশার নিচে পড়ে মৃত্যু এটা কেমন কথা? আর কিছু না অভিশাপ লেগে গেছে। মহাঅভিশাপ লেগে গেছে। এই বাড়িতে থাকা আর ঠিক হবে না।

সেই বছরের শেষ দিকে আমার সবচেয়ে ছোট বোনটি মারা গেল। তার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল বলা চলে। ডিপথেরিয়ায় মৃত্যু। ছোটবোনের মৃত্যুর পর বাবা সবাইকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। ঠিক হল ঢাকায় নতুন কোনো বড় বাড়ি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আমরা গ্রামে থাকব। অভিশাপ লাগা বাড়িতে ফিরে যাব না। গ্রামের বাড়িতে আমাদের লেখাপড়া দেখিয়ে দেবার জন্যে সার্বক্ষণিক একজন শিক্ষক রাখা হল তার নাম ইদরিশ। মুহম্মদ ইদরিশ মাস্টার। বাবা তাঁকে ডেকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে দিলেন—শিশুদের শাসনে রাখতে হবে। কঠিন শাসন। পড়াশোনা না করলে, বেয়াদবি করলে মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে। কোনো অসুবিধা নেই। শিশুদের দুইটাই অষুধ। একটা কৃমির অষুধ, আরেকটা মার।

মুহম্মদ ইদরিশ অত্যন্ত উৎসাহে তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু করলেন। প্রতিদিনই তিনি নির্যাতনের নানান কৌশল বের করতে লাগলেন। দুই হাতে ইট নিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকা দিয়ে শুরুটা করলেন। হাতের ইট তাঁর পায়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে প্রায় খোঁড়া করে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম বলেই হয়তো আমার শাস্তির ব্যাপারে তিনি বিশেষ যত্নবান হলেন। এমন সব শাস্তি যা অনেক চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা করে বের করতে হয়। চট করে মাথায় আসে না।

আমাকে তিনি এক বিকালে বিশেষ এক ধরনের শাস্তি দেবার জন্যে মন্দিরে নিয়ে ঢুকলেন। গা থেকে শার্ট খুলে খালি গা করলেন। দড়ি দিয়ে দুই হাত পেছনমোড়া করে বাঁধলেন। তারপর দুটা প্রকাণ্ড বড় মাকড়সা সুতা দিয়ে বেঁধে আমার গলায় মালার মতো পরিয়ে দিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন।

আমার মাকড়সা ভীতি আছে। এই নিরীহ প্রাণী মানুষের কোনোই ক্ষতি করে না কিন্তু যারা একে ভয় পায় তাদের কাছে এরা রাজ্যের বিভীষিকা নিয়ে উপস্থিত হয়। যে কারণে মাকড়সা ভীতির আলাদা নাম পর্যন্ত আছে।

প্রথম কিছুক্ষণ আমার মনে হল আমি বোধহয় এক্ষুনি মারা যাব। সুতা দিয়ে বাঁধা মাকড়সা দুটা সারা গায়ে কিলবিল করছে। গলা বেয়ে মুখের দিকে উঠতে চেষ্টা করছে। আমি চিৎকার করার চেষ্টা করছি, গলা দিয়ে সামান্যতম শব্দও বের হচ্ছে না। আমার ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে দরজায় আছড়ে পড়ি। সেটা সম্ভব হচ্ছিল না, কারণ আমার হাত-পা জমে গিয়েছিল। ঘর অন্ধকার। আমি চোখে কিছুই দেখছি না, কিন্তু অদ্ভুত কারণে মাকসড়া দুটাকে দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে তাদের গা থেকে হালকা সবুজ আলো বের হচ্ছে। এই সময় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল—চোখের সামনে দেখলাম একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ হাসি হাসি—যুবতী মেয়ে। তার গায়ে কোনো কাপড় নেই, তার জন্যে কোনো লজ্জাও নেই। তার মাথা ভর্তি লম্বা লম্বা চুল। সেই চুল মুখের

উপর পড়ে আছে বলে মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা বলল, মাকড়সা তো সামান্য পোকা। তুই ভয়ে দেখি মরে যাচ্ছিস?

আমি বললাম, আপনি মাকড়সা দুটা ফেলে দিন। আপনার পায়ে পড়ি।

নারীমূর্তি বলল, পায়ে পড়ে লাভ হবে না। আমি মাকড়সা হাত দিয়ে ছোঁব না। স্নান করে এসেছি। হাত নোংরা হবে। তুই মাকড়সার দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বল। তাহলে ভয় কমবে।

আমি বললাম, আপনি কে?

নারীমূর্তি চাপা গলায় বলল, আমি গৌর কালী। কী আশ্চর্য তুই তো দেখি মাকড়সার ভয়ে মরেই যাচ্ছিস! পেচ্ছাব করে মন্দিরও অপবিত্র করে ফেলেছিস। তুই কেমন ছেলে বল দেখি। মাকড়সার ভয়ে কেউ পেচ্ছাব করে? ছিঃ!

আমি বললাম, আপনি একটা কাঠি দিয়ে মাকড়সা দুটা ফেলে দিন।

নারীমূর্তি চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল—পাগলের মতো কথা বলবি না। আমি এখন কাঠি পাব কোথায়? কাঠি খুঁজতে হলে মন্দিরের বাইরে যেতে হবে। কুয়ার পাড়ে তোর মাস্টার বসে আছে। আমি নেংটো হয়ে তার সামনে যাব নাকি? তোকে একটা বুদ্ধি দেই শোন—এই মাস্টার তোকে আরো অনেক যন্ত্রণা দেবে। যন্ত্রণা দেবার আগেই ব্যবস্থা করে ফেল।

কী ব্যবস্থা?

মাস্টারকে প্রায়ই দেখি কুয়ার ওপর বসে থাকে। আচমকা ধাক্কা দিয়ে ব্যাটাকে কুয়ার ভেতর ফেলে দিবি। পারবি না?

না।

না পারার কী আছে? এক ধাক্কায় সব সমস্যার সমাধান। খুবই গহিন কুয়া। নিচে বিষাক্ত গ্যাস। একবার পড়লে আর দেখতে হবে না। কাজটা যে তুই করেছিস সেটাও কেউ বুঝবে না। ভাববে নিজে নিজে পড়ে গেছে। আমার অবিশ্যি ধারণা কেউ কোনোদিন জানবেও না যে এইখানে একজন মানুষ পড়ে আছে।

মন্দিরের ভেতরের স্মৃতি এরপর আমার কিছু মনে নেই। হয়তো আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। এই ঘটনার তৃতীয় দিনের দিন আমি মুহম্মদ ইদরিশ মাস্টারকে ধাক্কা দিয়ে কুয়ায় ফেলে দেই। কুয়াটা খুব গভীর তো বটেই, ধাক্কা দেওয়ার অনেক পরে ঝপাং শব্দটা কানে আসে। ও আল্লাগো ও আল্লাগো শব্দটি দুবার শোনা যায়। তারপর সব নিস্তব্ধ। আমি খুব স্বাভাবিকভাবে কুয়ার পাড়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করি। তারপর ঘরে চলে আসি।

মাস্টার সাহেব বাড়িতে নেই এটা নিয়ে বাড়ির কাউকেই উদ্বিগ্ন হতে দেখা গেল না—কারণ তখন আমার মায়ের শরীর খুবই খারাপ। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এখন মারা যান তখন মারা যান অবস্থা। মওলানা ডাকা হয়েছে। মওলানা তওবা করিয়েছেন। খবর পেয়ে বাবা চলে এসেছেন ঢাকা থেকে। মা সেই যাত্রা রক্ষা পেয়ে যান। বাবা উৎফুল্ল মনে ঢাকায় ফিরে যান। যাবার আগে আরেকজন নতুন মাস্টার ঠিক করে যান। মুহম্মদ ইদরিশের বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে সে ভালো কোনো সুযোগ পেয়ে চাকরি ছেড়ে ঢাকায় চলে গেছে। নিমকহারাম টিমকহারাম বলে তাকে অনেক গালাগালিও করেন।

মার শরীর আরেকটু ভালো হলে আমরা আবার ঢাকা শহরে চলে আসি। মুহম্মদ ইদরিশ কুয়ার ভেতরে থেকে যায়। তার বিষয়ে কেউ কিছুই জানে না। আমি নিজেও ব্যাপারটা ভুলে যাই। একবার শুধু রাতে মন্দিরে দেখা নারীমূর্তিকে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নটা এ রকম—আমি মন্দিরের বারান্দায় বসে পেয়ারা খাচ্ছি। নারীমূর্তি এসে আমার সামনে দাঁড়াল। পরিচিত ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলল, এই বাঁদর! আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি বললাম চিনতে পারছি।

অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছিস কেন? নাকি আমার গায়ে কাপড় নেই বলে তাকাতে লজ্জা লাগছে?

আমি বললাম, লজ্জা লাগছে।

চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বল তাহলে লজ্জা লাগবে না। এখন বল দেখি ইদরিশ মাস্টারের উচিত শিক্ষা হয়েছে না?

আমি বললাম, হয়েছে।

দেখলি কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারে নি।

হুঁ।

মানুষের শরীর পচে গেলে খুবই দুর্গন্ধ হয়। কুয়াটা তো অনেক গভীর এই জন্যে পচা গন্ধ নিচে জমে আছে উপরে আসতে পারছে না। বুঝতে পারছিস?

হুঁ।

আমি তোকে একটা বিষয়ে সাবধান করতে এসেছি।

কোন বিষয়ে?

তুই কুয়ার ধারে একা একা যাবি না।

গেলে কী হবে?

ইদরিশ মাস্টার তোকে ডাকবে। তুই বাচ্চা মানুষ তো। ডাক শুনে ভয়টয় পেতে পারিস।

আচ্ছা কুয়ার ধারে যাব না।

কখনো কোনোদিনও কুয়ার ভেতরে কী আছে উঁকি দিয়ে দেখতে যাবি না। দেখতে গেলেই মহাবিপদ।

আচ্ছা দেখতে যাব না।

ইদরিশ মাস্টারের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ। অনেক বছর পর ইদরিশ মাস্টারর প্রসঙ্গটা আমার আবার মনে আসে। তখন আমি বিলেতে পড়াশোনা করছি। কোনো এক উইক এন্ডে হঠাৎ একটা বই হাতে এল—বইটার নাম The crystal door. বইটার লেখক কিংস কলেজের একজন বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট—James Hauler. তিনি এই বইটিতে বললেন—মানুষের মনের কিছু দরজা আছে যা সহজে খোলে না। মানুষ যদি কোনো কারণে ভয়ঙ্কর কোনো চাপের মুখোমুখি হয় তখনি দরজা খুলে যায়। তিনি এই দরজার নাম দিয়েছেন crystal door.

জেমস হাউলার বলছেন—এই স্ফটিক দরজার সন্ধান বেশির ভাগ মানুষ সমগ্র জীবনে কখনো পায় না। কারণ বেশির ভাগ মানুষকে তীব্র ভয়াবহ মানসিক চাপের মুখোমুখি হতে হয় না। জেমস হাউলার মনে করেন মানুষের কাছে দুধরনের বাস্তব

আছে। একটি দৃশ্যমান জগতের বাস্তবতা, আরেকটি অদৃশ্য জগতের বাস্তবতা। স্বপ্ন হচ্ছে সে রকম একটি অদৃশ্য জগত এবং সেই জগতও দৃশ্যমান জগতের মতোই বাস্তব। স্ফটিক দরজা বা crystal door হল অদৃশ্য বাস্তবতার জগতে যাবার একমাত্র দরজা। এই সাইকিয়াট্রিস্ট মনে করেন যে কৃত্রিম উপায়ে মানুষের মনে চাপ সৃষ্টি করে অদৃশ্য দরজা খোলা যেতে পারে। তিনি একটি কৃত্রিম উপায় বেরও করেছেন। তার উপর গবেষণা করছেন।

মনের উপর কৃত্রিম চাপ সৃষ্টির জন্যে তিনি উৎসাহী ভলেন্টিয়ারকে একটি সাত ফুট বাই সাত ফুট এয়ার টাইট ধাতব বাক্সে ঢুকিয়ে তালাবদ্ধ করে দেন। বাক্সের ভেতরটা ভয়ংকর অন্ধকার। বাইরের কোনো শব্দও সেখানে যাবার কোনো উপায় নেই। পরীক্ষাটা কী, কেমন ভাবে হবে তার কিছুই ভলেন্টিয়ারকে জানানো হয় না। সে কোনো রকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই বাক্সের ভেতর ঢোকে। তারপর হঠাৎ লক্ষ করে বাক্সের ভেতর পানি জমতে শুরু করছে। আস্তে আস্তে পানি বাড়তে থাকে। ভলেন্টিয়ার বাক্সের ভেতর দাঁড়ায়। ডাকাডাকি করতে শুরু করে। বাক্সের ডালায় ধাক্কা দিতে থাকে। কোনো উত্তর পায় না। এদিকে পানি বাড়তে বাড়তে তার গলা পর্যন্ত চলে আসে। সে প্রাণে বাঁচার জন্যে পায়ের আঙুলে ভর করে উঠে দাঁড়ায়। পানি বাড়তেই থাকে। পানি নাক পর্যন্ত যাবার পর পরীক্ষাটা বন্ধ হয়। তীব্র ভয়ে ভলেন্টিয়ার দিশাহারা হয়ে যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা ত্রিশভাগ ভলেন্টিয়ার পরীক্ষার শেষ পর্যায়ে হঠাৎ নিজেকে বাক্সের বাইরে আলো ঝলমল একটা জগতে দেখতে পায়। যে জগতের আলো পৃথিবীর আলোর মতো না। সেই আলোর বর্ণ সোনালি। সেই জগতের বৃক্ষরাজি পৃথিবীর বৃক্ষরাজির মতো না। সেই জগত অদ্ভুত অবাস্তব এক জগত। যেখানে অস্পষ্ট কিন্তু মধুর সঙ্গীত শোনা যায়। শতকরা দশভাগ ভলেন্টিয়ার নিজেদের আবিষ্কার করেন অন্ধকারে ধূম্রময় এক জগতে। সেই জগত আতঙ্ক এবং কোলাহলের জগত। বাকি ষাট ভাগ কিছুই দেখে না। তারা আতঙ্কময় এক অভিজ্ঞতা নিয়ে বাক্স থেকে বের হয়ে আসে।

আমি জেমস সাহেবের বইটি পড়ে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যাই যে শৈশবে মুহম্মদ ইদরিশ মাস্টার না জেনেই এ ধরনের একটি পরীক্ষা আমার উপর করেছিল। ভয়াবহ মানসিক চাপ সৃষ্টি করে স্ফটিক দরজা খোলার ব্যবস্থা করেছিল। আমি আমার পাঠ্য বিষয় গণিতশাস্ত্রের চেয়ে প্যারাসাইকোলজির বিষয়ে বেশি আগ্রহ বোধ করতে থাকি। এ ধরনের বইপত্র যেখানে যা পাই পড়ে ফেলার চেষ্টা করি। এটা করতে গিয়ে অনেক ভালো বই যেমন পড়েছি—অনেক মন্দ বইও পড়েছি। ভালো বই পড়ার উদাহরণ হিসেবে বলি—মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মানসিক জগত নিয়ে লেখা পেরিনের অসাধারণ বই Death call. পেরিন দেখিয়েছেন মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষদের মানসিক রূপান্তর একই ধারায় হয়। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে আসার পর হঠাৎ মনে হয় মানুষগুলি আর এ জগতে বাস করছে না। তারা অন্য কোনো জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছে। যে জগতটির সঙ্গে পৃথিবীর জগতের কোনোই মিল নেই। তাদের সেই জগতটি সত্য বলে মনে হয়।

পেরিনের লেখা আরেকটি বইও আমাকে আলোড়িত করেছিল। এই বইটি ক্যানসারে আক্রান্ত রুগীদের নিয়ে লেখা। রুগীরা জানেন তাদের মারণ ব্যাধিতে

ধরেছে। বাঁচার কোনো আশা নেই। তারপরেও মনের গভীর গোপনে বেঁচে থাকার আশা পোষণ করেন। তাঁরা ভাবেন একটা কিছু অলৌকিক ব্যাপার তাঁদের জীবনে ঘটবে। ঈশ্বর প্রার্থনা শুনবেন, তাঁদের আরোগ্য করবেন। ক্যানসারের কোনো অষুধ বের হয়ে যাবে। সেই অষুধে রোগমুক্তি ঘটবে। আশায় আশায় বাঁচতে থাকেন। এক সময় হঠাৎ করেই বুঝতে পারেন—কোনো আশা নেই। নিশ্চিত মৃত্যু সামনেই অপেক্ষা করছে। তখন তাঁরা অন্য রকম হয়ে যান। আত্মা তাঁদের ত্যাগ করে। আশা ত্যাগ করার পরও দুএক দিন তাঁরা বাঁচেন। সেই বাঁচা ভয়াবহ বাঁচা। মানুষটা বেঁচে আছে, কথা বলছে, খাচ্ছে ঘুমুচ্ছে কিন্তু মানুষটার আত্মা নেই।

আমার মায়ের বেলায় ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল। আত্মা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার!

বিলেতে পড়াশোনার সময়ই আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলি সুযোগ এবং সুবিধামতো আমি প্যারাসাইকোলজির উপর কিছু কাজ করব। সেই সুযোগের জন্যে আমাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়।

মিসির আলি খাতার উপর থেকে চোখ তুললেন। সুলতান এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। সে এসেছে নিঃশব্দে। মিসির আলি সুলতানের ঘরে ঢোকার শব্দ পান নি। সে যখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তখনই বুঝতে পেরেছেন।

সুলতান খাটে বসতে বসতে বলল, সন্ধ্যাবেলা পড়াশোনার জন্যে ভালো না। মিসির আলি কিছু বললেন না। সুলতান বলল, আপনি গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার লেখা পড়ছেন দেখে ভালো লাগল। ঘটনাগুলি আমি মোটামুটি ভালোই গুছিয়ে লিখেছি।

মিসির আলি বললেন, আমি যখন কিছু পড়ি মন দিয়েই পড়ি। তুমি গুছিয়ে না লিখলেও আমি মন দিয়েই পড়তাম।

সুলতান বলল, এইখানে আপনার সঙ্গে আমার কিছু মিল আছে। আমি যখন যা করি মন দিয়েই করি। যখন আকাশের তারা দেখি, খুব মন দিয়ে দেখি। যখন মনে করি কারো উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করব তখন সেই কাজটাও খুব মন দিয়ে করি।

ভালো।

সুলতান বলল, ভালোমন্দ বিবেচনা করে আমি কিছু করি না। আমাকে যা করতে হবে সেটা আমি করি। যাই হোক এটা নিয়ে পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে। আপনি একটা কাজ করুন। পুরো খাতাটা এখন পড়ার দরকার নেই। ধীরে সুস্থে পড়বেন। আমার ধারণা আপনি পড়ার অনেক সময় পাবেন। এখন শুধু সালমার অংশটা পড়ুন। এই মেয়েটি হচ্ছে আমার বর্তমান গবেষণা সাবজেক্ট। মেয়েটার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। তার বিষয়ে আগে জানা থাকা ভালো।

মিসির আলি খাতা বন্ধ করতে করতে বললেন, তোমাদের ঐ কুয়াতে কি শুধু মুহম্মদ ইদরিশ মাস্টারই আছে? নাকি আরো অনেকে আছে?

সুলতান হাসি মুখে তাকিয়ে রইল—জবাব দিল না। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে খুব মজার কোনো কথা শুনল।

মিসির আলি বললেন, তোমার স্ত্রী কোথায়? লিলি?

সুলতান হাই তুলতে তুলতে বলল, ও অসুস্থ।

মিসির আলি বললেন, তোমার পরীক্ষা নিরীক্ষায় লিলি সাহায্য করে না?

সুলতান বলল, ওর সাহায্যের তেমন প্রয়োজন পড়ে না। ও ভলেন্টিয়ার যোগাড় করে আনে। আপনাকে যেমন আনল। অবিশ্যি আপনাকে ভলেন্টিয়ার বলা ঠিক হচ্ছে না। বিপজ্জনক কাজে ভলেন্টিয়ার পাওয়া যায় না—জোর করে বানাতে হয়। আপনি অকারণে কথা বলে সময় নষ্ট করছেন। সালমার বিষয়ে কী লিখেছি তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলুন। এক শ ছয় পৃষ্ঠায় পাবেন। আমি বরকতকে দিয়ে হারিকেন পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভালো কথা চা খাবেন? আপনাকে আজ মনে হয় বৈকালিক চা দেওয়া হয় নি। লিলি অসুস্থ হওয়ায় একটু সমস্যা হয়েছে। খাবারদাবারের ব্যবস্থাটা খানিকটা এলোমেলো হয়েছে।

সুলতান উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি হারিকেনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সালমার বিষয়ে কী লেখা আছে মন দিয়ে পড়তে হবে। মিসির আলি খাতা খুললেন। এক শ ছয় পৃষ্ঠা বের করলেন। এখনো ঘরে কিছু আলো আছে, পড়া শুরু করা যেতে পারে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই হারিকেন চলে আসবে।

স্যাম্পল নাম্বার ৭
নাম : সালমা
বয়স : পনের থেকে ষোল
পড়াশোনা : নবম শ্রেণীর ছাত্রী
বুদ্ধি : ভালো। বেশ ভালো।

জীব হিসেবে মানুষকে যতটা ভঙ্গুর মনে করা হয় সে তত ভঙ্গুর না। মানুষের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করা কঠিন কাজ। মস্তিষ্কের ডিফেন্স ম্যাকানিজম প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রবল। মানসিক চাপ প্রতিরোধে সে তার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে। আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে মানুষের এই ক্ষমতা অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। সালমার বিষয়েও একই ব্যাপার ঘটেছে। তার উপর সৃষ্টি করা মানসিক চাপ সে নিজস্ব ডিফেন্স ম্যাকানিজমের মাধ্যমে প্রতিহত করছে। আমি প্রতিদিনের পর্যবেক্ষণ লিখে যাচ্ছি।

১৮.৪.৮০

সালমাকে প্রথম সংগ্রহ করা হল। সংগ্রহ পদ্ধতি অবান্তর বলে উল্লেখ করছি না। বাবা-মা-ভাই-বোন ছেড়ে হঠাৎ এই নতুন জায়গায় উপস্থিত হয়ে সে প্রথমে খুবই ঘাবড়ে গেল। আমি অতি দ্রুত তার ভয় দূর করলাম। তাকে বলা হল আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বাবা মাকে খুঁজে বের করে তাকে তাদের কাছে পাঠাব। মেয়েটি মিশুক প্রকৃতির। প্রাথমিক শঙ্কা ও ভয় সে দ্রুত কাটিয়ে উঠল। রাতে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে গল্প করলাম। পড়াশোনার খোঁজ নিলাম। সে জানাল যে তার ভীতির বিষয় একটাই তা হল অংক। তার ধারণা সে এস.এস.সি.তে সব বিষয়ে পাস করলেও অংকে ফেল করবে। আমি তার অংক ভীতি কাটানোর জন্যে অংক নিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করলাম। নয় সংখ্যাটির অদ্ভুত গুণ ব্যাখ্যা করলাম। যেমন ৯ এমন একটা সংখ্যা যাকে যে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে এবং গুণফলের সাথে সংখ্যাগুলিকে যোগ করলে আবার ৯ হয়।

৯ × ৬ = ৫৪ ; ৫ + ৪ = ৯

৯ × ১৬ = ১৪৪ ; ১ + ৪ + ৪ = ৯

সালমা এতে খুবই মজা পেল। নিজেই ব্যাপারটা পরীক্ষা করল। এবং জানতে চাইল—৯-এর বেলায় এরকম কেন হচ্ছে? বোঝা যাচ্ছে মেয়েটির বুদ্ধি ভালো। অল্প বুদ্ধির মেয়ে অংকের এই ব্যাপারটা ধরতে পারত না।

১৯-৪-৮০

আজ সালমার উপর প্রথম মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হল। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম সে কুমারী কি না। প্রথম কিছুক্ষণ প্রশ্নটা সে ধরতেই পারল না। তাকে কুমারী বলতে কী বোঝাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করার পর সে হতভম্ব হয়ে গেল। সে কল্পনাও করে নি এ ধরনের কোনো প্রশ্ন আমি তাকে করতে পারি। সে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। আমি কঠিন ধমক দিয়ে তার কান্না থামিয়ে খুবই শান্ত গলায় বললাম যে তাকে এখানে আনা হয়েছে গৌর কালীর মন্দিরে দেবীর উদ্দেশে বলি দেওয়ার জন্যে। বলিদানের জন্যে কুমারী মেয়ে প্রয়োজন বলেই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে।

তাকে দেবীমূর্তি দেখিয়েও আনলাম। সে জানতে চাইল কবে বলি দেওয়া হবে। আমি বললাম অমাবস্যায়। মেয়েটি সারারাত অচেতনের মতো পড়ে রইল। তার শরীরের উত্তাপ বাড়ল। রাতে ভুল বকতে থাকল।

২০-৪-৮০

সকালবেলা মেয়েটা আমার সঙ্গে খুবই স্বাভাবিক ব্যবহার করল এবং ভীত গলায় বলল—গত রাতে সে ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। দুঃস্বপ্নে একজন কেউ তাকে এসে বলেছে যে তাকে মা কালীর কাছে বলি দেওয়া হবে। মেয়েটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, চাচা এমন একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন কেন দেখলাম?

মেয়েটির নিজস্ব ডিফেন্স ম্যাকানিজম কাজ করতে শুরু করেছে। তার মস্তিষ্ক তাকে নিশ্চিতভাবে বুঝিয়েছে কাল রাতের ঘটনাটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই না।

দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পাওয়া যেতে পারে, তবে দুঃস্বপ্ন কেটে গেলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তার সময়টা স্বপ্ন এবং জাগরণ—এই দুইয়ের ভেতর ভাগ করে নিল। যখনই সে ভয় পাচ্ছে তখনি ভাবছে এটা স্বপ্ন, কিছুক্ষণের মধ্যে স্বপ্ন কেটে যাবে এবং সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

২১-৪-৮০

আজ সালমাকে রাতে থাকতে দেওয়া হল মন্দিরে। মন্দিরে সামান্য আলোর ব্যবস্থা রাখা হল। গাঢ় অন্ধকারে মানুষ ভয় পায় না। ভয় পাবার জন্যে আলো-আঁধার প্রয়োজন। কুকুর তিনটা মন্দিরের চারপাশে যেন ঘুরপাক খায় সেই ব্যবস্থা করা হল। মন্দিরের মূল দরজা খোলা। আমার দেখার ইচ্ছা মেয়েটি কী করে। সে তেমন কিছু করল না। সারারাত মূর্তির গা ঘেঁষে বসে রইল। মাঝে মাঝে দেখছি তার ঠোঁট নড়ছে। সে হয়তো কথা বলছে মূর্তির সঙ্গে। আমার ধারণা মূর্তিটাকে সে ভয়ঙ্কর হিসেবে না নিয়ে বন্ধু হিসেবে নিয়েছে। কারণ মূর্তিটা দেখতে লিলির মতো। সালমা লিলিকে চেনে। মূর্তির গা ঘেঁষে বসে থাকার এই একটিই যুক্তি। তাকে অবিশ্যি অমাবস্যা কবে তা জানানো হয়েছে। অমাবস্যার মধ্যরাতে ঘটনা ঘটানো হবে তাও বলা হয়েছে। জেমস

হাউলারের বিখ্যাত পরীক্ষার মতো পরীক্ষা। তাঁর পরীক্ষার বাক্সে পানি জমতে শুরু করেছে। আমার পরীক্ষায় অমাবস্যা এগিয়ে আসছে। হা হা হা।

মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন। তাঁর মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন সালমা নামের মেয়েটি আজ রাতেই মহাবিপদে পড়তে যাচ্ছে। সুলতান তার বিখ্যাত পরীক্ষা সালমাকে নিয়ে করছে না। সে পরীক্ষাটি করছে মিসির আলি নামের একজনকে নিয়ে যাকে সে মানসিকভাবে নিজের কাছাকাছি ভাবছে। মিসির আলি মোটামুটি নিশ্চিত যে সুলতান মধ্যরাতে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটাবে তাঁকে ভয় দেখানোর জন্যে। বাচ্চা একটি মেয়ের মানসিক পরিবর্তন নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। সালমা মেয়েটি তার সাবজেক্ট না। তার সাবজেক্ট মিসির আলি। মেয়েটির মৃত্যুতে তার কিছু যায় আসে না। তার আগ্রহ কৌতূহল মিসির আলিকে নিয়ে। যে কারণে সালমা মেয়েটিকে যোগাড় করার পরই মিসির আলি নামের মানুষটাকে এখানে আনার জন্যে ব্যবস্থা করেছে। সুলতানের মতো মানুষেরা একটা পর্যায়ে বুদ্ধির খেলা খেলতে চায়। আমিই শ্রেষ্ঠ এটা প্রমাণ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এটা তাদের একটা খেলা। শিশুদের সঙ্গে সিরিয়াল কিলারদের কোথায় যেন সামান্য মিল আছে। শিশুদের কাছে যেমন সবই খেলা এদের কাছেও তাই।

সালমা মেয়েটিকে রক্ষা করার কোনো উপায় কি আছে? খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে এবং অতি দ্রুত ভাবতে হবে। হাতে সময় খুব বেশি নেই। সুলতানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে তিনি নামতে পারছেন না। মানসিক যুদ্ধ অবশ্যই করা যাবে কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্র কি তাঁর কাছে আছে?

সুলতানের বিষয় অংক। কাজেই যুক্তি ব্যাপারটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হবার কথা। যুক্তির ক্ষমতার প্রতি তার আস্থা অবশ্যই থাকবে। সুলতানের মানসিক দুর্গে তাঁকে পৌঁছতে হবে যুক্তির সিঁড়িতে পা রেখে। এমন যুক্তি যা সুলতানকে গ্রহণ করতে হবে। তিনি কি পারবেন? মিসির আলি চোখ বন্ধ করে আছেন। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। তিনি অনুভব করলেন তাঁর শরীর কাঁপছে। এটা ভালো লক্ষণ না। এটা বয়সের লক্ষণ। জরার লক্ষণ।

'দিধ্বং নো অত জরসে নিনেষজ্
জরা মৃত্যুবে পরি নো দদাত্যথ
পক্কেন সহ সংভবেম'

আমার ভাগ্য আমাকে নিয়ে যাবে জরায়, জরা নিয়ে যাবে সেই মৃত্যুতে যা আমাকে অসীমের সঙ্গে যুক্ত করবে।

মিসির আলির ঘুম পাচ্ছে। তিনি বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর শীত লাগছে। শীতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। তিনি গায়ের উপর চাদর টেনে দিলেন। তিনি কিছুক্ষণ ঘুমুবেন। মধ্যরাতের আগেই সুলতান নিশ্চয়ই তাঁকে ডেকে নিয়ে যাবে। হয়তো তখনি সালমার সঙ্গে দেখা হবে। হত্যাকাণ্ডটা যে খুব সহজ হবে তাও মনে হয় না। সুলতানের মতো মানুষেরা ড্রামা পছন্দ করে। হয়তো মেয়েটাকে স্নান করানো হবে। নতুন কাপড় পরানো হবে। গলায় দেওয়া হবে জবা ফুলের মালা। এই ফুল প্রাচীন ভারতের অনেক নররক্তের সাক্ষী। ঘুমের মধ্যে মিসির আলি বিড়বিড় করে বললেন, সালমা

মাগো, ভয় পেও না। আমি আছি তোমার পাশে। আমি সাধারণ কেউ না মা, আমি মিসির আলি।

সুলতান মরিচ ফুল গাছের বেদিতে বসে আছে। তার সামনে হারিকেন। হারিকেনের আলোয় সুলতানের মুখ দেখা যাচ্ছে। আনন্দময় মানুষের মুখ। সে হাত দিয়ে মাথার চুল টানছে। কিন্তু তাতে কোনো অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে না। সুলতানের সামনে দুটা পিরিচে ঢাকা কফির মগ। মিসির আলি এসে বেদিতে বসলেন। সুলতান কফির মগ মিসির আলির হাতে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আমি এর মধ্যে দুবার খোঁজ নিয়েছিলাম। দেখলাম আপনি ঘুমাচ্ছেন। স্যার আপনার ঘুম কি ভালো হয়েছে?

হ্যাঁ ভালো হয়েছে।

সুলতান হাসিমুখে বলল, এমন পরিস্থিতিতে কেউ ঘুমুতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

মিসির আলি বললেন, পরিস্থিতি কি খুব খারাপ?

খারাপ তো বটেই, আজ অমাবস্যা না? আমি সালমা মেয়েটার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ও আসলে আমার পরীক্ষায় কোনো কাজে আসছে না। তাকে তো আর ফেরতও পাঠাতে পারি না। এই রিস্ক আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব না। কাজেই অন্য ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। কফি খেতে কেমন হয়েছে?

ভালো হয়েছে।

সালমা মেয়েটির সঙ্গে কি কথা বলবেন?

না।

না কেন?

মিসির আলি জবাব দিলেন না। কফির মগে চুমুক দিতে লাগলেন। একবার তাকালেন মরিচ ফুল গাছটার দিকে। গাছ ভর্তি জোনাকি। জ্বলছে, নিভছে। এত সুন্দর লাগছে দেখতে যে তিনি চোখ ফেরাতে পারছেন না।

স্যার কী দেখছেন?

জোনাকি। অনেকদিন পর জোনাকি দেখলাম। অপূর্ব দৃশ্য! মনে হচ্ছে আকাশের সব তারা গাছে নেমে এসেছে।

সুলতান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আপনি জোনাকি দেখে অভিভূত হচ্ছেন, মেয়েটিকে রক্ষা কীভাবে করা যায় এই বিষয়ে ভাবছেন না?

ভাবছি। কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থেকে অন্য কিছু ভাবা সহজ।

ভেবে কিছু পেয়েছেন?

হ্যাঁ।

কী পেয়েছেন? আচ্ছা আমিই বলি আপনি কী পেয়েছেন—আপনি ঠিক করেছেন যুক্তি দিয়ে আমার সিদ্ধান্ত বদলাবেন। আপনার ঝুলিতে যেসব ধারালো যুক্তি আছে তার সব একের পর এক করবেন। সক্রেটিসের বিখ্যাত যুক্তিটা দিতে পারেন। সক্রেটিস বলেছেন, "কোনো মানুষই জেনেশুনে মন্দ কাজ করে না।"

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, এইসব যুক্তি তোমার বেলায় খাটবে না।

তোমাকে যা করতে হবে তা হল—তোমার মনের ভেতরে, চেতনার গভীরে যে ভয় বাস করছে তাকে বের করে আনা।

সুলতান শীতল গলায় বলল, আমার ভেতরে ভয় বাস করছে? কীসের ভয়?

মিসির আলি বললেন, কুয়ার ভয়। গৌর কালীমূর্তি এসে স্বপ্নে তোমাকে বলে গেল কখনো যেন কুয়ার পাশে না যাও। কুয়াতে ভয়ঙ্কর কিছু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। গৌর কালী বলে তো কিছু নেই। তোমার অবচেতন মন গৌর কালীকে সৃষ্টি করেছিল। সেই অবচেতন মনই ভয়টাকেও সৃষ্টি করেছে। সেই ভয় বাস করছে কুয়ার ভেতরে। আমি যুক্তি দিয়ে কথা বলছি তুমি কি যুক্তিগুলি বুঝতে পারছ?

পারছি।

কুয়ার পাশে যেই মুহূর্তে তুমি দাঁড়াবে প্রবল ভয় তোমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করবে। অবচেতন মন তোমাকে ভয়ঙ্কর কিছু দেখাবে। কী দেখবে আমি জানি—হয়তো দেখবে কুয়ার গা বেয়ে ইদরিশ মাস্টার উঠে আসছে। তাকে দেখাচ্ছে একটা কুৎসিত মাকড়সার মতো। কিংবা এর চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু দেখাবে।

সুলতান হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, আপনি যা বলছেন ঠিক আছে। আমি সেটা জানি। জানি বলেই কখনো কুয়ার পাশে যাই না। কারো পক্ষেই আমাকে কুয়ার পাশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, তোমাকে কুয়ার কাছে যেতে হবে কেন? কুয়া তোমার কাছে চলে আসবে। তুমি বসে আছ বেদিতে, তুমি দেখবে কুয়া ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তোমার দিকে।

সুলতান তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তার মানে?

মিসির আলি বললেন, তুমি আকাশের তারা দেখ—এই ব্যাপারটি তুমি সবচেয়ে ভালো বুঝবে। আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় না আকাশের তারা নিচে নেমে আসছে। অনেকটা সে রকম। দৃষ্টি বিভ্রম। কুয়া থাকবে কুয়ার জায়গায় অথচ তোমার মনে হবে কুয়া জীবন্ত প্রাণীর মতো এগিয়ে আসছে।

সুলতান চাপা গলায় বলল, আপনি আমার সঙ্গে একটা ট্রিকস করার চেষ্টা করছেন।

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ করছি। তোমার মনের গভীরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ভয়টাকে বের করে এনেছি। ভয়ে তোমার চেতনা যখন অসাড় হয়ে এসেছে তখন বলেছি কুয়া এগিয়ে আসছে। তোমার অবচেতন মন তা গ্রহণ করেছে। একে সাইকোলজির ভাষায় বলে induced hallucination. তোমার চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারছি তুমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ কুয়া তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। তোমার মনও আমাকে খানিকটা সাহায্য করেছে। এই কুয়াটার প্রতি তোমার তীব্র আকর্ষণ। তুমি সব সময় তার কাছে যেতে চেয়েছ। কিছুক্ষণের ভেতর কুয়াটাকে তুমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখবে। তোমার ইচ্ছা করবে না, তরপরেও তুমি উঁকি দেবে—এবং যে ভয় তুমি পাবে সেই ভয়ের জন্ম এই পৃথিবীতে নয়। অন্য কোনো জগতে।

সুলতান চিৎকার করে উঠল, স্টপ, প্লিজ স্টপ। স্টপ ইট প্লিজ।

সুলতান বিকৃত গলায় চেঁচাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে শুরু করেছে। ছুটে এসেছে লিলি। কিছুদূর এসেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সুলতান চিৎকার করেই যাচ্ছে।

সে থরথর করে কাঁপছে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মরিচ ফুলের গাছের বেদির দিকে। ভয়ঙ্কর কিছু সে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছে।

মিসির আলি শান্ত ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন। এগিয়ে গেলেন মন্দিরের দিকে। সালমা মেয়েটি নিশ্চয়ই মন্দিরে আছে। বেচারি হয়তো ভয়েই মরে যাচ্ছে! তার ভয়টা কাটানো দরকার।

সালমা মূর্তির আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসে ছিল। মিসির আলিকে দেখে সে চোখ বড় বড় করে তাকাল। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, কেমন আছ গো মা? মেয়েটা জবাব দিল না। তার চোখ ভর্তি হয়ে গেল পানিতে।

মিসির আলি বললেন, আমার ছোট্ট মায়ের চোখে পানি কেন? কাছে এস চোখ মুছিয়ে দেই। এস জোনাকি পোকা দেখি। আমি আমার জীবনে এক সঙ্গে এত জোনাকি দেখি নি।

বাঘবন্দি মিসির আলি

১

যখন যা প্রয়োজন তা হাতের কাছে পাওয়া গেলে কেমন হত—এরকম চিন্তা ইদানীং মিসির আলি করা শুরু করেছেন। এবং তিনি খানিকটা দুশ্চিন্তায়ও পড়েছেন। মানুষ যখন শারীরিক এবং মানসিকভাবে দুর্বল হয় তখনই এ ধরনের চিন্তা করে। তখনই শুধু মনে হয়—সব কেন হাতের কাছে নেই। তিনি মানসিক এই অবস্থার নাম দিয়েছেন—বেহেশত কমপ্লেক্স। এ ধরনের ব্যবস্থা ধর্মগ্রন্থের বেহেশতের বর্ণনায় আছে। যা ইচ্ছা করা হবে তাই হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আঙুর খেতে ইচ্ছে করছে, আঙুরের থোকা ঝুলতে থাকবে নাকের কাছে।

মিসির আলি খাটে শুয়ে আছেন। পায়ের কাছের জানালাটা খোলা। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। গা শিরশির করছে। এবং তিনি ভাবছেন—কেউ যদি জানালাটা বন্ধ করে দিত। ঘরে কাজের একটা ছেলে আছে ইয়াসিন নাম। তাকে ডাকলেই সে এসে জানালা বন্ধ করে দেবে। ডাকতে ইচ্ছা করছে না। তাঁর পায়ের কাছে ভাঁজ করা একটা চাদর আছে। ভেড়ার লোমের পশমিনা চাদর। নেপাল থেকে কে যেন তাঁর জন্য নিয়ে এসেছিল। ইচ্ছা করলেই তিনি চাদরটা গায়ে দিতে পারেন। সেই ইচ্ছাও করছে না। বরং ভাবছেন চাদরটা যদি আপনাআপনি গায়ের ওপর পড়ত তা হলে মন্দ হত না। নেপাল থেকে চাদরটা কে এনেছিল? নাম বা পরিচয় কিছুই মনে আসছে না। উপহারটা তিনি ব্যবহার করছেন, কিন্তু উপহারদাতার কথা তাঁর মনে নেই। এই ব্যর্থতা মানসিক ব্যর্থতা।

রাত কত হয়েছে মিসির আলি জানেন না। এই ঘরে কোনো ঘড়ি নেই। বসার ঘরে আছে। সময় জানতে হলে বসার ঘরে যেতে হবে, ঘড়ি দেখতে হবে। ইয়াসিনকে সময় দেখতে বললে লাভ হবে না। সে ঘড়ি দেখতে জানে না। অনেক চেষ্টা করেও এই সামান্য ব্যাপারটা ইয়াসিনকে তিনি শেখাতে পারেন নি। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে শিক্ষক হিসেবে তিনি ব্যর্থ। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই ব্যর্থতাটাও তিনি নিতে পারছেন না। এটাও মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ। মানসিকভাবে দুর্বল মানুষ ব্যর্থতা নিতে পারে না। মানসিকভাবে সবল মানুষের কাছে ব্যর্থতা কোনো ব্যাপার না। সে জানে সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুই সহোদর বোন। এরা যে কোনো মানুষের চলার পথে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে। সাফল্য নামের বোনটি দেখতে খুব সুন্দর। তার পটলচেরা চোখ, সেই চোখের আছে জন্ম কাজল। তার মুখে প্রথম প্রভাতের রাঙা আলো ঝলমল

করে। আর ব্যর্থতা নামের বোনটি কদাকার, মুখে বসন্তের দাগ, চোখে অল্প বয়সে ছানি পড়েছে। সবাই চায় রূপবতী বোনটির হাত ধরতে। কিন্তু তার হাত ধরার আগে কদাকার বোনটির হাত ধরতে হবে এই সহজ সত্যটা বেশিরভাগ মানুষের মনে থাকে না। মানুষের মন যতই দুর্বল হয় ততই সে ঝুঁকতে থাকে রূপবতী বোনটির দিকে। এটা অতি অবশ্যই মানসিক জড়তার লক্ষণ।

'স্যার ঘুম পাড়ছেন?'

মিসির আলি উঠে বসলেন। দাঁত কেলিয়ে ইয়াসিন দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স বার-তের। হাবাগোবা চেহারা। কিন্তু হাবাগোবা না। যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। শুধু বুদ্ধির ছাপ চেহারায় আসে নি। ঠোঁটে গোঁফের ঘন রেখা জাগতে শুরু করেছে, এতে হঠাৎ করে তাকে খানিকটা ধূর্তও মনে হচ্ছে। যদিও তিনি খুব ভালো করেই জানেন ইয়াসিন ধূর্ত না। ইয়াসিনকে অনেকবার বলা হয়েছে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকা অবস্থায় তাঁকে যেন কখনো জিজ্ঞাসা করা না হয়—"তিনি ঘুম পাড়ছেন না পাড়েন নি।" কোনো লাভ হয় নি। বরং উল্টোটা হয়েছে, তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলেই ইয়াসিন তাঁকে ডেকে তোলাকে তার দায়িত্বের অংশ বলে মনে করা শুরু করেছে। এবং সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্যে তাকে বেশ আনন্দিতও মনে হচ্ছে।

মিসির আলি শান্ত গলায় বললেন, ক'টা বাজে দেখে আয় তো। ইয়াসিন উৎসাহের সঙ্গে রওনা হল। তার যাবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে হয়তো আজ সে সময়টা বলতে পারবে। গতকাল রাতেও তিনি ছবিটবি এঁকে ঘড়ির সময় বোঝানোর চূড়ান্ত চেষ্টা করেছেন। ইয়াসিনের ঘন ঘন মাথা নাড়া দেখে মনে হয়েছে সে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। দেখা যাক।

ইয়াসিন হাসিমুখে ফিরে এল। মিসির আলি বললেন, ক'টা বাজে?

ইয়াসিনের মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হল। আনন্দময় গলায় বলল, বুঝি না। আউলা ঠেকে।

ছোট কাঁটা ক'টার ঘরে?

'তিনের ঘরে।'

'আর বড়টা?'

'ছোট জন যে ঘরে। বড় জনও একই ঘরে।'

মিসির আলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। দশটার বেশি রাত হয় নি। ছোট কাঁটা তিনের ঘরে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ছোট কাঁটা বড় কাঁটার ব্যাপারটাই হয়তো ইয়াসিন বোঝে নি। গোড়াতেই গিট্টু লেগে আছে।

'স্যার চা খাইবেন?'

'না।'

'দরজা বন কইরা দেন। কাইল সক্কালে আমুনে।'

'আজ না গেলে হয় না?'

'হয়। না গেলেও হয়। যাই গা। কাইল সক্কালে আমু।'

মিসির আলি উঠলেন। ইয়াসিন একবার যখন বলেছে যাবে তখন সে যাবেই। ইয়াসিনের বাবা—ফার্মগেট এলাকায় ভিক্ষা করে। ভিক্ষুক বাবার খোঁজখবর করার জন্য

সে প্রায়ই যায়। মাঝে মধ্যে নিজেও ভিক্ষা করে। ইয়াসিনরা তিন পুরুষের ভিক্ষুক। তার দাদাও ভিক্ষা করতেন। মিসির আলি ব্যাপক চেষ্টা করছেন পুরুষানুক্রমিক এই পেশা ভাঙার। ইয়াসিনকে এনে কাজ দিয়েছেন। লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেছেন। মাঝে মাঝে বক্তৃতা—মানুষ পৃথিবীতে দুটা হাত নিয়ে এসেছে কাজ করার জন্য ভিক্ষা করার জন্য না। আল্লাহ যদি চাইতেন মানুষ ভিক্ষা করবে তা হলে তাকে একটা হাত দিয়েই পৃথিবীতে পাঠাতেন। ভিক্ষার থালা ধরার জন্য একটা হাতই যথেষ্ট। মনে হচ্ছে না শেষ পর্যন্ত উপদেশমূলক বক্তৃতায় কোনো লাভ হবে। ইয়াসিনের প্রধান ঝোঁক ভিক্ষার দিকে। মিসির আলি নিশ্চিত আজ সে ভিক্ষা করার জন্যই যাচ্ছে। বিষ্যুদবার রাতে বাবার সঙ্গে সে আজিমপুর গোরস্থানের গেটে ভিক্ষা করতে যায়।

মিসির আলি বললেন, ভিক্ষা করতে যাচ্ছিস?

ইয়াসিন জবাব দিল না। উদাস দৃষ্টিতে তাকাল।

'সকালে কখন আসবি?'

'দেখি।'

'সকাল দশটার পরে এলে কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারবি না। আমি তালা দিয়ে চলে যাব। এগারোটার সময় আমার একটা মিটিং আছে। তুই অবিশ্যি দশটার আগে চলে আসবি।'

'দেখি।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন, ইয়াসিন তার ট্রাঙ্ক নিয়ে বের হচ্ছে। ভালো সম্ভাবনা যে সে আর ফিরবে না। নিজের সব সম্পত্তি নিয়ে বের হচ্ছে। এই ট্রাঙ্কটা সম্পর্কে মিসির আলির সামান্য কৌতূহল আছে। ইয়াসিন ট্রাঙ্কে বড় একটা তালা ঝুলিয়ে রাখে। গভীর রাতে শব্দ শুনে মিসির আলি টের পান যে তালা খোলা হচ্ছে।

'তুই কি সকালে সত্যি আসবি?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রাঙ্ক নিয়ে যাচ্ছিস কেন?'

'প্রয়োজন আছে।'

'আচ্ছা যা।'

ইয়াসিন পা ছুঁয়ে তাকে সালাম করল। এটা নতুন কিছু না। ইয়াসিন বাইরে যাবার আগে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করে।

মিসির আলি বিছানা থেকে নামলেন। দরজা বন্ধ করে ঘড়ি দেখতে বসার ঘরে গেলেন। ঘড়ির দুটা কাঁটা তিনের ঘরে এই কথাটা ইয়াসিন মিথ্যা বলে নি। তিনটা পনেরো মিনিটে ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাটারি শেষ হয়েছে নিশ্চয়ই। ঘরে একটা মাত্র ঘড়ি। তাঁর নিজের হাতঘড়িটা মাস তিনেক হল হারিয়েছেন। কাজেই রাতে আর সময় জানা যাবে না।

মিসির আলি সূক্ষ্ম অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলেন। তাঁর মনে হল সময় জানাটা খুবই দরকার। ঘরে খাবার পানি না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে পানির পিপাসা পেয়ে যায়। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি শুকিয়ে আসে। ঘরে পানি থাকলে কখনো এত তৃষ্ণা পেত না।

সময় জানার জন্য মিসির আলি উসখুস করতে লাগলেন। যদিও সময় এখন না জানলেও কিছু না। তাঁর ঘুমিয়ে পড়ার কথা। শরীর ভালো যাচ্ছে না। বুকে প্রায় সময়ই চাপ বোধ করেন। রাতে হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। তখন মনে হয় বুকের উপর কেউ যেন বসে আছে। সেও স্থির হয়ে বসে নেই, নড়াচড়া করছে। তিনি উঠে বসেন। বিছানা থেকে নামেন। বুকের উপর বসে থাকা বস্তুটা কিন্তু তখনো থাকে। টিকটিকির মতো বুকে সেঁটে থাকে। এইসব লক্ষণ ভালো না। এসব হচ্ছে ঘণ্টা বাজার লক্ষণ। প্রতিটি জীবিত প্রাণীর জন্য ঘণ্টা বাজানো হয়। জানিয়ে দেওয়া হয় তোমার জন্য অদৃশ্য ট্রেন পাঠানো হল। এ তারই ঘণ্টা। ভালো করে তাকাও দেখবে সিগন্যাল ডাউন হয়েছে। ট্রেন চলে আসার সবুজ বাতি জ্বলে উঠেছে। ট্রেন থামতেই তুমি টুক করে তোমার কমরায় উঠে পড়বে। না তোমাকে কোনো সুটকেস বেডিং নিতে হবে না। ট্রেনটা যখন তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তখন যেভাবে এসেছিলে যাবেও সেইভাবে। ট্রেন থামতে থামতে যাবে, নানান যাত্রী উঠবে—সবার গন্তব্য এক জায়গায়। সে জায়গাটা সম্পর্কে করোরই কোনো ধারণা নেই।

মিসির আলি দরজা খুললেন। বারান্দায় এস বসলেন। বুকে চাপ ব্যথাটা আবারো অনুভব করছেন। ফাঁকা জায়গায় বসে বড় বড় নিশ্বাস ফেললে আরাম হবার কথা। সেই আরামটা হচ্ছে না। মিসির আলির দু কামরার এই বাড়িটার আবার একটা বারান্দাও আছে। গ্রিল দেওয়া বারান্দা। বারান্দাটা এত ছোট যে দুটা চেয়ারেই বারান্দা ভর্তি। মিসির আলি এই বারান্দায় কখনো বসেন না। গ্রিল দেওয়ার কারণে বারান্দাটা তাঁর কাছে জেলখানার গরাদের মতো লাগে। বারান্দা থাকবে খোলামেলা। এবং অতি অবশ্যই বারান্দা থেকে আকাশ দেখা যাবে। জানালা মানে যেমন আকাশ, বারান্দা মানেও আকাশ। গ্রিল দেওয়া এই বারান্দা থেকে আকাশ দেখা যায় না।

বারান্দা থেকে বাড়িওয়ালা বাড়ির খানিক অংশ এবং নর্দমাসহ গলি ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। মিসির আলির খুব ইচ্ছা অন্তত জীবনের শেষ কিছু দিন তিনি এমন একটা বাড়িতে থাকবেন যে বাড়ির বড় বড় জানালা থাকবে। জানালার পাশ থেকে আকাশ দেখা যাবে। জীবনের শেষ সময় এসে পড়েছে বলেই তাঁর ধারণা—জানালাওয়ালা বারান্দার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয় নি। তবে তাঁর ধারণা তাঁর শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ হবে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর আত্মীয়স্বজনরা অবশ্যই তাকে কোনো একটা ভালো ক্লিনিকে ভর্তি করবে। সেই ক্লিনিকের ভাড়া তিনি দিতে পারবেন কি পারবেন না তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

ক্লিনিকে তাঁর বিছানাটা থাকবে জানালার কাছে। তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে পারবেন। ডাক্তার এবং নার্সরা মিলে তাঁর জীবন রক্ষার জন্যে যখন ছোটাছুটি করতে থাকবেন, তিনি তখন তাকিয়ে থাকবেন আকাশের দিকে। মৃত্যুর আগে আগে শারীরবৃত্তির সকল নিয়মকানুন এলোমেলো হয়ে যায়। কাজেই তিনি হয়তো তখন আকাশের কোনো অদ্ভুত রঙ দেখবেন। নীল আকাশ হঠাৎ দেখা গেল গাঢ় সবুজ হয়ে গেছে। কিংবা আকাশ হয়েছে বেগুনি। বেগুনি তাঁর প্রিয় রঙ।

'স্যার স্লামালিকুম।'

মিসির আলি চমকে তাকালেন। বাড়িওয়ালা বদরুল সাহেবের ভাগ্নে ফতে মিয়া।

আপন ভাগ্নে না। দূরসম্পর্কের ভাগ্নে। ফতে মিয়া মিসির আলির ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তিনি তাকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেন নি। যখন চোখ বন্ধ করে ছিলেন তখন এসেছে। ফতে মিয়ার চলাফেরা সম্পূর্ণ নিঃশব্দ। মানুষটা মনে হয় বাতাসের ওপর চলে। মানুষটা বাতাসের ওপর দিয়ে চলাফেরা করার মতো ছোটখাটো না। তার শরীর–স্বাস্থ্য ভালো। শুধু শরীরের তুলনায় মাথাটা ছোট। দেখে মনে হয় খুব রোগা কোনো মানুষের মাথা একজন কুস্তিগিরের শরীরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফতে মিয়ার গলার স্বর পরিষ্কার। ঝনঝন করে কথা বলে।

'ফতে মিয়া কেমন আছ?'

'স্যার আপনার দোয়া।'

'সঙ্গে ঘড়ি আছে? ক'টা বাজে বলতে পার?'

'দশটা চল্লিশ।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন সময় বলতে গিয়ে ফতে ঘড়ি দেখল না। এটা তেমন কোনো ব্যাপার না। ঘড়ি হয়তো সে একটু আগেই দেখেছে। তার পরেও মানুষের স্বভাব হল সময় বলার আগে ঘড়ি দেখে নেওয়া। ফতে মিয়া সময় বলেছে দশটা চল্লিশ। পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে এভাবে সময় বলা সম্ভব না। মিসির আলির মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। একবার ইচ্ছা হল জিজ্ঞেস করেন ঘড়ি না দেখে এমন নিখুঁতভাবে সময়টা সে বলছে কীভাবে। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ফতে মিয়া বলল, 'স্যার যাই?'

'আচ্ছা।'

'ঠাণ্ডা পড়েছে। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকেন। রেস্ট নেন। আশ্বিন–কার্তিক মাসের ঠাণ্ডাটা বুকে লাগে। পৌষ–মাঘ মাসের ঠাণ্ডায় কিছু হয় না।'

ফতে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল সেরকম নিঃশব্দেই চলে গেলেন। নিশাচর পশুরাই এমন নিঃশব্দে চলে। নিশাচরদের সঙ্গে ফতে মিয়ার কোথায় যেন খানিকটা মিল আছে। মিসির আলি বাড়িওয়ালা বদরুল সাহেবের হইচই চিৎকার শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। বদরুল সাহেব তার ভাগ্নেকে গালাগালি না করে ঘুমাতে যাবেন তা হবার না। ছ'মাসের ওপর হল মিসির আলি এ বাড়িতে আছেন। ছ'মাসে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখেন নি। বদরুল সাহেবের মেজাজ এমনিতেই চড়া। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন, হইচই চিৎকার গালাগালির মধ্যেই থাকেন। নিজের ভাগ্নের ক্ষেত্রে সব সীমা অতিক্রম করে। তিনি শুরুই করেন—"শুয়োরের বাচ্চা পাছায় লাথি মেরে তোমাকে আমি..." দিয়ে। মাঝে মাঝে চড়থাপ্পড় পর্যন্ত গড়ায়। বদরুল সাহেব ছোটখাটো রোগা পটকা মানুষ। তাঁর নানান অসুখবিসুখ আছে। চুপচাপ যখন বসে থাকেন তখন বুকের ভিতর থেকে শাঁ শাঁ শব্দ আসে। এরকম একজন মানুষের ফতে মিয়ার মতো বলশালী কাউকে চড় মারতে সাহস লাগে। সেই অর্থে বদরুল সাহেবকে সাহসী মানুষ বলা যায়।

আশ্রিত মানুষকে নানান অপমানের মধ্যে বাস করতে হয়। সেই অপমানেরও একটা মাত্রা আছে। ফতে মিয়ার ব্যাপারে কোনো মাত্রা নেই। মিসির আলি একবার তাকে দেখলেন ঠোঁট অনেকখানি কাটা। স্টিচ দিতে হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে ফতে?

সে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, মামা রাগ করে ধাক্কার মতো দিয়েছিলেন। সিঁড়িতে

পড়ে গেলাম। তেমন কিছু না। মামা প্রেসারের রোগী, রাগ সামলাতে পারেন না। তার ওপর মেয়েটা অসুস্থ। মেয়েটার জন্য মন থাকে খারাপ।

বদরুল সাহেবের একটাই মেয়ে। ছ'বছর বয়স—নাম লুনা। মেয়েটার মানসিক কোনো সমস্যা আছে। চুপচাপ একা বসে থাকে। তার একটাই খেলা—হাতের মুঠি বন্ধ করছে, মুঠি খুলছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এই খেলা খেলে পার করে দিতে পারে। মেয়েটা পরীর মতো সুন্দর।

মিসির আলি প্রায়ই মেয়েটাকে সিঁড়ির গোড়ায় বসে থাকতে দেখেন। একমনে হাতের মুঠি বন্ধ করছে, খুলছে। দৃশ্যটা দেখে মিসির আলির মন খুবই খারাপ।

আজ অনেকক্ষণ বসে থেকেও ফতে মিয়ার প্রেসারের রোগী মামার কোনো হইচই শোনা গেল না। আজ হয়তো তিনি সকাল সকাল শুয়ে পড়েছেন। বাড়িওয়ালার চিৎকারটাও রুটিনের অংশ হয়ে গেছে। কোনোদিন যদি শোনা না যায় তা হলে মনে হয় দিনটা ঠিকমতো শেষ হয় নি। কোথাও ফাঁক আছে।

মিসির আলি বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন। রাত কত হয়েছে বোঝার উপায় নেই। ঘড়ি বন্ধ। বিছানায় যাবার আগে এক কাপ গরম চা খেলে হত। বেশিরভাগ মানুষই কফি অথচা চা খেলে ঘুমাতে পারে না। অথচ গরম চা তাঁর জন্যে ঘুমের ওষুধের মতো কাজ করে। ইয়াসিন থাকলে চা এক কাপ খাওয়া যেত। তাঁর নিজের এখন আর চুলার কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না।

খুব হালকাভাবে কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। ইয়াসিনই ফিরে এসেছে কি না কে জানে। বাবাকে হয়তো খুঁজে পায় নি, কিংবা ভিক্ষা করে আজ তেমন সুবিধা করতে পারে নি।

'কে?'

'স্যার আমি ফতে।'

'কী ব্যাপার?'

'আপনার জন্যে মোমবাতি নিয়ে এসেছি স্যার।'

মিসির আলি বিস্মিত হলেন। মোমবাতির কথা কি তিনি ফতে মিয়াকে বলেছেন? না বলেন নি। মোমবাতি নিয়ে তার উপস্থিত হবার কোনোই কারণ নেই।

ফতে মিয়া শুধু মোমবাতি আনে নি। ফ্লাস্কে করে চা এনেছে। আজকাল দুটা বিস্কুটের ছোট ছোট প্যাকেট পাওয়া যায়। এক প্যাকেট বিস্কুটও এনেছে। সে ঘরে ঢুকে ফ্লাস্কের মুখে চা ঢেলে মিসির আলির দিকে এগিয়ে দিল। প্যাকেট খুলে বিস্কুট বের করল। দুটা বড় বড় মোমবাতি সামনে রাখল। মোমবাতির পাশে রাখল দেয়াশলাই। কাজগুলো করল যন্ত্রের মতো। যেন প্রতিদিনই এরকম কাজ সে করে। যে কোনো অভ্যস্ত কাজ করায় যে যান্ত্রিকতা থাকে তার সবটাই ফতের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। মিসির আলি বললেন, তোমাকে কি মোমবাতি আনতে বলেছিলাম?

ফতে লজ্জিত গলায় বলল, জি না বলেন নাই। দশ মিনিটের মধ্যে কারেন্ট চলে যাবে। লোডশেডিং হবে। অন্ধকারে কথা বলে আরাম পাওয়া যায় না, এই জন্য মোমবাতি নিয়ে এসেছি।

'দশ মিনিটের ভেতর লোডশেডিং হবে।'

'জি। চা খান। আমি নিজে বানিয়েছি। চিনি ঠিক হয়েছে কি না একটু দেখেন।'

মিসির আলি চায়ে চুমুক দিলেন। তিনি চায়ে যতটুকু চিনি খান, ঠিক ততটুকু চিনিই আছে। তিনি কড়া একটু তিতকুট ধরনের চা পছন্দ করেন—এই চা কড়া এবং তিতকুট ধরনের।

'ফতে।'

'জি স্যার।'

'তোমার চা খুব ভালো হয়েছে। আমি কোন ধরনের চা খাই তা তুমি জান?'

'ইয়াসিনকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি।'

'এখন ক'টা বাজে?'

'এগারোটা পাঁচ।'

'তোমার হাতে ঘড়ি আছে?'

'জি না।'

'আমার এখানে আসার আগে কি ঘড়ি দেখে এসেছ?'

'জি না।'

'তা হলে কী করে বলছ—এগারোটা পাঁচ বাজে?'

'ঘড়ি না দেখেও আমি সময় বলতে পারি। ছোটবেলা থেকেই পারি। মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুলে যখন পড়ি তখন স্কুল পরিদর্শনে ইন্সপেক্টার সাহেব এসেছিলেন, তাঁকে ঘড়ির খেলা দেখিয়েছিলাম। উনি খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন আমাকে একটা ভালো ঘড়ি পাঠিয়ে দেবেন। পাঠান নাই। ভুলে গেছেন হয়তো।'

'ঘড়ির খেলাটা কী?'

'ঘড়ি না দেখে বলা সময় কত।'

'ও আচ্ছা।'

'স্যারের শরীর কি খারাপ?'

'সামান্য খারাপ।'

'শরীরের যত্ন নিবেন স্যার। যত্ন বিনা কোনো কিছুই ঠিক থাকে না। এই আমাকে দেখেন সকালে ফজরের নামাজ পড়ে হাঁটতে বের হই। চাইর থেকে পাঁচ মাইল হাঁটি। এই কারণে আমার কোনো অসুখবিসুখ হয় না। আপনে যদি অনুমতি দেন সকালে হাঁটতে যাবার সময় আপনাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'কোনো দরকার নেই ফতে মিয়া। হাঁটাহাঁটি ব্যাপারটা আমার পছন্দ না। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ নানান কষ্টকর পদ্ধতির ভিতর দিয়ে যায়—ব্যায়াম করে, হাঁটাহাঁটি করে। আমার দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার কোনো বাসনা নেই।'

কথা শেষ করার আগেই কারেন্ট চলে গেল। ফতে মিয়া বলেছিল দশ মিনিটের মধ্যে কারেন্ট চলে যাবে। তাই হয়েছে। চমকানোর মতো কোনো ঘটনা না। ঢাকা শহরে রাতে পাঁচ–ছ'বার করে ইলেকট্রিসিটি চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে কেউ যদি বলে দশ মিনিটের মধ্যে লোডশেডিং হবে তার কথা সত্যি হবার সম্ভাবনাই বেশি। মিসির আলি ভেবেছিলেন ফতে বলবে, দশ মিনিটের মধ্যে কারেন্ট চলে যাবে বলেছিলাম দেখলেন সার কারেন্ট চলে গেছে।

ফতে তা করল না। সে সাবধানে মোমবাতি জ্বালাল। পাশাপাশি দুটা মোমবাতি। তার মুখ হাসি হাসি। কোনো একটা বিষয় নিয়ে সে আনন্দিত। ফ্লাস্ক থেকে নিজের জন্যে চা ঢালতে ঢালতে বলল, স্যার আজ আমার মনটা খুব ভালো।

'ভালো কেন?'

'আমি একটা দোকান নিয়েছি। সেলামির টাকা ছাড়াই দোকান পেয়েছি। আঠারো হাজার টাকা শুধু দিতে হয়েছে।'

'কিসের দোকান?'

'দরজির দোকান। আমি দরজির কাজ কিছু জানি না। ইনশাল্লাহ শিখে ফেলব। তবে একজন কর্মচারী আছে। কাজ ভালো জানে। দোকান নেওয়ার খবরটা স্যার আপনাকেই প্রথম দিলাম। আপনি নাদান ফতের জন্যে খাস দিলে একটু দোয়া করবেন।'

ফতের চোখ চকচক করছে। গলার স্বর ভারী হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে সে কেঁদেই ফেলবে। ফতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দোকানের টাকাটা খুবই কষ্ট করে যোগাড় করেছি। মামার সঙ্গে দুবছর ধরে আছি। এই দুবছরে মামার বাজার করতাম। রোজ কিছু কিছু টাকা সরাতাম। কোনোদিন দশ টাকা কোনোদিন পনেরো টাকা। এই অনেক টাকা হয়ে গেল—ঐ কবিতাটা পড়েছেন না স্যার বিন্দু বিন্দু বালিকণা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তুলে সাগর অতল। দৈনিক পনেরো টাকা সরালে দুই বছরে হয় দশ হাজার নয়শ পঞ্চাশ টাকা। আমার হয়েছে সাড়ে নয় হাজার টাকা। কিছু টাকা খরচ করে ফেলেছি। আমার আবার সিগারেট খাওয়ার বদভ্যাস আছে। নেশার মধ্যে সিগারেট আর জরদা দিয়ে পান। স্যার নেন আমার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নেন। বাংলা ফাইভ।

মিসির আলি সিগারেট নিলেন। ফতে আবারো কথা শুরু করল—একবার করলাম কি স্যার বেশ কিছু টাকা একসঙ্গে সরিয়ে ফেললাম। পঁচিশ হাজার টাকা। আমাকে ব্যাংকে পাঠিয়েছে জমা দিতে, আমি ফিরে এসে বললাম টাকা হাইজ্যাক হয়ে গেছে। মামা-মামি দুজনই আমার কথা বিশ্বাস করল। বিশ্বাস না করে উপায়ও নাই—আমার হাত-পা কাটা সারা শরীর রক্তে মাখামাখি।

'নিজেই নিজের হাত-পা কেটেছ?'

'জি স্যার। একটা ব্লেড কিনে, ব্লেড দিয়ে কেটেছি। নিজের হাতে নিজের শরীর কাটাকুটি করা খুবই কষ্টের কিন্তু কি আর করা এতগুলি টাকা। এত রক্ত বের হচ্ছিল যে আমার মামি পর্যন্ত মামার উপরে রেগে গিয়ে বলল—কেন তুমি তাকে একা একা এতগুলি টাকা দিয়ে পাঠালে। একে তো মেরেই ফেলত। স্যার আমার কথা শুনে কি আপনার খারাপ লাগছে?'

মিসির আলি কিছু বললেন না। তিনি আগ্রহ নিয়ে কথা শুনছেন। ফতের গল্প বলার ক্ষমতা ভালো। গলার স্বরের উঠানামা আছে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কথা বন্ধ করে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে। এতে গল্পটা আরো জমে যায়।

'স্যার বোধহয় আমাকে খুব খারাপ মানুষ ভাবছেন। স্যার আমি খারাপ না। মামার কাছ থেকে আমি কত টাকা নিয়েছি সব একটা খাতায় লিখে রেখেছি। ইনশাল্লাহ সব টাকা একদিন ফিরত দেব।'

'দরজির দোকান দেওয়ার ব্যাপারটা তোমার মামা জানে?'

'জি স্যার আজ বিকালে বলেছি।'

'উনি জিজ্ঞেস করেন নাই এত টাকা কোথায় পেয়েছ?'

'উনাকে বলেছি যে আমার এক বন্ধু আমাকে টাকাটা ধার দিয়েছে।'

'বন্ধুর কথা উনি বিশ্বাস করেছেন?'

'জি করেছেন। উনি জানেন আমার এক বন্ধু কুয়েতে কাজ করে। বাবুর্চি। সে আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবে এটা মামাকে অনেক দিন থেকেই বলছিলাম। মামা এটা নিয়ে আমাকে অনেক ঠাট্টা-মশকরাও করতেন। প্রায়ই বলতেন—কই তোর বন্ধুর টাকা কবে আসবে?

আজ সন্ধ্যায় মামাকে পা ছুঁয়ে বলেছি টাকা এসেছে। মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়েছি। মামা খুশি হয়েছে। দরজির দোকানের কথা মামাকে বলেছি। মামা বলেছেন প্রয়োজনে তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা নিতে। এটা অবশ্য মামার মুখের কথা। মামা মুখে অনেক কথা বলেন।'

'ফতে।'

'জি স্যার।'

'তুমি আমাকে যেসব কথা বললে তার সবই তো গোপন কথা। প্রকাশ হয়ে পড়লে তোমার সমস্যা। কথাগুলি আমাকে কেন বললে?'

'আপনার কাছ থেকে কোনো কথাই প্রকাশ হবে না। আপনি গাছের মতো। গাছের কাছ থেকে কোনো কথা প্রকাশ হয় না।'

'আমাকে কথাগুলি বলার কারণ কী?'

'কাউকে বলার ইচ্ছা করছিল। আমার স্যার কথা বলার লোক নাই। বাবা-মা শৈশবে গত হয়েছেন। একটা বোন আছে মাথা খারাপ। বন্ধুবান্ধব কেউ নাই।'

'কাউকে বলতে হয় বলেই কি তুমি আমাকে কথাগুলি বললে?'

'জি স্যার।'

কারেন্ট চলে এসেছে। ফতে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, স্যার যাই। আমার জন্যে একটু দোয়া রাখবেন স্যার। গরিবের ছেলে যদি দোকানটা দিয়ে কিছু করতে পারি। আরেকটা ছোট্ট অনুরোধ। যদি রাগ না করেন তা হলে বলি।

'বল।'

'দরজির দোকানের একটা নাম যদি দেন। সুন্দর কোনো নাম। আগে নাম ছিল বোম্বে টেইলারিং হাউস। আমি স্যার সুন্দর একটা নাম দিতে চাই। বাংলা নাম।'

'নামটাম আমার ঠিক আসে না।'

'আপনি যে নাম দিবেন সেটাই আমি রাখব। আপনি যদি খারাপ নামও দেন কোনো অসুবিধা নাই। আপনি যদি নাম দেন—"গু-গোবর টেইলারিং শপ" আল্লাহর কসম সেই নামই রাখব।'

'কেন?'

'এটা আমা একটা শখ। মানুষের অনেক শখ থাকে। আমার শখ আমার দরজির দোকানের নামটা আপনি দিবেন।'

'আচ্ছা দেখি মাথায় কোনো নাম আসে কি না।'

'এত চিন্তাভাবনা করার কিছু তো নাই সার। এখন আপনার মাথায় যে নামটা আসছে সেটা বলেন।'

'এখন মাথায় কিছু নেই।'

'যা ইচ্ছা বলেন।'

'সাজঘর।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আমার দোকানের নাম সাজঘর। স্যার উঠি?'

'আচ্ছা।'

ফতে বিনীত গলায় বলল, 'দুটা মোমবাতি আর একটা দেয়াশলাইয়ের দাম পড়েছে পাঁচ টাকা। আপনার কথা ভেবে কিনেছিলাম। ভাংতি পাঁচ টাকা কি আছে স্যার?'

মিসির আলি ড্রয়ার খুলে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করলেন। ফতের সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনে তিনি যতটা না অবাক হয়েছেন তারচে অনেক বেশি অবাক হয়েছেন পাঁচ টাকার ব্যাপারটায়।

ফতে চলে গেল। যাবার আগে অতি বিনয়ের সঙ্গে মিসির আলিকে কদমবুসি করল। মিসির আলির মনে হল তিনি ছোট্ট একটা ভুল করেছেন। চলে যাবার আগে ফতেকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন ছিল—ক'টা বাজে? ঘুমাতে যাবার আগে সময়টা জানা থাকা দরকার। আধুনিক মানুষ যন্ত্রনির্ভর হয়ে গেছে। মানুষ যেমন যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে, যন্ত্রও মানুষ নিয়ন্ত্রণ করছে।

মিসির আলি দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে গেলেন। ভালো শীত লাগছে। কোল্ড ওয়েভ হচ্ছে কি না কে জানে। কোল্ড ওয়েভের বাংলাটা ভালো হয়েছে—শৈত্যপ্রবাহ। কিছু কিছু শব্দ এমন আছে যে বাংলাটা সুন্দর—ইংরেজি তত সুন্দর না। যেমন Air condition বাংলা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ। বায়ু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না—তাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। তিনি পায়ের ওপর চাদরটা দিয়ে দিলেন—তখনই মনে পড়ল চাদরটা যে তাকে উপহার দিয়েছিল তার নাম তিনি মনে করতে পারছেন না। শুধু নাম না, মানুষটার পরিচয়ও তাঁর মনে নেই। মস্তিষ্ক মানুষটার পরিচয় মুছে ফেলেছে। মস্তিষ্ক মাঝে মাঝে এ ধরনের কাজ করে। খুব ঠাণ্ডায় মাথার বিশেষ বিশেষ কিছু স্মৃতির দরজা বন্ধ করে দেয়। মস্তিষ্ক মনে করে এই কাজটি করা প্রয়োজন, দরজা বন্ধ না করলে মস্তিষ্কের ক্ষতি হবে। এমন কোনো পদ্ধতি কি আছে যাতে এই বন্ধ দরজা খোলা যায়?

কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের কিছু কিছু ফাইল হঠাৎ হারিয়ে যেতে পারে। সেই সব ফাইল উদ্ধারের প্রক্রিয়া আছে। মানুষের মস্তিষ্ক তো অবিকল কম্পিউটারের মতোই। স্মৃতি তো কিছু না সাজিয়ে রাখা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল। কাজেই যে পদ্ধতিতে কম্পিউটারের হারানো ফাইল খোঁজা হয়—সেই পদ্ধতিতেই বা তার কাছাকাছি পদ্ধতিতে হারানো স্মৃতি খোঁজার চেষ্টা কেন হচ্ছে না?

মিসির আলি হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে বই নিলেন। তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর মন যে কোনো কারণেই হোক কিছুটা বিক্ষিপ্ত। মনকে শান্ত করতে না পারলে রাতে ভালো ঘুম হবে না। মন শান্ত করার একটি পদ্ধতিই মিসির আলি জানেন।

বই পড়া। সেই বইও হালকা গল্প-উপন্যাস না, থ্রিলার না, জটিল কোনো বিষয় নিয়ে লেখা বই। তিনি যে বইটি হাতে নিলেন তার নাম—Dark days. অন্ধকার দিন। লেখক এই পৃথিবীর ভয়াবহ কয়েকজন অপরাধীর একজন, নাম—David Bertzowitz. তাঁর লেখা আত্মজীবনী। তিনি লিখেছেন—

I have often noticed just how unobservant people are. It has been said that parents are the east to know. This may be true in my case, for I wonder how I at the ages of nine, eleven, thirteen manged to do so many negative things and go unnoticed. It is puzzling indeed. And I think it is sad.

"আমি প্রায়ই লক্ষ করেছি মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ভালো না। বলা হয়ে থাকে—বাবা-মা'রা সবার শেষে জানতে পারেন। আমার জন্যে এটা সত্যি। আমি খুবই অবাক হই যখন ভাবি ন' বছর, এগারো বছর এবং তেরো বছরে যেসব অন্ধকার কর্মকাণ্ড আমি করেছি তা কী করে কারোর চোখে পড়ল না। চোখে না পড়ার বিষয়টা রহস্যময় এবং অবশ্যই দুঃখের।"

মিসির আলি লক্ষ করলেন তাঁর মন শান্ত হয়েছে। মন নানান দিকে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছিল। একসঙ্গে অনেকগুলি পথে হাঁটছিল—এখন একটি পথে হাঁটছে। বইটির বিষয়বস্তুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। David Bertzowitz ঠিকই লিখেছে মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিম্নমানের। সে দেখেও দেখে না।

ফতের মামার কথাই ধরা যাক। ফতের মামা বদরুল সাহেব নিশ্চয়ই কখনো ফতেকে ভালোভাবে দেখেন নি। তিনি নিশ্চয়ই ফতের মানসিকতা, তার চিন্তাভাবনা কিছুই বলতে পারবেন না। ফজরের নামাজ শেষ করে ফতে মর্নিং ওয়াক করতে যায় এই তথ্য তিনি জানেন। কিন্তু কোথায় যায় তা কি জানেন? তিনি কি জানেন যে ফতের অনিদ্রা রোগ আছে, সে মাঝে মাঝে অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে হাঁটে। এই কাজটা যখন করে সে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। ফতের মামা কি জানেন যে ফতে বাজারের ভারী ব্যাগ নিয়ে যখন ঢোকে তখন ব্যাগটা থাকে তার বাঁ হাতে। বাঁ হাতি মানুষরা এই কাজ করে। ফতে বাঁ হাতি না। তারপরেও ভারী কাজগুলি সে বাঁ হাতে করে। ডান হাত ব্যবহার করে না।

মিসির আলি চিন্তা বন্ধ করে হঠাৎ নিজের ওপর খানিকটা বিরক্তি বোধ করলেন। ছেলেমানুষি এই কাজটা তিনি কেন করছেন? কেন প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ভালো। এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যার পড়াশোনার বিষয় মানুষের মন তাকে তো মানুষ পর্যবেক্ষণ করতেই হবে। মানুষের দিকে তাকিয়ে তার আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করে পৌঁছতে হবে মন নামক অধরা বস্তুতে। আচ্ছা মন কী?

মিসির আলি ভুরু কুঁচকালেন। উত্তরটা তাঁর জানা নেই। গত পঁচিশ বছর এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন। উত্তর পান নি। এখন বয়স হয়ে গেছে। যে কোনো একদিন অদ্ভুত ট্রেনে উঠে পড়তে হবে। ট্রেনে উঠার আগে কি উত্তরটা জেনে যাওয়া যাবে না?

বাড়িওয়ালা বদরুল সাহেবের মেয়েটা কাঁদছে। শিশুরা ব্যথা পেয়ে যখন কাঁদে

তখন কান্নার আওয়াজ এক রকম, আবার যখন মনে কষ্ট পেয়ে কাঁদে তখন অন্য রকম। লুনা মেয়েটার কান্না শুনে মনে হচ্ছে সে গভীর দুঃখে কাঁদছে।

মেয়েটা প্রায়ই এরকম কাঁদে। তখন কিছুতেই তার কান্না থামানো যায় না। বদরুল সাহেব কোলে নিয়ে হাঁটেন। তার স্ত্রী হাঁটেন। আদর করেন, ধমক দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। একটা পর্যায়ে তারা মেয়েকে ফতের কাছে দিয়ে দেন। ফতে কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত করে ফেলে।

অনেকক্ষণ ধরেই মেয়েটা কাঁদছে। মিসির আলি বই বন্ধ করে বসে আছেন। বাচ্চা একটা মেয়ে গভীর দুঃখে কাঁদবে আর তিনি তা অগ্রাহ্য করে স্বাভাবিকভাবে ঘুমাতে যাবেন—তা কীভাবে হয়?

তিনি বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় এস দাঁড়ালেন। লুনাকে নিয়ে তার মা দোতলার বারান্দায় রেলিং ঘেঁষে হাঁটছেন। এত দূর থেকেও ভদ্রমহিলাকে ক্লান্ত এবং হতাশ মনে হচ্ছে।

মিসির আলি বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন। লুনার কান্নাটা সহ্য করা যাচ্ছে না। তাঁর বিরক্তি লাগছে। কেন মেয়েটার বাবা-মা ফতেকে ডাকছেন না। ফতে নিমিষের মধ্যেই বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

বাচ্চা মেয়েটা কেঁদেই যাচ্ছে। কেঁদেই যাচ্ছে।

২

লুনাকে সামলে রাখার দায়িত্ব পড়েছে ফতের ওপর।

প্রতি মাসে এক-দুদিন ফতেকে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। কারণ প্রতি মাসে এই এক-দুদিন তসলিমা খানম যাত্রাবাড়ীতে তার বোনকে দেখতে যান। বোনের ক্যানসার হয়েছে। বাঁচার কোনো আশা ডাক্তাররা দিচ্ছেন না, আবার দ্রুত মরে গিয়ে অন্যদের ঝামেলাও কমাচ্ছে না।

তসলিমার অনুপস্থিতিতে ফতে লুনার দিকে লক্ষ রাখে। তাকে বলা আছে একটা সেকেন্ডের জন্যেও যেন মেয়েকে চোখের আড়াল না করে। ফতে তা করে না। সে লুনার আশপাশেই থাকে। লুনা এমনই লক্ষ্মীমেয়ে যে কোনো কান্নাকাটি করে না। খাবার সময় হলে শান্ত হয়ে ভাত খায়। সে শুধু রাতে কাঁদে। মেয়েটির আঁধারভীতি আছে।

লুনা বারান্দায় বসে আপনমনে খেলছে। হাতের মুঠি বন্ধ করছে, খুলছে। খুব ক্লান্তিকর খেলা কিন্তু ফতের দেখতে ভালো লাগছে।

ফতে ডাকল, লুনা। এই লুনা।

লুনা ফতের দিকে তাকিয়ে হাসল। আবার খেলা শুরু করল। ফতে বলল, লুনা কী কর?

লুনা তার হাতের মুঠি থেকে চোখ না তুলেই বলল, খেলি।

'এই খেলার নাম কী?'

'জানি না।'

'মা কোথায় গেছে লুনা?'

'জানি না।'

'মা কোথায় গেছে আমি জানি। সে প্রতি মাসে দুই-তিন দিন কোথায় যায় সেটা আমি জানি। বোনকে দেখতে যাবার নাম করে যায়। বোনকে দেখতে ঠিকই যায়। বোনের কাছে দশ-পনেরো মিনিট, খুব বেশি হলে আধঘণ্টা থাকে। বাকি সময়টা কোথায় থাকে আমি জানি।'

লুনা ফতের দিকে তাকিয়ে আছে। সে মিষ্টি করে হাসল।

ফতে বলল, তোমার মা কোথায় যায় আমি জানি। কীভাবে জানি বলব?

লুনা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। ফতে হতাশ মুখে বলল, কীভাবে জানি বললে তুমি বুঝবে না। এই জন্যে বলব না। অবিশ্যি বুঝতে পারলেও বলতাম না।

ফতে লুনার মতো খেলা নিজেও খেলতে শুরু করল। লুনা তাতে খুব মজা পাচ্ছে। খিলখিল করে হাসছে।

'আইসক্রিম খাবে?'

লুনা খুশি হয়ে মাথা নাড়ল।

ফতে বলল, চল আইসক্রিম খেয়ে আসি।

লুনা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ চকচক করছে। এর আগেও সে ফতের সঙ্গেই কয়েকবার চিড়িয়াখানায় গিয়েছে। লুনাকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এক পাও যাবার অনুমতি নেই। তারপরেও ফতে লুনাকে নিয়ে পাঁচ থেকে ছ'বার চিড়িয়াখানায় গিয়েছে। কেউ কিছু ধরতে পার নি। কাজের মেয়েটা কিছু বলে দেয় নি, আবার দারোয়ানও নালিশ করে নি। ফতে নিশ্চিত আজো কেউ কিছু ধরতে পারবে না। চিড়িয়াখানা যাওয়া, চিড়িয়াখানা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সব মিলিয়ে তিন ঘণ্টার মামলা।

ফতে লুনাকে শুধু যে চিড়িয়াখানা দেখাল তা-না—এয়ারপোর্ট নিয়ে গিয়ে প্লেন ওঠানামা দেখাল। এটা ফতের নিজের খুব পছন্দ। বিরাট একটা জিনিস কেমন করে শাঁ করে আকাশে উড়ে যাচ্ছে।

'লুনা কেমন লাগল?'

লুনা হাসল, কিছু বলল না।

'শুধু হাসলে হবে না, মুখে বল ভালো। বল, ভালো।'

'ভালো।'

'এখন বল আমি লোকটা কেমন?'

লুনা আবার হাসল।

'আরেকটা আইসক্রিম খাবে?'

'হুঁ।'

ফতে দুটা আইসক্রিম কিনল। একটা তার জন্যে একটা লুনার জন্যে। লুনা নিজে আইসক্রিম খেলে যত খুশি হয় বড় কাউকে আইসক্রিম খেতে দেখলে তার চেয়েও বেশি খুশি হয়। লুনাকে খুশি রাখা ফতের প্রয়োজন। খুশি রাখা না পোষ মানিয়ে ফেলা। এই কাজটা মনে হয় খুব সহজ—আসলে খুব কঠিন। বড়দের পোষ মানানো সহজ, শিশুদের

পোষ মানানো কঠিন। ভয়ঙ্কর কঠিন। কারণ শিশুরা অনেক কিছু বুঝতে পারে—বড়রা পারে না।

লুনার ব্যাপারটা ভিন্ন। সে শিশু হলেও জড়বুদ্ধির কারণে অনেকটাই পশুর মতো। খাবার দিয়ে, মিথ্যা মমতা দিয়ে পশুদের পোষ মানানো যায়। যে কসাই গরু জবেহ করবে সে যদি গরুটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় গরু তাতে আনন্দ পায়। চোখ বন্ধ করে লেজ নেড়ে আদর নেয়। আদরের সত্যি মিথ্যা ধরতে পারে না।

'লুনা আরেকটা আইসক্রিম খাবে?'

লুনা আবারো হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। আবার তার চোখ চকচক করে উঠল।

ফতে আবারো আইসক্রিম কিনল। এই মেয়েটা পোষ মেনেই আছে। পোষ মানানোটা আরো বাড়াতে হবে। মেয়েটাকে নিয়ে তার কিছু পরিকল্পনা আছে।

'লুনা বাসায় যাবে?'

'না।'

'চল আজ বাসায় চলে যাই। খুব তাড়াতাড়ি আবার বেড়াতে আসব। তখন আর বাসায় ফিরব না। আচ্ছা?'

লুনা মনের আনন্দে ঘাড় কাত করল।

ফতে যে তিন ঘণ্টা লুনাকে নিয়ে ঘুরে এসেছে ব্যাপারটা প্রকাশিত হল না। তসলিমা বেগমের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে ফতে নিজের কাজে বের হল। দোকানটা ঠিক করতে হবে। সাইনবোর্ড বানাতে হবে। হঠাৎ হঠাৎ দোকানে থাকতে হতে পারে। তার জন্যে বিছানা-বালিশ লাগবে। মশারি লাগবে। তার নিজের জন্যেও বাসা ভাড়া করা দরকার।

বুড়িগঙ্গায় বাড়ি ভাড়ার মতো নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। নৌকার ভেতর ঘুমানোর ব্যবস্থা। নৌকার ভেতরেই রান্নাঘর, বাথরুম। দু মাস, তিন মাসের জন্যে একটা নৌকা ভাড়া করে ফেলা যায়। স্থায়ী বাড়ির চেয়ে নৌকা বাড়ি অনেক ভালো। যেখানে সেখানে নৌকা নিয়ে যাওয়া যায়। কয়েকটা নৌকাওয়ালার সঙ্গে ফতের আলাপ হয়েছে। পছন্দসই নৌকা পাচ্ছে না। তাড়াহুড়া করে একটা নৌকা নিয়ে নিলেই হবে না। কোনো কিছু নিয়েই তাড়াহুড়া করা ঠিক না। আল্লাহপাক কোরান শরিফেও বলেছেন—"হে মানব সন্তান, তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।" ফতে তাড়াহুড়ায় বিশ্বাস করে না।

রাত এগারোটা বাজে। ফতে বসে আছে তাদের বাসার পেছনে মিউনিসিপ্যালিটির ফাঁকা জায়গাটার ভেতরে কংক্রিটের এক চেয়ারে। জায়গাটার নাম—শিশু বিনোদন পার্ক। এই নামে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জায়গার উদ্বোধন করেছেন। শ্বেতপাথরের একট ফলকে এই বিশেষ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্বোধনের দুদিন আগে তড়িঘড়ি করে কয়েকটা লম্বা চেয়ার বসানো হয়েছে। একটা স্লাইড এবং দুটা সি-সো। একটা দোলনা আনা হয়েছে, বসানো হয় নি। যেহেতু উদ্বোধন হয়ে গেছে এখন আর বসানোর তাড়া নেই। জিনিসগুলি রোদে পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে। দোলনাটা অবিশ্যি কিছু কাজে লাগছে। দোলনার খুঁটিতে দড়ি লাগিয়ে পলিথিন ঝুলিয়ে গ্রাম থেকে আসা একটা পরিবার সুন্দর সংসার পেতে ফেলেছে।

ফতে এই পরিবারটিকে শুরু থেকেই লক্ষ করছে। বাবা-মা, তেরো-চৌদ্দ বছরের একটা বড় বড় চোখের রোগা মেয়ে। এরা দিশাহারা ভঙ্গিতে একদিন পার্কে ঢুকল, ফতে তখন বেঞ্চিতে বসে বাদাম খাচ্ছে। লক্ষ্য রাখছে পরিবারটি কী করে। স্বামী-স্ত্রী নিচুগলায় কিছুক্ষণ কথা বলল। লোকটি এগিয়ে এল ফতের দিকে। ভিক্ষা চাইতে আসছে না এটা বোঝা যাচ্ছে। গ্রাম থেকে যারা আসে তারা এসেই ভিক্ষা করা শুরু করতে পারে না। সময় লাগে।

'ভাইসাব এইটা কি সরকারি জায়গা?'

লোকটা খুবই বিনীত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করছে। তার স্ত্রী ও কন্যা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। ফতে বলল, হ্যাঁ, এটা মিউনিসিপালটির জায়গা।

'সরকারি জাগাত আমরা যদি থাকি কোনো অসুবিধা আছে?'

'কোনো অসুবিধা নাই—থাকেন।'

'আমরা এই পরথম ঢাকা শহরে আসছি। কাজের ধান্দায় আসছি।'

'ভালো করেছেন।'

'এই জায়গাটা কি নিরাপদ?'

'আপনার এবং আপনার স্ত্রীর জন্যে নিরাপদ। আপনাদের মেয়ের জন্যে নিরাপদ না। একদিন দেখবেন মেয়ে নাই।'

লোকটা ভীত মুখে তাকিয়ে রইল। ফতে বলল, মেয়ের নাম কী?

'মেয়ের নাম দিলজান।'

'দিলজানকে বাকির খাতায় ধরে সংসার পাতেন কোনো সমস্যা নাই। আপনার দেখাদেখি আরো অনেকে উঠে আসবে। সুন্দর একটা বস্তি তৈরি হয়ে যাবে। আপনাদের সাহায্যের জন্যে এনজিওরা আসবে। সুন্দর সুন্দর স্মার্ট মেয়েরা ভিটামিন এ ট্যাবলেট দিয়ে যাবে। বয়স্করা স্কুলে ভর্তি হবে। নানান রকম পরীক্ষা হবে।'

'কী বলতেছেন কিছু বুঝতাছি না জনাব।'

'বোঝবার কিছু নাই। সংসার পাততে চান—পাতেন। নেন সিগারেট নেন।'

লোকটা একবার সিগারেটের দিকে তাকাচ্ছে একবার তার কন্যার দিকে তাকাচ্ছে। অপরিচিত মানুষের থেকে সিগারেট নেওয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না আবার আস্ত সিগারেটের লোভও ছাড়তে পারছে না। শেষ পর্যন্ত লোভ জয়ী হল—সে সিগারেট নিয়ে চলে গেল।

ফতে ফজলু মিয়ার পরিবারের পরবর্তী কর্মকাণ্ডে প্রায় মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা অতিদ্রুত সংসার সাজিয়ে ফেলল। প্রথম দিনেই লোকটির স্ত্রী চুলা বানিয়ে ফেলল—চুলার আশপাশের কিছু অংশ লেপে ফেলল। সেখানে একটা মোড়া এবং কাঠের গুঁড়ি চলে এল। এক রাতে দেখা গেল চুলার উপরে কাপড় শুকানোর মতো করে লম্বা করে তার টানানো হয়েছে। সেই তারে মাছ শুকানো হচ্ছে। লোকটিও চালাক—ঠেলা চালানোর কাজ যোগাড় করে ফেলল। দিনের বেলা ঠেলা চালায়, রাতে এক চায়ের দোকানের এসিসটেন্ট। মেয়েটিকে নিয়ে এখনো তাদের কোনো সমস্যা হয় নি। তবে তারা এখন একা না, আরো চার-পাঁচটি পরিবার চলে এসেছে। এখন নিশ্চয়ই তাদের খানিকটা জোর হয়েছে।

ফজলু রান্না চড়িয়েছে। তার কাছেই দিলজান। বাবার সঙ্গে নিচুগলায় গল্প করছে, মাঝে মাঝে চুলার খড়ি নেড়েচেড়ে দিচ্ছে। রান্না আজ অনেক দেরিতে শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে ফজলুর স্ত্রী অসুস্থ। ফতে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফজলুর দিকে এগিয়ে গেল, আগুনের পাশে বসে সিগারেটটা শেষ করলে ভালো লাগবে।

'ফজলু কেমন আছ?'

ফতে নিঃশব্দে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। ফজলু বুঝতে পারে নি বলে ভয়ঙ্কর চমকে গেল। ফতেকে দেখে সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। চোখে-মুখে ভয়ের ভাবটা থেকে গেল। শুকনো গলায় বলল, " জে ভালো আছি। আপনের সইল ভালো।" এই বলেই সে ফতে যাতে দেখতে না পায় এমন ভঙ্গিতে মেয়েকে চোখের ইশারা করল—যার অর্থ তুই এখানে থাকিস না। ঘরে ঢুকে যা। মেয়ে বাবার আদেশ পালন করল। ফতে পুরো প্রক্রিয়াটি দেখল। তার চেহারায় কোনো ভাবান্তর হল না। দিলজান যে মোড়ায় বসে ছিল ফতে সেই মোড়াতে বসতে বসতে বলল—কী রান্না হচ্ছে?

ফজলু বিনীত গলায় বলল, গরিবের খাওয়া খাদ্য।

গরিবের খাওয়া খাদ্যটা কী? আমার তো মনে হচ্ছে মাংস রান্না হচ্ছে। ভালো ঘ্রাণ বের হচ্ছে।

'দিলজান মাংস খাইতে চায়। কয়েক দিন ধইরা বলতেছে। দুই দিন পরে বিবাহ কইরা শ্বশুরবাড়িতে যাইব। আমার কাছে যে কয়দিন আছে শখ মিটিয়ে দেই।'

'বিয়ে ঠিক হয়েছে নাকি?

'জে না, তবে এইটা নিয়া চিন্তা করি না। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ আল্লাপাকের ঠিক করা। উনি যেখানে ঠিক করেছেন সেইখানেই হবে।'

'রোজগারপাতি কেমন হচ্ছে?'

'খারাপ না। আল্লা মেহেরবান—রোজই কাজ পাই। গতর খাটনি কাম—তয় গাছপালার কাম পাইলে ভালো হইত।'

'গাছপালার কামটা কী?'

ফজলু উৎসাহ নিয়ে ঘুরে বসল। আগ্রহের সঙ্গে বলল—ঢাকা শহরে দেখছি রাস্তায় রাস্তায় গাছপালা বেচে। ফুলের গাছ, ফলের গাছ। গাছ বেচতে পারলে ভালো হইত। গাছপালা আমার হাতে খুব হয়।

ফতের সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। সে সিগারেটের টুকরাটা দূরে ফেলে আরেকটা ধরাতে ধরাতে বলল—নার্সারির কাজ খারাপ না, কোনো ফুটপাত দখল করে বসে পড়লেই হয়। তবে ব্যবসাটা কীভাবে হয় জানতে হবে। গাছপালা যোগাড় করতে হবে। আমি এক নার্সারির মালিককে চিনি তার সাথে আলাপ করে দেখতে পারি।

ফজলুর চোখ চকচক করছে। মনে হচ্ছে সে চোখের সামনে দেখছে অসংখ্য গাছপালা সাজিয়ে সে বসে আছে। শহরের লোকজন বড় বড় গাড়ি নিয়ে আসছে। চকচকে নোট বের করে গাছ নিয়ে চলে যাচ্ছে। ফতে বলল—সিগারেট খাবে? ফজলু আনন্দের সঙ্গে বলল, দেন একটা টান দেই।

ফতে সিগারেট দিল। ফজলু চুলা থেকে জ্বলন্ত লাকড়ি বের করে সেই আগুনে

সিগারেট ধরিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বলল—গাছের ব্যবসার খোঁজখবর নিয়েন। আমি কলমের কামও খুব ভালো জানি।

তাই নাকি?

'জি। আমরার গেরামের যত তিতকুট বরই গাছ আছে—কলম দিয়া সব বরই মিষ্টি বানায়ে দিছি। আমরার গেরামে আমারে কী ডাকত জানেন ভাইজান? আমারে ডাকত গাছ ডাকতর।'

'তোমার গ্রামের নাম কী?

'শুভপুর। বড়ই সৌন্দর্য জায়গা। কপালে নাই বইল্যা থাকতে পারলাম না।'

ফতে উঠে পড়ল। রাত বারোটার আগে তাকে বাড়িতে পৌছতে হবে। রাত বারোটার সময় মূল গেট বন্ধ হয়ে যায়। দারোয়ান গেটে তালা লাগিয়ে গেটের পাশে বেঞ্চিতে বসে ঘুমাবার আয়োজন করে। তার ওপর নির্দেশ আছে বারোটার সময় গেট বন্ধ হয়ে যাবে। তখন গেট খুলতে হলে মালিকের অনুমতি লাগবে। গেট খোলার সময় তিনি উপস্থিত থাকবেন।

ফতের বেলায় হয়তো এটা হবে না। দারোয়ানের সঙ্গে ভালোই খাতির আছে, তারপরেও রিস্ক নেবার দরকার কী? মামা যদি জেগে থাকে গেট খোলার শব্দে অবশ্যই বারান্দায় এসে দাঁড়াবে। চিলের মতো গলায় বলবে—কে আসল? ও আচ্ছা, বাংলার ছোট লাট সাহেব।

ফতে থাকে তার মামার বাড়ির গ্যারেজে।

মামা গাড়ি কেনেন নি বলে তাঁর গ্যারেজ খালি। তিনি কখনো গাড়ি কিনবেন এরকম মনে হয় না। দরিদ্র লোকজন যখন টাকাপয়সা করে তখন জমি কেনে, বাড়ি বানায়। কেউ কেউ এক পর্যায়ে গাড়ি কেনার মতো সাহস সঞ্চয় করে ফেলে আর কেউ কোনোদিনই তা পারে না। বদরুল সাহেব দ্বিতীয় দলের। গাড়ি না কিনলেও তিনি একটা বেবিট্যাক্সি কিনেছেন। "প্রাইভেট" সাইনবোর্ড লাগানো বেবিট্যাক্সিতে করে তিনি ঘুরে বেড়ান, তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য দেখেন।

গ্যারেজে দুটো চৌকি আছে। একটায় ফতে ঘুমায় পাশেরটায় বেবিট্যাক্সির ড্রাইভার বাদল। তবে বেশিরভাগ সময় বাদল তার বাড়িতে চলে যায়। হঠাৎ হঠাৎ বেবিট্যাক্সি চালানোর প্রয়োজন পড়লে ফতে চালায়। তার লাইসেন্স নেই কিন্তু বেবিট্যাক্সি সে ভালোই চালাতে পারে। যদিও বদরুল সাহেব তার ভাগ্নের বেবিট্যাক্সি চালানোর কোনো ভরসা পান না। সারাক্ষণ টেনশনে থাকেন। সারাক্ষণ উপদেশ দিতে থাকেন—এই গাধা আস্তে চালা। এই গাধা তোর ওভারটেক করার দরকার কী? তোর কি হাগা ধরেছে? হর্ন দেস না কেন? হর্ন না দিলে রিকশাওয়ালা বুঝবে কী করে তার পিছনে বেবিট্যাক্সি? রিকশাওয়ালার মাথার পিছনে কি চক্ষু আছে?

বাসায় পৌছেই ফতে দেখে উঠানে জটলা। তার মামা ব্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছেন। ফতেকে দেখেই তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন—রাত বারোটা বাজে তুই ছিলি কোথায়? মদ ধরেছিস নাকি? মদের আখড়ায় ছিলি? গা দিয়ে তো মদের গন্ধ বের হচ্ছে। মাল টেনে এসেছিস?

ফতে জবাব দিল না। উত্তপ্ত মুহূর্তে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরে নীরব থাকতে হয়। মামা অতি উত্তপ্ত।

'বেবিট্যাক্সি বের কর। তোর মামিকে হাসপাতালে নিতে হবে। হঠাৎ তার পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। ব্যথায় হাত–পা নীল হয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম না কী ব্যাপার।'

ফতে বলল, কোন হাসপাতালে যাবেন মামা?

'আরে গাধা গাড়ি বের কর আগে। বেহুদা কথা বলে সময় নষ্ট।'

ফতে বলল, ব্যথা থাকবে না মামা। কমে যাবে।

বদরুল ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, তুই কি গণক এসেছিস? গনা গুনে বলে দিলি ব্যথা কমে যাবে। কথা বলে সময় নষ্ট। গাড়ি স্টার্ট দে।

ফতে গাড়ি স্টার্ট দিল। বদরুল তাঁর স্ত্রীকে হাত ধরে নিচে নিয়ে এলেন। তারা গাড়িতে ওঠার পরপরই ফতের মামি বলল, ব্যথা কমে গেছে।

বদরুল বললেন—কতটুকু কমেছে?

'অনেক কম। বলতে গেলে ব্যথা নাই।'

'একটু আগে কাটা মুরগির মতো ছটফট করছিলে এখন বলছ ব্যথা নাই।'

'হাসপাতালে যাব না।'

'আবার যদি শুরু হয়?'

'শুরু হলে তখন যাব।'

বদরুল স্ত্রীকে হাত ধরে নামালেন। ফতের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুই ঘুমাবি না। তোর মরণ ঘুম। একবার ঘুমালে কার সাধ্য তোকে ডেকে তোলে। তুই জেগে বসে থাকবি। তোর মামির ব্যথা আবার উঠবে বলে আমার ধারণা।

ফতে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। এবং ফজরের আজান না পড়া পর্যন্ত জেগে বসে রইল। অনেকের রাত জাগতে কষ্ট হয় ফতের কখনো হয় না। বরং রাত জাগতে তার ভালো লাগে। রাতে নানান চিন্তা করতে তার ভালো লাগে। এই চিন্তা দিনে কখনো করতে ভালো লাগে না। দিনে অবিশ্যি চিন্তাগুলি মাথায় আসেও না। চিন্তাগুলি রাতের। রাত যত গভীর হয় চিন্তাগুলিও গভীর হয়।

ফতের আশপাশের সব মানুষকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে। কাকে কীভাবে শাস্তি দেওয়া যায়—এই চিন্তা। যেমন মামা বদরুল আলম। তাঁকে নানানভাবে শাস্তি দেওয়া যায়—নরম শাস্তি, নরমের চেয়ে একটু বেশি—কঠিন শাস্তি। তবে মামার মানসিক অবস্থা এইরকম যে—যে কোনো শাস্তিই তার জন্যে কঠিন শাস্তি। ফতে একেক সময় একেক ধরনের শাস্তির কথা ভাবে। গতরাতে ভেবেছে সে তার মামিকে নিয়ে কিছু আজেবাজে কথা লিখে বেনামে মামার কাছে একটা চিঠি লিখবে। এই শাস্তিটা হবে খুবই কঠিন। কারণ তার মামার অসংখ্য দোষ থাকলেও তিনি তাঁর স্ত্রীকে পাগলের মতো ভালবাসেন। ভালবাসেন বলেই সন্দেহের চোখে দেখেন। স্ত্রীকে একা কোথাও যেতে দেবেন না। সব সময় নিজে সঙ্গে যাবেন। তাঁর স্ত্রীকে কেউ টেলিফেন করলে তিনি তৎক্ষণাৎ একতলায় চলে যাবেন। অতি সাবধানে একতলার টেলিফোন রিসিভার কানে নিয়ে শুনবেন কে টেলিফোন করেছে। একতলার টেলিফোন এবং দোতলার টেলিফোন প্যারালাল কানেকশান আছে। তাঁর স্ত্রীর নামে যেসব চিঠি আসে তার প্রত্যেকটা তিনি

আগে পড়ে তারপর স্ত্রীর হাতে দেন। এই যখন অবস্থা তখন যদি তার কাছে একটা চিঠি **আসে** যার বিষয়বস্তু ভয়াবহ তখন কী হবে? চিঠিটা এরকম হতে পারে—

জনাব বদরুল আলম সাহেব,
সালাম, পর সমাচার, আমি আপনাকে কিছু গোপন বিষয় জানাইবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি। বিষয়টি অত্যধিক গোপন বলিয়া আমি আমার নিজের পরিচয়ও গোপন রাখিলাম। এই ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন—ইহাই আমার কামনা। যাহা হউক এখন মূল বিষয়ে আসি—আপনার স্ত্রী তসলিমা খানম বিষয়ে কিছু কথা। তসলিমা খানম যখন বিদ্যাসুন্দরী স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী তখন জনৈক তরুণের সঙ্গে তাহার অতীব ঘনিষ্ঠতা হয়। যে ঘনিষ্ঠতার কথা ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। উক্ত তরুণ দুষ্ট প্রকৃতির ছিল, সে তসলিমা খানমের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার কিছু ছবি গোপনে তাহার আরেক দুষ্ট বন্ধুর সহায়তায় তোলে। ছবির সর্বমোট সংখ্যা একুশ। এই একুশটি ছবির মধ্যে পাঁচটি ছবি এতই কুরুচিপূর্ণ যে, যে কোনো মানুষ শিহরিত হইবে। জনাব আপনাকে উত্তেজিত এবং ছবির কারণে ভীত হইতে নিষেধ করিতেছে। কারণ আমি সমুদয় ছবির নেগেটিভসহ সংগ্রহ করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছি। কাজেই উক্ত ছবি দেখাইয়া কেহই অর্থ সংগ্রহের জন্যে আপনাকে চাপ দিতে পারিবে না। আপনাকে এই তথ্য জানাইয়া রাখিলাম। এখন কেহ যদি ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে ছবির কথা বলিয়া আপনার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করে আপনি ইহাকে মোটেই আমল দিবেন না।

হয়তো আপনার মনে প্রশ্ন জাগিতেছে আমি এই কাজটি কেন করিলাম? আমি কাজটি করিলাম কারণ আমার কাছে মনে হইয়াছে ইহা একটি সৎকর্ম। ইহকালে আমি সৎকর্মের কোনো প্রতিদান আশা করি না। কিন্তু পরকালে আমি এই সৎকর্মের প্রতিদান অবশ্যই পাইব।

এখন জনাব আপনার নিকট আমার একটি আবদার—আমি আপনার মঙ্গলের জন্যে একটি কঠিন কর্ম করিয়াছি। আমি আশা করি তাহার প্রতিদানে আপনি আমার একটা আবদার রক্ষা করিবেন। আবদারটি হইল—এই বিষয়ে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কোনো আলোচনা করিবেন না। উঠতি বয়সে তিনি একটি ভুল করিয়াছিলেন—সেই ভুল ক্ষমা করিবেন। আল্লাহপাক ক্ষমা পছন্দ করেন।

আরজ ইতি,
আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী জনৈক নাদান।

এই এক চিঠিতেই চৌদ্দটা বেজে যাবার কথা। শাস্তির শুরু। তারপর আস্তে আস্তে শাস্তির ডোজ বাড়াতে হবে।

ফতে ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। মিথ্যা চিঠি মানুষ বিশ্বাস করে না। মিথ্যা কখনো টেকে

না। খুব বেশি হলে সাত দিন। মিথ্যার আয়ু অল্প। শাস্তি দিতে হলে সত্যি দিয়ে শাস্তি দিতে হবে। সেই ধরনের 'সত্য' কিছু বিষয় ফতে জানে। অন্যভাবে জানে। এমনভাবে জানে যার সম্পর্কে ধারণা করা মানুষের জন্যে কঠিন। বেশ কঠিন। ফতে ক্ষমতাধর মানুষ। তার ক্ষমতা অন্য রকম ক্ষমতা।

ফতে সিগারেট ধরাল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও বাড়ছে। গলা থেকে মাফলার খুলে সে কান ঢাকল। মিসির আলি সাহেবের ঘরে বাতি জ্বলছে। বুড়ো এখনো জেগে গুটুর গুটুর করে বই পড়ছে। একটা মানুষ দিনরাত বই পড়ে কীভাবে কে জানে? এত জ্ঞান নিয়ে কী হবে? মৃত্যুর পর সব জ্ঞান নিয়ে কবরে যেতে হবে। যে মাথায় গিজগিজ করত জ্ঞান সেই মাথার মগজ পিঁপড়া খেয়ে ফেলবে। শরীরে ধরবে পোকা। ফতে সব মানুষকে চট করে বুঝে ফেলে এই মানুষটাকে এখনো বোঝা যাচ্ছে না। কখনো মনে হয় মানুষটা বোকা। শুধু বোকা না—বোকাদের উজির-নাজির। আবার কখনো মনে হয় লোকটা মহাচালাক। সে আসলে চালাকদের উজির-নাজির। তার কাজের একটা ছেলে আছে তার সাথে যেভাবে কথা বলে মনে হয় নিজের ছেলের সঙ্গে কথা বলে। একদিন সে বাড়িতে উঁকি দিয়ে দেখেছে দুজন পাশাপাশি বসে ভাত খাচ্ছে। আরেক দিনের কথা ফতের স্পষ্ট মনে আছে। সে গিয়েছে বাড়ি ভাড়া আনতে। মিসির আলি সাহেব তখন নিজেই চা বানাচ্ছিলেন। ফতেকে বলল, চা খাবে? ফতে বলল, না। এখন কাজের ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়াসিন চা খাবি? ইয়াসিন গম্ভীর গলায় বলল, হ। চিনি বেশি দিয়েন। ফতে অবাক হয়ে দেখল মিসির আলি কাজের ছেলের জন্যে চা বানিয়ে আনছেন।

লোকটা নাকি অনেক জটিল বিষয় জানে। কী জানে কতটুকু জানে তা ফতের দেখার ইচ্ছা। জটিল বিষয় ফতে নিজেও জানে। তাকে কেউ চিনে না কারণ সে বলতে গেলে—এক বাড়ির কাজের লোক, বেবিট্যাক্সির ড্রাইভার। তার কথা কে বিশ্বাস করবে? সে যদি বলে এই দুনিয়ার জটিল বিষয় আমি যত জানি আর কেউ এত জানে না। তা হলে কেউ কি তা বিশ্বাস করবে? কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ সে মিসির আলির মতো জ্ঞানী না। সে ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো দূরে থাকুক—নিজে ইউনিভার্সিটির ধারেকাছে কোনোদিন যায় নাই। যাওয়ার ইচ্ছাও নাই। সে যা শিখেছে নিজে নিজে শিখেছে। সবার ওস্তাদ থাকে তার কোনো ওস্তাদ নেই।

ফতের ইচ্ছা করে মিসির আলিকেও শাস্তি দিতে। জ্ঞানী লোকের জন্য জ্ঞানী শাস্তি। মনে কষ্ট দেওয়া শাস্তি। এই লোকটা কিসে কষ্ট পাবে তা আগে বের করতে হবে। মানুষ হল মাছধরা জালের মতো। মাছধরা জালে দুই একটা সুতা ছেঁড়া থাকে। মানুষের জালেও সেরকম ছেঁড়া সুতা আছে। সুতার ছেঁড়া জায়গাটা হল তার দুর্বল জায়গা। আক্রমণ করতে হয় দুর্বল জায়গায়। ফতের ধারণা মিসির আলির দুর্বল জায়গা তার জ্ঞান। ধাক্কাটা দিতে হবে জ্ঞানে। প্রমাণ করে দিতে হবে এত আগ্রহ করে যে জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে সেই জ্ঞান ভুল। কাজটা কঠিন, তবে খুব কঠিন না।

ফজলু মিয়াকেও শাস্তি দিতে হবে। আজ সে চোখের ইশারায় তার মেয়েকে সরে যেতে বলল। যেন ফতে কোনো দুষ্ট লোক। দুষ্ট লোকের হাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করার চেষ্টা। ফজলু ঠিকই ভেবেছে ফতে মিয়া দুষ্ট লোক। কিন্তু কী রকম দুষ্ট লোক তা

সে জানে না। জানার কথাও না। ফতে নিজেই জানে না, সে কীভাবে জানবে? ফজলু ভেবেছে ফতে তার চোখের ইশারা দেখতে পায় নি। ফতে ঠিকই দেখেছে। কাজেই ফজলু মিয়াও শাস্তি পাবে। তার শাস্তি আবার হবে অন্য রকম। শাস্তি হল জামার মতো। সাইজ হিসাবে জামা বানাতে হয়। কাঁধের পুট ঠিক থাকতে হয়, হাতার মুহুরি ঠিক থাকতে হয়, কলার ঠিক থাকতে হয়। যে কোনো শাস্তিই হতে হয় মাপমতো।

ফতে সিগারেট ধরাল। শীত আরো বেড়েছে। কুয়াশা বাড়ছে। কুয়াশায় মাথার মাফলার ভিজে যাচ্ছে। তার জেগে বসে থাকার কথা—সে নিজের ঘরে জেগে বসে থাকতে পারে। তা না করে সে আগের জায়গাতেই বসে রইল। সে হালকাভাবে শিস দিচ্ছে এবং পা নাচাচ্ছে। তাকে আনন্দিত মনে হচ্ছে।

লুনা কাঁদতে শুরু করেছে। কেঁদেই যাচ্ছে। কেঁদেই যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফতের ডাক পড়বে। ফতে অপেক্ষা করতে লাগল। এখনো ডাক আসছে না। মেয়ের মা মেয়েকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। লাভ হচ্ছে না। আচ্ছা এমন কি হবে যে বিরক্ত হয়ে লুনাকে কোলে নিয়ে তার মা বারান্দায় এল তারপর বিরক্ত হয়ে দোতলা থেকে মেয়েকে ফেলে দিল?

হওয়া বিচিত্র কিছু না। এই দুনিয়ায় অনেক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে।

৩

বদরুল সাহেবের হাতে দাওয়াতের একটা কার্ড। দাওয়াতের কার্ডটা মিসির আলির। বদরুল সাহেবের ঠিকানায় এসেছে, তিনি নিজেই কার্ড দিতে এসেছেন। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র। মিসির আলি বললেন, আপনার আসার প্রয়োজন ছিল না। কার্ডটা কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হত।

বদরুল সাহেব বললেন, আপনার সঙ্গে তো কথা হয় না, ভাবলাম এই সুযোগে দুটা কথা বলে আসি। ঢাকা শহরে ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালার মধ্যে সুসম্পর্ক হয় না। আমি চাই সুসম্পর্ক।

মিসির আলি বললেন, আপনি বসুন।

বদরুল সাহেব বললেন, বসব না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যাব। নানান ব্যস্ততায় থাকি। বসে গল্পগুজব করার মতো সময় কোথায়? আমার বাড়িতে আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

'জি না।'

'অসুবিধা হলে সরাসরি আমাকে বলবেন। আগে ফতেকে বললেই হত। এখন আবার ফতে দোকান দিয়েছে। আলাদা বাসা নিবে।'

'আমার কোনো সমস্যা হলে আমি আপনাকেই বলব।'

'আপনার কাজের ছেলেটাকে এক কাপ চা দিতে বলুন। চা খেয়েই যাই। নিজের বাড়ির চায়ের চেয়ে অন্যের বাড়ির চা খেতে সব সময়ই ভালো লাগে।'

মিসির আলি খানিকটা শঙ্কিত বোধ করলেন। খুব যারা কাজের মানুষ তারা মাঝে

মাঝে গা এলিয়ে দেয়। এই ভদ্রলোক মনে হচ্ছে গা এলিয়ে দিতেই এসেছেন। মিসির আলির হাতে কোনো কাজকর্ম নেই—তারপরেও আজ তিনি সামান্য ব্যস্ত। ঢাকা মেডিকেল এসোসিয়েশনের একটা সেমিনারে যাবেন বলে ঠিক করেছেন। সবকিছু থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। এই কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

বদরুল সাহেব চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আপনি কী করেন এটাই এখনো জানলাম না। আপনি করেন কী?

মিসির আলি বললেন, কিছু করি না।

'রিটায়ার করেছেন তাই তো?'

'রিটায়ারও করি নি। মাস্টারি করতাম। চাকরি চলে গিয়েছিল।'

'বলেন কি আপনার চলে কীভাবে?'

'কয়েকটা বই লিখেছিলাম—সেখান থেকে রয়েলটি পাই। এতে কষ্টটষ্ট করে চলে যায়।'

'বই বিক্রি বন্ধ হয়ে গেলে কী করবেন?'

'তখন খুব সমস্যায় পড়ব।'

'ফতের কাছে শুনলাম, বিয়েও করেন নি।'

ঠিকই শুনেছেন। এতে একদিক দিয়ে সুবিধা হয়েছে—টাকাপয়সার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে রাস্তায় নেমে পড়ব। একা মানুষের জন্যে বিরাট শহরে বাসস্থান ছাড়া বাস করা তেমন কঠিন না।

বদরুল সাহেব বিস্মিত গলায় বললেন, রাতে ঘুমাবেন কোথায়? বাথরুম করবেন কোথায় ?

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বদরুল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, ইতস্তত করে বললেন—বাড়ি ছাড়ার আগে আমাকে এক মাসের নোটিশ দিতে হবে।

মিসির আলি বললেন, নোটিশ অবশ্যই দেব। আপনি চা না খেয়ে উঠে যাচ্ছেন।

'চা খাব না।'

মিসির আলির মনে হল এই ভদ্রলোক তার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি এখন মিসির আলিকে ভাড়াটে হিসেবে দেখছেন না—একজন ছিন্নমূল মানুষ হিসেবে দেখছেন। ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে কোনো বাড়িওয়ালা কখনো গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করবে না। মিসির আলির মনে হল—খুব শিগগিরই তিনি বাড়ি ছাড়ার নোটিশও পাবেন। যে ভাড়াটের টাকাপয়সার সাপ্লাইয়ের ঠিক নেই তাকে কোনো বাড়িওয়ালা রাখবে না।

বদরুল সাহেব চলে যাওয়ায় মিসির আলির জন্যে খানিকটা সুবিধা হল। সেমিনারে যাওয়া যাবে। শুধু সেমিনার না, তিনি ঠিক করলেন—বিয়ের যে নিমন্ত্রণটা পেয়েছেন, সেখানেও যাবেন। প্লেট ভর্তি করে পোলাও নেবেন। হাতাহাতি করে রেজালা নেবেন। একগ্লাস বোরহানি থাকা সত্ত্বেও আরো একগ্লাস নিতে গিয়ে তাড়াহুড়া করে গ্লাস ফেলে পাশের জনের জামাকাপড় ভিজিয়ে দেবেন। নগরে বাস করতে হলে নাগরিক মানুষ হতে হয়। মিসির আলি ঠিক করলেন, তিনি পুরোপুরি নাগরিক মানুষ হবার একটা চেষ্টা চালাবেন।

সেমিনারের বিষয়বস্তু বয়ঃসন্ধিকালীন মানসিক জটিলতা। গেস্ট স্পিকার অধ্যাপক স্টাইনার এসেছেন আমেরিকা থেকে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যার অধ্যাপক। তিনি সস্ত্রীক দশ দিনের জন্যে এসেছেন। বাংলাদেশে একদিন থেকে চলে যাবেন নেপালের পোখরায়। দুদিন ছুটি কটিয়ে যাবেন নয়াদিল্লি। নয়াদিল্লির আরেকটি সেমিনার শেষ করে ইজিপ্ট হয়ে দেশে ফিরবেন। প্রফেসর স্টাইনারের মূল স্পনসর দিল্লির মেডিকেল এসোসিয়েশন। বাংলাদেশ ফাঁকতালে ঢুকে পড়েছে। যেহেতু নেপাল যাবার পথে বাংলাদেশের ঢাকায় একদিনের জন্যে ট্রানজিট নিতেই হবে কাজেই তাঁকে ধরা হল একটা দিন বাংলাদেশকে দিতে হবে। সেমিনারের গেস্ট স্পিকার হবার বিনীত অনুরোধ। তাঁকে সামান্য সম্মানী দেওয়া হবে। ঢাকায় একরাত তাঁকে রাখা হবে ফাইভ স্টার হোটেলে।

বিদেশী বিশেষজ্ঞরা এই জাতীয় প্রস্তাবে সহজেই রাজি হয়ে যান। প্রফেসর স্টাইনারও সানন্দে রাজি হলেন। আরেকটা দেশ দেখা হলে মন্দ কি? প্রফেসর রাজি হওয়া মাত্রই ঢাকা মেডিকেল এসোসিয়েশনের কর্তাব্যক্তিরা ছোটাছুটি শুরু করলেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞ এলেই হবে না, প্রধানমন্ত্রীকে আনতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মানেই পাবলিসিটি। টিভিতে বিরাট কভারেজ। প্রধানমন্ত্রীর আগমনের কারণে মেডিকেল এসোসিয়েশনের কর্তাব্যক্তিদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ঘোরাঘুরি বাড়তি সুযোগ। মোটামুটি নিরুত্তাপ ডাক্তারদের জীবনে কিছু উত্তাপ। সেমিনার উপলক্ষে খাওয়াদাওয়া। যেহেতু বিদেশী বিশেষজ্ঞ গেস্ট আসছেন তাঁর সম্মানে রাতে একটা এক্সক্লুসিভ ককটেল পার্টি। প্রধান বিষয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন। মানের ক্রম অনুসারে ককটেল পার্টি, সেমিনারের খাওয়াদাওয়া, বিদেশী বিশেষজ্ঞকে নিয়ে শহর পর্যটন। সেমিনারটা ফাও।

প্রায় এক সপ্তাহ কর্মকর্তারা ছোটাছুটি করলেন। তাঁরা পুরোপুরি হতাশ হয়ে গেলেন যখন জানা গেল এই সময় প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। তিনি বিদেশে যাচ্ছেন। এই তারিখে প্রেসিডেন্টকেও পাওয়া যায় কি না সেই চেষ্টা চলতে থাকল। চারটা কমিটি করা হল। একটা হল এন্টারটেইনমেন্ট কমিটি। এই কমিটি সন্ধ্যাবেলায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। আরেকটি কমিটি হল ফুড কমিটি। এই কমিটির দায়িত্ব সেমিনারের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা। তৃতীয় কমিটি দেখছে ককটেল পার্টি। খুবই সেনসেটিভ বিষয়। কাকে দাওয়াত দিতে হবে কাকে দাওয়াত দিতে হবে না এটা চিন্তাভাবনা করে ঠিক করতে হবে। নানান ধরনের ড্রিংকের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে বোতলের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য দেখে অধ্যাপক এবং অধ্যাপকপত্নীর চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। মূল সেমিনার বিষয়ে কোনো কমিটি হল না। এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। প্রফেসর স্টাইনারকে পাওয়া গেছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ। সেমিনারে বাংলাদেশ থেকে দুটা পেপার পড়া হবে। পেপার দুটা তৈরি আছে—ব্যস আর কি।

সেমিনার শেষ হয়েছে। দু ঘণ্টার সেমিনার শেষে অতিথিদের জন্যে লাইট রিফ্রেসমেন্ট। সাংবাদিক এবং অতিথিরা খাবারের টেবিলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাদের দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন তাঁরা অনশনে ছিলেন। আজ অনশন ভঙ্গ করেছেন। কে কার আগে প্লেট নেবেন তা নিয়ে ধাক্কাধাক্কি চলছে। খাবার ভালো। ফাইভ স্টার হোটেলের খাবার, পাঁচশ টাকা প্লেটের রিফ্রেসমেন্ট খারাপ হবার কারণ নেই।

এ ধরনের সেমিনারে মিসির আলি প্রথমে এক কাপ কফি নিয়ে নেন। শুরুতে চা এবং কফির টেবিল খালি থাকে। কোনোরকম ধাক্কাধাক্কি ছাড়াই চা-কফি নিয়ে নেওয়া যায়। নাশতার টেবিলের ভিড় যখন কমে তখন সেখানে নাশতা থাকে না।

আজ ঘটনা অন্য রকম হল। মিসির আলি কফি নিয়ে এক কোনায় বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে কিন্তু জায়গাটা স্মোক ফ্রি কি না বুঝতে পারছেন না। অ্যাশট্রে চোখে পড়ছে না। এই সময় মিসির আলির পেছনে প্রফেসর স্টাইনার এসে উপস্থিত হলেন। বিশুদ্ধ বিস্ময় নিয়ে সাউথের উচ্চারণে ইংরেজিতে বললেন—প্রফেসর মিসির আলি না? আমার কথা মনে আছে?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ মনে আছে।

'আপনি বাংলাদেশের তা ধারণা ছিল না। আমি জানতাম আপনি শ্রীলংকান।'

মিসির আলি বললেন, আপনি তেমনভাবে আমার খোঁজ নেবার চেষ্টা করেন নি। ভাসা ভাসা খোঁজ নিয়েছেন কাজেই ভাসা ভাসা তথ্য পেয়েছেন।

প্রফেসর স্টাইনার খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিসির আলির পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। তিনি মিসির আলির হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে। মুগ্ধ গলায় বললেন—কেরোলিন ইনি হচ্ছেন—প্যারাসাইকোলজির গুরু। উনার কিছু প্রবন্ধ নিয়ে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি একটি বই প্রকাশ করেছে। বইটির নাম দি থার্ড কামিং। আমি বইটি তোমাকেও পড়তে দিয়েছিলাম। আমি নিশ্চিত তুমি পড় নি। না পড়লেও পৃথিবী নামক এই গ্রহের কয়েকটি শুদ্ধতম ব্রেইনের অধিকারীদের একজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক কর। এই ঘটনার পর মিসির আলির আর নাশতার জন্যে চিন্তা করতে হল না। বিশিষ্ট মেহমানদের সঙ্গে খাবার জন্যে তাঁকে আলাদা করে নেওয়া হল। কর্মকর্তাদের একজন এক ফাঁকে গলা নিচু করে বলল, মিসির আলি সাহেব সন্ধ্যার পর ফ্রি থাকবেন। এক্সক্লুসিভ ককটেল পার্টি। হুইস্কির মধ্যে ব্লু লেভেল যোগাড় হয়েছে।

মিসির আলি বললেন, আমি তো হুইস্কি খাই না।

'লাইটার ড্রিংকসও আছে—খুব ভালো ওয়াইন আছে।'

'আমি মদ্যপান করি না।'

'কোক-পেপসিও আছে। কোক-পেপসি খাবেন।'

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, মদের আসরে পেপসি-কোকওয়ালাদের না থাকাই ভালো।

'আপনার যে বই আছে তা জানতাম না। বইয়ের কপি কি আছে—একটা কপি আমাকে দেবেন তো।'

'আমার কাছে কোনো কপি নাই। নিজের কপিও নাই।'

আচ্ছা ঠিক আছে—আমি বই যোগাড় করে নেব। আমার জন্যে আমেরিকা থেকে বই আনা কোনো ব্যাপার না। আমার মেয়ে জামাই থাকে আমেরিকায়। ইন্টারনেটে জানিয়ে দিলে নেক্সট উইকে বই এসে যাবে। আপনার জন্যে কি একটা কপি আনাব?

'না আমার জন্যে কোনো কপি লাগবে না।'

মিসির আলি ভরপেট খাবার খেলেন। আরো এক কাপ কফি খেলেন। প্রফেসর

সাহেবের স্ত্রী কিশোরীদের মতো কিছু আহ্লাদী তাঁর সঙ্গে করল—"আমি কিন্তু এই বিখ্যাত মানুষটার সঙ্গে ছবি তুলব, এবং তাঁর অটোগ্রাফ নেব। ছবি সেশান এবং অটোগ্রাফ সেশানও শেষ হল। ফটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ একের পর এক জ্বলতেই থাকল। মিসির আলি তাঁর মুখ হাসি হাসি করে রাখলেন। যে পূজার যে মন্ত্র। ফটো সেশান পূজার মন্ত্র হল—মুখভর্তি হাসি। মুখ হাসি হাসি করে রাখা যে এমন এক ক্লান্তিকর ব্যাপার তিনি জানতেন না। সেমিনার হলে মিসির আলি যতটা বিরক্ত হয়েছিলেন তারচেয়ে অনেক বিরক্ত হলেন সেমিনার-পরবর্তী কর্মকাণ্ডে।

হোটেল থেকে বের হয়ে তাঁর বিরক্তি কেটে গেল। আকাশে মেঘ করেছে। কার্তিক মাসের ঘোলাটে পাতলা মেঘ না, আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। মেঘ দেখেই মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে। বর্ষাকালের বৃষ্টির এক ধরনের মজা, শীতের অপ্রত্যাশিত বৃষ্টির অন্য ধরনের মজা।

'বৃষ্টি দেখলে মানুষ উতলা হয় কেন?" এরকম চিন্তা করতে করতে মিসির আলি হাঁটতে শুরু করলেন। বৃষ্টি দেখে মন উতলা হবার তেমন কোনো বাস্তব কারণ নেই। ব্যবস্থাটা প্রকৃতি করে রেখেছে। সমস্ত প্রাণিকুলের জিনে কিছু তথ্য দিয়েছে। এই তথ্য বলছে—আকাশ যখন মেঘে ঢেকে যায় তখন তোমরা উতলা হবে। শুধু প্রাণিকুল না বৃক্ষকুলের জন্যেও একই তথ্য। এর কারণ কী? প্রকৃতি কি আমাদের বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছে যা আমরা ধরতে পারছি না। প্রকৃতি কি চায় বর্ষা বাদলায় আমরা বিশেষ কিছু ভাবি? অন্য ধরনের চিন্তা করি। বর্ষা বাদলার সঙ্গে সৃষ্টি সম্পর্কিত কিছু কি জড়িয়ে আছে? প্রকৃতি মানুষকে সরাসরি কিছু বলে না। সে কথা বলে ইঙ্গিতে। সেই ইঙ্গিত বোঝাও কঠিন।

বাসায় ফিরে মিসির আলি স্বস্তি পেলেন। ইয়াসিন চলে এসেছে। বাসায় তালা খুলে ঢুকে পড়েছে। তালা খোলার ব্যাপারে এই ছেলেটির দক্ষতা ভালো। মিসির আলি সদর দরজার জন্যে তিন শ টাকা খরচ করে একটা আমেরিকান তালা লাগিয়েছিলেন। তালার প্যাকেটে লেখা ছিল—"বার্গলার প্রুফ লক।" সেই কঠিন তালা এগোরো-বারো বছরের একটা ছেলে মাথার ক্লিপ দিয়ে খুঁচিয়ে কীভাবে খুলে ফেলে সেটা এক রহস্য। একই সঙ্গে চিন্তারও বিষয়।

ইয়াসিন যখন কাজ করে—মন লাগিয়ে কাজ করে, এবং অত্যন্ত দ্রুত কাজ করে। ঘর ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। পানি দিয়ে মোছা হয়েছে। বিছানার চাদর বদলে নতুন চাদর টানটান করে বিছানো হয়েছে। দেয়াল ঘড়িতে ব্যাটারি লাগানো হয়েছে এবং ঘড়ি চলছে। ঠিক টাইম দিচ্ছে। ইয়াসিন যেহেতু ঘড়ির টাইম দেখতে পারে না কাজেই ধরে নেওয়া যায়—ঘড়ি নিয়ে দোকানে গিয়ে ব্যাটারি লাগিয়ে এনেছে। মিসির আলি সাহেবের পড়ার টেবিলও গোছানো। টেবিলের ওপর চকচকে পাঁচ শ টাকার একটা নোট—কলম দিয়ে চাপা দেওয়া।

গত সপ্তাহে এই টেবিল থেকেই পাঁচ শ টাকার একটা নোট হারিয়েছে। সেই নোটও কলম দিয়ে চাপা দেওয়া ছিল। তিনি যখন ইয়াসিনকে জিজ্ঞেস করলেন, একটা পাঁচ শ টাকার নোট রেখেছিলাম নোটটা কোথায় রে?

ইয়াসিন বলল, জানি না।

'তুই নিয়েছিস নাকি?'

'না।'

'ভালো করে মনে করে দেখ নোটটা নিয়ে মনের ভুলে পকেটে রেখেছিস কি না।'

ইয়াসিন আবারো বলল, না। তারপর থমথমে মুখে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। মিসির আলির সামান্য মন খারাপ হল—ছেলেটা কি চুরি করা শিখছে? এবং এই চুরি শেখার জন্যে নানান জায়গায় টাকাপয়সা ছড়িয়ে রেখে তাকে সাহায্য করছে? তিনি এই বিষয়ে ইয়াসিনকে আর কিছু বলেন নি। ভেবে রেখেছিলেন, সময় সুযোগমতো নানান ব্যাখ্যা দিয়ে চুরি যে গুরুতর অপরাধের একটি তা বুঝিয়ে দেবেন। সেই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আর যাওয়া হয় নি। তারপর ঘটনাটা ভুলেই গেছেন। আজ টেবিলে পাঁচ শ টাকার নোট পড়ে থাকতে দেখে মনে পড়ল। তিনি ইয়াসিনকে ডাকলেন। শান্ত গলায় বললেন, টেবিলের ওপর পাঁচ শ টাকার নোট কে রেখেছে, তুই?

ইয়াসিন হ্যাঁ-না, কিছুই বলল না।

মিসির আলি বললেন, যে নোটটা হারিয়েছিল, এটা কিন্তু সেই নোট না। হারানো নোটটা ছিল ময়লা। আর এই নোটটা চকচক করছে।

ইয়াসিন তার পরেও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তুই এখন করছিস কী?'

'রান্ধি।'

'কী রাঁধিস?'

'হুকনা মরিচের ভর্তা, ডাইল আর ডিমের সালুন।'

রান্না শেষ করার পর আমার কাছে আসবি—পাঁচ শ টাকার নোটের বিষয়ে কথা বলব। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি কখনো কাউকে শাস্তি দেই না। তুই কি আমাকে ভয় পাস?

'না।'

ইয়াসিন রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। আসন্ন বিচারসভা নিয়ে তাকে তেমন চিন্তিত মনে হচ্ছে না। তার পেট থেকে কোনো কথা বের করা যাবে এটাও মিসির আলির মনে হচ্ছে না। মানুষ দু শ্রেণীর—এক শ্রেণীর মানুষ কিছুতেই ভাঙবে না তবে মচকাবে। আরেক শ্রেণীর মানুষের চরিত্রে মচকানোর ব্যাপারটি নেই। সে ভেঙে দু টুকরা হবে, কিন্তু কিছুতেই মচকাবে না। ইয়াসিন দ্বিতীয় শ্রেণীর। পাঁচ শ টাকার নতুন নোট প্রসঙ্গে তার মুখ থেকে একটি বাক্যও বের করা যাবে না। সে পাথরের মতো মুখ করে মেজের দিকে তাকিয়ে থাকবে। বিড়াল যেমন গড়গড় শব্দ করে, মাঝে মাঝে এই ধরনের শব্দ করবে।

বিজ্ঞান দ্রুত এগুচ্ছে—এমন যন্ত্র হয়তো খুব শিগগিরই বের হয়ে যাবে যার সামনে কাউকে বসালে তার মাথায় কী আছে সব পরদায় পরিষ্কার দেখা যাবে। মস্তিষ্কে জমা স্মৃতি ভিডিওর মতো পরদায় চলে আসবে। কোনো অপরাধী বলতে পারবে না—এই অপরাধ সে করে নি। মস্তিষ্ক থেকে স্মৃতি বের করে পরদায় নিয়ে আসা খুব কঠিন কোনো প্রযুক্তি বলে মিসির আলির মনে হয় না। আগামী বিশ-পঁচিশ বছরেই গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটা ঘটে যাবে।

কিছুদিন আগে মিসির আলি কাগজে পড়েছেন—দুই ভাড়াটে খুনির ফাঁসি হয়ে গেছে। যারা তাকে ভাড়া করেছে তাদের কিছু হয় নি। তারা বেকসুর খালাস পেয়েছে। কারণ প্রমাণ নেই। নতুন পৃথিবীতে প্রমাণের জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না। আদালতের নির্দেশে মাথা থেকে স্মৃতির টেপ সরাসরি নিয়ে নেওয়া হবে। নতুন পৃথিবীতে নির্দোষ মানুষ কখনো শাস্তি পাবে না।

মিসির আলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। মেঘ আরো ঘন হয়েছে। শীতের ধূলি ধূসরিত শুকনো শহর তৃষিতের মতো তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। এখন যদি কোনো কারণে বৃষ্টি না হয় তা হলে কষ্টের ব্যাপার হবে।

'স্যার গো।'

মিসির আলি চমকে তাকালেন। দরজা ধরে ইয়াসিন দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে দুশ্চিন্তার লেশমাত্র নেই। বরং মুখ হাসি হাসি।

'কী ব্যাপার ইয়াসিন?'

'একটা মেয়েছেলে আসছে। আপনেরে চায়।'

মিসির আলি বসার ঘরে চলে এলেন। খুবই আধুনিক সাজ পোশাকের একজন তরুণী। গায়ে বোরকা জাতীয় কালো পোশাক যা ঠিক বোরকাও না। মাথায় স্কার্ফ বাঁধা। স্কার্ফের উজ্জ্বল রঙ। সাধারণত মরুভূমির মেয়েরা এমন উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করে। মেয়েটি রূপবতী। তাকে দেখেই মিসির আলির মনে যে উপমা এল তা হল জ্বলন্ত মোমবাতি। মিসির আলি মেয়েটিকে চিনতে পারলেন না। মেয়েটি মিসির আলিকে দেখেই চট করে উঠে দাঁড়াল। এবং তিনি কিছু বুঝতে পারার আগেই তাকে এসে সালাম করে ফেলল।

'স্যার আমাকে চিনতে পারছেন?'

'না।'

ভালো করে আমার দিকে তাকান। ভালো করে না তাকালে আপনি আমাকে চিনবেন কী করে। আপনি তো কখনো কোনো মেয়ের দিকে ভালো করে তাকান না।

মিসির আলি ভালো করে তাকালেন। লাভ হল না। তিনি তখনো চিনতে পারছেন না।

মেয়েটি বলল, আমার নাম প্রতিমা। হিন্দু নাম। কিন্তু আমি মুসলমান মেয়ে এখন চিনতে পেরেছেন?

'না।'

'মাথায় স্কার্ফ আছে বলে আপনি হয়তো চিনতে পারছেন না। আপনার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে কখনোই মাথায় স্কার্ফ ছিল না। মাথাভর্তি চুল ছিল। এখন স্কার্ফ থাকায় হয়তো অচেনা লাগছে।'

মেয়েটি মাথার স্কার্ফ খুলে মাথায় ঝাঁকুনি দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মিসির আলি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এমন রূপবতী একজনকে দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।

'স্যার আমাকে এখন কি চিনতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন আমার নাম প্রতিমা, এটা মনে পড়েছে?'

'হ্যাঁ মনে পড়েছে। তোমার মা এক দুপর বেলায় গান শুনছিলেন। প্রতিমা নামের একজন গায়িকার গান—"একটা গান লিখ আমার জন্য।" এই গান শুনতে শুনতে তোমার মা আবেগে দ্রবীভূত হলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তার কিছুক্ষণ পর তোমার মা'র ব্যথা শুরু হল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। আট ঘণ্টা পর তোমার জন্ম হল। এই আট ঘণ্টা তীব্র ব্যথার মধ্যে তোমার মায়ের মাথায় "একটা গান লিখ আমার জন্য" ঘুরতে লাগল। যখন তিনি শুনলেন, তাঁর মেয়ে হয়েছে—গায়িকার নামে মেয়ের নাম রাখলেন, প্রতিমা।'

এই তো আপনার সবকিছু মনে পড়েছে। আপনার জন্যে আমি নেপাল থেকে একটা চাদর এনেছিলাম। চাদরটা আপনি ব্যবহার করছেন দেখে ভালো লাগছে। স্যার এখন বলুন আমি কবে থেকে কাজ শুরু করব?

মিসির আলি থমকে গেলেন। তিনি যে যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, সেই যন্ত্রণা আবার শুরু হয়েছে।

প্রতিমা বলল, আপনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন—ভেবেছিলেন আপনার ঠিকানাটা আমি খুঁজে বের করতে পারব না। দেখলেন, কীভাবে খুঁজে বের করেছি?

'দেখলাম।'

প্রতিমা বসতে বসতে বলল, স্যার আপনি আমাকে ভয় পান কেন? আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি আপনাকে নিয়ে একটা বই লিখব। আপনার জীবনের বিচিত্র সব ঘটনার নোট নেব। ব্যস ফুরিয়ে গেল।

মিসির আলি কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন—প্রতিমা নামের এই মেয়েটি ভয়াবহ একটা সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি সেই সমস্যার দ্রুত সমাধান করেছিলেন। তারপরই মেয়েটির মাথায় ঢুকে গেছে মিসির আলি তাঁর জীবনে যত সমস্যার সমাধান করেছেন সেগুলি সে লিখে ফেলবে।

প্রতিমা হাসতে হাসতে বলল, স্যার আপনি এমন হতাশ চোখে তাকাচ্ছেন কেন? আমি বাঘ-ভালুক কিছু না। আমি খুবই সাধারণ একটা মেয়ে। সাধারণ হলেও ভালো মেয়ে। আমি নানানভাবে আপনাকে সাহায্য করব। মনে করুন সকালবেলা আপনার কাছে এলাম। আপনি কিছুক্ষণ কথা বললেন, আমি নোট নিলাম। তারপর আপনার ঘরের কাজকর্ম গুছিয়ে দিলাম। আমি রান্না করা শিখেছি। আপনার জন্যে রান্না করলাম।

'তোমার এখনো বিয়ে হয় নি?'

'না। আমি তো আগেই বলেছি—আমি কখনো বিয়ে করব না।'

প্রতিমা খিলখিল করে হাসছে। মিসির আলি বললেন, 'হাসছ কেন?'

প্রতিমা বলল, 'আপনি হতাশ চোখে তাকাচ্ছেন। আপনাকে দেখে খুবই মায়া লাগছে। এই জন্যে হাসছি।'

'চা খাবে?'

'না চা খাব না। আমি চলে যাব। আপনি প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিন। তারপর আমি আসব। স্যার, ভালো কথা আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিবরণ আমি গুছিয়ে লিখে ফেলেছি। কপি আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি। কপি আপনি পড়বেন—এবং বলবেন কিছু বাদ পড়েছে কি না। স্যার ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ ঠিক আছে।'

'আজই পড়বেন। স্যার, আপনি ঘুম থেকে কখন ওঠেন?'

রাত করে ঘুমাতে যাই তো, ঘুম ভাঙতে ন'টা-দশটা বেজে যায়।

আমি যখন চার্জ নেব, আপনাকে ঠিক রাত দশটায় ঘুমাতে যেতে হবে। ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে তুলে দেব। এক ঘণ্টা আপনাকে হাঁটতে হবে। এক ঘণ্টা পর মর্নিং ওয়াক সেরে এসে দেখবেন—ব্রেকফাস্ট রেডি।

মিসির আলি চিন্তিত গলায় বললেন, তুমি এখানে থাকবে নাকি?

প্রতিমা বলল, হ্যাঁ। তবে এ বাড়িতে না। বারিধারায় আমার পাশাপাশি দুটা ফ্ল্যাট আছে—একটায় আপনি থাকবেন, অন্যটায় আমি থাকব। আমি একজন ইনটেরিয়ার ডিজাইনারকে খবর দিয়েছি—সে আপনার ফ্ল্যাটটা আপনার প্রয়োজনমতো সাজিয়ে দেবে। লাইব্রেরি থাকবে, লেখার টেবিল থাকবে।

'আমাকে গিয়ে তোমার ফ্ল্যাটে উঠতে হবে?'

'হ্যাঁ। স্যার এ রকম শুকনা মুখ করে তাকালে হবে না। আমি আগামীকাল সকাল ন'টার সময় আসব। ঝড়-বৃষ্টি-সাইক্লোন-হরতাল যাই হোক না কেন সকাল ন'টায় আমি উপস্থিত হব।'

'ঠিক আছে।'

'এর মধ্যে আমার লেখাটা পড়ে ফেলবেন। লেখার কিছু কিছু অংশ ভালোমতো দেখে দেবেন আমি দাগ দিয়ে রেখেছি।'

'তুমি কি এখন চলে যাচ্ছ?'

প্রতিমা হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ—তবে কাল দেখা হবে। ঠিক সকাল ন'টায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লাভ নেই—আপনি নিশ্চয়ই একদিনের মধ্যে বাড়ি বদলাতে পারবেন না?

মিসির আলির মনে হল মেয়েটা পুরোপুরি সুস্থ না। কিছু সমস্যা তার এখনো রয়ে গেছে।

মিসির আলি দুপুরের খাওয়া শেষ করে ঘড়ির দিকে তাকালেন, দুটা পঁচিশ বাজে। বিছানায় এসে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করা যায়। দুপুরের খাবার শেষ করে বই হাতে বিছানায় কাত হবার মধ্যে আনন্দ আছে। শরীর ভরা আলস্য, চোখভর্তি ঘুম—হাতে চমৎকার একটা বই। আজ অবিশ্যি হাতে বই নেই—প্রতিমা নামের জ্বলন্ত মোমবাতির লেখা বাহান্ন পৃষ্ঠার খাতা। হাতের লেখা না, কম্পিউটারে কম্পোজ করা হয়েছে, স্পাইরেল বাইন্ডিং করা হয়েছে। হাতের লেখা হলে ভালো হত। মানুষ তার চরিত্রের অনেকখানি হাতের লেখায় প্রকাশ করে। কারো লেখা হয় জড়ানো। একটা অক্ষরের গায়ে আরেকটা অক্ষর মিশে থাকে। কেউ কেউ লেখে গোটা গোটা হরফে। কেউ প্রতিটি অক্ষর ভেবেচিন্তে লেখে। কেউ অতি দ্রুত লেখে। লেখা দেখেই মনে হয় তার চিন্তা করার ক্ষমতা দ্রুত। সে মাথার চিন্তাকে অনুসরণ করছে বলে লেখাও দ্রুত লিখতে হচ্ছে। তবে কেউ কেউ লেখে ঢিমেতালে।

কম্পিউটার মানুষকে অনেক কিছু দিচ্ছে, আবার অনেক কিছু কেড়েও নিচ্ছে।

কম্পিউটারের লেখায় কোনো কাটাকুটি নেই। হাতের লেখায় কাটাকুটি থাকবেই। সেই কাটাকুটিই হবে মানুষের চরিত্রের রহস্যের প্রতিফলন। হাতের লেখার যুগ পার হয়েছে। এখন শুরু হয়েছে কম্পিউটারে লেখার যুগ। এই যুগ শেষ হয়ে নতুন যুগ আসবে। কী রকম হবে সেটা? মানুষ চিন্তা করছে আর সেই চিন্তা লেখা হয়ে বের হয়ে আসবে? সে রকম কিছু হলে মন্দ হয় না। তা হলে সেই যুগ হবে হাতের লেখার যুগের কাছাকাছি। কারণ চিন্তার মধ্যেও কাটাকুটি থাকবে।

প্রতিমার লেখার ওপর মিসির আলি চোখ বুলাতে শুরু করলেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে তিনি কোনো গল্পের বই পড়ছেন। মেয়েটা সে রকম ভঙ্গিতেই লেখার চেষ্টা করছে। লেখার ভঙ্গিটা জার্নালিস্টিক হলে ভালো হত। প্রতিমা লিখছে—

আমার নাম প্রতিমা। এটা কিন্তু কাগজপত্রের নাম না। কাগজপত্রে আমার নাম আফরোজা। যেহেতু আমার মা খুব শখ করে প্রতিমা নাম রেখেছিলেন, এবং আমার বয়স এক বছর পার হবার আগেই মারা গেছেন সে কারণে মা'র প্রতি মমতাবশত সবাই আমাকে ডাকা শুরু করল প্রতিমা। মুখে মুখে ডাকনাম এক ব্যাপার, কাগজপত্রে নাম থাকা অন্য ব্যাপার।

আকিকা করে আমার মুসলমানি নাম রাখা হল তবে সেই নামে কেউ ডাকত না। শুধু বাবা মাঝে মধ্যে ডাকতেন। তখন আমি জবাব দিতাম না।

আমার বাবা আমাকে অতি আদরে মানুষ করতে লাগলেন। তিনি আদর্শ পত্নীপ্রেমিকদের মতো দ্বিতীয় বিয়ে করেন নি। বাড়িতে মাতৃস্থানীয় কেউ না থাকলে তাঁর কন্যার অযত্ন হবে ভেবে তিনি সার্বক্ষণিক একজন নার্স রাখলেন। ছোটবেলায় এই নার্সকেই আমি মা ডাকতাম। আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন কী একটা কারণে যেন এই নার্স মহিলাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। শৈশবের এই স্মৃতিটি আমার মনে আছে। এই মহিলা হাউমাউ করে কাঁদছেন এবং বাবার পা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছেন। বাবা বলছেন—ডোন্ট টাচ মি। ডোন্ট টাচ মি। তোমাকে যে আমি কানে ধরে উঠবস করাচ্ছি না এই কারণেই তোমার সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

যে মহিলাকে আমি মা বলে জানতাম সেই মহিলার এমন হেনস্তা দেখে আমি খুবই অবাক হলে গেলাম। ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। নার্স মাকে আমি এর পরে আর কোনোদিন দেখি নি। বাড়িতে এই মহিলার কোনো ছবি ছিল না বলে কিছুদিনের মধ্যেই আমি তার চেহারাও ভুলে গেলাম। শুধু মনে থাকল—শ্যামলা একটি মেয়ে—যার মুখ গোলাকার এবং তিনি ঠোঁট গোল করে শিস দিতে খুব পছন্দ করতেন।

শৈশবের ভয়াবহ স্মৃতি এই একটাই। এই স্মৃতির ব্যাপারটা আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টদের কাছে বারবার বলতে হয়েছে। বাবা আমাকে নিয়ে অনেক বড় বড় সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। তাদের প্রথম প্রশ্নই হল—শৈশবে কোনো দুঃখময় স্মৃতি আছে Painful memory?

মিসির আলি সাহেবও এই প্রশ্ন করলেন। তবে অন্য সাইকিয়াট্রিস্টরা যেমন এই ঘটনা শুনে ঝাঁকের পর ঝাঁক প্রশ্ন করেছিলেন মিসির আলি তা করলেন না। তিনি শুধু বললেন—ঐ মহিলার গলার স্বর কেমন ছিল?

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম গলার স্বর দিয়ে কী হবে? উনার গলার স্বর কেমন জানতে চাচ্ছেন কেন ?

মিসির আলি বললেন, এমনি জানতে চাচ্ছি।

আমি বললাম, গলার স্বর মিষ্টি ছিল। খুব মিষ্টি। উনার বিষয়ে আমার আর কিছু মনে নেই শুধু মনে আছে উনি ঠোঁট গোল করে শিস দিতেন।

মিসির আলি বললেন, আরেকটি জিনিস নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। উনি যে তোমাকে বিশেষ নামে ডাকতেন সেটা তো মনে থাকার কথা।

'উনি আমাকে বিশেষ নামে ডাকতেন এটা আপনাকে কে বলেছেন?'

'কেউ বলে নি। আমি অনুমান করছি।'

'এ রকম অনুমান কেন করছেন? কেন?'

'তোমার কথা থেকে মনে হচ্ছে এই মহিলা তোমায় খুবই আদর করত। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে অতি আদরের কাউকে বিশেষ নামে ডাকা। যে নামে অন্য কেউ ডাকবে না। এই থেকেই অনুমান করছি তোমাকে বিশেষ কোনো নামে ডাকতেন। সেই বিশেষ নামটা কী?'

উনি আমাকে ডাকতেন মাফু। মা বলার পর ফু বলে লম্বা টান দিতেন—এ রকম করে মাফু্‌ ্‌ ্‌।

মিসির আলি হাসলেন এবং প্রায় সেই মহিলার মতো করে ডাকলেন মাফু্‌ ্‌ ্‌। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, জি। তিনি বললেন, মাফু তুমি কেমন আছ?

আমি বললাম ভালো নেই। আপনি আমাকে সারিয়ে দিন।

তিনি আবারো হাসলেন। এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—ইনি আমাকে সারিয়ে দেবেন। উনার সেই ক্ষমতা আছে।

এখন আমি আমার অসুখের ঘটনাটা বলি—আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন বাবার শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। হার্টের সমস্যা, ডায়াবেটিস, অ্যাজমার অ্যাটাক সব একসঙ্গে। তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে বললেন—মা, তোর কি পছন্দের কোনো ছেলে আছে?

আমি বললাম কেন?

বাবা বললেন, তোর কোনো পছন্দের ছেলে থাকলে বল। আমি তোর বিয়ে দিতে চাই। আমার শরীর ভালো না। যে কোনো সময় যে কোনো কিছু ঘটতে পারে। তার আগেই আমি দেখে যেতে চাই তোর সংসার হয়েছে। যার ওপর ভরসা করতে পারিস এমন একজন কেউ তোর আশপাশে আছে।

আমি বললাম, আমার পছন্দের কেউ নেই।

বাবা বললেন, আমি দেখেশুনে তোর জন্যে একজন ছেলে নিয়ে আসি?

বাবার হতাশ মুখ দেখে আমার খুবই মায়া লাগল। তখন তাঁর অ্যাজমার টান উঠেছে। বুকের ভেতর থেকে শাঁ শাঁ শব্দ আসছে। মনে হচ্ছে তাঁর ফুসফুসে ছোট কোনো বাঁশি কেউ রেখে দিয়েছে—যেই তিনি লম্বা করে নিশ্বাস নিচ্ছেন ওমনি সেই বাঁশিতে শব্দ উঠছে। তখন আমার বিয়ে করার কোনো রকম ইচ্ছা ছিল না। বাবার অবস্থা দেখে বললাম, তুমি যা ভালো মনে কর—করতে পার।

বাবা অতি দ্রুত একটা ছেলে যোগাড় করে ফেললেন। ছেলের বাবা মফস্বলের কোনো এক কলেজের অধ্যাপক। বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে। মেডিকেল কলেজে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। সুন্দর চেহারা। ছেলের সঙ্গে বাবা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম ছেলে খুব লাজুক। কথা বলার সময় সে সরাসরি আমার দিকে তাকায় না। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। আমি তাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম। সেখানে কথা যা বলার আমিই বললাম সে শুধু হ্যাঁ হুঁ করল। বিয়ে উপলক্ষে ছেলের বাবা-মা ঢাকায় চলে এলেন। ঢাকায় তারা দু মাসের জন্যে একটা বাড়ি ভাড়া করলেন। সব যখন ঠিকঠাক তখন বাবা বললেন—এখন বিয়ে হবে না। ছেলেটার কিছু সমস্যা আছে। কী সমস্যা বাবা তা ব্যাখ্যা করলেন না।

বিয়ে বাতিল হয়েছে শুনে ছেলের বাবা-মা দুজনই খুব আপসেট হয়ে পড়লেন। বাবার সঙ্গে নানান কথাবার্তা বলতে লাগলেন। আমার সঙ্গেও কথা বলার চেষ্টা করলেন। আমি কথা বললাম না। শুধু যে ছেলের বাবা-মা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন তা না, ছেলেও আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। বারবার টেলিফোন—সে শুধু পাঁচ মিনিটের জন্যে কথা বলতে চায়।

সেই পাঁচ মিনিট তাকে দেওয়া হল না। তারপরই একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ছেলেটা রিকশা করে যাচ্ছিল। পেছন থেকে একটা মাইক্রোবাস এসে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিল। লোকজন ধরাধরি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতালে নেবার পথেই সে মারা গেল।

ছেলেটির সঙ্গে আমার কোনো মানসিক বন্ধন তৈরি হয় নি, কাজেই তার মৃত্যু আমার জন্যে ভয়ঙ্কর রকম আপসেট হবার মতো কোনো ঘটনা না। তারপরেও কয়েকদিন আমার মন খারাপ গেল। বেচারা পাঁচ মিনিট আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। কী হত পাঁচ মিনিট কথা বললে?

আমার সমস্যাটা শুরু হল ছেলেটার মৃত্যুর ঠিক ছ'দিন পর। আমি আমার ঘরে ঘুমাচ্ছি। টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আমার হাতের কাছে টেলিফোন। টেলিফোন ধরার আগে ঘড়ি দেখলাম। রাত তিনটা বাজে। রাত তিনটায় কে টেলিফোন করবে? কোনো ক্র্যাংক কল নিশ্চয় এসেছে। টেলিফোন ধরলেই জড়ানো গলায় কেউ নোংরা কোনো কথা বলবে। ধরব না ধরব না করেও টেলিফোন ধরলাম। হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে লাইন কেটে দিল। আমি বিরক্ত হয়ে টেলিফোন রেখে বাথরুমে গেলাম। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমার খুব সমস্যা হয়। ঘুম আসতে চায় না। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখি—আমার বিছানায় পা তুলে ছেলেটা বসে আছে। যে বইটা পড়তে পড়তে রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেই বইটা তার হাতে। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকতেই সে বই রেখে বলল, পাঁচটা মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলব। এর বেশি না।

আমি চিৎকার করে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। শুরু হল আমার দুঃস্বপ্নের দিনরাত্রি।

এইটুকু পড়েই মিসির আলি খাতা নামিয়ে রাখলেন। মেয়েটির চিকিৎসা কীভাবে করা হয়েছে তাঁর মনে পড়েছে। লেখা পড়ে নুতন কিছু জানা যাবে না। মিসির আলির ঘুম পাচ্ছে। বরং কিছুক্ষণ ঘুমানো যেতে পারে। ঘুমের মধ্যে বৃষ্টি নামলে চমৎকার হয়। বৃষ্টির শব্দটা কোনো-না-কোনো ভাবে ঘুমন্ত মানুষের মাথায় ঢুকে যায়। ঝমঝম শব্দে

আনন্দময় বাজনা মাথার ভেতর বাজতে থাকে। মানুষের অবচেতন মন বৃষ্টির গান খুবই পছন্দ করে। কেন করে তার নিশ্চয়ই কারণ আছে। কারণটা একদিন ভেবে দেখতে হবে।

৪

মিসির আলির দিন শুরু হয়েছে রুটিন মতোই। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখেছেন—মশারির ভেতর দিয়ে খবরের কাগজটা ঢুকিয়ে দেওয়া। একসময় বাসিমুখে খবরের কাগজ পড়তে তিনি আনন্দ পেতেন, এখন পান না, কিন্তু অভ্যাসটা রয়ে গেছে। অভ্যাস সহজে যায় না। খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই ইয়াসিন চা নিয়ে আসে। মশারির ভেতরে ঢুকিয়ে গলা খাঁকারি দেয়। সেই চা, চা-না অতিরিক্ত চিনির কারণে সিরাপ জাতীয় ঘন তরল পদার্থ। ইয়াসিনকে অনেক বলেও চিনি কমানোর ব্যবস্থা মিসির আলি করতে পারেন নি। এখন মিসির আলির গরম সিরাপ খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রায়ই তাঁকে বলতে শোনা যায়—ইয়াসিন আরেক চামচ চিনি দে। ইংরেজি প্রবচনটা এতই সঠিক—Old habit die hard. পুরোনো অভ্যাস সহজে মরে না।

মিসির আলির হাতে খবরের কাগজ। তিনি খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছেন—হঠাৎ এমন কোনো খবর চোখে পড়ে কি না যা মনে গেঁথে যায়। এমন কিছু চোখে পড়ছে না। হত্যা, ধর্ষণ ছাড়া তেমন কিছু নেই। মিসির আলির মনে হল সব পত্রিকার উচিত এই দুটি বিষয়ে আলাদা পাতা করা। খেলার পাতা, সাহিত্য পাতার মতো ধর্ষণ পাতা, হত্যা পাতা। যারা ঐ সব বিষয় পড়তে ভালবাসে তারা ঐ পাতাগুলি পড়বে। যারা পড়তে চায় না তারা পাতা আলাদা করে রাখবে। বিশেষ দিনে হত্যা এবং ধর্ষণ বিষয়ে সচিত্র ক্রোড়পত্র বের হবে।

পত্রিকায় নতুন একটি বিষয় চালু হয়েছে—জন্মদিনের শুভেচ্ছা। মামণির এক বছর বয়সপূর্তি উপলক্ষে পিতা-মাতার শুভেচ্ছা। মিসির আলি বেশ আগ্রহ নিয়েই পড়ছেন।

অনিক
পৃথিবীতে আজ যত গোলাপ ফুটেছে সবই তোমার জন্যে
তোমার বাবা ও মা

অনিকের ছবি। দুই হাতে ভর দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত গোলাপের মালিক হাঁ করে বসে আছে। তার জিব দেখা যাচ্ছে।

শিপ্রা,
আজ আমাদের শিপ্রার শুভ জন্মদিন
পৃথিবীর সব দুঃখ করবে সে বিলীন।

শিপ্রার
নানা নানু ছোট মামা, ছোট মামি ও রনি।

পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ যে বিলীন করবে সেই শিপ্রার ক্রন্দনরতা একটা ছবি। শিপ্রার হাতে চকবার।

মিসির আলি ছবিটির দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন। মেয়েটি কাঁদছে কেন? চোখে মুখে কি চকবারের কাঠির খোঁচা লেগেছে?

জন্মদিনের শুভেচ্ছায় শুধু ছোট মামা, ছোট মামি আছেন। যেহেতু ছোট মামার উল্লেখ করা আছে অবশ্যই ধরে নিতে হবে বড় মামাও আছেন। বড় মামা-মামি কি আলাদা বাণী দেবেন? তিনি কি পরিবারের সঙ্গে থাকেন না? নাকি বড় মামা মারা গেছেন। শুভেচ্ছা বাণীতে বড় মামা নেই কেন? আরেকটা নাম আছে রনি। এই রনিটা কে? কাজিন? মামাতো ভাই। শিপ্রা মেয়েটির কি কোনো খালা নেই।

ইয়াসিন চায়ের কাপ মশারির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। যথারীতি গরম সিরাপ। মিসির আলি চুমুক দিলেন—তাঁর কাছে মনে হল মিষ্টি সামান্য বেশি তবে খেতে খারাপ না। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিসির আলি শিক্ষার্থীর পাতা উল্টালেন। শিক্ষার্থীর পাতা বলে আরেকটা জিনিস খবরের কাগজে চালু হয়েছে। আজ আছে ক্লাস সিক্সের বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা। অগ্রণী গার্লস হাই স্কুলের ফার্স্ট গার্লের ইন্টারভ্যু। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের একজন শিক্ষিকার বৃত্তি পরীক্ষার ওপর কিছু '—টিপস'। মিসির আলি প্রথম পড়তে শুরু করলেন ফার্স্ট গার্ল নাজনিন বেগমের ইন্টারভ্যু—

"তুমি দৈনিক কত ঘণ্টা পড়াশোনা কর?"

আমি দৈনিক পাঁচ থেকে ছ'ঘণ্টা পড়াশোনা করি।

"তুমি অবসর সময়ে কী কর?"

আমি অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ি। টিভি দেখি।

" তোমার পড়াশোনার পেছনে কার অনুপ্রেরণা সবচেয়ে বেশি কাজ করে?"

আমার পিতা-মাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা।

" তোমার কি কোনো গৃহশিক্ষক আছে?"

দু জন গৃহশিক্ষক আছে।

"তুমি কি কোনো কোচিং সেন্টারে যাও?"

আমি একটি কোচিং সেন্টারে সপ্তাহে তিনদিন যাই।

" তোমার সাফল্যের রহস্য কী?"

আমি দিনের পড়া দিনে তৈরি করে রাখি।

" তোমার বয়সী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তোমার কী উপদেশ?"

'তোমরা নিয়মিত পড়াশোনা কর।'

ফার্স্ট গার্ল নাজনিন বেগমের ইন্টারভ্যু শেষ করে মিসির আলি ভিকারুননিসা নূন স্কুলের শিক্ষিকার কঠিন উপদেশগুলি পড়তে শুরু করলেন। তাঁর খানিকটা মন খারাপ হতে শুরু করেছে—তাঁর কাছে মনে হচ্ছে সবাই বাচ্চাগুলির পেছনে লেগেছে। শিশুর স্বপ্ন, শিশুর আনন্দ কেড়ে নেবার খেলা শুরু করেছে। শিশুদের শিশুর মতো থাকতে দিলে কেমন হয়। বৃত্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দিলে কেমন হয়? পরীক্ষার ব্যাপারটা কি উঠিয়ে দেওয়া যায় না। পরীক্ষা নামের ব্যাপারগুলি রেখে অতি অল্পবয়সেই শিশুদের মাথায় একটা

জিনিস আমরা ঢুকিয়ে দিচ্ছি—তোমাদের মধ্যে কেউ ভালো, কেউ খারাপ। তোমাদের মধ্যে একদল বৃত্তি পায়, একদল পায় না। তোমাদের মধ্যে একজন হয় ফার্স্ট গার্ল নাজনিন। আরেকজন খুব চেষ্টা করেও দশের ভেতর থাকতে পারে না। যেদিন স্কুলে রেজাল্ট দেয় সেদিন সে কান্না কান্না মুখে বাড়ি ফেরে। এবং তার মা মেয়ের ওপর প্রচণ্ড রাগ করেন। এই মা-ই আবার মেয়েকে গান শেখান—আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

আমরা যে সবাই রাজা না, কেউ কেউ রাজা কেউ কেউ প্রজা, পরীক্ষা নামক ব্যবস্থাটা তা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়।

মিসির আলি পত্রিকা ভাঁজ করে রাখলেন। মশারির ভেতর থেকে বের হলেন না। সকালে মশারির ভেতর থেকে তিনি বেশ আয়োজন করে বের হন। যেন তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন, সারা দিন কাজকর্ম করবেন আবার রাত এগারোটা বারোটায় জেলখানায় ঢুকবেন।

কলিংবেল বাজছে।

মিসির আলি মশারির ভেতর থেকে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন। কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বাজে। প্রতিমা এসে পড়েছে। সে ন'টায় আসবে বলেছিল—ঠিক ন'টায় এসেছে। পাঁচ-ছ'মিনিট আগেই হয়তো এসেছে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ন'টা বাজার অপেক্ষা করেছে। এ ধরনের মানুষ খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়। মিসির আলি ছোট্ট নিশ্বাস ফেললেন। মানুষের সঙ্গ তাঁর কাছে খুব আনন্দদায়ক কোনো ব্যাপার না। তিনি একা থেকে থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। অন্যরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

মিসির আলির ধারণা যেসব মানুষ দীর্ঘদিন একা থাকে এবং বই পড়ে সময় কাটায় তারা অন্য রকম। মানুষকেও তারা বই মনে করে। যে বই তার পছন্দ সে লাইব্রেরি থেকে সেই বই টেনে নেয়। ঠিক একইভাবে যে মানুষটি তার পছন্দ সেই মানুষকে সে ডেকে নিয়ে আসে। কোনো মানুষ নিজে তাদের কাছে উপস্থিত হবে এটা তাদের পছন্দ না।

মিসির আলি অপ্রসন্ন মুখে মশারির ভেতর থেকে বের হলেন। বসার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেন প্রতিমা আসে নি। বেতের চেয়ারে ফতে মিয়া বসে আছে।

'স্যার কেমন আছেন?'

মিসির আলি বললেন, ভালো আছি।

ফতে বলল, চলে যাচ্ছি তো স্যার, এইজন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। একটু দোয়া রাখবেন।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'গতকাল আপনাকে বললাম না আমি একটা দরজির দোকান দিচ্ছি। এখন থেকে দোকানেই থাকব।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনাকে একদিন আমার দোকানে নিয়ে যাব।'

মিসির আলি ফতের সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, ঠিক আছে।

'আমার একটা আবদার আছে স্যার। যদি রাখেন খুব খুশি হব।'

'কী আবদার?'

'আমার দোকানের প্রথম দরজির কাজটা আপনাকে দিয়ে করাব। আপনার জন্যে একটা পাঞ্জাবি বা ফতুয়া দিয়ে দোকানের শুরু। আপনাকে কখনো ফতুয়া পরতে দেখি নাই। আপনি কি ফতুয়া পরেন?'

'পোশাক নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। পোশাক নিয়ে আমি তেমন ভাবি না।'

'স্যার আপনি কি নাশতা করেছেন?'

'না।'

'আমিও নাশতা করি নাই। ইয়াসিনকে বলেছি আমাদের দুজনের নাশতা দিতে। শুধু পরোটা ভাজতে বলেছি। আমি বিরিয়ানি হাউস থেকে মুরগির লটপটি নিয়ে এসেছি। মুরগির লটপটি জিনিসটা কখনো খেয়েছেন?'

'না।'

হোটেলে অনেক মুরগি রান্না হয় তো। সেই সব মুরগির গিলা, কলিজা, পাখনা, এইগুলো কী করবে? ফেলে তো দিতে পারে না—হোটেলওয়ালারা এইগুলো দিয়ে একটা ঝোলের মতো বানায়। এটাকে বলে লটপটি। পরোটা দিয়ে লটপটি খেতে খুবই সুস্বাদু।

'ও আচ্ছা।'

ফতে মিয়া হাসতে হাসতে বলল, সকালবেলা এসে আপনার সঙ্গে বকবক শুরু করেছি, আপনার খুব বিরক্ত লাগছে তাই না স্যার?

মিসির আলি বললেন, খুব বিরক্তি লাগছে না, তবে কিছুটা যে বিরক্ত হচ্ছি না—তা না। অকারণ কথাবার্তা বলতে আমার ভালো লাগে না।

ফতে বলল, আমি তো চলেই যাচ্ছি স্যার। এরপর আর রোজ রোজ এসে আপনাকে বিরক্ত করব না। যান হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, একসঙ্গে নাশতা খাই। আমি স্যার গজফিতা নিয়ে এসেছি—আপনার ফতুয়ার মাপ নিব। আমি মাপ নেওয়া শিখেছি। আপনাকে দিয়ে বিসমিল্লাহ করব।

মিসির আলি অপ্রসন্ন মুখে বাথরুমের দিকে রওনা হলেন। ফতে মিয়া ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করবে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই প্রতিমা চলে আসবে। সে তো আর সহজে যাবে না। বাজারটাজার নিয়ে আসবে। মহাউৎসাহে মাছ ভাজতে শুরু করবে। ঘর ধোয়া মোছা করবে। প্রতিমার কর্মকাণ্ড এখানেই শেষ হবে না। সে অবশ্যই চেষ্টা করবে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে। বাড়াবাড়ি এই মেয়ে করবেই। মানুষের জিনের মধ্যে এমন কিছু কি আছে যা তাকে দিয়ে 'বাড়াবাড়ি' করায়। ডিএনএ অণুতে প্রোটিনের এমন কোনো বিশেষ অবস্থান যা বাড়াবাড়ি করতে বিশেষ বিশেষ মানুষকে প্রেরণা দেয়। সেই মানুষ যখন ঘৃণা করে বাড়াবাড়ি ধরনের ঘৃণা করে। যখন ভালবাসে বাড়াবাড়ি ভালবার্সে। অনেক অসুখের মতো এটাও যে একটা অসুখ তা কি মানুষ জানে? এখন না জানলেও একদিন জানবে। কোনো ওষুধ কোম্পানি ওষুধ বের করে ফেলবে। যেসব মানুষের বাড়াবাড়ি করার রোগ আছে তারা ট্যাবলেট খেয়ে রোগ সারাবে। একসময় হুপিংকফ, পোলিওর মতো 'বাড়াবাড়ি' রোগেরও টিকা বের হবে। শিশুদের বয়স ছয় মাস হবার আগেই তাদের 'বাড়াবাড়ি প্রবণতা' রোগের টিকা দেওয়া

হবে। রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার দেখা যাবে আপনার শিশুকে কি "বাড়াবাড়ি প্রবণতা"র টিকা দিয়েছেন?

বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিসির আলি বিরক্ত মুখে নিজের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা করছে। তাঁর যদি প্রচুর টাকা থাকত তিনি সমুদ্রের কোনো জনমানবশূন্য দ্বীপে একটা ঘর বানাতেন। আলেকজান্ড্রিয়ার লাইব্রেরির মতো—সেখানে তাঁর বিশাল লাইব্রেরি থাকত। তিনি দ্বীপে ঘুরে ঘুরে বই পড়তেন। ঘুম পেলে বালির ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। রবিনসন ক্রুশোর আনন্দময় জীবন।

মিসির আলির চোখ-মুখ জ্বালা করছে। তিনি মুখে ঠাণ্ডা পানির ছিটা দিচ্ছেন তাতেও জ্বলুনি কমছে না। হঠাৎ তাঁর খুব মেজাজ খারাপ লাগছে। এতটা মেজাজ খারাপ হবার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নি। তিনি সমাজে বাস করছেন। সমাজের আর দশটা মানুষের মতোই তাকে থাকতে হবে। সামাজিকতা করতে হবে। কেউ তাঁর সঙ্গে গল্প করতে চাইলে গল্প করতে হবে। কেউ লটপটি নামক বস্তু নিয়ে এসে তার সঙ্গে নাশতা খেতে চাইলে নাশতা খেতে হবে। কোনো উপায় নেই। তিনি সমাজে বাস করছেন—বাস করার মূল্য তাঁকে দিতেই হবে।

মিসির আলি বাথরুম থেকে বের হয়ে ইয়াসিনকে গরম পানি দিতে বললেন। গোসল করবেন। সকালে গোসল করার অভ্যাস তার নেই। এখন গোসলে যাওয়ার অর্থ কিছুটা সময় নিজের করে পাওয়া। ফতে তার গজফিতা নিয়ে থাকুক একা একা। একা থাকার অভ্যাস করাটাও জরুরি।

ফতে সিগারেট ধরিয়েছে। পা নাচাচ্ছে। সে আনন্দেই আছে। তার মুখ হাসি হাসি। সে ঠিক করেই এসেছে আজ মিসির আলি সাহেবকে সে চমকে দেবে। ছোটখাটো চমক না, বড় ধরনের চমক। ছোটখাটো চমকে এই লোকের কিছু হবে না। ছোটখাটো চমক সে দিয়ে দেখেছে। ঘড়ি না দেখে ঘড়ির সময় বলেছে। আজ তার চেয়ে বেশি কিছু করবে। সকালবেলা মিসির আলি সাহেব যখন তার সামনে এসে বসেছিলেন তখন ফতে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল উনার মাথায় ঘুরছে রনি নামের একজনের নাম। রনিটা কে তিনি বুঝতে পারছিলেন না। রনির সঙ্গে শিপ্রার সম্পর্ক কী তা নিয়ে তিনি চিন্তিত। ফতে ইচ্ছা করলে এই কথাটা বলেও তাকে চমক দিতে পারত। কিংবা সে সকাল ন'টায় যখন এসেছে তখন বলতে পারত—ন'টার সময় অন্য একজনের আসার কথা। সে আসে নি আমি এসেছি। যার আসার কথা তার নাম প্রতিমা।

ফতে জানে সে ক্ষমতাধর একজন মানুষ। অন্যের মাথার ভেতর সে ঢুকে পড়তে পারে। ছোটবেলা থেকেই পারে। তার ধারণা ছিল সব মানুষই এটা পারে। ব্যাপারটা যে অন্যরা পারে না শুধু সে একা পারে এটা ধরতে তার অনেক সময় লেগেছে। ক্লাস ফাইভে যখন পড়ে তখন তার হঠাৎ চিন্তা হল—সে কী ভাবছে অন্যরা তা বুঝতে পারছে না কেন ? অন্যদের তো বুঝতে পারা উচিত।

ক্লাসের স্যার যখন তাকে প্রশ্ন করলেন, ফতে বল তিব্বতের রাজধানী কী?

ফতে খুবই অবাক হল। প্রশ্ন করার দরকার কী? স্যার কেন তার মাথার ভেতর ঢুকে পড়ছেন না। মাথার ভেতর ঢুকলেই তো স্যার জানতে পারতেন। তিব্বতের রাজধানীর

নাম ফতে জানে না। তবে এই মুহূর্তে জানে—কারণ স্যারের মাথায় নামটা ঘুরছে। তিব্বতের রাজধানী—লাসা। এই প্রশ্নের পরে স্যার কী প্রশ্ন করতেন এটাও সে জানে। স্যারের পরের প্রশ্ন—ভুটানের রাজধানীর নাম কী। উত্তরও স্যারের মাথায় আছে—থিম্পু।

মানুষের মাথার ভেতর ঢুকতে পারার অস্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়ে ফতের কোনো লাভ হয় নি। সে কিছুই করতে পারে নি। এই ক্ষমতার কারণে স্কুল জীবনটা তার মোটামুটি ভালো কেটেছে—স্যারদের মার খেতে হয় নি। প্রশংসা শুনেছে—। ইতিহাসের স্যার তো গর্ব করে বলতেন—ইতিহাসের সন তারিখ সব ফতের মুখস্থ। তার সমস্যা একটা পরীক্ষার খাতায় কিছু লিখতে পারে না।

ক্ষমতা পাওয়ায় ফতের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে। তাকে সারাক্ষণ চিন্তার ভিতর থাকতে হয়—"অন্য কেউ কি আমার মাথার ভিতর ঢুকে পড়ছে। ঢুকে পড়লে ভয়ঙ্কর হবে। কারণ আমার মাথার ভেতর ভয়ঙ্কর সব জিনিস আছে।" ফতে তার জীবনটাই কাটাল আতঙ্ক নিয়ে। কেউ অন্য রকমভাবে তার দিকে তাকালেই তার বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সর্বনাশ কি হয়ে গেল?

কেউ তার মাথার ভিতর ঢুকতে পেরেছে এ রকম কোনো প্রমাণ তার হাতে নেই—তবে মাঝে মাঝেই সে লক্ষ করেছে তার দিকে তাকানোর সময় কেমন করে যেন তাকাচ্ছে। তার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছে। শিশুদের ব্যাপারে এই ঘটনাটা বেশি ঘটে। বেশিরভাগ শিশুই তাকে দেখলে কাঁদতে শুরু করে। সাধারণ কান্না না। চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করে ফেলার মতো কান্না। তখন ফতের ভয়ঙ্কর রাগ লাগে। ইচ্ছা করে আছাড় দিয়ে মাথাটা ফাটিয়ে ফেলতে।

আরো একজনের সঙ্গে ফতের দেখা হয়েছিল যাকে দেখে সে নিজে আতঙ্কে অস্থির হয়েছিল। ঘটনাটা এ রকম—ফতের মামা ফতেকে দোকানে পাঠিয়েছিলেন—টুথপেস্ট আনতে। ফতে টুথপেস্ট কিনল। স্টেশনারি দোকানের পাশের সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কেনার সময় হঠাৎ পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বললেন, কিছু মনে করবেন না। আপনার নাম কী?

অপরিচিত কোনো মানুষ হঠাৎ এ ধরনের কথা বলে না। ফতে হকচকিয়ে গেল। তার বুকে ধাক্কার মতো লাগল। ঘটনা কী? লোকটা কি সব বুঝে ফেলেছে। ফতে বলল, আমার নাম ফতে।

'আপনি কোথায় থাকেন?'

ফতে ক্ষীণ স্বরে বলল, কেন ?

'আপনার বিষয়ে আমার কৌতূহল হচ্ছে এই জন্যেই জানতে চাচ্ছি ।'

ফতে খুব নার্ভাস হয়ে গেল। তার বুক ধড়ফড় করা শুরু হয়ে গেল। সে ইচ্ছা করলে লোকটার মাথার ভিতর ঢুকতে পারে। লোকটা কেন এ রকম প্রশ্ন করছে তা জানতে পারে—সমস্যা হচ্ছে ফতে যখন ভয় পেয়ে যায় তখন তার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। তখনো হল। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা একটা লোক। রোগা। থুতনিতে সামান্য দাড়ি আছে। শান্ত ভদ্র চেহারা। লোকটা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ চোখে। ফতে নিজেকে শান্ত করার জন্যে সিগারেট ধরাল। লোকটা বলল, আপনি কী করেন জানতে পারি?

ফতে নিজেকে সামলে নিয়ে কঠিন গলায় বলল, আমি কী করি তা দিয়ে আপনার প্রয়োজন কী?

লোকটা বলল, প্রয়োজন নেই। শুধুই কৌতূহল।

ফতে বলল, এত কৌতূহল ভালো না।

এই বলেই সে আর দাঁড়াল না। হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর যাবার পর পেছন ফিরে দেখে লোকটা তার পেছনে পেছনে আসছে। ফতের বুক আবার ধড়ফড় করতে শুরু করল। সে দৌড়াতে শুরু করল। তখন ঐ লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল, তবে তাকিয়ে রইল ফতের দিকে। দৃশ্যটা মনে পড়লেই ফতের বুক কাঁপে।

মিসির আলির ব্যাপারটা ফতে ঠিক ধরতে পারছে না। ফতের যে ক্ষমতা এই মানুষটার কি সেই ক্ষমতা আছে? মাঝে মাঝে মনে হয় আছে—আবার মাঝে মাঝে মনে হয় নেই। মিসির আলির মাথায় বেশিরভাগ সময়ই ফতে ঢুকতে পারে না। সন্দেহটা সেই কারণেই হয়। যতবার ফতে মিসির আলির মাথার ভিতর ঢুকেছে ততবারই সে ধাক্কার মতো খেয়েছে। লোকটা একসঙ্গে অনেক কিছু চিন্তা করছে। তিনটা–চারটা চিন্তা কোনো মানুষ একসঙ্গে করছে—এমন কারোর সঙ্গেই ফতের এর আগে দেখা হয় নি। ফতে মিসির আলির ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে চায়। পুরোপুরি জানতে চায় এই মানুষটারও কি তার মতো ক্ষমতা আছে?

ফতের মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে তার ক্ষমতার ব্যাপারটা মিসির আলিকে খোলাখুলি বলে। কিন্তু তার মন সায় দেয় না। লোকটাকে এটা বলে তার লাভ কী। এমন তো না যে এটা কোনো অসুখ সে অসুখ থেকে মুক্তি চায়। আগবাড়িয়ে বললে—একজন তার গোপন ব্যাপারটা জেনে ফেলবে। একজন জানা মানেই অনেকের জানা। কী দরকার।

মিসির আলির গোসল শেষ হয়েছে। তিনি এসে ফতের সমনের চেয়ারে বসেছেন। ফতে খুবই হতাশা বোধ করছে। মিসির আলির মাথার ভেতর সে ঢুকতে পারছে না। ইয়াসিন এসে পরোটা এবং বাটিতে করে মুরগির লটপটি দিয়ে গেল। ফতে বলল, স্যার খান এর নাম মুরগির লটপটি।

মিসির আলি কোনো কথা না বলে খেতে শুরু করলেন। ফতে বলল, খেতে কেমন স্যার?

মিসির আলি বললেন, ভালো।

'আপনার কি শরীর খারাপ?'

'না শরীর খারাপ না। মেজাজ সামান্য খারাপ। কোনো কারণ ছাড়াই খারাপ।'

'আমি বেশিক্ষণ থাকব না স্যার। নাশতা খেয়ে আপনার ফতুয়ার মাপটা নিয়ে কাপড় কিনতে যাব। কী রঙের কাপড় আপনার পছন্দ?'

মিসির আলি বললেন, কাপড়ের রঙ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। শুধু কটকট না করলেই হল।

'হালকা নীল রঙ কিনব স্যার?'

'কিনতে পার।'

'কাপড়ের দামটা স্যার আমি দিব। আপনি যদি কিছু মনে না করেন। শুধু দরজির খরচটা আপনি দিবেন। প্রথম ব্যবসা—বিনা টাকায় করা ঠিক না।'

মিসির আলি বললেন, আমি দরজির খরচ দেব। কোনো অসুবিধা নেই।

'আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফতুয়া দোকানে গিয়ে ডেলিভারি নেবেন। কষ্টটা আপনাকে করতে হবে।'

'আচ্ছা করব। ঠিকানা রেখে যাও, আমি সন্ধ্যার পরপর যাব।'

মিসির আলির নাশতা খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি চা খাচ্ছেন। ফতে কয়েকবার চেষ্টা করেও মিসির আলির মাথার ভেতর ঢুকতে পারল না। সে পরিকল্পনা বদলাল। লোকটাকে চমকে দেবার কোনো দরকার নেই। পরে হয়তো দেখা যাবে চমকে দিতে গিয়ে এমন কিছু ঘটল যে উল্টো সে নিজেই চমকাল। লোকটির বিষয়ে আগে সে পুরোপুরি জানবে। তারপর অন্য ব্যবস্থা।

ফতে মাপ নেবার জন্যে ফিতা বের করল। দরজিদের মতোই উঁচু গলায় মাপ বলতে বলতে কাগজে লিখে নিল।

লম্বা	২৯
বুক	৩৪
পুট	৬
হাত	১২
মুহরি	১৬
গলা	১৩$^{১}/_{২}$

ফতে বলল, একটু দোয়া রাখবেন স্যার দরজির কাজটা যেন তাড়াতাড়ি শিখতে পারি। খবরের কাগজে নকশা করে, খবরের কাগজ কেটে কেটে কয়েকদিন চেষ্টা করেছি আউলা লেগে যায়।

মিসির আলি বললেন, সব কাজ সবার জন্যে না।

ফতে সামান্য চমকাল মিসির আলি এই কথাটা কেন বললেন। তিনি কি কিছু বুঝতে পারছেন? না এটা শুধুই কথার কথা। ফতে বলল, স্যার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। যদি কিছু মনে না নেন।

'জিজ্ঞেস কর।'

ফতে মিনমিনে গলায় বলল, আমার বিষয়ে আপনার কী ধারণা?

তোমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না। আরো পরিষ্কার করে বল।

'আমাকে দেখলে আপনার কী মনে হয়?'

'মনে হয় তুমি সব সময় আতঙ্কে আছ। সবাইকে ভয় পাচ্ছ।'

ফতে মুখ শুকনা করে ফেলল। ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। এই লোক কী করে বুঝল সে সবাইকে ভয় পায়। তার ভয় তো সে প্রকাশ করে না। নিজের ভিতর লুকিয়ে রাখে। লুকানো জিনিস সে জানল কীভাবে?

স্যার আমি যাই?

ফতুয়ার লেখা কাগজটা ফেলে গেছ। মাপটা নিয়ে যাও। লম্বার মাপে ভুল আছে—লম্বা বাইশ। তুমি মাপ নিয়েছ বাইশের বলেছ উনত্রিশ, লিখেছও উনত্রিশ।

মিসির আলি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরেই থাকলেন। প্রতিমা এল না। এতে তার টেনশন কমল না—যে কোনো সময় চলে আসবে এই টেনশন থেকেই গেল।

সন্ধ্যায় ফতুয়া আনতে গেলেন। দরজির দোকান ফতে সুন্দর সাজিয়েছে। ঝলমলে বাতি জ্বলছে। টাকা দিয়ে মিসির আলি ফতুয়া নিলেন। দোকানের মালিক ফতে ছিল না। মিসির আলি কেমন যেন স্বস্তিবোধ করলেন। স্বস্তিবোধ করার কারণটা তাঁর কাছে স্পষ্ট না।

মিসির আলি মাথা নিচু করে হাঁটছেন। বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। তার মনে ক্ষীণ সন্দেহ—বাসায় ফিরে দেখবেন প্রতিমা এসেছে। দেড়টনি একটা ট্রাক নিয়ে এসেছে। সে ট্রাকে মিসির আলির জিনিসপত্র তুলে অপেক্ষা করছে কখন মিসির আলি আসবেন।

এতটা এই মেয়ে নিশ্চয়ই করবে না, আবার করতেও পারে। অস্বাভাবিক মানুষ পারে না এমন কাজ নেই। কাউকে চট করে অস্বাভাবিক বলা ঠিক না। মানুষ স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিকের সীমারেখায় বাস করে। একজন স্বাভাবিক মানুষ মাঝে মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ করে, আবার খুবই অস্বাভাবিক মানুষ হঠাৎ স্বাভাবিক আচরণ করে। এখানেও কথা আছে—কোন আচরণগুলিকে আমরা স্বাভাবিক আচরণ বলব। স্বাভাবিকের মানদণ্ড কে ঠিক করে দেবে? মিসির আলি যে আচরণকে স্বাভাবিক ভাবছেন—ফতে মিয়া কি তাকে স্বাভাবিক ভাববে?

ভ্রূ কুঁচকে মিসির আলি ফতের কথা ভাবতে শুরু করলেন। ফতেকে কি খুব স্বাভাবিক মানুষ বলা যায়?

মিসির আলি মাথা নেড়ে নিজের মনে বললেন, হ্যাঁ বলা যায়।

মিসির আলি আবারো নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ফতেকে কি অস্বাভাবিক বলতে চাইলে বলতে পারে?

প্রশ্ন এবং উত্তরের খেলা চলতে লাগল। কিছু দাবা খেলোয়াড় আছে সঙ্গী না পেলে নিজেই নিজের সঙ্গে দাবা খেলে—মিসির আলিও ইদানীং তাই করেন। নিজেই প্রশ্ন করেন। নিজেই উত্তর দেন। কাজটা বেশিরভাগ সময় করেন পথে যখন হাঁটেন। এটাও বয়স বাড়ার কোনো লক্ষণ কি না তিনি জানেন না। একটা বয়সের পর সবাই কি এ রকম করে? করার কথা।

মিসির আলির নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার নমুনা এ রকম—

প্রশ্ন : ফতের কোন আচরণটা সবচেয়ে অস্বাভাবিক?

উত্তর : সে ভীতু প্রকৃতির মানুষ। ভয়ে সে অস্থির হয়ে থাকে। ভীতু মানুষরা কারো চোখের দিকে সরাসরি তাকায় না। আর তাকালেও খুব অল্প সময়ের জন্যে তাকায়। এ ধরনের মানুষ বেশিরভাগ সময় মেজের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ফতে সব সময় চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রশ্ন : সে কেন চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে?

উত্তর : হয়তোবা চোখের ভাষা পড়তে চায়। হয়তো সে চোখের ভাষা সহজে বুঝতে পারে।

প্রশ্ন : তোমার এই হাইপোথিসিস কীভাবে প্রমাণ করা যাবে?

উত্তর : খুব সহজেই প্রমাণ করা যায়। চোখে সানগ্লাস পরে তার সামনে বসতে হবে। সানগ্লাসের কারণে তার চোখ দেখা যাবে না। কাজেই ফতে আর চোখের দিকে তাকাবে না।

প্রশ্ন : আর কোনো পদ্ধতি আছে?

উত্তর : একজন জন্মান্ধের সঙ্গে তাকে কথা বলতে দিয়ে দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন : তার অস্বাভাবিকতার আর কোনো উদাহরণ কি আছে ?

উত্তর : হ্যাঁ আছে। বড় একটা উদাহরণ আছে।

প্রশ্ন : বল শুনি।

উত্তর : না এখন বলব না। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিই।

প্রশ্ন : কী আশ্চর্য তুমি যা বলার আমাকেই তো বলছ। আমি তো বাইরের কেউ না।

উত্তর : যে প্রশ্ন করছে এবং যে উত্তর দিচ্ছে তারা একই ব্যক্তি হলেও আলাদা সত্তা। একটি সত্তা অন্য সত্তার থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে চাইতেই পারে।

মিসির আলি ঘড়ি দেখলেন সাড়ে সাতটা বাজে। প্রায় দেড় ঘণ্টা তিনি হেঁটেছেন—কোনো এক চিপা গলির ভেতর ঢুকে পড়েছেন। জায়গাটা চিনতে পারছেন না। একজনকে জিজ্ঞেস করলেন—"ভাই এই জায়গাটার নাম কী?" সে এমনভাবে তাকাল যেন খুব গর্হিত কোনো প্রশ্ন তিনি করে ফেলেছেন। জবাব না দিয়ে সে চলে গেল। আরেকজনকে একই প্রশ্ন করলেন, সে নিতান্তই বিরক্ত গলায় বলল, জানি না।

অদ্ভুত এক গলি, তার চোখের সামনে দিয়ে কালো রঙের প্রকাণ্ড এক শূকর কয়েকটা বাচ্চা নিয়ে চলে গেল। মেথরপট্টিতে শূকর পোষা হয় এই জায়গাটা নিশ্চয় মেথরপট্টি না। তিনি কোথায় এসে পড়েছেন ?

রাত ন'টা।

ফতে মিয়াকে নিউমার্কেটের কাঁচাবাজারে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। সে এসেছে মুরগি কিনতে। সে চারটা রোস্টের মুরগি কিনবে। ফতের মামির কিছু বান্ধবী কাল দুপুরে খাবে। মামি রাতেই রোস্ট রেঁধে ফেলতে চান।

ফতে দাঁড়িয়ে আছে—বড় মাছের দোকানের সামনে। বিশাল চকচকে বঁটি দিয়ে মাছ কাটা হয়—বঁটির গা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। কী অসাধারণ দৃশ্য! ফতের দেখতে ভালো লাগে। দৃশ্যটা দেখার সময় মেরুদণ্ড দিয়ে শিরশির করে কী যেন বয়। শরীর ঝনঝন করতে থাকে। ফতের বড় ভালো লাগে। মাছটা যদি জীবিত হয় তখন তার আরো ভালো লাগে। আজ একটা কাতল মাছ কাটা হচ্ছে। মাছটা জীবিত ছটফট করছে। আহা কী দৃশ্য!

মাছ কাটা দেখে ফতে গেল মুরগি কিনতে। ফতে মনের ভেতর চাপা আনন্দ অনুভব করছে। জীবিত মুরগিগুলিকে জবেহ করা হবে। জবেহ করার ঠিক আগে মুরগিগুলি আতঙ্কে অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকে—তখনো ফতের ভালো লাগে। ফতে ঠিক

করেছে মুরগি জবেহ্ করার সময় সে বলবে মাথাগুলি যেন পুরোপুরি শরীর থেকে আলাদা করা হয়। খুব ছোটবেলায় একবার সে এই দৃশ্য দেখেছিল। বাড়িতে মেহমান এসেছে— মুরগি জবেহ হচ্ছে। ধারালো বঁটি দিয়ে টান দিতেই মুরগির মাথাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল। যে মুরগি ধরে ছিল সে হাত ছেড়ে দিল। কী আশ্চর্য মাথা ছাড়া মুরগিটা তিন–চার পা এগিয়ে গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল। এই দৃশ্য এর পরে ফতে আর দেখে নি। যতবারই মুরগি কাটা হয়—ফতে আগ্রহ নিয়ে এই দৃশ্য দেখার জন্যে বসে থাকে। সে নিশ্চিত একসময় না একসময় সে দৃশ্যটা দেখবে। কে জানে কপাল ভালো হলে হয়তো আজই দেখবে। আজ তার জন্যে শুভদিন। নিজের দোকান চালু হয়েছে।

ফতে মুরগি কাটতে দিয়ে নিচুগলায় বলল, মুরগির মাথা পুরাটা আলগা করে ফেলেন।

মুরগি কাটার লোক বলল, বুঝলাম না কী কন।

ফতে বলল, এক পোচ দিয়ে মাথা আলাদা করে ফেলেন।

লোকটা আপত্তি করল না। যা বলা হল তাই সে করল। ছোটবেলার ঘটনাটা ঘটল না। মাথাবিহীন কোনো মুরগি দৌড় দিল না। ফতে আফসোসের ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। এ ধরনের মজাদার ঘটনা রোজ রোজ ঘটে না। হঠাৎ হঠাৎ ঘটে।

মুরগির কাটা মাথাগুলি ফতে আলাদা করে পলিথিনের ব্যাগে নিয়ে নিল। কাটা মাথাগুলি নিয়ে একটা মজা করা যাবে। যে বেবিট্যাক্সিতে করে সে বাড়িতে ফিরবে— মুরগির কাটা মাথাগুলি সেই বেবিট্যাক্সির সিটে রেখে দেবে। সিটের উপর রক্তমাখা মাথা রেখে ফতে নেমে যাবে। পরে যে যাত্রী উঠবে সে বসতে গিয়ে ভয়ে ভিরমি খাবে। চিৎকার–চেঁচামেচি করবে। ফতের ভাবতেই ভালো লাগছে। এই সময় সে কাছে থাকবে না এটাই একটা আফসোস।

ফতে বেবিট্যাক্সি বাড়ি পর্যন্ত নিল না, বাড়ির কাছাকাছি এসে ছেড়ে দিল। বেবিট্যাক্সিওয়ালাকে বাড়ি চেনানো মোটেই ঠিক হবে না। কেন সে মুরগির মাথা সিটে রেখেছে তা নিয়ে দরবার করতে পারে। এই সব সূক্ষ্ম কাজ খুব ঠাণ্ডা মাথায় করতে হয়। সামান্য উনিশ–বিশও করা যায় না। ফতে এই কাজগুলি ঠাণ্ডা মাথায় করে বলেই এখনো টিকে আছে। কেউ তাকে ধরতে পারে নি। কোনোদিন পারবেও না।

চারটা মুরগি নিয়ে ফতে রওনা হয়েছে। তার বেশ মজা লাগছে। সে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে তার পরে বেবিট্যাক্সিতে যে উঠবে তার দশাটা কী হবে। ধরা যাক স্বামী–স্ত্রী উঠেছে। প্রথমে উঠল স্ত্রী। সে বসতে গিয়ে বলল, কিসের ওপর বসলাম গো? স্বামী বলল, তুমি সব সময় যন্ত্রণা কর। স্ত্রী বলল, হাতে যেন রসের মতো কী লাগল। এর মধ্যে স্বামী এসে উঠেছে। দেয়াশলাই জ্বালিয়ে আঁতকে উঠেছে—হতভম্ব গলায় বলছে সর্বনাশ শত শত মুরগির মাথা। কোত্থেকে আসল?

চারটা মুরগির মাথাই তখন তাদের কাছে শত শত মুরগির মাথা বলে মনে হবে। ভয় পেলে এ রকম হয়।

ফতে ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে ভাবল মুরগির মাথা না হয়ে যদি মানুষের মাথা হত তখন কেমন হত। চারটা মাথার তখন প্রয়োজন নেই। একটা কাটা মাথাই যথেষ্ট। সিটের

এক কোনায় কাটা মাথাটা পড়ে আছে। অন্ধকার বলে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। যাত্রী উঠল। বেবিট্যাক্সি চলা শুরু করেছে। যাত্রী বলল, কে যেন ব্যাগ নাকি ফেলে গেছে। বলেই সে হাত দিয়ে জিনিসটা তুলল। এরপর যে নাটক হবে তার কোনো তুলনা নেই। এই নাটক কল্পনায় দেখলে হবে না। এই নাটক দেখতে হবে বাস্তবে। বেবিট্যাক্সি নিয়ে ফতেকেই বের হতে হবে। যাত্রী যখন কাটা মাথাটা হাত দিয়ে তুলে ধরে হতভম্ব গলায় বলবে—"এটা কী?" তখন ফতে খুব স্বাভাবিক গলায় বলবে, "এটা একটা ছোট বাচ্চার কাটা মাথা। সাইডে রেখে দেন।"

ভাবতেই গা যেন কেমন করছে। মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। শরীর ঝলমল করছে।

কাজটা করতে হবে। একটা কাটা মাথা নিয়ে বের হতে পারলে অনেক মজা করা যাবে। হয়তো আত্মভোলা টাইপ কোনো যাত্রী উঠেছে। সিটের কোনায় কী পড়ে আছে সে তাকিয়েও দেখছে না। তাকে সে বলল, স্যার সিটের কোনায় ছোট বাচ্চার একটা কাটা মাথা আছে। একটু খেয়াল রাখবেন মাথাটা যেন পড়ে না যায়।

কিংবা ধরা যাক খুব সাহসী কোনো যাত্রী এসেছে। সে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, এই বেবি থামাও। গাড়ির ভেতর মানুষের মাথা কেন? কোত্থেকে এসেছে। চল থানায় চল।

সে তখন খুবই বিনীত গলায় বলবে, মাথাটা স্যার আমি এনেছি। শুক্রাবাদ থেকে আরেকটা মাথা তুলে ডেলিভারি দিতে হবে। মাল দুটা ডেলিভারি দিয়ে আপনার সঙ্গে থানায় যাব। কোনো সমস্যা নেই।

ফতের চোখ চকচক করছে। কল্পনা করতেই এত আনন্দ। আসল ঘটনার সময় না-জানি কত আনন্দ হবে।

আসল ঘটনার খুব দেরিও নেই। নকল ঘটনা ঘটতে ঘটতে আসল ঘটনা ঘটে। তার জীবনে সব সময় এ রকমই হয়েছে। অতীতে যেহেতু হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। কোনো এক বর্ষার রাতে দেখা যাবে মাফলার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে সে বেবিট্যাক্সি নিয়ে বের হয়েছে। সেই বেবিট্যাক্সির 'প্রাইভেট' লেখা সাইনবোর্ড সে খুলে ফেলেছে। এখন তারটা সাধারণ ভাড়ার বেবিট্যাক্সি। ফার্মগেট থেকে যাত্রী তুলেছে, যাবে উত্তরায়। মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা। স্বামী-স্ত্রী এবং ছোট একটা বাচ্চা। বাচ্চাটাই প্রথম দেখল। সহজ গলায় মাকে বলল—মা এটা কী?

ফতের মামি তসলিমা খানম ফতেকে দেখেই রেগে উঠলেন। ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, চারটা মুরগি কিনতে এতক্ষণ লাগে? তুমি কি ডিমে তা দিয়ে মুরগি ফুটিয়ে এনেছ?

ফতে কিছু বলল না। বলার কিছু নেই। সে যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসত—তা হলেও তসলিমা খানম চেঁচামেচি করতেন। অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে চেঁচামেচি। তখন হয়তো বলতেন—বুড়া মোরগ কোত্থেকে এনেছ? এটা কি রোস্টের মুরগির সাইজ। রোস্টের মুরগির যে মিডিয়াম সাইজ হয় তুমি জান না। নাকি জীবনে কখনো রোস্ট খাও নি। তোমাকে কি রোস্ট কোনোদিন দেওয়া হয় না। আবার বেয়াদবের মতো চোখে চোখে তাকিয়ে আছ কেন?

মামির চেঁচামেচিকে ফতে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু ভাব করে যেন খুব গ্রাহ্য করছে। ভয়ে বুক কাঁপছে। এই অভিনয় সে ভালোই করে শুধু একটাই সমস্যা তাকে তাকিয়ে

থাকতে হয়। চোখের দিকে না তাকালে সে মাথার ভেতর ঢুকতে পারে না। সমস্যা হচ্ছে চোখের দিকে তাকালেই লোকজন মনে করে সে বেয়াদবি করছে।

তসলিমা খানমের মাথার ভেতর ঢোকা ফতের জন্যে খুব সহজ। হুট করে ঢুকে যাওয়া যায়। তবে খুব সাধারণ একটা মাথা। ঢুকে কোনো আনন্দ নেই। এই মহিলার সমস্ত চিন্তাভাবনা সংসার নিয়ে। আজ কী রান্না হবে। ঘর কোথায় নোংরা। ধোপাখানা থেকে কাপড় আনতে হবে। সবুজ রঙের বিছানার চাদরটা কি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেল। কাজের বুয়া চুরি করে নি তো। এই মহিলার চিন্তাভাবনার মধ্যে শুধু একটাই মজার ব্যাপার আছে—খায়রুল কবির নামের একজন আধবুড়ো মানুষ। এই আধবুড়ো লোকটাকে এই মহিলা ডাকেন—বড়দা। আধবুড়োটা তাকে ডাকে পুটুরানী। আধবুড়ো শয়তানটা বিয়ে করে নি। সে বাসাবোর একটা দোতলা বাড়িতে থাকে। ফতে কোনোদিন সে বাড়িতে যায় নি তবে বাড়িটা কোথায়, কেমন সব জানে। কোন ঘরে কী ফার্নিচার তাও সে বলতে পারবে। কারণ ঐ বাড়িটা তসলিমা খানমের মাথায় খুব পরিষ্কারভাবে আছে। তসলিমা খানম স্কুলে পড়ার সময় থেকে ঐ বাড়িতে যেতেন। বিয়ের পরেও যান। আধবুড়ো শয়তানটা তখন তাকে পুটুরানী, পুটুরানী করে খুবই নোংরাভাবে আদর করা শুরু করে। একসময় পুটুরানী বলে, বড়দা এ রকম করলে আমি কিন্তু আর আসব না। তুমি একা একা থাক বলে মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে আসি, তুমি এসব কী কর। বুড়োটা বলে—আচ্ছা যা আর আসতে হবে না। পুটুরানী তখন বলে, দরজাটা বন্ধ কর। দরজা তো খোলা। বুড়োটা বলে, তোর বন্ধ করতে ইচ্ছা হলে তুই কর। পুটুরানী বলে, " কে না কে দেখবে।" বুড়ো বলে, দেখুক যার ইচ্ছা।

ফতের মাঝে মাঝে ইচ্ছা করেছে বুড়োর কথা বলে হঠাৎ সে তার মামিকে চমকে দেয়। যেমন সে খুব সহজ গলায় বলল, মামি বুধবার যে আপনার বড়দার কাছে যাওয়ার কথা, আপনি যাবেন না?

এটা করা ঠিক হবে না। তখন তার আশ্রয় নষ্ট হয়ে যাবে। মামি তৎক্ষণাৎ তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। তবে এখন যদি সে চায় তা হলে এই কাজটা করতে পারে। এখন বাড়ি থেকে বের করে দিলেও তার থাকার জায়গা আছে। সাজঘরে বিছানা পেতে শুয়ে থাকবে। এখন 'পুটুরানীর' বিষয়টা নিয়ে মজা করা যায়। মজাটা এমনভাবে করা যেন কেউ ধরতে না পারে মজার পেছনে সে আছে।

ফতেকে আবার বাজারে যেতে হচ্ছে। গরম মশলা এনে বাসায় ঢোকা মাত্র মামি বললেন, টক দই আন নি কেন? তিনটা মাত্র জিনিস আনতে পাঠালাম এর মধ্যে একটা ভুলে গেলে। তখন ফতে যদি বলে, টক দইয়ের কথা আপনি বলেন নি তা হলে মামি খুবই রেগে যাবেন। আবার ফতে যদি নিজ থেকে টক দই নিয়ে আসে তা হলেও মামি রাগ করবেন। গলার রগ ফুলিয়ে বলবেন, আগবাড়িয়ে তোমাকে কে দই আনতে বলেছে ? সব সময় মাতব্বরি কর কেন? আলগা মাতব্বরি করবে না।

বাজারে যাবার সময় ফতে দেখল—সিঁড়ির গোড়ায় লুনা বসে আছে। একা একা খেলছে। হাতের আঙুল একবার খুলছে একবার বন্ধ করছে। এটা লুনার বিশেষ ধরনের খেলা এবং খুবই পছন্দের খেলাটা সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলতে পারে।

ফতে তার কাছে এগিয়ে বলল—পুটুরানী পুটুরানী।

লুনা চোখ তুলে তাকাল। মিষ্টি করে হাসল। ফতে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—পুটুরানী, পুটুরানী, পুটুরানী।

এইবার লুনা ফিসফিস করে বলল, পুটুরানী।

ফতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কাজ হয়েছে। এখন লুনা নিজের মনেই পুটুরানী পুটুরানী করতে থাকবে। ফতের মামি ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নিতে পারবেন না। লুনার কপালে আজ দুঃখ আছে। চড়থাপ্পড় অবশ্যই খাবে। ভাবতেই ফতের মজা লাগছে। লুনার চড়থাপ্পড়ের চেয়ে মজার দৃশ্য হবে পুটুরানী পুটুরানী শুনে তসলিমা খানম কী করেন সেটা। এই মজার দৃশ্য ফতে দেখতে পাবে না। কী আফসোস!

৫

'স্যার কেমন আছেন?'

প্রশ্নের জবাব দেবার আগে মিসির আলি দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন। সকাল ন'টা। দেয়ালঘড়িটা আধুনিক ইলেকট্রিক্যাল ঘড়ি না হয়ে পুরোনো দিনের পেন্ডুলাম ঘড়ি হলে ঢং ঢং করে ন'টা ঘণ্টা বাজাতে শুরু করত। মিসির আলি শুকনো গলায় বললেন, ভালো আছি। প্রতিমা তুমি কেমন আছ?

'যাক নাম তা হলে মনে আছে। আমি ভাবলাম আবার বোধহয় প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। আমার পরিচয় দিতে হবে। কেন আমার নাম প্রতিমা ব্যাখ্যা করতে হবে।'

মিসির আলি মনে মনে ভাবলেন—মেয়েটা আগে এত কথা বলত না। এখন বলছে কেন?

প্রতিমা বলল, স্যার এখন বলুন আমাকে দেখে কি রাগ লাগছে?

'না।'

'বিরক্তি লাগছে।'

'বুঝতে পারছি না।'

প্রতিমা বলল, আমাকে দেখে আসলে আপনি খুশি হয়েছেন। আপনি বুঝানোর চেষ্টা করছেন যে বিরক্ত হয়েছেন—আসলে তা-না। স্যার ঠিক বলেছি?

আনন্দে এবং উৎসাহে প্রতিমা ঝলমল করছে। আজ তাকে আরো সুন্দর লাগছে। মিসির আলি তাকিয়ে দেখলেন। বসার ঘরে দুটা বড় বড় সুটকেস। এই সুটকেস প্রতিমাই নিয়ে এসেছে। সুটকেস কেন এনেছে কে জানে। মিসির আলি বললেন, যেদিন আসার কথা ছিল সেদিন আস নি। আস নি কেন?

প্রতিমা বলল, আপনি বলুন কেন আসি নি। আপনি হচ্ছেন দ্য গ্রেট মিসির আলি। আমার দিকে তাকিয়েই আপনার বলে দেওয়া উচিত কেন আসি নি। বসার ঘরে দুটা সুটকেস কেন এনেছি বলুন তো? দেখব আপনি আগের মিসির আলি আছেন না বয়স হবার কারণে আপনার আগের ডিটেকটিভ ক্ষমতা কমে গেছে।

মিসির আলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি ছটফট করছ কেন? বস।

প্রতিমা বলল, আপনিইবা আমাকে দেখে এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আপনিও বসুন।

মিসির আলি বসলেন। প্রতিমা বলল—আমি বলেছিলাম ন'টার সময় আসব। আমি ঠিকই এসেছিলাম। ন'টা বাজার আগেই গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক ন'টার সময় ঢুকব এই হচ্ছে আমার প্ল্যান। ন'টা বাজতেই প্ল্যান বদলালাম। ঠিক করলাম—আপনার কাছে যাব না, যাতে সারা দিন আপনি মনে মনে অপেক্ষা করেন। তাই করেছিলেন না?

'হ্যাঁ।'

'তার পরদিন এলাম না। তার পরদিনও না। এটা করলাম—যাতে অপেক্ষা করতে করতে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বলুন আপনি ক্লান্ত হয়েছেন না?'

'খানিকটা হয়েছি।'

'এবং একসময় আপনার নিশ্চয়ই মনে হওয়া শুরু হয়েছে—আচ্ছা মেয়েটা আসছে না কেন—ওর কী হয়েছে। বলুন এ রকম হয়েছে না?

'হ্যাঁ হয়েছে।'

'আমি এই অবস্থাটা আপনার ভেতর তৈরি করার চেষ্টা করেছি। সত্যি করে বলুন, পেরেছি কি না।'

'হ্যাঁ পেরেছ।'

প্রতিমা হাসি হাসি মুখে বলল—ঐ দিন আমার ওপর আপনি খুবই বিরক্ত হচ্ছিলেন। আমি আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব এটা ভেবে আপনি আতঙ্কে অস্থির হয়েছিলেন। আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। তখনই ঠিক করেছিলাম আমি এমন অবস্থা তৈরি করব যাতে আপনি খুব আগ্রহ নিয়েই আমার সঙ্গে থাকতে আসেন।

'তোমার কি ধারণা সে রকম অবস্থা তৈরি করতে পেরেছ?'

'না এখনো পারি নি। তবে এখন আর আপনি আমাকে আগের মতো অপছন্দ করছেন না।'

'সুটকেসে কী?'

সুটকেসে কিছু না। খালি সুটকেস। আপনার বইগুলি আজ আমি সুটকেসে ভরে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। প্রথম দিন বই, তারপর জামাকাপড়, তারপর বাসনকোসন এইভাবে ঘর খালি করব। সব শেষের দিন আপনি যাবেন। আমি আপনাকে নিয়ে যাব না, আপনি নিজ থেকে যাবেন।

'বল কী?'

প্রতিমা খিলখিল করে হাসছে। মনে হচ্ছে সে খুবই মজা পাচ্ছে। মেয়েটার হাসি শুনে মিসির আলির বুক ধড়ফড় করতে লাগল। এই মেয়ে হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে সে যা করবে বলছে তা সে করবে।

প্রতিমা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, স্যার শুনুন—আপনার শোবার ঘরে যেখানে আপনার বিছানা করেছি সেখানে বিশাল একটা জানালা আছে। আপনি সারাক্ষণ আকাশ দেখতে পারবেন।

'আমি সারাক্ষণ আকাশ দেখতে চাই এটা তোমাকে কে বলল?'

'কেউ বলে নি। আমি জানি। আপনার একটা ইচ্ছা হল—মৃত্যুর সময় আপনি আকাশ দেখতে দেখতে মারা যাবেন।'

'আমি আকাশ দেখে মরতে চাই তোমাকে কে বলল?'

'কেউ বলে নি। আমি বুঝতে পেরেছি।'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, কীভাবে বুঝতে পেরেছ?

প্রতিমা হতাশ গলায় বলল, স্যার আপনার হয়েছে কী? আমি যে মনের কথা বুঝতে পারি আপনি তো সেটা জানেন। খুব ভালো করে জানেন। এই নিয়ে আপনি অনেক পরীক্ষাটরীক্ষাও করেছেন—এখন মনে করতে পারছেন না কেন?

'বুঝতে পারছি না, কেন মনে করতে পারছি না।'

'আপনার কি আলজেমিয়ারস ডিজিজ হয়েছে? আমার ধারণা তাই হয়েছে। নেপাল থেকে আমি আপনাকে পশমি চাদর এনে দিলাম। আপনাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলাম—সব সময় এই চাদর ব্যবহার করবেন। আপনি ঠিকই এই চাদর ব্যবহার করছেন। কিন্তু আমি যে চাদরটা দিয়েছি এটা ভুল মেরে বসে আছেন। কেন স্যার?'

মিসির আলি জবাব দিলেন না। মেয়েটা সত্যি কথাই বলছে—এর বিষয়ে তাঁর কিছুই মনে নেই। মেয়েটি সম্পর্কে যাবতীয় স্মৃতি মস্তিষ্ক মুছে ফেলেছে। ব্যাপারটা রহস্যময়। প্রতিমা সম্পর্কে জানার জন্যে তিনি তাঁর পুরোনো ফাইল ঘেঁটেছেন। প্রতিটি কেইস হিস্ট্রির ফাইল তাঁর আলাদা করা। সেখানে প্রতিমার কেইস হিস্ট্রি থাকার কথা—অথচ নেই। পাঁচটি পাতা ফাইল থেকে ছেঁড়া হয়েছে। যে ছিঁড়েছে সে যে খুব সাবধানে গুছিয়ে ছিঁড়েছে তাও না—টেনে ছিঁড়েছে।

প্রতিমা বলল, স্যার এই মুহূর্তে আপনি কী ভাবছেন বলি?

'বল।'

'এই মুহূর্তে আপনি ভাবছেন—পাতাগুলি কে ছিঁড়ল?'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। প্রতিমা হাসতে হাসতে বলল, আপনি এত চমকে গেলেন কেন? আমি যে মনের কথা ধরতে পারি তার প্রমাণ অনেকবার আপনাকে দিয়েছি। অথচ আপনি এমনভাবে চমকেছেন যেন প্রথমবার দেখলেন।

ইয়াসিন দু কাপ চা নিয়ে ঢুকেছে। প্রতিমা তার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, তুমি চা বানিয়ে নিয়ে এসেছ কেন? আমি না তোমাকে বললাম তুমি পানি গরম করে আমাকে খবর দেবে আমি চা বানিয়ে দেব। কি বলি নি?

'বলছেন।'

'আর কখনো এই ভুল করবে না।'

ইয়াসিন মুখ ভোঁতা করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিমা কড়া গলায় বলল, যা হাঁদারামের মতো দাঁড়িয়ে থাকবি না।

ইয়াসিন চলে গেল। প্রতিমা এমনভাবে কথা বলছে যেন সে এ বাড়ির কর্ত্রী। বাড়ির দেখাশোনা, সংসার চালানোর সব দায়িত্ব তার একার। মিসির আলি চায়ে চুমুক দিলেন। প্রতিমা বলল, স্যার আপনি কি নিজের হাতের লেখা চিনতে পারবেন? নাকি নিজের হাতের লেখাও ভুলে গেছেন।

মিসির আলি বললেন, হাতের লেখা চিনব।

পঞ্চাশ টাকার স্ট্যাম্পে আপনাকে দিয়ে কিছু কথা লিখিয়ে নিয়েছিলাম। মনে আছে?

না।

দলিল সঙ্গে নিয়ে এসেছি। চা শেষ করে দলিলটা দেখুন। চা খেতে খেতে দলিল দেখলে সমস্যা আছে।

'কী সমস্যা?'

'আপনি বিষম খাবেন। চা শ্বাসনালি দিয়ে ঢুকে সমস্যা তৈরি করবে।'

'ভয়ঙ্কর কিছু কি লিখেছি?'

'আপনার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হতে পারে। নিন দেখুন। শুধু পড়ার সময় চায়ে চুমুক দেবেন না।'

মিসির আলি দলিল পড়ছেন। হাতের লেখা তার। কালির কলমে লেখা। লেখা দেখে কোন কলমটা ব্যবহার করেছেন সেটাও মনে পড়েছে। ওয়াটারম্যান কলম। ইয়াসিনের আগে যে ছেলেটা কাজ করত সে অনেক জিনিসপত্রের সঙ্গে তার এই শখের কলমটাও চুরি করে নিয়ে যায়। দলিলে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—

আমি মিসির আলি

সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে নিম্নলিখিত অঙ্গীকার করছি।

ক. আমার চিকিৎসাধীন রোগী প্রতিমার (ভালো নাম আফরোজা বানু) সঙ্গে জীবনের একটি অংশ কাটবে। সে যখন আমাকে তার সঙ্গে থাকতে ডাকবে তখনই আমি তাতে রাজি হব।

খ. প্রতিমার (আফরোজা বানু) সঙ্গে বিবাহ্ নামক সামাজিক প্রথার ভেতর দিয়ে যেতেও আমার কোনো আপত্তি নেই।

অঙ্গীকারনামার শেষে ইংরেজি ও বাংলায় মিসির আলির দস্তখত। তারিখ দেওয়া আছে। ছ'বছর আগের একটা তারিখ।

প্রতিমা দলিলটা মিসির আলির হাত থেকে নিয়ে তার হ্যান্ডব্যাগে রাখতে রাখতে বলল—দলিল পড়ে আপনি কি চমকেছেন?

মিসির আলি জবাব দিলেন না।

প্রতিমা বলল, দলিলটা যে আপনার হাতেই লেখা, এ বিষয়ে কি আপনার কোনো সন্দেহ আছে?

মিসির আলি বললেন, সন্দেহ নেই।

প্রতিমা মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল, তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে—আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন? এই মুহূর্তে আমি আপনাকে বিয়ের জন্যে চাপ দেব না। একসঙ্গে এতটা টেনশন আপনার সহ্য হবে না। আপাতত আমার সঙ্গে থাকলেই হবে।

মিসির আলি চুপ করে রইলেন।

প্রতিমা বলল—কথা বলুন। মুখ পুরোপুরি সিল করে রাখলে হবে কীভাবে? বইগুলি বের করে দিন, আমি ব্যাগে গুছাতে থাকি।

মিসির আলি বললেন, আমাকে কিছু দিন সময় দাও।

প্রতিমা শান্ত গলায় বলল, কতদিন সময় চান?

‘সাত দিন।’

‘সাত দিন সময় চাচ্ছেন কী জন্যে?’

‘চিন্তা করার জন্যে।’

‘কী চিন্তা করবেন?’

‘আমি আমার মতো করে চিন্তা করব।’

‘ঠিক আছে সাত দিন চিন্তা করুন। সাত দিন পর আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।’

‘তোমাকে নিয়ে যেতে হবে না। তুমি তোমার ঠিকানা রেখে যাও। সাত দিন পর আমি নিজেই উপস্থিত হব।’

প্রতিমা শান্ত গলায় বলল, ‘না আমি আপনাকে নিয়ে যাব। ব্যাগ থাকল, আমি উঠলাম। ভুলে যাবেন না, আগামী সোমবার।’

ইয়াসিন দরজা ধরে চোখ গোল করে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি মিসির আলির দিকে। মানুষটা ছটফট করছে। কেন ছটফট করছে সে বুঝতে পারছে না, তবে তার ধারণা একটু আগে যে মেয়েটা এসেছিল তার সঙ্গে এর কোনো যোগ আছে। ব্যাপারটা ইয়াসিনের ভালো লাগছে না। সে তার ছোট জীবনে লক্ষ করেছে নিরিবিলি সংসারে কোনো একটা মেয়ে উপস্থিত হলেই সব লণ্ডভণ্ড হতে শুরু করে। তার নিজের বাবার সংসারেও একই ঘটনা ঘটেছে। সে এবং তার বাবা সুখেই ছিল। একসঙ্গে ভিক্ষা করত। রাতে ঘুমানোর জন্যে সুন্দর একটা জায়গাও তাদের ছিল। বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে ঘুমাত। বাবা গুটুর গুটুর করে কত মজার গল্প করত। তার বাবার ভিক্ষুক জীবন বড়ই রোমাঞ্চকর। হঠাৎ তাদের সংসারে এক কমবয়সী ভিখারিনি উপস্থিত হল। সেও তাদের সঙ্গে ভিক্ষা করা শুরু করল। এরপর থেকে বাবা আর তার ছেলেকে দেখতে পারে না। কারণে–অকারণে ধমক। একদিন তাকে এমন এক ধাক্কা দিল যে সে একটু হলেই ট্রাকের নিচে পড়ত।

এই সংসারেও একই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। মেয়েটা ঢুকে পড়েছে। এখনই কেমন মাতবরি শুরু করেছে—“পানি গরম করে আমাকে ডাকবি। চা বানাবি না। চা আমি এসে বানাব।” শখ কত। তুমি চা বানাবে কেন? আমি কি বানাতে পারি না? এই মেয়েকে শিক্ষা দেবার ক্ষমতা ইয়াসিনের আছে। মেয়েকে শিক্ষা দেবার জিনিস তার ব্যাগেই আছে। শিক্ষা দেবার ভয়ঙ্কর জিনিসটা সে আসলে যোগাড় করেছিল তার বাবার সঙ্গে যে মেয়েটা ঘোরে তাকে শিক্ষা দেবার জন্যে। সেই সুযোগ তার খুব ভালোই আছে। বাবা মনে কষ্ট পাবে এমন কাজ ইয়াসিন কোনোদিন করবে না। আসমান থেকে ফেরেশতা নেমেও যদি বলে—“ইয়াসিনরে কাজটা কর। তোর আখেরে মঙ্গল হবে।” তবু সে কাজটা করবে না। তার বাবার মনে কষ্ট হয় এমন কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব না।

মিসির আলি নামের মানুষটার মনে কষ্ট হয় এমন কিছুও সে করতে পারবে না। এই মানুষটাও পেয়ারা মানুষ। তবে প্রতিমা নামের মেয়েটার কিছু হলে মিসির আলির যাবে আসবে না। কারণ উনি মেয়েটাকে পছন্দ করেন না। উনি যে ছটফট করছেন—

মেয়েটার কারণেই ছটফট করছেন। মেয়েটা উনাকে নিয়ে চলে যেতে চাচ্ছে। উনি যেতে চাচ্ছেন না। মেয়েটার ক্ষতি হলে উনি খুশিই হবেন।

ইয়াসিনের ট্রাংকে একটা বোতল আছে। বোতলে ভয়ঙ্কর জিনিস আছে। ভয়ঙ্কর জিনিসটা দেখতে পানির মতো। গ্লাসে ঢাললে মনে হবে পানি ঢালা হয়েছে। সেই পানি মুখে দিলে জ্বলেপুড়ে সব ছারখার হয়ে যাবে। জিনিসটার নাম এসিড। এর আরেকটা নাম আছে—ভোম্বল। ভোম্বল নামটা ফিসফিস করে বললেই—যার বোঝার সে বুঝে নেবে।

ইয়াসিন বলল, স্যার চা খাইবেন?

মিসির আলি কিছু বললেন না। ইয়াসিন আবার বলল, স্যার চা খাইবেন?

মিসির আলি সেই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। ইয়াসিনের মনটা খারাপ হয়ে গেল—আহারে লোকটা কী কষ্টে পড়েছে! দুনিয়াদারিই তার মাথায় নাই। লোকটার মাথায় মেয়েটা ঘুরছে। লোকটাকে মেয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। বাঁচানোর সরঞ্জাম তার হাতেই আছে—এক নম্বুরি ভোম্বল। এই ভোম্বল লোহা হজম করে ফেলে। এই ভোম্বল সহজ ভোম্বল না।

ইয়াসিন চা বানাতে গেল। মিসির আলি না চাইলেও সে সুন্দর করে চা বানিয়ে সামনে রাখবে। মনে মনে বলবে—"এত চিন্তার কিছু নাই। আমি আছি না। আমি একবার যারে ভালো পাই তারে জন্মের মতো ভালো পাই।"

মিসির আলি বেতের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর হাতে সিগারেট। সামনে চায়ের কাপ। চায়ের কাপের চা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে—তিনি খালি কাপেই চুমুক দিচ্ছেন। হাতের সিগারেটের ছাইও সেইখানেই ফেলছেন। তাঁর মুখের কাঠিন্য কমে আসছে। দলিলের রহস্য পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। তিনি এগুচ্ছেন সহজ লজিক দিয়ে। সহজ লজিক তাঁকে যেখানে পৌঁছে দিচ্ছে সেই জায়গাটা তাঁর পছন্দ না। তিনি এই জায়গাটায় পৌঁছতে চাচ্ছেন না।

মিসির আলি লজিকের সিঁড়িগুলি এইভাবে দাঁড়া করিয়েছেন—

১. দলিলের লেখাগুলি তার হাতের। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১. কোনো নেশার বস্তু খাইয়ে ঘোরের মধ্যে এই লেখা আদায় করা হয় নি। কারণ লেখা স্পষ্ট, পরিষ্কার।

৩. মানুষকে হিপনোটাইজ করে কিছু লেখা লেখানো যায়—সেই লেখাও হবে নেশাগ্রস্ত মানুষের হাতের লেখার মতো। ছোট কোনো বাক্যও সম্পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব। নেশাগ্রস্ত এবং হিপনোটিক ইনফ্লুয়েন্সের লেখা হবে কাঁপা কাঁপা। এই সময় ভিশন ডিসর্টটেড হয় বলে কেউ সরলরেখা টানতে পারে না, এবং সরলরেখায় লিখতেও পারে না।

কাজেই তিনি দলিলের লেখাগুলি ঠাণ্ডা মাথায় এবং অবশ্যই সূক্ষ্ম মস্তিষ্কে লিখেছেন।

৪. প্রতিমা তাকে দলিল দেখাবার সময় খুব মজা পাচ্ছিল এবং হাসাহাসি করছিল। কাজেই দলিলের ব্যাপারটা মেয়েটার কাছে সিরিয়াস কোনো ব্যাপার না—মজার কোনো খেলা। এই খেলা সে প্রথম খেলছে না। আগেও খেলেছে।

তা হলে ব্যাপার এই দাঁড়াচ্ছে যে মেয়েটি মজা করার জন্যে মিসির আলিকে দিয়ে লেখাগুলি লিখিয়ে নিয়েছে। এবং মেয়েটি জানে এই লেখার বিষয় মিসির আলির মনে নেই। মনে থাকলে তো খেলাটার মজা থাকত না।

তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে মেয়েটা মিসির আলিকে দিয়ে কাগজে লেখার মতো জটিল কাজটি করিয়ে নিয়েছে এমনভাবে যে মিসির আলি কিছু বুঝতেই পারেন নি। যার স্মৃতি পর্যন্ত মস্তিষ্কে নেই। অর্থাৎ মিসির আলির মস্তিষ্কের পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল মেয়েটির কাছে। মেয়েটি কোনো এক অস্বাভাবিক ক্ষমতায় মানুষের মাথার ভেতর সরাসরি ঢুকে যেতে পারছে। এই ক্ষমতা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। তবে এ ধরনের ক্ষমতার উল্লেখ বারবারই প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায়। আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটি এই বিষয়ের ওপর দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করেছে যে, এই ক্ষমতার কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি শুধুমাত্রই লোকজ বিশ্বাস।

মিসির আলি আরেকটা সিগারেট ধরালেন। বুক শেলফ থেকে সাইকোপ্যাথিক মাইন্ড বইটি হাতে নিলেন—কিন্তু পাতা উল্টালেন না। তাঁর স্মৃতিশক্তি আগের মতো নেই—তার পরেও এই বইটির প্রতিটি পাতা তার প্রায় মুখস্থ।

পৃথিবীর ভয়ঙ্কর সব খুনিদের মানসিক ছবি বা সাইকোলজিক্যাল প্রফাইল এই বইটিতে দেওয়া আছে। প্রতিটি ভয়ঙ্কর অপরাধীর ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে—অপরাধীর একটি অস্বাভাবিক ক্ষমতার কথা—অন্যকে বশীভূত করার ক্ষমতা।

এই ক্ষমতার উৎস কী? অপরাধী কি অন্যের মাথার ভেতর ঢুকে পড়ছে? তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে?

এই ক্ষমতা শুধু যে ভয়ঙ্কর অপরাধীদের আছে তা না—মহান সাধুসন্তদেরও আছে বলে বলা হয়ে থাকে। তারাও মানুষের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারতেন। একজনের নিয়ন্ত্রণ আলোর দিকে—অন্যজনের নিয়ন্ত্রণ অন্ধকারের দিকে।

'স্যার চা খাইবেন?'

মিসির আলি চমকে তাকালেন। ইয়াসিন তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টিটা যেন কেমন। যেন অশুভ কিছু সেখানে আছে।

মিসির আলি বললেন, না চা খাব না। আমি রাস্তায় কিছুক্ষণ হাঁটব।

'স্যার আপনের শইল কি খারাপ?'

'না আমার শরীর ভালো।'

ফজলু খুব লজ্জিত বোধ করছে। ফতে নামের এমন একজন ভালো মানুষের ব্যাপারে সে এত খারাপ ধারণা করেছিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। প্রথম থেকেই তার মনে হয়েছিল—লোকটা খারাপ। লোকটার ভেতর মতলব আছে। লোকটার নজর দিলজানের দিকে। লোকটা যখন তাকে সিগারেট দিত—তার কাছে মনে হত সে কোনো মতলবে সিগারেটটা দিচ্ছে। তার নিতে ইচ্ছা করত না, লোভে পড়ে নিত। লোভ খুব খারাপ জিনিস।

ফজলু দিলজানকে বলে দিয়েছে যেন কখনো ফতের কাছে না যায়। ফতে যদি তাকে ডাকে সে যেন ঘরে ঢুকে পড়ে। ফজলু নিশ্চিত ছিল—ফতে দিলজানকে ডাকবে। ফতে ডাকে নি। কোনোদিনও ডাকে নি। তার পরেও ফজলুর সন্দেহ দূর হয় নি। আজ

সন্দেহ পুরোপুরি দূর হয়েছে। ফতে তাকে নার্সারিতে কাজ যোগাড় করে দিয়েছে। প্রতিদিন তিন ঘণ্টা কাজ করবে। গাছে পানি দেবে—গোবর আর মাটি মিশিয়ে মশলা তৈরি করবে। বিনিময়ে পঞ্চাশ টাকা পাবে।

কাজটা শেখা হয়ে গেলে সে নিজেই একটা নার্সারি দিবে। কোনো একটা রাস্তার ফুটপাত দখল করে বসে পড়বে। সে টাকা জমাতে শুরু করেছে। বন্ধকি বসতবাড়ি ছাড়িয়ে এনে স্ত্রী–কন্যাকে গ্রামে পাঠিয়ে দেবে। মেয়ের বিয়ে দেবে।

ফজলু গাঢ় স্বরে বলল, আপনি আমার বড় একটা উপকার করলেন।

ফতে বলল, এটা কোনো উপকার হল নাকি। এটা কোনো উপকারই না। নাও একটা সিগারেট নাও।

ফজলু আনন্দে অভিভূত হয়ে সিগারেট নিল। এমন একটা ভালোমানুষের বিষয়ে সে কী খারাপ ধারণাই না করেছিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

ফতে বলল, চা খাবে নাকি? চল এক কাপ চা খাই।

ফজলু বলল, চলেন। চায়ের দাম কিন্তু আমি দিমু। এইটা আমার একটা আবদার।

ফতে চা খাচ্ছে। রাস্তার পাশের দোকানের টুলের উপর সে একা বসে আছে। ফতের এটা দ্বিতীয় কাপ। প্রথম কাপের দাম ফজলু দিয়ে চলে গেছে। দ্বিতীয় কাপে সে একা বসে চুমুক দিচ্ছে।

তার হাতে সময় বেশি নেই। বড় ঘটনা আজ রাতেই ঘটবে। এই ভেবে তার মনে আলাদা কোনো উত্তেজনা নেই বরং শান্তি শান্তি লাগছে। ঘটনাগুলি সে সাজিয়ে রেখেছে। সাজানোর কোনো ভুল নেই। তার পরেও প্রতিটি ঘটনায় একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করা।

ফতের মাথা ঠাণ্ডাই আছে। যে কোনো বড় ঘটনা ঘটাবার আগে তার মাথা ঠাণ্ডা থাকে। বড় ঘটনা এর আগে সে চারবার ঘটিয়েছে—তিনবার গ্রামে, একবার শহরে। কোনোবারই তার মাথা এলোমেলো ছিল না। চারটা বড় ঘটনার বিষয়ে কেউই কিছু জানে না। এবারো কেউ কিছু জানবে না। এবারেরটা আরো বেশি গোছানো।

আজ বুধবার তার মামি গিয়েছেন তার আদরের বুড়ো ভাইয়ার কাছে। সেই ভাইয়া মনের সুখে পুটুরানী পুটুরানী করে আদর করছে। আদরটাদর খেয়ে মামি বাসায় ফিরবে। তার আগেই বাড়ির গেটের কাছে ফতে বসে থাকবে লুনাকে নিয়ে। লুনা তার মাকে দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে বলবে—পুটুরানী পুটুরানী। এটা লুনা বলবে কারণ ফতে তাকে শিখিয়ে দেবে। এই ঘটনার ফলাফল কী হবে ফতে জানে না। হয়তো মা মেয়েকে চড়থাপ্পড় দেবে। কিংবা হাত ধরে মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাবে। যাই করুক না কেন ফতের কিছু যায় আসে না। সে জানে মামি তাকে অকারণে কিছুক্ষণ ধমকাধমকি করবে। তারপর পাঠাবে কোনো একটা কিছু দোকান থেকে কিনে আনতে। কাপড় ধোয়ার সাবান, সয়াবিন তেল, কিংবা কাঁচা মরিচ বা ধনেপাতা।

ফতে গায়ে চাদর জড়িয়ে বাজার আনতে যাবে। চাদরের নিচে গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে থাকবে লুনা। গেট দিয়ে যখন ফতে বের হবে তখন কেউ বুঝতেও পারবে না, ফতের চাদরের নিচে কী আছে।

ফতে কিছুক্ষণের জন্যে লুনাকে রাখবে ফজলুর কাছে। লুনা খুব স্বাভাবিকভাবেই থাকবে—হইচই করবে না, কান্নাকাটি করবে না। নিজের মনে মুঠি বন্ধ করা এবং মুঠি খোলার খেলা খেলতে থাকবে। লুনাকে রেখে ফতে অতিদ্রুত বাজার শেষ করে বাড়ি ফিরবে। তখন ফতের মামি আতঙ্কিত গলায় ফতেকে জিজ্ঞেস করবেন—লুনা কোথায়। ওকে পাচ্ছি না। ফতে বলবে, আপনার সঙ্গেই তো ছিল। মামি তখন কাঁদো কাঁদো গলায় বলবেন, দেখছি নাতো। ফতে তৎক্ষণাৎ লুনার খোঁজে রাস্তায় বের হবে। চলে যাবে ফজলুর কাছে। সেখান থেকে লুনাকে নিয়ে যাবে বুড়িগঙ্গায়। যে নৌকাটা সে থাকার জন্যে ভাড়া করেছে সেই নৌকায়। আসল ঘটনা নৌকায় ঘটানো হবে।

তারপর সে আবার বাড়ি ফিরে আসবে। ততক্ষণে পুলিশ চলে এসেছে। বাড়িতে কান্নাকাটি হচ্ছে। ফতে আবারো লুনার খোঁজে বের হবে। এবার বের হবে বেবিট্যাক্সি নিয়ে। তার চাদরের নিচে বড় কালো পলিথিনের ব্যাগে সযত্নে রাখা মাথাটা বের করে সে যাত্রীদের সিটের এক কোনায় রেখে দেবে। আসল খেলা শুরু হবে তখন।

লুনা মেয়েটাকে নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। এই মেয়েটা বড় হয়ে বাবা-মার জন্যে যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নিয়ে আসবে না। সব যন্ত্রণার সমাধান। এক অর্থে ফতে তার মামা-মামির উপকারই করছে।

পুরো ব্যাপারটা ভাবতে ফতের খুব মজা লাগছে। হাসি চাপতে পারছে না। চায়ের দোকানি অবাক হয়ে বলল, ভাইজান একলা একলা হাসেন ক্যান?

ফতে হাসি না থামিয়েই বলল, আমার মাথা খারাপ এই জন্যে একা একা হাসি। দেখি আরেক কাপ চা দেন। চিনি বেশি করে দেবেন। সব পাগল চিনি বেশি খায়।

ফতে শরীর দুলিয়ে শব্দ করে হাসবে। তার কাছে মনে হচ্ছে কালো পলিথিনের ব্যাগে মোড়া জিনিসটা একবার এই দোকানদারকে দেখিয়ে দিলে হয়। এই সব চায়ের দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। রাত একটা দেড়টার দিকে দোকান খোলা থাকার কথা। বেবিট্যাক্সি দোকানের সামনে রেখে সে চা খেতে আসতে পারে। তখন দোকানিকে বলতে পারে—ভাইসাব আমার বেবিট্যাক্সির সিটে একটা জিনিস আছে। দেখলে মজা পাবেন। দেখে আসেন।

৬

বদরুল সাহেবের বাড়ির সামনে জটলা। হইচই হচ্ছে। বদরুল সাহেবের স্ত্রীর তীক্ষ্ণ গলা শোনা যাচ্ছে। মিসির আলি ইয়াসিনকে বললেন, কী হয়েছে রে?

ইয়াসিন বলল, জানি না। মনে হয় চোর ধরছে।

সন্ধ্যার দিকে ঐ বাড়িতে রোজই হইচই হয়। এতে গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। কিন্তু মহিলার তীক্ষ্ণ গলার স্বর কানে লাগছে।

মিসির আলি ইয়াসিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার জন্যে মাথা ধরার ট্যাবলেট নিয়ে এস। খুব মাথা ধরেছে।

ইয়াসিন বলল, মাথা বানায়া দেই।

মিসির আলি বললেন, মাথা বানাতে হবে না। মাথা বানানোই আছে। তুমি মাথা ধরার ট্যাবলেট কিনে এনে খুব কড়া করে এক কাপ চা বানিয়ে দাও।

ইয়াসিন চলে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফতে ঘরে ঢুকল। মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার আপনার ঘরে কি লুনা লুকিয়ে আছে?

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, নাতো।

ফতে বলল, মেয়েটারে পাওয়া যাচ্ছে না। চুপিচুপি এসে খাটের নিচে হয়তো লুকিয়ে আছে। স্যার একটু খুঁজে দেখি?

হ্যাঁ দেখ।

ফতে সবগুলি ঘর খুঁজল। বাথরুমে উঁকি দিল। খাটের নিচে দেখল। ফতের সঙ্গে সঙ্গে মিসির আলিও খুঁজলেন।

ফতে বলল, নাহ্ এদিকে আসে নাই।

মিসির আলি বললেন, ফতে তোমাকে একটা কথা বলি শোন। তুমি মেয়েটাকে খুঁজতে এসেছ—খাটের নিচে উঁকি দিয়েছ—কিন্তু তুমি কিন্তু মেয়েটাকে খুঁজছিলে না।

ফতে শান্ত গলায় বলল, স্যার এটা কেন বললেন?

মিসির আলি বললেন, আমার খাটের নিচে দুটা বইভর্তি ট্রাংক আছে। সত্যি সত্যি মেয়েটাকে খুঁজলে তুমি অবশ্যই ট্রাংকের ওপাশে কী আছে দেখার চেষ্টা করতে। তা ছাড়া তুমি বাথরুমে উঁকি দিয়েছ? বাথরুমের ভেতরটাও তুমি দেখ নি। বাথরুমের দরজা খুলে তুমি তাকিয়ে ছিলে আমার দিকে।

ফতে বলল, স্যার আপনি ঠিক ধরেছেন। আমি আসলে খুঁজি নাই। কারণ আমি জানি লুনা এই দিকে আসে নাই। সে নিজে নিজে কোনোদিকে যায় না। তার মা'র মনের শান্তির জন্যে আমি এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করতেছি। ছাদে গিয়েছি দুইবার। ছাদের পানির টাংকির মুখ খুলে ভিতরে দেখেছি।

মিসির আলি বললেন, ফতে তুমি একটু বস তো। এই চেয়ারটায় বস।

ফতে বসল।

মিসির আলি বললেন, বাচ্চা একটা মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ের মা কান্নাকাটি করছে—আমি কিন্তু তোমার ভেতর কোনো উত্তেজনা লক্ষ করছি না। তোমাকে খুবই স্বাভাবিক লাগছে।

ফতে বলল, সব মানুষ তো একরকম না স্যার। আমি যেরকম, আপনি সেরকম না। কিছু কিছু মানুষ উত্তেজিত হলেও বাইরে থেকে বোঝা যায় না। স্যার কী করে বুঝলেন যে আমি খুব স্বাভাবিক আছি? আমার কপাল ঘামে নাই, আমার কথাবার্তা জড়ায়ে যায় নাই এই জন্যে।

'না, তা না। তুমি খুব স্বাভাবিক আছ এটা বুঝেছি সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপার থেকে। তুমি লেফট হ্যান্ডার। বাঁহাতি মানুষ। বাঁহাতি মানুষ উত্তেজিত অবস্থায় ডান হাত ব্যবহার করতে শুরু করে। তুমি তা করছ না। তুমি বাঁ হাতই ব্যবহার করছ। অথচ তোমাদের বাড়িতে আজ ভয়ঙ্কের ঘটনা ঘটেছে।

ফতে মনে মনে বলল, শাবাশ বেটা। তুই মানুষের মাথার ভিতর ঢুকতে পারিস না।

তার পরেও তুই অনেক কিছু বুঝতে পারিস। তোর সাথে পাল্লা দিতে পারলে খারাপ হয় না। আমি তোকে চিনে ফেলেছি, তুই কিন্তু এখনো আমাকে চিনস নাই।

মিসির আলি বললেন, ফতে শোন তুমি এতই স্বাভাবিক আছ যে আমার সন্দেহ হচ্ছে মেয়েটা কোথায় আছে তুমি জান। এবং আমার ধারণা মেয়েটাকে তুমিই সরিয়েছ।

ফতে আবারো মনে মনে বলল, শাব্বাশ। শাব্বাশ। আয় দুইজনে একটা খেলা খেলি। বাঘবন্দি খেলা। তুই একটা চাল দিবি। আমিও একটা চাল দিব।

মিসির আলি বললেন, ফতে কিছু একটা বল। চুপ করে আছ কেন? মেয়েটাকে তুমি সরাও নি?

ফতে বলল, গেটে দারোয়ান আছে। লুনাকে নিয়ে গেট থেকে বের হলে দারোয়ান দেখত না?

মিসির আলি বললেন, তোমার গায়ে ভারী চাদর। এই চাদর দিয়ে ঢেকে মেয়েটাকে সরিয়ে নিলে কারোর সন্দেহ করার কিছু নেই। চাদরের নিচ থেকে মেয়েটাও কোনো শব্দ করবে না। কারণ সে তোমাকে খুব পছন্দ করে। তাকে চাদরের নিচে ঢুকিয়ে তুমি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছ এই দৃশ্য আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি।

ফতে মনে মনে বলল, তুই বাঘবন্দি খেলা খেলতে চাস, আয় খেলি। তুই তিন–চারটা ভালো চাল দিয়ে ফেলেছিস। আমি কোনো চাল দেই নাই। এখন দেব।

মিসির আলি বললেন, ফতে কথা বল। চুপ করে থেক না। বাচ্চা মেয়েটাকে তুমি সরিয়েছ?

'জি।'

'মেয়েটা কোথায় আছে?'

'খুব ভালো জায়গায় আছে, স্যার কোনো সমস্যা নেই। আপনি এত দুশ্চিন্তা কইরেন না স্যার। নেন একটা সিগারেট খান।'

'তুমি এই কাজটা কেন করলে?'

ফতে হেসে ফেলে বলল, মামা করতে বলেছে। এই জন্যে করেছি।

'বদরুল সাহেব বলেছেন?'

'জি। মামার হুকুমে লুনাকে এক বাসায় রেখে এসে এমন ভাব করতেছি যেন আমি খুব পেরেশান হয়ে খুঁজতেছি।'

মিসির আলি বললেন, তোমার মামা এই কাজটা কেন করছেন?

ফতে হাই তুলতে তুলতে বলল, মামিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে কাজটা করেছেন। মামি এই বাচ্চাটাকে মাঝে মাঝে মারে। এটা মামার ভালো লাগে না। অসুস্থ একটা বাচ্চা। একে তার মা মারবে কেন? এই জন্যে মামা ঠিক করেছে লুনাকে তিন–চার ঘণ্টা লুকিয়ে রাখবে—যাতে মামি বুঝতে পারে সন্তান কী জিনিস। ঘটনাটা কি এখন বুঝেছেন স্যার?

'হ্যাঁ বুঝেছি। বাচ্চাটা আছে কোথায়?'

'বুড়িগঙ্গা নদীতে—নৌকার ভিতরে। সে খুব মজায় আছে। স্যার একটা কাজ করবেন?'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, বল কী কাজ?

ফতে বলল, আপনি আমার সঙ্গে চলেন। নৌকা থেকে দুজনে মেয়েটাকে নিয়ে আসি।

মিসির আলি বললেন, চল যাই।

ফতে বলল, দুজন একসঙ্গে বের হলে মামি সন্দেহ করবে। স্যার আপনি আগে চলে যান। সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের সামনে চায়ের দোকান আছে। ঐখানে বসে চা খান— আমি মামিকে বলি লুনাকে খোঁজার জন্যে বের হচ্ছি। এই বলে চলে আসব। আমার পৌঁছতে দশ মিনিটের বেশি দেরি হবে না। স্যার যাবেন?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ।

এক ঘণ্টার বেশি হয়েছে মিসির আলি অপেক্ষা করছেন। ফতের কোনো দেখা নেই। তিনি দুশ্চিন্তা করা শুরু করেছেন। ফতে লুনা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে মিসির আলির কাছে মনে হয়েছে এই ব্যাখ্যা ঠিক না। ফতে তাৎক্ষণিকভাবে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। মানসিকভাবে অসুস্থ একটা মেয়েকে রাতের বেলা বুড়িগঙ্গায় নৌকার উপর রাখার কোনো যুক্তি নেই। মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখলে তার বাবা তাকে খুব কাছাকাছি কোথাও রাখবে। বুড়িগঙ্গায় নৌকার উপর পাঠাবে না। মিসির আলির মনে হল লুনা মেয়েটি বিপদে আছে। সহজ কোনো বিপদ না। জটিল ধরনের বিপদ। বিপদ ঘটতে খুব দেরিও নেই। মিসির আলি ইয়াসিনের দিকে তাকালেন। ইয়াসিন কী মনে করে যেন তাঁর সঙ্গে এসেছে। ইয়াসিনকে কি লুনার বাবার কাছে চিঠি দিয়ে পাঠাবেন? তিনি অপেক্ষা করবেন ফতের জন্যে—ইয়াসিন চিঠি নিয়ে চলে যাবে বদরুল সাহেবের কাছে। চিঠিতে লেখা থাকবে—আপনার মেয়ের মহাবিপদ। পুলিশে খবর দিন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কী তাঁর মাথায় আসছে না। মাথায় এলে সেটাও চিঠিতে লিখে দিতেন।

স্যার অনেক দেরি করে ফেলেছি?

মিসির আলি চমকে দেখলেন ফতে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

'জামে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম—এমন জাম শেষে বেবিট্যাক্সি রেখে হেঁটে চলে এসেছি। স্যার চলেন যাই—।'

মিসির আলি কিছু বললেন না, নিঃশব্দে ফতেকে অনুসরণ করলেন। ফতে বলল, সঙ্গে সিগারেট আছে স্যার? না থাকলে নিয়ে নেই। নদীর মাঝখানে সিগারেট টান দিতে বড়ই মজা।

'সিগারেট সঙ্গে আছে?'

মিসির আলি ক্লান্ত গলায় বললেন, সিগারেট সঙ্গে আছে।

ইঞ্জিন লাগানো নৌকা। বেশ বড়সড়। অনেকটা বজরার মতো দরজা-জানালা আছে। নৌকায় কোনো মাঝি নেই। ফতে নিজেই ইঞ্জিন চালু করে নৌকা ছেড়ে দিয়ে বলল— স্যার আপনি ভিতরে যান। লুনা ভেতরে আছে। এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল—এখন মনে হয় জেগেছে।

মিসির আলি বললেন, মেয়েটা একা ছিল নাকি?

ফতে বলল, একাই ছিল। তার কাছে একা যে কথা দোকা তিকাও সেই কথা। যান স্যার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলেন—এর মধ্যে আমি নৌকা ঐ পারে নিয়ে যাই।

'নৌকা ঐ পারে নেবার দরকার কী?'

'দরকার আছে স্যার। ফতে বিনা প্রয়োজনে কোনো কাজ করে না। ঐ পারে ভিড় নাই।'

মিসির আলি দরজা খুলে নৌকার ভেতরে ঢুকলেন। লুনা বসে আছে। তার সামনে লজেন্সের দুটা প্যাকেট। সে প্যাকেট থেকে সব লজেন্সের খোসা ছাড়িয়ে এক পাশে রাখছে। কাজটায় সে খুবই আনন্দ পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। মিসির আলির দিকে তাকিয়ে লুনা হাসল। একটা লজেন্স মিসির আলির দিকে বাড়িয়ে দিল।

মিসির আলি বললেন, খুকি তুমি কেমন আছ?

লুনা বলল, ভালো।

'কী কর?'

'খেলি।'

'এই খেলার নাম কী?'

'জানি না।'

লুনা আরেকটা লজেন্স ইয়াসিনের দিকে বাড়িয়ে দিল। ইয়াসিন লজেন্স নিল না। লুনা হাত বাড়িয়েই থাকল। মিসির আলি বুঝতে পারছেন লজেন্স হাত থেকে না নেওয়া পর্যন্ত এই মেয়ে হাত নামাবে না। মেয়েটা খুবই অসুস্থ। তার মস্তিষ্কের কোনো একটা অংশ জট পাকিয়ে গেছে। এই জট কে খুলতে পারে? এমন কোনো বুদ্ধি যদি থাকত মাথার ভেতর ঢুকে জট খোলা যেত। মিসির আলির হঠাৎ করে প্রতিমার কথা মনে পড়ল। প্রতিমা কি এই মেয়েটার জন্যে কিছু করতে পারে।

নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। ফতে দরজা খুলে নৌকায় ঢুকেই দরজা বন্ধ করে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে হাসল। মিসির আলির বুক ধক করে উঠল। এই হাসি তো মানুষের হাসি না। এই হাসি পিশাচের হাসি। ফতে মিসির আলির চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল—স্যার আপনার তো খুবই বুদ্ধি। বুদ্ধি খাটায়ে বলেন তো—লুনা মেয়েটাকে নিয়ে আমি মাঝনদীতে কেন এসেছি। বলতে পারলে আমি আপনাকে একটা প্রাইজ দিব।

মিসির আলি এখন জানেন ফতে কেন লুনাকে মাঝনদীতে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন তার সেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তিনি ফতের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ইয়াসিনকে বললেন, "ইয়াসিন তুমি মেয়েটার হাত থেকে লজেন্সটা নাও। লজেন্স না নেওয়া পর্যন্ত সে হাত উঁচু করে রাখবে।" ইয়াসিন লজেন্স নিল। লুনা মিষ্টি করে হেসে আবারো লজেন্সের খোসা ছাড়ানোয় মন দিল।

ফতে সিগারেট ধরিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, স্যার যে কাজটা করতে যাচ্ছি এই কাজ এর আগে আমি আরো চারবার করেছি।

মিসির আলি বললেন, কেন করেছ?

'করতে খুব মজা লাগে স্যার। আমার হাতের কাজ যে দেখে সে খুবই ভয় পায়।

কেউ ভয় পেলে আমি খুব সহজে তার মাথার ভিতর ঢুকে পড়তে পারি। অনেক দূর যেতে পারি। তার মাথা লণ্ডভণ্ড করে ফেলতে পারি। তখন কী যে আনন্দ হয়!'

'ফতে তুমি যে খুব অসুস্থ একজন মানুষ তা কি তুমি জান?'

'জানি। তার জন্যে আমার খারাপ লাগে না। আল্লাই আমাকে অসুস্থ করে পাঠিয়েছেন। আমি কী করব।'

'এক অর্থে তোমার কথা ঠিক। তোমার জিনে কোনো গণ্ডগোল আছে। যে কারণে ভয়াবহ কাণ্ডগুলি হাসিমুখে করছ। তোমার সুস্থ হবার কোনো সুযোগ আছে বলেও আমার মনে হয় না।'

'আপনার ভয় লাগছে না?'

'না, ভয় লাগছে না। যে ভয়ঙ্কর ঘটনা তুমি ঘটাবে বলে ভাবছ সেই ঘটনা তুমি ঘটাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না?'

ফতে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, স্যার আমার ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই। আমি যে কোনো মানুষের মাথার ভেতর ঢুকে পড়তে পারি। এখন আপনার এই কাজের ছেলের মাথার ভেতর আমি ঢুকে বসে আছি। এর পকেটে একটা কাচের বোতল আছে। বোতল ভর্তি নাইট্রিক এসিড। আমি যখনই তাকে বলব—ইয়াসিন বোতলের জিনিসটা মিসির আলি সাহেবের গায়ে ঢেলে দে—সে গায়ে ঢেলে দেবে।

ফতে ইয়াসিনের দিকে তাকিয়ে বলল, কীরে ইয়াসিন ঢালবি না? যে মেয়েটার গায়ে ঢালার জন্যে বোতল ভর্তি এসিড নিয়ে ঘুরছিস সে যখন নেই তখন স্যারের গায়ে ঢালবি। পারবি না?

ইয়াসিন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। ক্ষীণ স্বরে বলল, পারব।

ফতে বলল, তা হলে বোতলটা পকেট থেকে বের করে মুখটা খুলে রাখ।

ইয়াসিন তাই করল। ফতে হাসতে হাসতে বলল, একটু ভয় ভয় লাগছে না স্যার?

মিসির আলি বললেন, না।

'একটুও লাগছে না?'

'না।'

মিসির আলি নিজেও বিস্মিত হচ্ছেন। ভয়ঙ্কর একজন মানুষ তাঁর সামনে বসে আছে অথচ তিনি বিচলিত হচ্ছেন না। প্রচণ্ড ভয়ের কোনো কারণ ঘটলে রক্তে এড্রোলিন নামের এনজাইম প্রচুর পরিমাণ চলে আসে। ভয় কেটে যায়। সেরকম কিছু কি ঘটেছে? তিনি ইয়াসিনের দিকে তাকালেন। এসিডের বোতল হাতে সে শক্ত হয়ে বসে আছে। তার দৃষ্টি পুরোপুরি ফতের দিকে। ফতে তাকিয়ে আছে ইয়াসিনের দিকে। মিসির লক্ষ করলেন ফতে যখনই তার দৃষ্টি মিসির আলির দিকে দিচ্ছে—ইয়াসিন তখনই নড়ে উঠছে। তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে ফতে যে দাবি করছে সে মানুষের মাথার ভেতর ঢুকে পড়তে পারে—মাথার ভেতর ঢুকতে তার কি চোখ নামক পথের প্রয়োজন হয়। ইয়াসিন যদি চোখ বন্ধ করে ফেলে তা হলেও কি ফতে তার মাথার ভেতর ঢুকে বসে থাকতে পারবে।

মিসির আলিকে অতিদ্রুত যে কাজটা করতে হবে তা হল ইয়াসিনের হাত থেকে এসিডের বোতলটা নিয়ে নিতে হবে। মিসির আলি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে ডাকলেন—ইয়াসিন!

ইয়াসিন তাঁর দিকে তাকাল না। ফতের দিকেই তাকিয়ে রইল। ফতের ঠোঁটের কোনায় ক্ষীণ হাসির রেখা। মিসির আলি দ্রুত চিন্তা করছেন। ফতেকে এক্ষুনি বিভ্রান্ত করতে হবে। চমকে দিতে হবে। মিসির আলি হালকা গলায় বললেন, ফতে শোন তুমি যে ক্ষমতার কথা বলছ এই ক্ষমতা যে আমার নেই তা কী করে বুঝলে?

ফতে চমকে তাকাল।

মিসির আলি বললেন, এস আমার মাথার ভেতর ঢুকে দেখ।

ফতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তার মুখ হাঁ হয়ে আছে। ঠোঁট বেয়ে লালার মতো কিছু গড়িয়ে পড়ল। ফতে মিসির আলির মাথার ভেতর ঢোকার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ থেকেই করছে। পারছে না। তার নিজেরই সামান্য ভয় ভয় লাগছে। ভয় পাওয়া ঠিক হবে না। সে ভয় পেলে মাথায় ঢুকতে পারবে না। খুব বেশি ভয় পেয়ে গেলে হয়তো উল্টো ব্যাপার ঘটবে। মিসির আলিই তর মাথায় ঢুকে পড়বেন। ফতে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগল।

মিসির আলি বললেন, তুমি আমার সঙ্গে যে খেলা খেলতে চেয়েছ এই খেলাটা খেলতে পারবে না। আমি খেলায় কয়েকটা দান এগিয়ে আছি।

ফতে বলল, কীভাবে?

আমি এক ঘণ্টা লঞ্চঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলাম না। আমি পুলিশে খবর দিয়েছি।

আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।

ফতে আমি তো বোকা না। তুমি আমাকে বোকা ভাবলে কেন? তোমার মতো ক্ষমতা আছে এমন একজন রোগীর আমি চিকিৎসা করেছিলাম, সেও আমাকে বোকা ভাবত। এখনো ভাবে। এজাতীয় ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের প্রধান দুর্বলতা হল এরা অন্য সবাইকে বোকা ভাবে। তুমি কি এখনো আমাকে বোকা ভাবছ?

ফতে শীতল গলায় বলল, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন, আপনি পুলিশকে খবর দেন নাই।

মিসির আলি বললেন, ফতে তুমি বোধ হয় লক্ষ কর নি ইয়াসিনের হাতে যে বোতলটা ছিল—সে বোতলটা এখন আমার হাতে। পুলিশের বাঁশির আওয়াজ তুমি এক্ষুনি শুনবে।

মিসির আলির কথা শেষ হবার আগেই—পরপর দুবার বাঁশি বেজে উঠল। নৌকা দুলে উঠল। ফতে ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল।

মিসির আলি বললেন, এটা পুলিশের বাঁশির শব্দ না। লঞ্চ ছাড়ছে—ভেঁপু দিচ্ছে। ফতে তুমি ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছ।

ফতে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আপনি পুলিশে খবর দেন নাই।

মিসির আলি বললেন, তুমি ঠিকই বলছ। আমি পুলিশে খবর দেই নি। পুলিশের কথা বলেছি তোমার ভিতর ভয়ের বীজ ঢুকিয়ে দেবার জন্যে। ভয়ের বীজ ঢুকে গেছে। সত্যি করে বল ফতে তোমার ভয় লাগছে না?

'না।'

মিথ্যা কথা বলার দরকার নেই ফতে। আমি যেমন সত্যি কথা বলছি তুমিও সত্যি কথা বল। তীব্র ভয়ে অস্থির হলে মানুষের যেসব শারীরিক পরিবর্তন হয় তার সবই

তোমার হচ্ছে। তোমার শরীর কাঁপছে। তোমার চোখের মণি বড় বড় হয়ে গেছে। পুলিশকে তো আমি খবর দেই নি। তুমি কাকে ভয় পাচ্ছ?

'আপনাকে।'

আমার হাতে এসিডের বোতল এই জন্যে ভয় পাচ্ছ? শোন ফতে আমার পক্ষে কোনো অবস্থাতেই কারো গায়ে এসিড ছুড়ে ফেলা সম্ভব না। এই দেখ বোতলটা আমি পানিতে ফেলে দিচ্ছি। তাতেও কিন্তু তোমার ভয় কমবে না।

ফতে ঢোক গিলল। মিসির আলি নামের মানুষটা সত্যি সত্যি বোতলটা ফেলে দিয়েছে। মানুষটার দুর্দান্ত সাহস। এত সাহস সে পেল কোথায়। ফতে যেখানে বসেছে তার নিচেই বড় একটা ধারালো ছুরি আছে। হাত নামিয়ে সে কি ছুরিটা নেবে।

'ফতে!'

'জি।'

'তুমি ভয়ঙ্কর অসুস্থ একজন মানুষ। তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার। প্রতিমার সাহায্য নিয়ে আমি তোমার চিকিৎসা করার চেষ্টা করতে পারি। তুমি কি চাও আমি তেমার চিকিৎসা করি?'

'না।'

'তোমাকে তো ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না ফতে। তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি ভয়ঙ্কর সব অপরাধ করবে। আমি তা হতে দিতে পারি না।'

লুনা আরেকটা লজেন্সের খোসা ছাড়িয়ে ফতের দিকে ধরে আছে। মিসির আলি বললেন, ফতে লজেন্সটা ওর হাত থেকে নাও। লজেন্স না নেওয়া পর্যন্ত সে হাত উঁচু করেই রাখবে।

ফতে লজেন্স নিল।

মিসির আলি বললেন, চল নৌকার পাটাতনে গিয়ে দাঁড়াই। তুমি বলেছিলে মাঝনদীতে সিগারেট টানতে খুব মজা—দেখি আসলেই মজা কি না। ফতে কোনোরকম আপত্তি করল না, মিসির আলির সঙ্গে নৌকার পাটাতনে এসে দাঁড়াল।

মিসির আলি বললেন, ফতে তুমি কি পানিতে ঝাঁপ দেওয়ার কথা চিন্তা করছ?

ফতে চমকে উঠে বলল, আপনি কীভাবে বললেন?

মিসির আলি বললেন, অনুমান করে বলছি। আমার কারো মাথায় ঢোকার ক্ষমতা নেই। তবে আমি খুব ভালো অনুমান করতে পারি। সেই অনুমানটা মাথায় ঢোকার মতোই। ফতে তুমি পানিতে ঝাঁপ দিও না। পানি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হবার কথা।

আর স্রোতও বেশি। তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। ফতে ঠিকই বলেছে মাঝনদীতে সিগারেট ধরাবার আনন্দই আলাদা। আনন্দের সঙ্গে তিনি গাঢ় বিষাদও অনুভব করছেন। বিষাদের কারণটা তিনি ধরতে পারছেন না। নৌকার ভেতরে লুনা মেয়েটা খিলখিল করে হাসছে। আশ্চর্য প্রতিমাও ঠিক এ রকম করেই হাসে।

কহেন কবি কালিদা

কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে
নাই তাই খাচ্ছ,
থাকলে কোথায় পেতে?
—লোকছড়া

১

সন্ধ্যা হয়–হয় করছে। এখনো হয় নি। আকাশ মেঘলা। ঘরের ভেতর অন্ধকার। সন্ধ্যা লগ্নে ঘর অন্ধকার থাকা অলক্ষণ। মিসির আলি লক্ষণ–অলক্ষণ বিচার করে চলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠতে তাঁর আলস্য লাগছে বলে ঘরে বাতি জ্বালানো হয় নি। তিনি খানিকটা অস্বস্তির মধ্যেও আছেন। তাঁর সামনে যে–তরুণী বসে আছে, অস্বস্তি তাকে নিয়েই। আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা। এতক্ষণ সে বোরকার ভেতর থেকে কথা বলছিল, কিছুক্ষণ আগে মুখের সামনের পরদা তুলে দিয়েছে। মিসির আলি ধাক্কার মতো খেয়েছেন। এমন রূপবতী মেয়ে তিনি খুব বেশি দেখেছেন বলে মনে করতে পারছেন না।

লম্বাটে মুখ। খাড়া নাক। লিপস্টিকের বিজ্ঞাপন হতে পারে এরকম পাতলা ঠোঁট। বড় বড় চোখ। চোখের পল্লব দীর্ঘ। তবে এই দীর্ঘ পল্লব নকলও হতে পারে। এখনকার মেয়েরা নকল পল্লব চোখে পরে। বরফি কাটা চিবুক। চিবুকে লাল তিল দেখা যাচ্ছে। এই তিলও মনে হয় নকল।

আমার নাম সায়রা। সায়রা বানু।

মিসির আলি মনে–মনে কয়েকবার বললেন—সায়রা, সায়রা। তাঁর ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল। কেন তিনি মনে–মনে মেয়েটির নাম নিলেন তা বুঝতে পারলেন না। তিনি কি মেয়েটির নাম মনে রাখার চেষ্টা করছেন? এই কাজটি তিনি কেন করলেন? মেয়েটির অস্বাভাবিক রূপ দেখে? একটি কুরূপা মেয়ে যদি তার নাম বলত তিনি কি মনে–মনে তার নাম জপতেন?

সায়রা, তুমি কি রোজা রেখেছ?

জি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইফতারের সময় হবে। আমার এখানে ইফতারের ব্যবস্থা নেই।

পানি তো আছে। এক গ্লাস পানি নিশ্চয়ই দিতে পারবেন।

বলতে–বলতে মেয়েটি হাসল। রূপবতী মেয়েদের হাসি বেশিরভাগ সময়ই সুন্দর হয় না। দেখা যায় তাদের দাঁত খারাপ। কিংবা হাসির সময় দাঁতের মাড়ি বের হয়ে আসে। দাঁত–মাড়ি ঠিক থাকলে হাসির শব্দ হয় কুৎসিত—হায়না টাইপ। প্রকৃতি কাউকে সবকিছু দেয় না। কিন্তু সায়রা নামের মেয়েটিকে দিয়েছে। মেয়েটির হাসি সুন্দর। হাসি শেষ হবার পরেও মেয়েটির চোখ সেই হাসি ধরে রেখেছে। এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

মিসির আলি বিব্রত বোধ করছেন। মেয়েটি সারাদিন রোজা রেখেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাগরিবের আজান হবে। মেয়েটি রোজা ভাঙবে। ঘরে পানি ছাড়া কিছুই নেই।

আমি কি আপনাকে চাচা ডাকতে পারি?

পার।

চাচা, আমার ইফতার নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার ইফতারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কীভাবে হবে?

আমি অনেকবার লক্ষ করেছি রোজার সময় আমি যখন বাইরে থাকি তখন কেউ-না-কেউ আমার জন্য ইফতার নিয়ে আসে। চিনি না জানি না এমন কেউ।

মিসির আলি চেয়ারে সোজা হয়ে বসতে-বসতে বললেন, সায়রা তুমি নিতান্তই যুক্তিহীন কথা বলেছ।

সায়রা হাসিমুখে বলল, আমি বিশ্বাসের কথা বলেছি, যুক্তির কথা বলি নি।

আমি বরং কিছু ইফতার কিনে নিয়ে আসি?

না, আপনি যেভাবে বসে আছেন বসে থাকুন। আপনার ঘরে কি জায়নামাজ আছে? আমি রোজা ভেঙেই নামাজ পড়ি।

জায়নামাজ নেই।

মিসির আলি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটি এখন সামান্য দুলছে। যে-চেয়ারে সে বসে আছে সেটা কাঠের একটা চেয়ার। রকিং-চেয়ার না। মেয়েটির দুলুনি দেখে মনে হচ্ছে সে রকিং-চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। কিশোরী মেয়েদের চেয়ারে বসে দুলুনি মানানসই, এই মেয়েটির জন্য মানানসই না।

সায়রা!

জি?

তুমি কী জন্য আমার কাছে এসেছ সেটা এখনো বলো নি।

বলব। রোজা ভাঙার পর বলব।

আমি যদি সিগারেট ধরাই তোমার সমস্যা হবে?

জি না।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখার নিয়ম। তুমি যদি তুন্দ্রা অঞ্চলে যাও তখন রোজা রাখবে কীভাবে? সেখানে তো ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত।

সায়রা বলল, চাচা, আমি তো তুন্দ্রা অঞ্চলে যাই নি। যখন যাব তখন দেখা যাবে। আপনার কি চা খেতে ইচ্ছা করছে? আপনাকে এক কাপ চা বানিয়ে দিই? যারা প্রচুর সিগারেট খায় তারা সিগারেটের সঙ্গে চা খেতে পছন্দ করে। এইজন্য বললাম। আপনি চা খেতে চাইলে আমি আপনার জন্য চা বানিয়ে নিয়ে আসতে পারি।

মেয়েটি মিসির আলির অনুমতির জন্য অপেক্ষা করল না। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনার রান্নাঘর কোনদিকে?

মিসির আলি অতিদ্রুত কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে বিষয়টা তাঁকে সাহায্য করল তা হচ্ছে—মেয়েটি রান্নাঘরে গেল খালি পায়ে। স্যান্ডেল চেয়ারের

পাশে পড়ে থাকল। তার অর্থ নিজ-বাড়িতে মেয়েটি খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করে। এই বাড়িতেও সে পুরোনো অভ্যাসবশত খালি পায়ে রান্নাঘরে গেছে। যে-বাড়িতে এই মেয়ে খালি পায়ে হাঁটে সে বাড়ির মেঝে হতে হবে ঝকঝকে ধূলিশূন্য। মার্বেলের মেঝে কিংবা পুরো বাড়িতে ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট।

মেয়েটি চেয়ারে বসে দোল খাওয়ার ভঙ্গি করছিল। অর্থাৎ মেয়েটির বাড়িতে একটি রকিং-চেয়ার আছে। সে অনেকখানি সময় এই চেয়ারে বসে কাটায়। সেই অভ্যাস রয়ে গেছে।

মেয়েটির নাকে নাকফুল আছে। নাকফুল হীরের। হীরের সাইজ ভালো। সচরাচর মেয়েরা নাকে যেসব হীরের নাকফুল পরে সেই হীরে চোখে দেখা যায় না। ম্যাগনিফাইং গ্লাসে দেখতে হয়।

মেয়েটি যখন উঠে রান্নাঘরে গেল তখন তার গা থেকে হালকা সেন্টের গন্ধ এসেছে। অতি দামি পারফিউম মাঝে মাঝে গন্ধ ছড়ায়। সব সময় ছড়ায় না। মেয়েটি অতি দামি কোনো পারফিউম মেখেছে।

মেয়েটি 'আপনার রান্নাঘর কোথায়' বলেই রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিয়েছে। রান্নাঘরে যাবার অনুমতি চায় নি। এর অর্থ, এই মেয়ে অনুমতি নিয়ে কোনোকিছু করায় অভ্যস্ত না। যে-বাড়িতে সায়রা বাস করে সেই বাড়ির কর্ত্রী সে নিজে।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। অনেকগুলো ছোট-ছোট সিদ্ধান্ত থেকে একটা বড় সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সেটা কোনো জটিল কাজ না।

সায়রা নামের মেয়েটি অতি ধনবান গোত্রের একজন। সে গাড়ি ছাড়া আসবে না। সে অবশ্যই গাড়ি নিয়ে এসেছে। গাড়ি কাছেই কোথাও অপেক্ষা করছে। মেয়েটির ইফতার গাড়িতেই আছে। ইফতারের সময় হলেই গাড়ির ড্রাইভার ইফতার নিয়ে আসবে। এই ব্যাপারে মেয়েটি নিশ্চিত বলেই ইফতারের ব্যাপারে মাথা ঘামায় নি।

চাচা আপনার চা।

মিসির আলি চায়ের কাপ হাতে নিলেন। সায়রা বলল, আমি আগামীকাল লোক পাঠাব। সে এসে রান্নাঘর পরিষ্কার করে দেবে। আমি আমার জীবনে এমন নোংরা রান্নাঘর দেখি নি।

সায়রা আগের জায়গায় বসল। হাতঘড়িতে সময় দেখল। মিসির আলি বললেন, ইফতারের সময় হলেই তোমার ড্রাইভার ইফতার দিয়ে যাবে আমার এই অনুমান কি ঠিক আছে?

সায়রা বলল, ঠিক আছে।

মিসির আলি বললেন, তুমি তোমার বাড়িতে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা রকিং-চেয়ারে বসে দোল খাও আমার এই অনুমান কি ঠিক আছে?

হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনাকে আমি যত বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম আপনার বুদ্ধি তারচেয়ে বেশি। আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। আমি আপনাকে দয়া করতে বলছি না। আমি আল্লাহ্‌পাকের দয়া ছাড়া কারোর দয়া নিই না। আপনার কাজের জন্য আমি যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেব।

তুমি আল্লাহ্‌পাকের দয়া ছাড়া কারো দয়া নাও না?

জি না।

আল্লাহ্‌পাক তো সরাসরি দয়া করেন না। তিনি কারো–না–কারো মাধ্যমে দয়া করেন। তুমি অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যাও। তার সেবা তোমাকে নিতে হয়।

আপনি তর্ক খুব ভালো পারেন। আমি আপনার সঙ্গে তর্কে যাব না। আমার মূল কথা হচ্ছে, আপনাকে যোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

যোগ্য পারিশ্রমিকটা কী?

উত্তরায় ২৪ শ স্কয়ার ফিটের আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। ফোর বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট। আমি অ্যাপার্টমেন্টটা আপনাকে দিয়ে দেব।

মিসির আলি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটিও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না। চোখে চোখ রাখার খেলা মেয়েরা খুব ভালো পারে।

সায়রা বানুর ড্রাইভার ইফতার নিয়ে এসেছে। সে সঙ্গে করে জায়নামাজও এনেছে। টেবিলে সে দুটা চায়ের কাপ এবং ফ্লাস্ক রাখল। ফ্লাস্কে নিশ্চয়ই চা আছে। গোছানো ব্যবস্থা।

আজান হয়েছে। মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে মেয়েটির রোজা ভাঙার দৃশ্য দেখলেন। এক গ্লাস পানি খেয়ে সে রোজা ভেঙেই জায়নামাজ নিয়ে বসল। অপরিচিত জায়গায় কেউ নামাজ পড়তে চাইলে প্রথমেই পশ্চিম কোন দিকে জেনে নেয়। সায়রা তা করে নি। তার পরেও পশ্চিমমুখী করে জায়নামাজ পেতেছে। এর অর্থ সে আজ প্রথম এখানে আসে নি। আগেও এসেছে, খোঁজখবর নিয়েছে।

মেয়েটির আচার–আচরণে কোনো জড়তা নেই, অস্পষ্টতা নেই। সে নিজে কী করছে তা জানে। নিজের ওপর তার বিশ্বাস প্রবল। এই বিশ্বাস সে অর্জন করেছে তা মনে হচ্ছে না। বিশ্বাসটা সে মনে হয় জন্মসূত্রেই নিয়ে এসেছে।

সায়রার হাতে চায়ের কাপ। সে আগ্রহ নিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। মিসির আলি সিগারেট ধরিয়েছেন।

সায়রা বলল, চাচা, আপনি কি আমার প্রস্তাবে রাজি?

মিসির আলি বললেন, কোন প্রস্তাব? সমস্যার সমাধান করব, বিনিময়ে বাড়ি?

হুঁ।

মিসির আলি বললেন, তুমি আমার বিষয়ে ভালো খোঁজখবর নিয়েই এসেছ। কাজেই তোমার জানা উচিত সমস্যা সমাধান আমার পেশা না। তা ছাড়া সমস্যার সমাধান আমি সেইভাবে করতেও পারি না। জগতের বড় বড় রহস্যের বেশিরভাগ থাকে অমীমাংসিত। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে। রহস্যের মীমাংসা তেমন পছন্দ করে না।

সায়রা শান্ত গলায় বলল, প্রকৃতি রহস্যের মীমাংসা পছন্দ করুক বা না করুক আপনি মীমাংসা পছন্দ করেন। আমি আপনার কাছে সাহায্যের জন্য এ সছি। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

কেন সাহায্য করব?

আপনি আপনার নিজের আনন্দের জন্য করবেন। সমস্যা সমাধান করে আপনি

আনন্দ পান। সমস্যা যত বড় আপনার আনন্দও হয় তত বেশি। এখন আপনার কিছুই করার নেই। আপনি সময় কাটান শুয়ে-বসে, বই পড়ে এবং সস্তার সিগারেট টেনে। মানুষের জীবন যতটা একঘেয়ে হওয়া উচিত আপনার জীবন ততটাই একঘেয়ে। আপনি কিছুক্ষণের জন্য হলেও সেই একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি পাবেন। তার মূল্যও কি কম? বলুন কম?

না, কম না।

আপনি জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছেন। সস্তার একটা ভাড়া বাড়িতে বাস করেন। একটা মাত্র কামরা। ঘরে নিশ্চয়ই এসি নেই। গরমে কষ্ট পান। শীতের সময় বরফের মতো ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করতে হয়। এখন যদি আপনার চমৎকার একটা ফ্ল্যাট থাকে যে-ফ্ল্যাটে এসি আছে, বাথরুমে গিজার আছে তা হলে ভালো হয় না?

আমি যে-জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত আমার জন্য সেটাই ভালো।

ঠিক আছে বাদ দিলাম। আপনার যদি আমার মতো একটা মেয়ে থাকত সেই মেয়ে যদি কাঁদতে-কাঁদতে আপনাকে সমস্যার কথা বলত আপনি কী করতেন?

তুমি কিন্তু কাঁদছ না।

আপনি বললে আমি কাঁদতে পারি। আমি অতি দ্রুত চোখে পানি আনতে পারি। কেঁদে দেখাব?

বলো তোমার সমস্যা।

সায়রা বলল, থ্যাংক য়্যু স্যার। বলেই সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। এর মধ্যেই সে চোখে পানি নিয়ে এসেছে। মিসির আলি মেয়েটির কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হলেন।

সায়রা বলল, পুরোটা আমি লিখে এনেছি। আপনার কাছে খাতাটা রেখে যাচ্ছি। খাতায় আমার টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে। যখন পড়া শেষ হবে আমাকে টেলিফোন করবেন আমি চলে আসব। আবার যদি পড়তে-পড়তে আপনার খটকা লাগে তা হলেও নিজে এসে খটকা দূর করব।

সায়রার ড্রাইভার এসেছে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে। সায়রা বলল, কাপ দু'টা থাকুক। এই বাড়িতে ভালো কাপ নেই। আবার যখন আসব—এই কাপে চা খাব।

মিসির আলি খাতাটা হাতে নিলেন। প্রায় এক শ পৃষ্ঠা গুটিগুটি করে লেখা। পুরোটাই ইংরেজিতে। শিরোনাম—

Autobiography of an unknown young girl.

সায়রা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, লেখাটার টাইটেল আমি একজনের কাছ থেকে নকল করেছি। নীরদ সি চৌধুরীর একটা বই আছে, নাম—

Autobiography of an unknown Indian. সেখান থেকে নেওয়া।

মিসির আলি বললেন, তোমার পড়াশোনার সাবজেক্ট কি ইংরেজি?

জি না। কেমিস্ট্রি। আমি স্কটল্যান্ডের এবারডিন ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রিতে পিএইচ. ডি. করেছি। বুঝতে পারছি আপনি ছোটখাটো ধাক্কার মতো খেয়েছেন। আপনি আমাকে অনেক অল্পবয়সি মেয়ে ভেবেছিলেন। আমার বয়স ত্রিশ। এখন আপনাকে আরেকটা ছোট্ট ধাক্কা দিতে চাই। দেব?

দাও।

আমি একটা সিগারেট খাব। আপনি যদি অনুমতি দেন।

অনুমতি দিলাম।

সায়রা তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে সিগারেট বের করল। লাইটার বের করল। খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাল।

মিসির আলি তেমন কোনো ধাক্কা খেলেন না। মেয়েটা ধূমপানে অভ্যস্ত না। এই কাজটা যে সে তাঁকে চমকে দেবার জন্য করেছে তা বোঝা যাচ্ছে। সিগারেটের প্যাকেটটা নতুন। লাইটার ধরাবার কায়দাও সে জানে না। সিগারেটের ধোঁয়া ফুসফুসে নিয়ে সে কাশছে। চোখের মণি লাল হয়ে গেছে।

আপনি কি আমার সিগারেট খাওয়া দেখে রাগ করছেন?

না।

বিরক্ত হচ্ছেন?

না।

প্লিজ রাগ করবেন না। বিরক্তও হবেন না। সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার আমি আপনার জন্য এনেছি। হঠাৎ কেন জানি ইচ্ছা হল আপনাকে আরেকটু চমকাই। চাচা এখন আমি যাই?

যাও।

আপনি কিন্তু খাতাটা আজ রাতেই পড়তে শুরু করবেন।

মিসির আলি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

যাই বলেও সায়রা দাঁড়িয়ে আছে। যাচ্ছে না। মিসির আলি বললেন, তুমি কি আরো কিছু বলবে?

সায়রা বলল, আমি আপনাকে যেরকম ভেবেছিলাম আপনি সেরকম না।

মিসির আলি বললেন, কীরকম ভেবেছিলে?

অহংকারী, রাগী। আমি চিন্তাই করি নি আপনি এত সহজে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবেন। থ্যাংক য়্যু।

২

সায়রার লেখা অটোবায়োগ্রাফির সরল বঙ্গানুবাদ

বাবা আমার নাম রেখেছিলেন মিথেন। আমার নাম মিথেন, আমার ছোট বোনের নাম ইথেন।

ছোটবেলায় কেউ আমার নাম জিজ্ঞেস করলে মজার ব্যাপার হত। প্রশ্নকর্তা নাম শুনে অবাক হয়ে বলত—এমন নাম তো শুনি নি! এর অর্থ কী?

আমি বলতাম মিথেন হল হাইড্রোকার্বন। এর কেমিক্যাল ফর্মুলা CH_4. আমার ছোট বোনের নাম ইথেন। ইথেনের কেমিক্যাল ফর্মুলা হল $CH_3 — CH_3$.

প্রশ্নকর্তা আরো অবাক হয়ে বলত, এমন অদ্ভুত নাম কে রেখেছে?

আমি বলতাম, বাবা। তিনি কেমিস্ট্রির টিচার।

আমার বাবার নাম হাবিবুর রহমান। ছোটখাটো মানুষ। কুঁজো হয়ে হাঁটতেন যখন তখন তাঁকে আরো ছোট দেখাত। কলেজের ছাত্ররা তাঁকে ডাকত ট্যাবলেট স্যার। আমার ছোট বোন ইথেন ছিল ফাজিল স্বভাবের মেয়ে। সে একদিন বাবাকে ট্যাবলেট বাবা ডেকে ফেলেছিল। বাবা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর ছোট মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—এটা কী বললা গো মা?

ইথেন বলল, আর কোনোদিন বলব না বাবা। এই বলেই সে কাঁদতে শুরু করল। বাবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে কান্না বন্ধ করলেন।

আমার ট্যাবলেট বাবা মানুষ হিসেবে ভালো ছিলেন। শুধু ভালো না একটু বেশিরকম ভালো। তিনি আমাদের দুই বোনকে খুবই আদর করতেন। কিছু-কিছু মানুষ আদর স্নেহ ভালবাসা এইসব মহৎ গুণ নিয়ে জন্মায় কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। বাবা ছিলেন সেই দলের। মা'র মৃত্যুর পর বাবা আর বিয়ে করেন নি কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল সৎমায়ের সংসারে আমরা দুই বোন কষ্ট পাব।

ধর্মকর্মের প্রতি বাবার কোনো ঝোঁক আগে ছিল না। মা'র মৃত্যুর পর তিনি এইদিকে ঝুঁকে পড়েন। নামাজ, নফল রোজা, গভীর রাতে জিগির এইসব চলতে থাকে। তিনি দাড়ি রাখলেন, চোখে সুরমা দেওয়া শুরু করলেন। কলেজের ছাত্ররা তাঁর নতুন নামকরণ করল ট্যাবলেট হুজুর।

অতিরিক্ত ধর্মকর্মই সম্ভবত বাবার মধ্যে কিছু পরিবর্তন নিয়ে এল—তিনি শুচিবায়ু রোগে পড়লেন। অজু করার পরপরই তাঁর মনে হত যে-বদনায় তিনি অজু করেছেন সেই বদনা নাপাক। কাজেই বদনা ধুয়ে আবার নতুন করে অজু। শুচিবায়ু খুব খারাপ রোগ—এই রোগ কখনো স্থির থাকে না, বাড়তে থাকে। বাবার এই রোগ বাড়তে থাকল। তার সঙ্গে যুক্ত হল ইবলিশ শয়তান-দেখা রোগ। তিনি মাঝে মধ্যেই আমাদের বাড়ির আনাচে-কানাচে ইবলিশ শয়তানকে দেখতে শুরু করলেন। ইবলিশ শয়তান নাকি নিজ দায়িত্বে এই বাড়িতে এসে উঠেছে। তার একটাই কাজ—বাবাকে ধর্মের পথ থেকে সরিয়ে আনা।

একদিনের কথা। বাবা মাগরিবের নামাজের পর আমাদের দুই বোনকে ডেকে পাঠালেন। আমরা অবাকই হলাম, কারণ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত বাবা কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। জায়নামাজে বসে তসবি টানতেন।

আমরা বাবার সামনে বসলাম। তিনি জায়নামাজে বসে আছেন। আমরা বসেছি জায়নামাজ থেকে একটু দূরের পাটিতে। দরজা-জানালা বন্ধ। ঘর অন্ধকার। বাবার সামনে আগরদানে আগরবাতি জ্বলছে। বাবা বললেন, মাগো তোমাদের একটা বিশেষ কারণে ডেকেছি। কারণটা মন দিয়ে শোন। ইবলিশ স্বয়ং এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, তার বিষয়ে সাবধান। আমি কয়েকবারই তার সাক্ষাৎ পেয়েছি। তোমরাও নিশ্চয়ই পাবে। যাতে তোমরা ভয় না পাও এইজন্য আগেভাগে সাবধান করলাম।

ইথেন বলল, বাবা, ইবলিশের দেখা যদি পাই তা হলে তাকে কী ডাকব? ইবলিশ ভাই?

বাবা হতভম্ব হয়ে ইথেনের দিকে তাকালেন। ইথেন সহজভাবে তাকিয়ে রইল। বাবা বললেন, মাগো, তুমি কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস টেনে উঠেছি।

যে–মেয়ে ক্লাস টেনে উঠেছে সে তো মাশাল্লা অনেক বড় মেয়ে। তার কি উচিত সব সময় ঠাট্টা–ফাজলামি ধরনের কথা বলা?

উচিত না বাবা।

বাবা বললেন, ইবলিশ শয়তান যে এই বাড়িতে আছে আমার এই কথাটা তোমরা গুরুত্বের সঙ্গে নাও। এর ক্ষমতা অনেক বেশি বলেই আল্লাহ্পাক স্বয়ং তার বিষয়ে বারবার সাবধান করেছেন। মা ইথেন তুমি কি জান ইবলিশ কে?

জানি। সে শুরুতে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র ছিল। একজন বড় ফেরেশতা।

তোমার জানায় সামান্য ভুল আছে। ইবলিশ ফেরেশতা না। সে জিন সম্প্রদায়ের। জিন সম্প্রদায় মানব সম্প্রদায়ের কাছাকাছি—এদের জন্ম–মৃত্যু আছে। তবে ইবলিশের মৃত্যু হবে কেয়ামতের সময়। তার আগে না।

ইথেন আবারো বেফাঁস কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি তাকে ইশারায় থামালাম। বাবা বললেন, আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে। শয়তান চলে মানুষের শিরায়–শিরায়। তারা মানুষের সবচেয়ে দুর্বল অংশে আঘাত করে। আমাকে শয়তান কিছু করতে পারছে না। কাজেই সে তোমাদের মাধ্যমে আমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। কারণ আমি তোমাদের অত্যন্ত স্নেহ করি। স্নেহ–ভালবাসা মানুষের দুর্বল স্থান। কাজেই ইবলিশ আঘাত করবে স্নেহ–ভালবাসার দুর্বল স্থানে।

বাবার কথা শেষ হবার আগেই ইথেন বলল, বাবা আমি উঠি? আমার একটা জরুরি কাজ আছে।

কী কাজ?

টিভিতে X-File নামে একটা শো হয়। আমি তার কোনোটাই মিস করি নি। আজকেরটাও করব না।

X-File–এ কী দেখায়?

ভূতপ্রেত সুপার ন্যাচারাল এইসব হাবিজাবি।

হাবিজাবি দেখার দরকার কী?

হাবিজাবি আমার ভালো লাগে বাবা। কী করব বলো, আমি মেয়েটাই মনে হয় হাবিজাবি।

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, আচ্ছা যাও।

ইথেন তৎক্ষণাৎ উঠে চলে গেল। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে মা, তুমিও যাও।

হাবিজাবির দিকে ইথেন খুবই ঝুঁকে পড়েছিল। সে সিগারেট খাওয়া ধরেছিল। রাতে ঘুমাতে যাবার সময় সে তার ব্যাগ থেকে সিগারেট বের করে প্রথমেই আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলত—আপা খাবি? একটা টান দিয়ে দ্যাখ না? এমনভাবে তাকাচ্ছিস কেন? ছেলেরা যে–জিনিস খেতে পারে মেয়েরাও পারে। তোর ইচ্ছা হলে

বাবাকে বলে দে। যা, এখনই গিয়ে বল। আমি কোনোকিছু কেয়ার করি না। বাবা কী করবে, আমাকে মারবে? মারলে মারুক।

সে যে কোনো কিছুই কেয়ার করে না তার প্রমাণ কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। এক রাতে সে তার ব্যাগ থেকে কোকের ক্যানের মতো ক্যান বের করে বলল, আপা এক চুমুক খেয়ে দেখবি?

আমি বললাম, কী?

বিয়ার। সামান্য অ্যালকোহল আছে। সেটা না-থাকার মতো।

তুই বিয়ার খাচ্ছিস?

হুঁ। অসুবিধা কী? রোজ তো খাচ্ছি না। এক দিন একটু চেখে দেখব। ইউরোপ আমেরিকায় আমার বয়সি মেয়েরা পানি খায় না। বিয়ার খায়।

বিয়ার তোকে কে দিয়েছে?

দিয়েছে একজন। নাম দিয়ে কী করবি?

আমি অবাক হয়ে দেখলাম সে তার বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছে। বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিচ্ছে, পা দোলাচ্ছে। তার মুখ হাসি-হাসি। আমি মনে-মনে ভাবলাম বাবার কথাই মনে হয় ঠিক। আমাদের দুই বোনের মধ্যে দিয়ে শয়তান কাজ করতে শুরু করেছে।

আমার উচিত ছিল ইথেনের কর্মকাণ্ড বাবাকে জানানো। আমি তা জানালাম না। এখানেও হয়তো শয়তানের কোনো হাত আছে।

এর মাসছয়েক পরের কথা। বর্ষাকাল। তুমুল বর্ষণ হচ্ছে। আমরা দুই বোন ছাদে বৃষ্টির পানিতে গোসল সেরে ফিরেছি। ইথেন আমাকে বলল, আপা, আমার যদি কোনো মেয়ে হয় তার নাম কী হওয়া উচিত? কেমিস্ট্রি নাম। প্রপেন নামটা তোর পছন্দ হয়? ছেলে হলেই-বা কী নাম হবে? তুই যা তো, বাবার কাছ থেকে জেনে আয়।

আমি বললাম, বিয়ে হোক। ছেলেমেয়ে হোক তখন বাবার কাছ থেকে জানব।

আমার এখনই জানা উচিত।

এখনই জানা উচিত কেন?

ইথেন বলল, এখনই জানা উচিত কারণ আমার পেটে বাচ্চা।

আমি বললাম, ফাজলামি করিস না।

ইথেন বলল, ফাজলামি করছি না। যা বাবাকে গিয়ে বল। এক্ষুনি বল।

আমি বললাম, ইথেন সবকিছুর সীমা আছে।

ইথেন বলল, সবকিছুর সীমা আছে তোকে কে বলল? মহাকাশের সীমা নেই। মানুষের ভালবাসার সীমা নেই। ঘৃণার সীমা নেই। অহংকারের সীমা নেই।

চুপ।

আমি চুপ করব না। আপা আমি নাম চাই। বাবা যদি নাম না দেন তা হলে আমি ইবলিশের কাছে নাম চাইব। সেটা কি ভালো হবে? ইবলিশ নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখে যদি নাম দেয় কিবলিশ সেটা ভালো হবে? লোকে হাসবে না?

৩

বাবার ঘর অন্ধকার। দরজা–জানালা বন্ধ। ঘরের বাতি নেভানো। তবে জায়নামাজের পাশে মোমবাতি জ্বলছে। ঘরে আগরবাতির গন্ধ। আগরবাতি দেখা যাচ্ছে না তবে জ্বলছে নিশ্চয়ই। তিনি মোমবাতির দিকে পেছন ফিরে তসবি টানছিলেন। আমি তাঁর সামনে বসতেই তিনি আমার দিকে ফিরলেন। পেছন থেকে মোমবাতি এনে দুজনের সামনে রাখতে–রাখতে বললেন, যে জটিল কথাটা বলতে এসেছিস বলে ফেল। কী বলবি সেটা মনে হয় আমি জানি। মোমবাতির আলোতে বলতে অসুবিধা হলে মোমবাতি নিভিয়ে দিই।

আমি বললাম, বাতি নেভাতে হবে না। বাবা তসবি টানা বন্ধ করলেন না। আমার দিকে তাকালেনও না। তিনি তাকিয়ে রইলেন মোমবাতির দিকে। আমি কথা শেষ করলাম। তাঁর চেহারায়, চোখ–মুখের ভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন হল না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, মা, দেখি আতরের শিশিটা এনে দাও তো।

নিজের মেয়ে সম্পর্কে এমন ভয়াবহ কথা শোনার পর পৃথিবীর কোনো বাবা বলতে পারেন না—আতরের শিশিটা দেখি।

গায়ে আতর মাখা তিনি সম্প্রতি শুরু করেছেন। এক সুফি মানুষ নাকি মেশকে আম্বর নামের এই শিশি দিয়েছেন। আতরের বৈশিষ্ট্য হল গন্ধ অতি কড়া, তবে কড়া গন্ধে মাথা ধরে না।

আমি বললাম, বাবা সত্যি আতর এনে দেব?

বাবা বললেন, হুঁ। ইবলিশ শয়তান সুগন্ধি সহ্য করতে পারে না। তার পছন্দ সালফার–পোড়া দুর্গন্ধ, সব সময় গায়ে আতর মাখবি।

আমি আতরদানি এনে বাবার সামনে রাখলাম। তিনি অনেক আয়োজন করে আতর দিলেন। প্রথমে তুলায় আতর মাখলেন। সেই তুলা হাতে ঘষলেন, নাকে ঘষলেন, শেষ পর্যায়ে কানের ভাঁজে রেখে দিলেন।

আমি বললাম, তুমি কি ইথেন বিষয়ে কিছু বলবে? নাকি আমি চলে যাব? তুমি আরো চিন্তাভাবনা করবে?

বাবা বললেন, আমার মেয়েটির কোনো দোষ নাইরে মা। সব শয়তান করাচ্ছে। তাকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। প্রথম যে–কাজটা করতে হবে তার কাছে যেন শয়তান যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। তাকে পাকপবিত্র থাকতে হবে। নাপাক শরীর শয়তানের পছন্দ। তার গায়ে সুগন্ধি থাকতে হবে। সে আতর মাখবে বলে মনে হয় না। তাকে সেন্ট মাখতে হবে। তাকে...

আমি বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, বাবা তুমি মনে হয় মূল বিষয়টা ধরতে পারছ না। ইথেন বলছে—তার পেটে বাচ্চা। এটার কী করবে?

বাবা বললেন, আমার কী করা উচিত?

আমি বললাম, আমি তো বুঝতে পারছি না বাবা। বিষয়টা আমার জন্য জটিল।

বাবা বললেন, যে–ছেলের কারণে ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে ইথেনের বিবাহ দিয়ে

দেব ইনশাল্লাহ্। যে-ছেলের কারণে ঘটনা ঘটেছে তার নাম-ঠিকানা এনে দে। আমি তাকে রাজি করাব। প্রয়োজনে তার পায়ে ধরব।

আমি বললাম, যে-ছেলে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে সে তো খারাপ ছেলে। তুমি তার সঙ্গে ইথেনের বিয়ে দেবে?

হ্যাঁ দেব। এতে ইথেনের সম্মান রক্ষা হবে। সম্মান অনেক বড় জিনিসরে মা। তুই ছেলেটার নাম-ঠিকানা এনে দে। আর শোন মা, আজ রাতে আমি কিছু খাব না। উপোস দেব। সারা রাত উপোস নিয়ে আল্লাহ্‌পাকের নাম জিগির করব।

বাবা মোমবাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিলেন। আমি গেলাম ইথেনের কাছে।

ইথেন খুবই স্বাভাবিক। কিটক্যাট চকোলেটের একটা প্যাকেট তার হাতে। সে খাটে বসে পা দোলাচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকতেই সে বলল, আজ রাতে HBO-তে ভালো মুভি আছে আপা, দেখবি? Silence of the Lambs.

আমি বললাম, মুভি দেখব না। তোর সঙ্গে কথা আছে।

মুভি দেখার ফাঁকে-ফাঁকে কথা বলব। যখন অ্যাড হবে তখন কথা বলব। আপা চকোলেট খাবি?

আমি বললাম, বাবা ছেলেটার নাম-ঠিকানা চাচ্ছে।

কোন ছেলেটার?

যে-ছেলেটার সঙ্গে কাণ্ড ঘটিয়েছিস।

কী কাণ্ড ঘটিয়েছি?

আমার সঙ্গে ফাজলামি করিস না। তুই জানিস তুই কী ঘটিয়েছিস।

ইথেন হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতে সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে এমন অবস্থা। আমি বললাম, হাসছিস কেন?

ইথেন বলল, তোকে বোকা বানিয়ে খুব মজা পেয়েছি এই জন্য হাসছি। মন দিয়ে শোন, আমার কিছুই হয় নি। কারো সঙ্গে কিছু ঘটে নি। আমার ভয়ংকর কথা শুনে তুই কী করিস, বাবার কী রিঅ্যাকশান হয় এটা দেখার জন্যই আমি গল্প বানিয়েছি।

গল্প বানিয়েছিস?

হুঁ। ভালো কথা, আমাদের হুজুর তোর কাছে সব শুনে কী করল, মাথা ঘুরে পড়ে গেল?

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। ইথেন বলল, আপা এখন বল, ছবি দেখবি?

হ্যাঁ, দেখতে পারি।

থ্যাংক য়্যু। ভয়ের ছবি একা দেখে মজা নেই। ভয়ের ছবি সব সময় দুজন মিলে দেখতে হয়। হাসির ছবি দেখতে হয় চার-পাঁচ জন মিলে—ভয়ের ছবি শুধু দুই জন।

আমি বললাম, তুই যে মিথ্যামিথ্যি ভয় দেখিয়েছিস এটা বাবাকে বলে আসি?

যা বলে আয়। আনন্দসংবাদ শুনে ট্যাবলেট হুজুর কী করে কে জানে।

আমি বাবার ঘরে ঢুকলাম। মোমবাতি জ্বালিয়ে বাবার পাশে বসলাম। দেখলাম বাবার মুখ ছাইবর্ণ। কপালে ঘাম। তিনি সামান্য কাঁপছেন। তাঁর ঠোঁট নড়ছে। নিশ্চয়ই

কোনো দোয়াদরুদ পড়ছেন। তিনি ইশারায় আমাকে চুপ করে থাকতে বললেন। তিনি বড় কোনো দোয়ার মাঝখানে আছেন। দোয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কারো কথা শুনবেন না।

আমি অপেক্ষা করে আছি। একসময় তাঁর দোয়া শেষ হল। তিনি আমার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, মা, ইবলিশের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ইবলিশ আমাকে বলেছে—তোমার মেয়ে বিষয়টা অস্বীকার করবে। ভাব করবে ঠাট্টা। কিন্তু ঘটনা সত্য।

ইবলিশের সঙ্গে তোমার কখন কথা হয়েছে?

তুমি আমার এখান থেকে যাওয়ার পরেই। ইথেন কি তোমাকে এরকম কিছু বলেছে?

হুঁ।

তার কথা বিশ্বাস করবে না।

আমি বললাম, তার কথা বিশ্বাস করব না, ইবলিশ শয়তানের কথা বিশ্বাস করব?

বাবা বললেন, এই ক্ষেত্রে করবে। শয়তান সব সময় সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশায়। এমনভাবে মিশায় যে সত্য-মিথ্যা আলাদা করা যায় না।

আমি বললাম, মানুষও তো সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশায়।

বাবা বললেন, মানুষের মিশ্রণ ভালো হয় না। মানুষের মিশ্রণ হয় তেল-জলের মিশ্রণ। কিছুক্ষণ পরেই তেল-জল আলাদা হয়ে যায়। আর শয়তানের মিথ্যা হল দুধ-পানির মিশ্রণ, আলাদা করা যায় না।

আমি বললাম, এক ফোঁটা লেবুর রস দিলে দুধ-পানি আলাদা হয়ে যায়।

বাবা বললেন, সেই লেবুর পানি সবার কাছে থাকে না মা। এই বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আর তর্ক করব না। তর্ক করার মতো মানসিক অবস্থা আমার না। তুমি এখন যাও। বোনের সঙ্গে তোমার ছবি দেখার কথা, ছবি দেখ।

ছবি দেখার কথাও কি ইবলিশ শয়তান আপনাকে বলেছে?

হ্যাঁ।

কী ছবি দেখব সেটা বলেছে? ছবির নাম?

ছবির নাম বলে নাই, শুধু বলেছে ভয়ের ছবি।

আমি বাবার সামনে থেকে উঠে গেলাম, বাবা ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিলেন।

আমরা রাত দুটা পর্যন্ত ছবি দেখলাম। ছবি শেষ করে খেতে গেলাম। খাবার টেবিলে খাবার সাজিয়ে বাবাকে ডাকতে গেলাম, তিনি যদি মত বদলে খেতে আসেন। বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। দরজায় অনেকবার ধাক্কা দেবার পরও তিনি দরজা খুললেন না।

ইথেন কিছু খেতে পারছে না। খাবার নাড়াচাড়া করছে।

আমি বললাম, কী হল, খাবি না?

ইথেন বলল, বমি-বমি আসছে আপা। এখন আমার খাবারের গন্ধ নাকে এলেই বমি আসে।

আমি তাকিয়ে আছি। ইথেন খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ল। তবে চলে গেল না। চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, আর কিছু বলবি?

ইথেন বলল, হুঁ। ছবি শুরু হবার আগে যে–ঘটনাকে আমি ঠাট্টা বলেছিলাম তা ঠাট্টা না। ঘটনা সত্যি। আমার পেটে বাচ্চা আছে। ফার্মেসি থেকে প্রেগনেন্সি টেস্টের কিট এনে প্রেগনেন্সি টেস্ট করিয়েছি। টেস্ট পজিটিভ। সুন্দর 'রিং' হয়।

আমি কিছুই বলছি না, তাকিয়ে আছি। আমার চোখে ভয় না বিস্ময় কী ছিল তা জানি না, তবে ইথেনের চোখে এই প্রথম দেখলাম হতাশা।

ইথেন বলল, আমি জানি তোমরা চাইবে ঐ ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে। সেটা সম্ভব না।

আমি বললাম, সম্ভব না কেন?

কেন সম্ভব না সেটা তোমাকে বলব না। সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারব না।

এই বলেই ইথেন চলে গেল। হঠাৎ প্রচণ্ড ভয়ে আমি অস্থির হয়ে গেলাম। আমার কাছে মনে হল ভয়াবহ দুঃসময় আমাদের ওপর চেপে বসতে যাচ্ছে।

(প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত)

মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন। সিগারেট ধরালেন। রান্নাঘরে গেলেন। চুলা ধরিয়ে চায়ের কেটলি বসালেন। রাত বেশি হয় নি। নয়টা দশ। সাড়ে নয়টার দিকে হোটেল থেকে খাবার আসবে। দুই পিস রুটি, ভাজি, কোনোদিন ঘন ডাল। কোনোদিন মুরগির মাংস। তাঁর ঘরে কাজের লোক নেই। হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিন বেলাই হোটেল থেকে খাবার আসে। খাবার ভালো। বেশ ভালো। মিসির আলির ধারণা হোটেলওয়ালা তাঁর খাবার আলাদা রান্না করে। তার ধারণার পেছনের কারণ হল রাতের খাবারটা হোটেলের মালিক হারুন বেপারী হটপটে করে নিজে নিয়ে আসে। খাওয়াদাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামনে বসে থাকে। মিসির আলির সঙ্গে সে অতি আগ্রহের সঙ্গে নানান বিষয়ে গল্প করে। গল্পের কোনো বিশেষ ধারা নেই। একেক দিন একেকটা। যেমন গতকাল গল্পের বিষয়বস্তু ছিল—সাপের মণি শক্ত না নরম।

মিসির আলি বললেন, সাপের তো মণিই হয় না, শক্ত নরমের প্রশ্ন উঠছে না।

হারুন বেপারী বিস্মিত হয়ে বলল, মিসির আলি সাব, আপনি অনেক জ্ঞানী লোক। তার পরেও সব জ্ঞানী লোক সব বিষয় জানে না। আপনেও জানেন না। সাপের মণি অবশ্যই হয়—আমি নিজ চোখে দেখেছি। এখন বলেন আমি মিথ্যা দেখেছি।

মানুষের দেখার মধ্যেই ভুল থাকে। দড়ি দেখেও অনেকে মনে করে সাপ। এজন্যই বলা হয় রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

হারুন বলল, যারা মালটাল খেয়ে হাঁটাহাঁটি করে তারা দড়ি দেখে বলে সাপ। আমি জিন্দেগিতে মাল খাই নাই। কোনোদিন খাবও না ইনশাল্লাহ্। যদি কোনোদিন এক ফোঁটা মাল খাই আপনার কাছে এসে স্বীকার যাব। আপনি আমাকে পায়ের জুতা দিয়ে দুই গালে দুই বাড়ি দিবেন।

এই ধরনের মানুষের সঙ্গে কোনোরকম তর্কে যাওয়াই বিপজ্জনক। মিসির আলি তর্কে পারতপক্ষে যান না। লোকটি তাঁকে পছন্দ করে। মাত্রার বেশিই পছন্দ করে। সেই পছন্দকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

হারুন বেপারী গত সপ্তাহে তাঁকে একটা মোবাইল টেলিফোন গিফট করেছে। বাজার থেকে কিনে এনে যে গিফট করেছে তা না। কোনো এক কাস্টমার নাকি মোবাইল টেলিফোন তার দোকানে ফেলে গেছে। সে মোবাইল টেলিফোনের সিম কার্ড ফেলে নতুন সিম কার্ড ভরে উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছে মিসির আলির জন্য।

মিসির আলি বলেছেন, ঐ কাস্টমার নিশ্চয়ই মোবাইল টেলিফোনের খোঁজে আপনার রেস্টুরেন্টে আসবে।

হারুন বলেছে—সকালে ফালায়ে গেছে—দুপুরে আইসা উপস্থিত। আমি বলেছি আমরা কিছু পাই নাই।

কাজটা কি ঠিক হল?

অবশ্যই ঠিক হইছে। তুই সাবধানে চলাফিরা করবি না? যেখানে সেখানে জিনিসপত্র ফালায়া চইল্যা যাবি?

মিসির আলি কাতর গলায় বললেন, ভাই আমি এই টেলিফোন রাখব না।

কেন রাখবেন না? আপনি তো চুরি করেন নাই। আমি আপনারে দিতেছি।

আমার টেলিফোনের দরকার নাই।

অবশ্যই দরকার আছে। এখন মোবাইলের জমানা। আমি আপনার ছোট ভাই হিসেবে দিতেছি। আপনের রাখতে হবে।

ঝামেলা এড়াবার জন্য মিসির আলি টেলিফোন রেখে দিয়েছেন তবে কখনো ব্যবহার করেন নি। ব্যবহার করার আসলেই কোনো প্রয়োজন পড়ে নি।

আজ ইচ্ছা করলে ব্যবহার করা যায়। সায়রা নামের মেয়েটিকে কয়েকটা প্রশ্ন করা দরকার।

১. সায়রার বাবা হাবিবুর রহমান সাহেব এখনো জীবিত কি না।

২. তাদের বাড়িতে দুই বোন এবং বাবা ছাড়া অন্য কেউ থাকে কি না।

৩. সায়রা যে লেখা লিখছে হুবহু সত্য কি না। তার লেখার ভঙ্গি উপন্যাসের ভঙ্গি। উপন্যাস-লেখক সত্য ঘটনা বর্ণনার সময়ও নানান রঙ ব্যবহার করেন। নানান রঙের মিশ্রণ থেকে 'সাদা-কালো' সত্য বের করা বেশ কঠিন হয়ে যায়।

ইবলিশ শয়তান মেয়েদের বাবার সঙ্গে গল্পগুজব করছে, বাবাকে বলছে মেয়েরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ভয়ের ছবি দেখবে এটা একেবারেই অসম্ভব। একজন কেউ মিথ্যা বলছে। হয় হাবিবুর রহমান সাহেব বলছেন অথবা সায়রা তার লেখা রহস্যময় করার জন্য বানিয়েছে।

মেয়েদের বাবার সঙ্গেও কথা বলা দরকার। তিনি কেন ইবলিশকে জিন বলছেন? সুরা বাকারাতে স্পষ্টই ইবলিশকে ফেরেশতা বলা হয়েছে। কোন আয়াতে বলা হয়েছে সেটা মনে নেই। অন্য কোনো আয়াতে কি ইবলিশকে জিন বলা হয়েছে?

ভদ্রলোককে পাওয়া গেলে আরো একটি প্রশ্ন করা যেত। তিনি কেন ইবলিশকে ইবলিশ শয়তান বলছেন? শয়তান শব্দটা এসেছে—শায়াতিন থেকে। শায়াতিন হল ইবলিশদের নেতা। তিনি কি জেনেশুনেই ইবলিশকে ইবলিশ শয়তান বলছেন নাকি এটা তাঁর কথার কথা। নাকি সায়রার বর্ণনাভঙ্গিতেই ব্যাপারটা এসেছে।

সায়রার বর্ণনাতেও একটা খটকা তৈরি হয়েছে। তিনি মোটামুটি নিশ্চিত সায়রা যে-সময়ের কথা বলছে সে-সময়ে Silence of the Lambs ছবিটি তৈরিই হয় নি। মিসির আলি ছবি দেখেন না। তাঁর আগের বাড়িওয়ালা জোর করে এই ছবিটি তাঁকে দেখিয়েছেন কারণ এই ছবিতে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কথা আছে। বাড়িওয়ালার ধারণা যেহেতু মিসির আলিও এই ধারার মানুষ তাঁর ছবিটা দেখা উচিত।

সায়রা বলে গিয়েছিল কোনো খটকা লাগলে তাকে যেন টেলিফোন করা হয়। মিসির আলির কাছে যে চোরাই মোবাইল টেলিফোন আছে তিনি নীতিগতভাবে সেই টেলিফোন ব্যবহার করতে পারেন না।

Autobiography of an unknown young girl বইটির দ্বিতীয় চ্যাপ্টার পড়াও শুরু করলেন না। প্রথম চ্যাপ্টারের খটকা আগে কাটুক। তিনি অপেক্ষা করছেন সায়রার জন্য।

৪

মধ্যবয়স্ক এক লোক রান্নাঘর ধোয়ামোছা করছে। মিসির আলি ঘর ঝাঁট দেবার শব্দ পাচ্ছেন, পানি ঢালার শব্দ পাচ্ছেন, ফিনাইলের গন্ধ পাচ্ছেন। তাঁর শোবার ঘরেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সব বই সাজিয়ে বুকশেলফে তোলা হয়েছে। বুকশেলফটা নতুন। আগের ভাঙা বেতের বুকশেলফ আপাতত বারান্দায় রাখা হয়েছে। মনে হচ্ছে সেখান থেকে চলে যাবে ডাস্টবিনে।

মিসির আলির খাটের কাছে নতুন একটি সাইডটেবিল দেওয়া হয়েছে। সাইডটেবিলে টেবিলল্যাম্প। টেবিলল্যাম্পের পাশে একটি টেবিলঘড়ি এবং ক্রিস্টালের অ্যাশট্রে।

যে-জায়গায় কয়েকটি কাঠের চেয়ার পেতে বসার ব্যবস্থা ছিল সেখানের পরিবর্তনটা চোখে পড়ার মতো। মেঝেতে কার্পেট বিছানো। দুটা অতি আরামদায়ক গদির চেয়ার। গদির চেয়ার দুটার সামনে একটি দামি রকিং-চেয়ার। এই রকিং-চেয়ারে বর্তমানে দোল খাচ্ছে সায়রা। ঘর ঠিক করার নির্দেশ সে দোল খেতে-খেতেই দিচ্ছে। সায়রার সামনে মিসির আলি বসে আছেন। তিনি বেশ আগ্রহের সঙ্গেই তাঁর ঘরের সংস্কার দেখছেন।

রান্নাঘরের মধ্যবয়স্ক লোকটি ছাড়াও বারো-তেরো বছরের একটি কাজের মেয়েও সায়রা নিয়ে এসেছে। মেয়েটি অতি কর্মঠ। তার নাম নাসরিন। সে মনে হয় কথা বলে না। মিসির আলি এখন পর্যন্ত তার মুখ থেকে একটি শব্দও শোনেন নি।

সায়রা বলল, আপনি কি একদিনের জন্য বাসাটা ছাড়তে পারবেন?

মিসির আলি বললেন, কেন ছাড়তে হবে?

সায়রা বলল, আমি আপনার বাসা ডিসটেম্পার করাব। দরজা-জানালায় নতুন পরদা লাগানো হবে। তার জন্য কিছু কাঠের কাজ করতে হবে।

মিসির আলি বললেন, ও আচ্ছা।

সায়রা বলল, আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম আপনাকে যদি গিফট হিসেবে কোনো অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়াও হয় আপনি সেখানে যাবেন না। আপনি থাকবেন আপনার একরুমের ঘরে। কাজেই যেখানে আছেন সেটা ঠিক করে দেওয়া ভালো না?

মিসির আলি বলল, হুঁ ভালো।

আমি নাসরিনকে রেখে যাচ্ছি। সে ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে রাখবে। আপনার জন্য রান্না করবে। নাসরিন মেয়েটি কথা বলে না তবে খুব কাজের। তার রান্নাও ভালো। সপ্তাহে আপনি একদিন বাজার করবেন। সেই বাজারও নাসরিন করবে। আপনাকে বাজারে যেতে হবে না। আপনার জন্য বারো সিএফটির একটা ফ্রিজ কেনা হয়েছে। একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন কেনা হয়েছে। ইলেকট্রিশিয়ান এসে কানেকশন ঠিক করে দেবে।

মিসির আলি 'হুঁ' বলে মাথা ঝাঁকালেন। এই মাথা ঝাঁকানোর অর্থ সম্ভবত—আচ্ছা ঠিক আছে।

সায়রা বলল, আপনার বাসায় ইলেকট্রিক লাইন এইসব গ্যাজেটসের উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না। ইলেকট্রিশিয়ান মূল লাইনটাও বদলাবে। কারণ আপনার বাসায় দুই টনের একটা এসি বসবে। এসি আপনার জন্য না। আমার জন্য। এসি ছাড়া ঘরে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। আমি যেহেতু মাঝে মধ্যে আপনার কাছে আসব, আপনার সঙ্গে কিছু সময় কাটাব—আমাকে শান্তিমতো বসতে হবে, তাই না?

মিসির আলি বললেন, সারাক্ষণ এসিতে থাকার এই অভ্যাস তোমার নিশ্চয়ই বিয়ের পর হয়েছে?

সায়রা বলল, হ্যাঁ বিয়ের পর হয়েছে। আমার স্বামী এদেশের অতি ধনবান মানুষদের একজন। তাঁর কী পরিমাণ টাকা আছে তা মনে হয় তিনি নিজেও জানেন না।

তিনি কি বর্তমানে অসুস্থ?

সায়রা একটু চমকাল। চমক সামলে নিয়ে সহজভাবে বলল, তিনি অসুস্থ আপনার এমন ধারণা কেন হল?

এমনি বললাম।

না আপনি এমনি বলেন নি। চিন্তাভাবনা ছাড়া আপনি কথা বলেন না।

তোমার কাজের মেয়েটিকে দেখে আমার ধারণা হয়েছে। এই মেয়ে ঘর ঝাঁট দেবার সময় এমনভাবে ঝাঁট দিচ্ছিল যেন কোনো শব্দ না হয়। পা ফেলছিল অতি সাবধানে। তার চিন্তা-চেতনায় এটা পরিষ্কার যে কোনোরকম শব্দ করা যাবে না। তার মানে হল এই মেয়েটি যেখানে কাজ করে সেখানে একজন অসুস্থ মানুষ আছে যে শব্দ সহ্য করতে পারে না।

সেই অসুস্থ মানুষ আমার স্বামী না হয়ে শাশুড়িও হতে পারতেন।

তা পারতেন।

তা হলে কেন বললেন, তোমার স্বামী কি অসুস্থ? কেন বললেন না, তোমার শাশুড়ি কি অসুস্থ?

মিসির আলি হেসে ফেললেন। সায়রা বলল, না, আপনি হাসবেন না। আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আমি আপনার কাছ থেকে জবাবটা চাচ্ছি।

কেন চাচ্ছ?

আপনি যে-পদ্ধতিতে রহস্যের সমাধান করেন সেই পদ্ধতিটা জানতে চাই। শিখতে চাই।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, সায়রা শোন, আমি যা করি তা হল লজিকে ত্রুটি আছে কি না সেটা প্রথমে দেখি। যখন ত্রুটি ধরা পড়ে তখন ত্রুটিটা কেন হল সেটা নিয়ে ভাবি। তারপর লক্ষ করি আচরণগত ত্রুটি।

সেটা কী?

যেমন ধর কোনো একজন মানুষ খুব হাসিখুশি। হঠাৎ-হঠাৎ তার সেই হাসিখুশি ভাবটা নষ্ট হয়। এটাই তার আচরণগত ত্রুটি।

আপনি আর কী দেখেন?

আর দেখি যে কথা বলে সে কতটা সত্য কথা বলে। মানুষ আল আমিন না। একমাত্র আমাদের প্রফেট আল আমিন হতে পেরেছেন, আমরা বাকি সবাই মিথ্যা বলি। এই মিথ্যাও আবার দু রকম।

দুই রকম মিথ্যা মানে?

একটা মিথ্যা হল সরাসরি মিথ্যা। আরেক ধরনের মিথ্যা আছে যে-মিথ্যাকে মিথ্যা বলা যাবে না।

মানে কী?

মানে হচ্ছে, মনে কর তুমি একটা মিথ্যা কথা বলছ, তুমি ভেবে নিচ্ছ এটা সত্যি। এই ধরনের মিথ্যা মানুষ বলে কম, লেখে বেশি।

আপনি আমার লেখা কতটুকু পড়েছেন?

এক চ্যাপ্টার।

পড়তে কেমন লাগছে?

ভালো।

বেশ ভালো না মোটামুটি ভালো?

বেশ ভালো।

বেশ ভালো যদি হয় তা হলে এক চ্যাপ্টার পড়েই পড়া থামিয়ে দিয়েছেন কেন?

আমার কিছু খটকা আছে। খটকা দূর হবার পর দ্বিতীয় চ্যাপ্টার পড়ব বলে ঠিক করেছি।

বলুন কী খটকা?

তুমি লিখেছ HBO-তে সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্বস দেখেছ। যখনকার কথা বলছ তখন এই ছবি তৈরি হয় নি। তুমি তোমার লেখায় মিথ্যা ঢুকিয়েছ। একটা মিথ্যা যখন ঢুকিয়েছ তখন ধরে নিতে হবে আরো মিথ্যা ঢুকিয়েছ। আমার কাছে এই লেখা উপন্যাস হিসেবে ঠিক আছে। কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত লেখা যা পড়ে আমি তোমার সমস্যা ধরতে পারব এবং সমস্যার সমাধান করব সেই লেখা এটা না।

আপনি ভুল ধরলে আমি ঠিক করে দেব।

সব ভুল তো ধরতে পারব না।

ভুল কিন্তু নেই। সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্বস-এর ব্যাপারটা বলি—সেই রাতে আমরা একটা ভূতের ছবি দেখি। ছবিটা যথেষ্ট ভয়ের ছিল, আমরা দুই বোনই খুব ভয়

পেয়েছিলাম। আমি যখন লেখা শুরু করি তখন আর ভূতের ছবির নাম মনে করতে পারছিলাম না। সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্বস ছবিটা তার কয়েকদিন আগেই দেখেছি সেই নামটা দিয়ে দিয়েছি। এতে কি বড় কোনো সমস্যা হয়েছে?

আমার জন্য সমস্যা। ছোটখাটো বিষয়গুলো আমার জন্য খুব জরুরি। ভালো কথা, তুমি কি প্রায়ই ভূতের ছবি দেখ?

হ্যাঁ।

দুই বোনই ভূতের ছবি দেখতে পছন্দ কর?

হ্যাঁ।

তোমার বাবা যখন বললেন ইবলিশ শয়তান তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে সেটা বিশ্বাস করেছ?

হ্যাঁ, কারণ বাবা কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। আর কিছু জানতে চান?

তোমার বাবা কি বেঁচে আছেন?

হ্যাঁ বেঁচে আছেন।

আগের মতোই ধর্মকর্ম নিয়ে আছেন?

হ্যাঁ।

উনি তোমার সঙ্গে থাকেন, তাই না?

হ্যাঁ, উনি আমার সঙ্গে থাকেন। এই বয়সে বাবা নিশ্চয়ই একা একা থাকবেন না। আপনার কী করে ধারণা হল উনি আমার সঙ্গে থাকেন?

আন্দাজে বলছি। তাঁর দুই মেয়ে। একজন মারা গেছে আরেকজন বেঁচে আছে। তিনি জীবিত মেয়ের সঙ্গে বাস করবেন এটাই তো স্বাভাবিক।

আপনি একটু আগে বলেছেন আপনি শুধু প্রথম চ্যাপ্টার পড়েছেন। ইথেন যে মারা গেছে এটা আমি শেষের দিকে লিখেছি। তার মানে কিন্তু এই দাঁড়ায় যে আপনি পুরো লেখা পড়েছেন কিন্তু বলছেন প্রথম চ্যাপ্টার পড়েছেন।

মিসির আলি শান্তগলায় বললেন, আমি প্রথম চ্যাপ্টারই শুধু পড়েছি। প্রথম চ্যাপ্টার পড়লেই কিন্তু বোঝা যায় যে–বোন সম্পর্কে তুমি লিখছ সেই বোন বেঁচে নেই।

আপনার কথা স্বীকার করে নিলাম। আপনি আর কী জানতে চান?

এই মুহূর্তে আমি আর কিছু জানতে চাচ্ছি না। তবে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বাবার সঙ্গে আমি আপনাকে দেখা করতে দেব না। কেন দেব না তাও আপনি জানতে চাইবেন না।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে–ধরাতে বললেন—ঠিক আছে।

রাত এগারোটা। মিসির আলির সারা শরীরে আরামদায়ক আলস্য। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। খোলা জানালায় হাওয়া আসছে। মিসির আলির গায়ের উপর চাদর। চাদর গলা পর্যন্ত টেনে দিলে আরাম হত, তাতে বই পড়ার অসুবিধা। হাত চলে যাবে চাদরের ভেতর। আজ অবিশ্যি তিনি বই পড়বেন না। সায়রা বানুর লেখা আত্মজীবনীর

২য় অধ্যায় পড়বেন। চোখ যেভাবে ভারী হয়ে এসেছে বেশি দূর পড়তে পারবেন বলেও মনে হচ্ছে না।

দরজা ধরে নাসরিন মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগেই তাকে বলেছেন, মাগো, তুমি শুয়ে পড়। বেশিরভাগ সময়ই নাসরিন নামটা তাঁর মনে আসে না। তখন বলেন 'মাগো'। কাজের মেয়েকে মাগো বলা সম্ভবত উচিত না। তিনি কিন্তু আন্তরিকভাবেই বলেন। মিসির আলির ধারণা তাঁর নিজের কোনো মেয়ে থাকলে সে তাঁকে যতটা যত্ন করত এই মেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি যত্ন করে। আজ রাতের খাবারের কথাই ধরা যাক। রাতে রান্না হয়েছে গরুর মাংস এবং চালের আটার রুটি। তিনি যাতে গরম-গরম রুটি খেতে পারেন তার জন্য তাঁকে রান্নাঘরে খেতে বসতে হয়েছে। নাসরিন একটা-একটা করে রুটি সেকে তাঁর পাতে দিয়েছে। এ ধরনের আদরযত্নের কোনো মানে হয় না।

মিসির আলি খাতা খুললেন। আর তখনই নাসরিন বলল, খালুজান আর কিছু লাগব?

মিসির আলি বললেন, মাগো আর কিছু লাগবে না। তুমি শুয়ে পড়।

নাসরিন সঙ্গে সঙ্গে দরজার আড়ালে সরে গেল। এই বুড়ো মানুষটা যতবার তাকে মাগো ডাকে ততবারই নাসরিনের চোখে পানি এসে যায়। সে তার চোখের পানি কাউকে দেখাতে চায় না।

নাসরিন দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে এসে বলল, খালুজান সুপারি খাইবেন? সুপারি দেই? পান-সুপারি আইন্যা রাখছি।

মিসির আলি বললেন, পান-সুপারি তো আমি খাই না মা। আচ্ছা ঠিক আছে এনেছ যখন দাও।

নাসরিন পান-সুপারি এনে দিল। মিসির আলি বললেন, আমাকে খালুজান ডাকা তোমার ঠিক না। খালার স্বামী হল খালু। আমি বিয়ে করি নি।

নাসরিন বলল, আমি আপনেরে খালুজানই ডাকব।

মিসির আলি বললেন, ঠিক আছে ডেক। তুমি কি লিখতে-পড়তে জান?

নাসরিন না-সূচক মাথা নাড়ল।

মিসির আলি বললেন, আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাব। তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি অতি দ্রুত লেখাপড়া শিখতে পারবে। এখন যাও গো মা শুয়ে পড়। কেউ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে আমি পড়তে পারি না।

নাসরিন সরে গেল কিন্তু ঘুমাতে গেল না। সাবধানে মোড়া টেনে দরজার পাশে বসল। এখান থেকে বুড়ো মানুষটাকে দেখা যায়। এই তো উনি পড়া শুরু করেছেন—

মিসির আলি খাতার পাতা উল্টালেন। শুরুতেই লেখা—

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

'দ্বিতীয় অধ্যায়' বাক্যটা শুধু বাংলায়। বাকিটা আগের মতোই ইংরেজিতে।

যে ইবলিশ শয়তান নিয়ে বাবার এত সাবধানতা সেই ইবলিশ শয়তানকে আমি একদিন

দেখলাম। লম্বা কালো ভয়ংকর রোগা। তার গায়ে নীল রঙের শার্ট। দীর্ঘদিন জ্বরে ভুগলে যেমন হয় তেমন চেহারা। চোখ পশুদের চোখের মতো জ্বলজ্বলে।

ঘটনাটা বলি।

বাড়িতে শুধু আমরা দুই বোন। বাবা বাড়িতে নেই। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি বাড়িতে থাকেন না। তিনি তাঁর পীর সাহেবের কাছে যান। পীর সাহেব তাকে নিয়ে সারা রাত জিগির করেন।

আমরা খালি বাড়িতে যেন ভয় না পাই সেজন্য বাবার কলেজের একজন পিয়ন আমাদের সঙ্গে থাকে। পিয়নের নাম ইসমাইল। ইসমাইলের রাতকানা রোগ আছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে সে বাড়িতে আসে। এসেই বসার ঘরের সোফায় চাদর গায়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তার ঘুম ভাঙে পরদিন সকালে। রাতের খাবারের জন্য একবার তার ঘুম ভাঙানো হয়।

আমার লেখা খানিকটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আগেরটা পরে পরেরটা আগে লিখে ফেলছি। ইবলিশ শয়তানকে আমার আগে দেখেছে ইথেন। তার গল্পটা আগে বলা উচিত। আমার অভিজ্ঞতা পরে বলছি। এক বৃহস্পতিবার রাতে ইথেন চিরুনি হাতে আমার সামনে বসতে-বসতে বলল, আপা তোর সাহস কেমন?

আমি বললাম, সাহস ভালো।

ইথেন বলল, তোর ভালো সাহস হওয়া দরকার। সাহস কম হলে তুই বিপদে পড়বি। প্রতি বৃহস্পতিবার বাবা চলে যাবে জিগির করতে। তুই থাকবি একা।

আমি বললাম, একা থাকব কেন? তুই তো আছিস।

ইথেন বলল, আমি তো থাকব না। আমি মারা যাব। পেটের বাচ্চা খালাস করতে গিয়ে মারা যাব। কিংবা তারও আগে ইবলিশ শয়তান আমাকে মেরে ফেলবে।

আমি বললাম, উদ্ভট কথা আমাকে বলবি না।

ইথেন বলল, আমি কোনো উদ্ভট কথা বলছি না। ইবলিশ শয়তান যে এ বাড়িতে বাস করে এটা আমি জানি। আমি দেখেছি।

কোথায় দেখেছিস?

একবার দেখেছি ছাদে, আরেকবার দেখেছি রান্নাঘরে। সে চেহারা বদলায়। ছাদে যাকে দেখেছি আর রান্নাঘরে যাকে দেখেছি তারা দেখতে দু রকম। একজন ছিল কুচকুচে কালো আরেকজন ধবল কুষ্ঠ রোগীর মতো সাদা।

আমি বললাম, ইথেন তুই আমাকে ভয় দেখাবি না।

ইথেন বলল, ভয় দেখাচ্ছি না। যেটা ঘটেছে সেটা বলছি। পুরোপুরি বলছি। দাঁড়ি-সেমিকোলনসহ।

দরকার নেই।

দরকার আছে। আগে থেকে জানলে সাবধান থাকতে পারবি। নয়তো হঠাৎ দেখে ভয়ে ভবদা মেরে যাবি। আগে ছাদে কী দেখেছি বলি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলার কথা। সালোয়ার-কামিজ পরেছি ওড়না খুঁজে পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে হল আমি ওড়না ছাদে শুকাতে দিয়েছি। শুধু ওড়না না তার সঙ্গে দুটা ব্লাউজ ছিল। পেটিকোট ছিল। আমি ছাদে গেলাম। ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি ঘরের দরজা সব সময় খোলা থাকে সেদিন দেখলাম

বন্ধ। দরজায় কোনো তালা নেই। ধাক্কা দিলে খোলার কথা। ধাক্কা দিয়েও খুলতে পারছি না।

আমি ইথেনকে বললাম, সেদিন আমি কোথায় ছিলাম?

ইথেন বলল, তুই তোর ঘরে। তোর জ্বর এসেছিল। তুই চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলি। মনে পড়েছে?

না মনে পড়ছে না।

ইথেন বলল, দাঁড়া মনে করিয়ে দিচ্ছি। তোর গায়ে অনেক জ্বর তারপরেও বাবা তোকে ফেলে রেখে জিগির করতে চলে গেল। তুই মন খারাপ করলি, এখন মনে পড়ছে?

হুঁ, মনে পড়েছে।

ইথেন বলল, গল্পের মাঝখানে কথা বলবি না। ফ্লো নষ্ট হয়ে যায়। পুরো গল্পটা একবার বলে নেই তারপর যা প্রশ্ন করার করবি। নো ইন্টারাপশান। আমি যেন কোথায় ছিলাম?

সিঁড়ি ঘরের দরজা খুলতে পারছিলি না।

হ্যাঁ সিঁড়ি ঘরের দরজা খুলতে পারছি না। ধাক্কাধাক্কি করছি। একসময় মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ফিরে আসার জন্য রওনা হয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে দু স্টেপ নেমেছি তখন আপনাআপনি দরজা খুলে গেল। ঘটনাটা যে অস্বাভাবিক এটা আমার মনে হল না। আমি খুশি মনে ছাদে গেলাম। ছাদের মাঝামাঝি জায়গায় ইবলিশ শয়তানটা দাঁড়িয়ে ছিল। মিশমিশে কালো। দেখতে মোটামুটি মানুষের মতো। শুধু তার গলাটা অস্বাভাবিক লম্বা। তবে শুরুতেই তার গলার দিকে চোখ গেল না। শুরুতেই যা দেখে কলিজা নড়ে গেল তা হচ্ছে জিনিসটা নগ্ন। তারপর চোখ পড়ল তার গলার দিকে। লম্বা গলার কারণে মাথাটা শরীর থেকে অনেকখানি ঝুঁকে আছে।

নগ্ন মানুষের মতো দেখতে জন্তুটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। আমি আতঙ্কে জমে গেলাম। আমার চিৎকার দেওয়া উচিত। ছাদ থেকে ছুটে নেমে যাওয়া উচিত এইসব কিছুই মনে এল না। আমি তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই আছি।

ভূতপ্রেতের ছবিতে দেখা যায় এরা যখন হাঁটে দ্রুত হাঁটে। বাতাসের উপর দিয়ে ছুটে যায় কিন্তু এই নগ্ন জিনিসটা পা টিপেটিপে হাঁটছে। ছোট বাচ্চারা হাঁটা শিখলে যেভাবে হাঁটে তার হাঁটার ভঙ্গি সেরকম। টলমল করে হাঁটা। যেন তাকে না ধরলে সে এক্ষুনি ধপাস করে পড়ে যাবে। সে যখন আমার কাছাকাছি চলে এল তখন আমার মনে হল আমি করছি কী? আমি কেন দাঁড়িয়ে আছি? তখনই দৌড় দিলাম। পাগলের মতো সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম।

ইথেন বড় নিঃশ্বাস ফেলে থামল। আমি বললাম, ঐ নগ্ন জিনিসটা তোর পিছনে–পিছনে আসে নি?

ইথেন বলল, না।

আমি বললাম, তুই বাবাকে এই বিষয়ে কিছু বলেছিলি?

না।

বলিস নি কেন?

আমার ইচ্ছা হয় নি। দ্বিতীয়বার কী দেখলাম বলি?

আজ থাক আরেকদিন শুনব।

ইথেন বলল, বলতে যখন শুরু করেছি আজই বলব। অন্য আরেকদিন হয়তো আমারই বলতে ইচ্ছা করবে না। সেদিনও ছিল বৃহস্পতিবার। বাবা গেছেন জিগির করতে। ঘরে আমরা দুইজন আর বাবার কলেজের পিয়নটা। আমার পেট ব্যথা করছিল বলে রাতে না খেয়ে শুয়ে পড়েছি। অনেক রাতে খিদের জন্য ঘুম ভেঙে গেছে। ফ্রিজে খাবার আছে একটা কিছু খেয়ে নিলেই হয়। আবার মনে হচ্ছে এখন যদি খেতে যাই ঘুম পুরোপুরি ভেঙে যাবে। এপাশ-ওপাশ করে রাত কাটবে। তারচেয়ে চোখ বন্ধ করে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকি। ঘুমিয়ে পড়লে ক্ষুধা টের পাব না। তখন শুনলাম ডাইনিং হলে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। কে যেন চেয়ার নাড়াচ্ছে। বেসিনে পানি ঢালার শব্দও হল। আমি উঠে বসলাম। বাতি জ্বালালাম। ঘর থেকে বের হলাম। ডাইনিং হল অন্ধকার। তবে সেখানে যে কেউ আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। আবার চেয়ার টানার শব্দ হল। আমি ডাইনিং হলের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পরদা টানলাম। স্পষ্ট দেখলাম আমার দিকে পিছন ফিরে একজন কেউ বসে আছে। তার সামনে একটা প্লেট, প্লেট থেকে খাবার নিয়ে সে খাচ্ছে। আমি বললাম, কে? সে খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে ফিরল। মানুষের মুখের মতো একটা মুখ। শুধু তার চোখ দুটা পশুদের চোখের মতো। পশুদের চোখ যেমন অন্ধকারে জ্বলে তার চোখও অন্ধকারে জ্বলছে। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার খেতে শুরু করল। যেন আমার উপস্থিতিতে তার কিছু যায় আসে না। আমি তোকে ডেকে তুললাম এবং বললাম আজ রাতে তোর সঙ্গে ঘুমাব। তোর মনে আছে না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

এটা কি মনে আছে সারা রাত তোকে ঘুমাতে দেই নি। হাসাহাসি করেছি। গল্পগুজব করেছি। তারপর দিলাম টিভি ছেড়ে। কী যেন একটা হিন্দি ছবিও দেখলাম।

মনে আছে।

পরদিন ভোরে ডাইনিং হলে গিয়ে দেখেছি প্লেট পড়ে আছে। প্লেটে আধ খাওয়া খাবার।

আমি বললাম, কী খাবার?

ইথেন বলল, সাধারণ ভাত-মাছ। ডাল।

আমি বললাম, জিন-ভূত কি ভাত-মাছ খায়?

ইথেন বলল, আমি তো জানি না জিন-ভূত কী খায়। আমি জিন-ভূত না।

আমি বললাম, এমন কি হতে পারে না যে ভাত-মাছ-ডাল তুই নিজেই খেয়েছিস। তারপর ঘুমাতে গিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছিস।

ইথেন আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। তার মুখ দেখে মনে হল আমার কথা সে একেবারে যে অগ্রাহ্য করছে তা না। জিনের খাদ্য কী এই নিয়ে সব সময় তার মাথাব্যথা ছিল। জিন কী খায়, ভূত কী খায় এই নিয়ে বাবাকে প্রায়ই প্রশ্ন করে। বাবা অসম্ভব বিরক্ত হতেন।

বাবা জিনের খাদ্য কী?

বাবা বললেন, জানি না মা।

তুমি এমন ধর্মকর্ম করা মানুষ। তুমি না জানলে কীভাবে হবে?

বাবা বললেন, আমি ধর্মকর্ম করলেও ধর্মের অনেক কিছু জানি না।

ইথেন বলল, যে জানে তার কাছ থেকে জেনে দাও। তোমার পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস কর।

বাবা বললেন, এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে ভালো লাগে নারে মা।

তুমি তো কারো সঙ্গে আলোচনা কর নি। তুমি বুঝবে কীভাবে আলোচনা করতে ভালো লাগে কি লাগে না?

মাগো বিরক্ত করিস না।

আমার প্রশ্নের জবাব বের না করে দিলে আমি বিরক্ত করেই যাব।

জিনের খাদ্য কী জেনে তুই কী করবি?

ওদের সব খাদ্য যোগাড় করে রাতের বেলা টেবিলে সাজিয়ে রাখব যাতে ওরা এসে খেতে পারে। জিনের খাদ্য নিয়ে আমি একটা বই লিখব বলেও ঠিক করেছি। বইটার নাম হবে—জিনের সুষম খাদ্য। আরেকটা বই লিখব—জিনের খাদ্য ও পুষ্টি। এটা হবে রান্নার বই। সেখানে সব খাবারের রেসিপি দেওয়া থাকবে।

বাবা হতাশ গলায় বললেন, মারে তোর তো মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ইথেন গম্ভীর গলায় বলল, মাত্র শুরু আরো হবে।

আরো যে হবে আমরা তার লক্ষণ দেখলাম। সে তার কোনো এক টিচারের কাছ থেকে খবর আনল জিনের পছন্দের খাবার মিষ্টি। মিষ্টির দোকানে তারা গভীর রাতে যায়। সব মিষ্টি খেয়ে দাম দিয়ে চলে যায়। যে কারণে গ্রামের অন্য সব দোকান সন্ধ্যার সময় বন্ধ হয়ে গেলেও মিষ্টির দোকানগুলো গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে।

ইথেন প্রতি রাতে ঘুমাতে যাবার আগে তেরোটা সন্দেশ একটা থালায় রাখে। তারের জালির ঢাকনা দিয়ে থালাটাকে ঢেকে রাখে যাতে বিড়াল এসে খেতে না পারে। সারা রাত সন্দেশের থালা থাকে ডাইনিং টেবিলে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই ইথেন সন্দেশ গোনে। তেরোটা সন্দেশই আছে না জিন এসে খেয়ে কমিয়েছে। তেরোটা সন্দেশের রহস্য হল ইথেনের লাকি নাম্বার তেরো। তার জন্ম তারিখ অক্টোবরের তেরো।

সন্দেশ রাখার চতুর্থ দিন ভোরবেলায় হইচই শুরু হল। দেখা গেল সন্দেশ আছে বারোটা। একটা কম। জিন এসে একটা সন্দেশ খেয়ে গেছে। ইথেন আনন্দ এবং উত্তেজনায় লাফাচ্ছে। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, জিন সন্দেশ খেয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

ইথেন বলল, কেন মনে হচ্ছে না।

আমি বললাম, জিনের যেমন মিষ্টিপ্রীতির কথা শুনেছি তারা একটা সন্দেশ খাবে না। কয়েকটা খাবে। সন্দেশ খাবার পর তারা পানি খাবে না। এই জিন সন্দেশ খাবার পর পানি খেয়েছে। সন্দেশের থালার কাছে আধ খাওয়া পানির গ্লাস।

ইথেন মুখ কালো করে বাবার কাছে গেল। থমথমে গলায় বলল, বাবা রাতে তুমি সন্দেশ খেয়েছ?

বাবা বিব্রত গলায় বললেন, একটা সন্দেশ খেয়েছি মা। হঠাৎ ক্ষুধা লাগল।

ইথেন কাঁদতে শুরু করল। বাবা বললেন, কাঁদার কী হয়েছে? বারোটা সন্দেশ তো তোর জিনের জন্য রাখা ছিল।

ইথেন সারা দিন কিছু খেল না। সেই রাতে দেখা গেল—বারোটা সন্দেশের একটাও নেই। কেউ এসে খেয়ে গিয়েছে।

তার পরের সপ্তাহেই আমি জিন বা শয়তান বা ইবলিশকে দেখলাম। তার সঙ্গে কথা বললাম। এই বিষয়টি আমি বিস্তারিত বর্ণনা করব।

শ্রাবণ মাস। বৃহস্পতিবার রাত। বৃষ্টি শুরু হয়েছে সন্ধ্যা থেকে। শ্রাবণ মাসের টিপটিপ বৃষ্টি না। আষাঢ় মাসের ঝমঝমা বৃষ্টি। ঝমঝমা বৃষ্টি হলেই ইথেনের বৃষ্টিতে ভেজার শখ হয়। তার পাল্লায় পড়ে আমিও বৃষ্টিতে গোসল করেছি। পানি বরফের মতো ঠাণ্ডা। আমার ঠাণ্ডার ধাত। সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই টনসিল ফোলে। জ্বর এসে যায়। আমরা গোসল করছি ছাদে। আমার ইচ্ছা খানিকক্ষণ ভিজেই উঠে পড়ব। ইথেন আমাকে ছাড়ল না। যতবার উঠতে যাই সে আমাকে জাপটে ধরে রাখে। প্রায় এক ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজলাম। আমার টনসিল ফুলে গেল। জ্বর এসে গেল। রাতে জ্বর বাড়ল। জ্বরের সঙ্গে তীব্র মাথাব্যথা। ইথেনের কাছে মাথাব্যথার ট্যাবলেট আছে। আমি দরজা খুললাম। ইথেনের কাছ থেকে ট্যাবলেট নেব এবং রাতে তার সঙ্গে ঘুমাব। অসুখবিসুখ হলে আমি একা ঘুমাতে পারি না।

বারান্দায় এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। শার্ট-প্যান্ট পরা এক লোক বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে আছে। বসে আছে ঠিক না খবরের কাগজ পড়ছে। লোকটার চোখে ভারী চশমা। চুল সুন্দর করে আঁচড়ানো। শান্ত ভদ্র চেহারা। চেহারা দেখে মন হল তাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি।

রাত বাজে দুটা। এত রাতে কেউ গম্ভীর ভঙ্গিতে খবরের কাগজ পড়ে না। আমি বললাম, আপনি কে?

লোকটা খবরের কাগজ ভাঁজ করে পাশের চেয়ারে রাখতে-রাখতে বলল, আপনি ভালো আছেন? লোকটার গলার স্বর মিষ্টি। কথা বলার ভঙ্গিতে কোনো আড়ষ্টতা নেই। যেন আমি তার পূর্ব-পরিচিত। তাকে দেখাচ্ছিল পূর্ব-পরিচিতের মতোই। আমি আবারো বললাম, আপনি কে?

লোকটি বলল, বসুন তারপর বলছি।

আমি বললাম, আমি কি আপনাকে চিনি? আগে কখনো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

লোকটি বলল, অবশ্যই দেখা হয়েছে। আমি ইবলিশ শয়তান। বলেই লোকটা হাসল। তখনি বুঝলাম আমি স্বপ্ন দেখছি। ইবলিশ শয়তান সেজেগুজে রাত দুটার সময় আমাদের বাড়ির বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়বে না। শুরুতে যে ভয়টা পেয়েছিলাম সেটা কেটে গেল। আমি বললাম, ইবলিশ শয়তান আপনি ভালো আছেন?

সে বলল, মিথু দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো।

আমি আবার চমকালাম। আমার নাম মিথেন কিন্তু একজন মানুষ আমাকে মিথু ডাকত। যখন ক্লাস নাইনে পড়তাম তখন আমার একজন প্রাইভেট মাস্টার ছিলেন। আমাকে অঙ্ক করাতেন। তাঁর নাম রকিব। আমি যাকে ইবলিশ শয়তান ভাবছি সে আসলে রকিব স্যার।

মিথু আমাকে চিনতে পারছ? আমরা শয়তানরা নানান রূপ ধরতে পারি। আমি তোমার অতি প্রিয় একজনের রূপ ধরে এসেছি।

আমি বললাম, রকিব স্যার কখনোই আমার অতি প্রিয় একজন ছিলেন না।

অবশ্যই ছিলেন। তোমার মনে নেই একদিন পড়াতে-পড়াতে তিনি হঠাৎ টেবিলের নিচে তোমার পায়ের উপর পা তুলে দিলেন। তুমি কিন্তু আঁতকে উঠে পা সরিয়ে নাও নি। চুপ করেই সারাক্ষণ বসে ছিলে। রকিব স্যার সারাক্ষণ পা দিয়ে পা ঘষেছেন। হা হা হা।

আমি বললাম, আমি পা সরিয়ে নেই নি এটা ঠিক। সরিয়ে নেই নি কারণ আমি তাঁকে লজ্জা দিতে চাই নি। আপনি এত কিছু যখন জানেন তখন আপনার জানা থাকা উচিত যে সেই দিনই ছিল রকিব স্যারের কাছে আমার শেষ পড়া। আমি এরপর তাঁর কাছে আর পড়ি নি।

রেগে যাচ্ছ কেন মিথু?

আমাকে মিথু বলে ডাকবেন না।

আচ্ছা যাও ডাকব না। বসো গল্প করি।

আপনার সঙ্গে আমার গল্প করার কোনো ইচ্ছা নেই।

ইচ্ছা না থাকলেও তোমাকে গল্প শুনতে হবে। এখন আর তোমার আলাদা ইচ্ছা বলে কিছু নেই। আমার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা। বসতে বলছি বস।

আমি বসলাম। লোকটা বলল, কী নিয়ে গল্প করা যায় বলো তো? আমি জবাব দিলাম না। লোকটা আমার দিকে ঝুঁকে এসে বলল, জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলার আগে কিছুক্ষণ সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলি যেমন জিনের খাদ্য। তোমার বোনের ধারণা জিনরা মিষ্টি খায়। ধারণা ঠিক না। তারা মানুষ যে-অর্থে খাদ্য গ্রহণ করে সেই অর্থে খাদ্য গ্রহণ করে না। তোমরা মানুষরা মাছ-মাংস, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ জাতীয় পদার্থ কত কিছু খাও। গাছ খায় শুধু পানি এবং সূর্যের আলো। কিছু কিছু ক্যাকটাস গোত্রের গাছ পানিও খায় না। সূর্যের আলোই তাদের জন্য যথেষ্ট। তোমরা মানুষরা যেমন একটা স্পেসিস, গাছও তেমন একটা স্পেসিস। একই পৃথিবীতে বাস করছ অথচ কী বিরাট পার্থক্য। জিন সম্পূর্ণ আলাদা একটা স্পেসিস। এই ব্যাপারটা তোমার বোনকে বুঝতে হবে। মানুষের মানদণ্ডে তাদের বিচার করা যাবে না।

আমি বললাম, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে নাকি আরো কিছু বলবেন?

জ্ঞান বিতরণ অনুষ্ঠান শেষ এখন সন্দেহ বিতরণ অনুষ্ঠান।

তার মানে?

ইবলিশের কাজ কী? ইবলিশের কাজ মানুষের মনে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া। মানুষের মন সন্দেহের বীজের জন্য অতি আদর্শ জমি। অতি উর্বর। কোনোরকমে একটি

সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিতে পারলে আর দেখতে হবে না। কিছু দিনের মধ্যেই সেই বীজ থেকে চারা হবে। দেখতে-দেখতে সেই চারা পত্রপল্লবে শোভিত হয়ে বিরাট মহীরুহ।

আপনি সন্দেহের কোন বীজ ঢুকাতে চান?

তোমার মা বিষয়ক সন্দেহ বীজ।

মানে?

মিথু মন দিয়ে শোন—

তোমার মা কি ধর্মকর্ম করতেন? নামাজ-রোজা? বলো, 'না'। কারণ আমি জানি এর উত্তর, 'না'।

না।

মৃত্যুর পর তাঁর যে কবর হয়েছে তোমরা দুই বোন সেই কবর জিয়ারত করতে গিয়েছ? বলো—'না'। কারণ এর উত্তর যে না সেটা আমি জানি।

কবর জিয়ারত করতে আমরা যাই নি। কারণ তাঁর কবর হয়েছে বগুড়ার এক গ্রামে। সারিয়াকান্দি। অনেক দূরের ব্যাপার।

তার যে কবর হয়েছে এই বিষয়ে কি তোমরা নিশ্চিত? তোমরা কী তোমার মাকে কবর দিতে দেখেছ?

আমরা দেখি নি। বাবা ডেডবডি নিয়ে একা গেছেন৷ তখন আমরা দুই বোনই অসুস্থ ছিলাম। ইথেনের ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়েছিল।

তোমাদের মার দিকের কোনো আত্মীয়স্বজন কখনো তোমাদের বাড়িতে এসেছিলেন? বলো—'না'। কারণ এই প্রশ্নের উত্তরও না। আমি জানি।

না।

এখন দুইয়ে দুইয়ে চার মিলালে কেমন হয়? আমি যদি বলি তোমাদের আদর্শ পিতা একটি হিন্দু মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সেই হিন্দু মেয়ে তার ধর্ম ত্যাগ করে নি। কাজেই তাদের বিবাহ হয় নি। অর্থাৎ তোমরা দুই বোন জারজ সন্তান। হা হা হা।

হাসবেন না।

হাসব না কেন? মজার ব্যাপার না? অতি ধার্মিক বাবা দুই জারজ কন্যা নিয়ে ঘুরঘুর করছে। এর মধ্যে একজন আবার সন্তানসম্ভবা। সেই সন্তানও একই জিনিস। জারজে জারজে ধুল পরিমাণ। হা হা হা।

লোকটা হাসছে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা বদলে যাচ্ছে। গায়ের রঙ কালো হয়ে যাচ্ছে। দাঁত বের হয়ে আসছে। চুল হয়ে যাচ্ছে লালচে এবং লোকটার গা থেকে অদ্ভুত এক ধরনের গন্ধ আসতে শুরু করেছে। গন্ধটা পরিচিত তবে আমি ধরতে পারছি না। লোকটা বলল, তুমি কি কোনো গন্ধ পাচ্ছ? নিশ্চয়ই পাচ্ছ। তুমি ভাবছ গন্ধটা আমার শরীর থেকে আসছে। তা না, গন্ধ আসছে তুলসী গাছ থেকে। তুলসীর গন্ধ। তোমার মা টবে তুলসী গাছ লাগিয়েছিলেন। হিন্দু মহিলার বাড়িতে তুলসী গাছ থাকবে না তা কি হয়? আচ্ছা তোমরা তুলসী গাছে ঠিকমতো 'জল' দাও। পানি না বলে 'জল' বলছি লক্ষ করছ? হা হা হা। মিথু তোমার সঙ্গে কথা বলে বড়ই আরাম পাচ্ছি। বোল হরি হরি বোল। মিথু শোন আমি এখন বিদায় হচ্ছি। আবার আসব। আসতেই থাকব। তোমার

শিক্ষকের তোমাকে যেমন পছন্দ হয়েছিল আমারও হয়েছে। পরেরবার আমি তোমার শিক্ষকের মতো পা দিয়ে ঘষাঘষি করব। ঠিক আছে লক্ষ্মী সোনা চাঁদের কণা।

আমি বললাম, আমি যা দেখছি সবই স্বপ্ন। আপনি দূর হন।

তুমি না বললেও দূর হয়ে যাব। দেহধারণ করে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। তবে তুমি যা দেখছ সবই স্বপ্ন এটা কিন্তু ঠিক না। স্বপ্নে মানুষ গন্ধ পায় না। তুমি গন্ধ পেয়েছ। পবিত্র তুলসীর গন্ধ। সবই যদি স্বপ্ন হয় তা হলে গন্ধটা আসে কোথেকে! যাবার আগে একটা প্রশ্ন তোমার বোনের পেট খালাসের কী করেছ? দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। ব্যবস্থা এখনই নেওয়া দরকার। তুমি বললে আমি নিজেও চেষ্টা নিতে পারি। ছাদ থেকে নিচে ফেলে দিতে পারি। তবে মানুষ মেরে আমি আনন্দ পাই না। মানুষ খেলিয়ে আরাম পাই। মরে যাওয়া মানে শেষ। আর তাকে দিয়ে খেলানো যাবে না। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনই সে খেলবে। খেলা দেখব আনন্দ পাব। আনন্দ পাব হাসব। হা হা হা।

হাসির শব্দে আমার ঘুম ভাঙল। আমি বুঝলাম এতক্ষণ যা দেখেছি সবই স্বপ্ন। তবে পুরোপুরি স্বপ্নও বোধ হয় না। ঘরে তুলসীর গন্ধ। আমার মা বড় দুটা টবে তুলসী গাছ লাগিয়েছিলেন। গাছ দুটা খুব ভালো হয়েছে। ঝুপড়ির মতো হয়েছে।

এই ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহ পরের ঘটনা, সেদিনও বৃহস্পতিবার। বাবা যথারীতি জিগিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মাগরিবের নামাজ পড়ে চলে যাবেন ফিরবেন পরদিন ফজরের নামাজের পর। সন্ধ্যা হয়–হয় করছে। ইথেন দুটা মগ হাতে আমার কাছে এসে বলল, আপা চল তো। আমি বললাম, কোথায়?

ইথেন বলল, ছাদে। সন্ধ্যাবেলা ছাদে বসে চা খেতে আমার ভালো লাগে। একা যেতে ভয়–ভয় লাগে তুইও চল।

আমি বললাম, না।

ইথেন বলল, তোকে যেতেই হবে।

ইথেন কিছু বলবে আর তা করবে না তা কখনো হয় না। তার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আমাকে ছাদে যেতে হল। আমাদের বাড়ির ছাদটা সুন্দর। মার বাগানের শখ ছিল। ছাদে বাগান করেছিলেন। বিশাল সাইজের টবে দেশী ফুল গাছ। কামিনী, গন্ধরাজ, বেলি। কয়েক রকমের বাগান বিলাসও আছে। এর মধ্যে একটার পাতা হালকা নীল রঙের। এই গাছটা নাকি তিনি আসামের শীলচর থেকে আনিয়েছিলেন। ছাদের বাগান খুব সুন্দর লাগছিল। বাগান বিলাসের তিন চার রকম রঙ। বেলি ফুলের সিজন না বলে বেলি ফুল নেই। বেলি ফুল যখন ফুটত তখন মা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছাদের বাগানে বসে থাকত।

আমরা দুই বোন বসে চা খাচ্ছি। ইথেনকে হাসিখুশি লাগছে। সে অবিশ্যি এমনিতেই হাসিখুশি তবে সেদিন তাকে অস্বাভাবিক উৎফুল্ল লাগছিল। সে বলল, আপা তোকে মজার একটা খবর দিতে পারি। দেব? আমি বললাম, না। ইথেনের মজার খবর মানেই হল উদ্ভট কিছু যা শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। ইথেন বলল, তোকে আমি

ছাদে নিয়ে এসেছি মজার খবরটা দেওয়ার জন্য। খবরটা হল আমাদের মা ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। মার নাম রমা গঙ্গোপাধ্যায়।

আমি বললাম, তোকে কে বলেছে?

ইথেন বলল, আমাকে কেউ কিছু বলে নি। আমি নিজেই মহিলা শার্লক হোমসের মতো বের করেছি। তালা ভেঙে পুরোনো ট্রাঙ্ক ঘাঁটাঘাঁটি করে অনেক কিছু পেয়েছি। বাবার হাতের লেখা দশটা চিঠি। সব চিঠির সম্বোধন—রমা। ইনিয়েবিনিয়ে লেখা ইষ্টিমিষ্টি চিঠি। বাবার লেখা প্রেমপত্র পড়ার মজাই অন্য রকম। আপা তুই পড়বি? আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

আমি বললাম, না।

ইথেন বলল, পড়লে তোর ভালো লাগবে। একটু কড়া মিষ্টি। তোর বানানো চায়ের মতো বেশি মিষ্টি।

আমি বললাম, ট্রাঙ্ক ঘেঁটে এইসব গোপন চিঠিপত্র বের করা কি ঠিক?

ইথেন বলল, ঠিক না। কিন্তু আমরা তো সব সময় ঠিক কাজটা করি না। মাঝে মধ্যে বেঠিক কাজ করি। তবে আপা তুই আমার দিকে এত কঠিন চোখে তাকাস না। এতক্ষণ তোর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছি। আমি ট্রাঙ্কের তালা ভেঙে কোনো তথ্য বের করি নি। আমাকে যা বলার বলেছে ইবলিশ শয়তান এবং আমার ধারণা ইবলিশের কথা ঠিক। আমরা এই বাড়িতে মোটামুটি সত্যবাদী একজন ইবলিশ পেয়েছি।

ইবলিশ যে সত্যি কথা বলেছে তার প্রমাণ কী?

প্রমাণ বাবা স্বয়ং। আমি তাকে শক্ত করে ধরেছিলাম। তিনি খকখক করে কাশতে-কাশতে সব বলে দিয়েছেন। বাবা আসলে আমাকে ভয় পায়।

তুই ভয় পাওয়ার মতোই মেয়ে।

অবশ্যই। ইবলিশ নিজেও আমাকে ভয় পায়। আমাকে ডাকে ছোট আপা। হি হি হি।

তোকে ছোট আপা ডাকে?

হুঁ। আমিও তাকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখি। গল্পগুজব করি। একটা মজার ব্যাপার জান আপা? শয়তানের সব গল্প কিন্তু শিক্ষামূলক। ঈশপের গল্পের মতো। গল্পের শেষে মোরাল থাকে। শয়তানের একটা গল্প তোমাকে বলব আপা? যদি মজা না পাও তা হলে আমি আমার নিজের নাম বদলে ফরমালডিহাইড রাখব। আপা ফরমালডিহাইডের ফর্মুলা HCHO না?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ইথেন বলল, আপা চলে যাচ্ছিস? সন্ধ্যাটা মিলাক। সন্ধ্যা মিলাবার সময় একটা মজা হবে। মজাটা দেখে যা।

কী মজা হবে?

মা ছাদের যে জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে নিচে লাফ দিয়ে পড়েছিল আমি ঠিক সেই জায়গা থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ব। তোদের সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যাব। আমার পেটের বাচ্চা নিয়ে তোদের চিন্তায় অস্থির হতে হবে না। আমি ইবলিশ ভাইজানের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করেছি। ভাইজান বলেছেন—ছোট আপা একটা ভালো বুদ্ধি। হি হি হি।

ইথেনের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কথা বলার অর্থ হয় না। আজান পড়ে গেছে আমি মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য নিচে নামলাম। সবেমাত্র জায়নামাজে দাঁড়িয়েছি—ধুপ করে শব্দ হল। ইথেন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

যেহেতু অস্বাভাবিক মৃত্যু ইথেনের সুরতহাল হয়েছিল। তার পেটে কোনো সন্তান ছিল না। পেটে সন্তানের পুরো বিষয়টাই ছিল তার বানানো।

৫

আত্মজীবনীর তৃতীয় অধ্যায়

মৃত্যু ভয়াবহ একটি ব্যাপার। মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার কি আছে? অবশ্যই আছে। মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার আমি ঘটতে দেখলাম। ইথেন মারা গেল সন্ধ্যাবেলায়। রাত দশটায় পুলিশ এসে বাবাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। রমনা থানার ওসি জানালেন, থানায় এক মহিলা টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে তিনি স্পষ্ট দেখেছেন ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি পরা দাড়িওয়ালা এক লোক ইথেনকে ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলেছে। আমাদের বাড়ির পাশের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে তিনি থাকেন। তিনি তার পরিচয় জানাতে চান না। এবং এই বিষয়ে আর কিছু বলতেও চান না। তিনি চান পুলিশ তদন্ত করে বিষয়টা বের করুক। মহিলার টেলিফোন কলের পরপরই পুলিশ একজন পুরুষ মানুষের কল পায়। তিনিও একই কথা বলেছেন।

আমি ওসি সাহেবকে বললাম, ঘটনাটা যখন ঘটে তখন বাবা নামাজ পড়ছিলেন। আমিও একই ঘরে নামাজ পড়েছি। শব্দ শোনার পর দুজন একসঙ্গে ছুটে গেছি।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার কথা বুঝতে পারছি কিন্তু আমাদের তদন্ত করতেই হবে।

আমি বললাম, যে-মানুষটার মেয়ে মারা গেছে তাকে আপনি ধরে নিয়ে যাবেন। আজই নিতে হবে? দুই-একদিন পরে নিয়ে যান।

আজই নিতে হবে। তদন্ত দ্রুত হতে হয়।

ওসি সাহেবকে কিছু টাকাপয়সা দিলে কাজ হত। আমার মাথায় আসে নি। তারা বাবাকে নিয়ে গেল। শুধু যে বাবাকে নিয়ে গেল তা-না, ইথেনকে নিয়ে গেল। তার মৃত্যু অস্বাভাবিক। কাজেই পোস্টমর্টেম করা হবে।

আমি একা বাসায় রইলাম। দুনিয়ার লোকজন ঘরে ঢুকছে। ঘর থেকে বের হচ্ছে। সবাই অপরিচিত। এর মধ্যে ক্যামেরা গলায় সাংবাদিকও আছে। সাংবাদিক ফ্ল্যাশ দিয়ে আমার একটা ছবি তুলল। তখন আমার মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল। আমি চিৎকার করে বললাম, কেন আপনি আমার ছবি তুললেন? কোন সাহসে আপনি আমার ছবি তুললেন? কেউ আমার বাড়িতে থাকতে পারবেন না। কেউ না। যে বাড়িতে ঢুকবে তাকেই আমি খুন করে ফেলব।

সত্যি-সত্যি আমি রান্নাঘর থেকে বঁটি নিয়ে এলাম। আমার উন্মাদ চেহারা দেখে ভয়েই লোকজন বের হয়ে গেল তবে পুরোপুরি গেল না। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে জটলা

পাকাতে লাগল। কিছু রিকশা দাঁড়িয়ে গেল। রিকশার যাত্রীরা সিটের উপর দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে। দর্শকদের কেউ কেউ আবার ঢিল ছুড়ছে। বাবাকে নিয়ে যাবার সময় ওসি সাহেব একটা ভদ্রতা করলেন। বাড়ির সামনে দুজন পুলিশ রেখে গেলেন। তাদের দায়িত্ব কাউকে ঘরে ঢুকতে না দেওয়া।

ওসি সাহেব যখন বাবাকে নিয়ে যাচ্ছেন তখনো আমি বাবার মধ্যে তেমন কোনো অস্থিরতা দেখলাম না। তিনি সারাক্ষণই মাথা নিচু করে রাখলেন। আমাকে একসময় চাপা গলায় বললেন, ইবলিশের কাজ কেমন পরিষ্কার দেখলি? সে আরো অনেক কিছু করবে। সাবধান থাকবি।

আমি বললাম, কীভাবে সাবধান থাকব?

বাবা বললেন, দমে-দমে আল্লাহ্‌র নাম নিবি। কিছুক্ষণ পরে-পরে আয়তুল কুরসি পড়ে হাততালি দিবি। হাততালির শব্দ যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত ইবলিশ আসবে না। ঘরে সব বাতি জ্বালিয়ে রাখবি। ঘর যেন অন্ধকার না থাকে। ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে জ্বলুক। হারিকেনও জ্বালিয়ে রাখ।

আমি চাচ্ছিলাম ইবলিশ শয়তান আসুক। তার সঙ্গে কথা বলি। দেখি সে আসলে কী চায়। আজ তার আসতে সমস্যা নেই। বাড়ি খালি। খালি বাড়িতে আমি একা হাঁটছি।

ইবলিশ শয়তান এল না। রাত বারোটার দিকে বাবা ফিরলেন। পুলিশের জিপ এসে বাবাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। রমনা থানার সেকেন্ড অফিসার ছিল বাবার ছাত্র। তার কারণেই বাবা বিনা ঝামেলায় ছাড়া পেয়ে গেলেন। ইথেনের ডেডবডি পাওয়া গেল না। তাকে রাখা হয়েছে মেডিকেল কালেজ হাসপাতালের মর্গে। তার পোস্টমর্টেম হবে পরদিন সকাল দশটায়। পোস্টমর্টেম হবার আগে আমাদের কিছু করার নেই।

বাবা প্রতি বৃহস্পতিবার যে পীর সাহেবের কাছে যেতেন ওনার কাছে খবর পৌঁছেছিল। উনি রাত একটার দিকে চলে এলেন। দোয়া-দরুদ পড়ে বাড়ি বন্ধন করলেন। বসার ঘরের মেঝেতে বিছানা করা হল। বিছানায় জায়নামাজ বিছানো হল। আগরবাতি জ্বালানো হল। বাবা তাঁর পীর সাহেবকে নিয়ে কোরান শরিফ পাঠ করা শুরু করলেন। বাবার এই পীর সাহেবকে আমার পছন্দ হল। তিনি সান্ত্বনাসূচক কোনো কথাবার্তায় গেলেন না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি একটা কাজ হাতে নিয়ে এসেছেন। কাজটা সুন্দর মতো করবেন। এর বেশি কিছু না। আমাকে তিনি শুধু একটি কথাই বললেন, মাগো! সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

রাত কত হয়েছে আমি জানি না। আমি বসে আছি ইথেনের ঘরে। টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। টেবিলল্যাম্পের আলো ছাড়া ঘরে আর কোনো আলো নেই। ইথেনের বিছানা এলোমেলো। দুটা বালিশের একটা মেঝেতে। খাটের নিচে গাদা করে রাখা কাপড়। ধোপার বাড়িতে যাবার জন্য আলাদা করে রাখা। দেওয়ালে ইথেনের ছোটবেলার আঁকা ছবি। চারটা ছবি। ফ্রেম করে বাঁধানো। গ্রাম ঘর বাড়ি। নদীতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রাখাল বালক বাঁশি বাজাচ্ছে। আমাদের দু বোনের একটা ফটোগ্রাফও আছে। কক্সবাজারে সমুদ্রে নেমেছি তার ছবি। ইথেন সমুদ্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শাড়ি সামান্য উঁচু

করছে। তার সুন্দর ফরসা পা দেখা যাচ্ছিল। এখন অবিশ্যি দেখা যাচ্ছে না। বাবা কালো স্কচ টেপ দিয়ে পায়ের এই অংশ ঢেকে দিয়েছেন।

আমার অদ্ভুত লাগছে। আমি একজন মৃত মানুষের ঘরে বসে আছি। এখনো তার শরীরের গন্ধ ঘরে ভাসছে অথচ সে নেই। পাশের ঘর থেকে কোরান পাঠের আওয়াজ আসছে। মাঝে–মাঝে আসছে আগরবাতির গন্ধ। এই গন্ধটা মনে করিয়ে দিচ্ছে এই বাড়িতে মৃত্যু এসেছে।

কোথায় রেখেছে ইথেনকে? এই চিন্তাটা অস্পষ্টভাবে আমার মাথায় আসছে। চিন্তাটা দূর করতে চাচ্ছি কিন্তু পারছি না। ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ কেমন আমি জানি না। আরো অনেক বেওয়ারিশ লাশের সঙ্গে সে শুয়ে আছে? নাকি তাকে আলাদা রাখা হয়েছে? সে কি শুয়ে আছে ঠাণ্ডা মেঝেতে? নাকি টেবিলে রাখা হয়েছে? সকালবেলা ডাক্তাররা আসবেন। কাটাকুটি করবেন।

দরজায় টোকা পড়ছে। কেউ যেন খুব সাবধানে দরজা টানছে। আমি বললাম, কে?

দরজার ওপাশ থেকে চাপা গলায় কেউ একজন বলল, আপা আসব?

আমি এই গলা চিনি। ইথেনের গলা। সামান্য ভাঙা ভাঙা। ঠাণ্ডা লাগলে ইথেনের গলা সামান্য ভেঙে যায়। আমি আবারো বললাম, কে?

দরজার ওপাশ থেকে ইথেন বলল, আপা তুমি যদি ভয় না পাও তা হলে আমি ঘরে আসব। আসি?

আমি জবাব দিলাম না। আমার মাথা কাজ করছে না। ইথেনের ঘরে বসে তার কথা ভাবছিলাম বলেই কি আমি প্রবল ঘোরের জগতে চলে গেছি? হেলুসিনেশন হতে শুরু করেছে? আমার এখন কী করা উচিত? বাবাকে ডাকা উচিত। নাকি আমি ইথেনকে ঘরে ঢুকতে বলব?

দরজায় ইথেনের হাত দেখা যাচ্ছে। চুড়ি পরা ফরসা হাত। সবুজ কাচের চুড়ি। কত উঁচু থেকে সে পড়েছে। হাতের সব চুড়ি ভেঙে যাওয়ার কথা। অথচ এখনো হাতভর্তি চুড়ি। সে দরজা আস্তে করে ভেতরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই তো ইথেনকে দেখা যাচ্ছে। তার বড় বড় চোখ ফরসা শান্ত চেহারা।

আপা তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

না।

ওরা আমাকে ঠাণ্ডা একটা বাক্সে ভরে রেখেছে। ভয় লাগছিল বলে চলে এসেছি। বেশিক্ষণ থাকব না। আপা বসব?

বোস।

বাতিটা নিভিয়ে দেবে? বাতির জন্য তাকাতে পারছি না। আলো চোখে লাগছে।

আমি যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে বাতি নিবালাম। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হল না। বারান্দার বাতি জ্বলছে। তার আলো খোলা দরজা দিয়ে আসছে। সেই আলোয় ইথেনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমার ক্ষীণ সন্দেহ হল সে কি আসলেই ইথেন? নাকি ইবলিশ শয়তান ইথেনের রূপ ধরে এসেছে? নাকি পুরো ব্যাপারটাই একটা প্রবল ঘোর।

আপা বাবার সঙ্গে ঐ লোকটা কে?

ওনার পীর সাহেব।

তোকে একটা কথা বলতে এসেছি আপা। কথাটা বলে চলে যাব।

বল কী কথা?

তুই সাবধানে থাকিস। ইবলিশ শয়তান তোকে মারবে। সামান্য অসাবধান হলেই মারবে।

কীভাবে সাবধানে থাকব?

তাকে তুই ধাঁধার মধ্যে রাখবি। সে যেন তোকে পরিষ্কার কখনো বুঝতে না পারে।

কী রকম ধাঁধা?

তুই যে তার মতলব জানিস এটা তাকে বুঝতে দিবি না। আমার বুদ্ধি কম আমি তার কাছে ধরা খেয়ে গেছি। তোর বুদ্ধি বেশি তুই পারবি।

ইথেন আমার বুদ্ধি কিন্তু বেশি না।

তা হলে এক কাজ কর। খুব বুদ্ধি আছে এমন কারোর কাছে যা।

খুব বুদ্ধি আছে এমন কাউকে আমি চিনি না।

এখন চিনিস না পরে চিনবি। অতি বুদ্ধিমান একজন মানুষের সঙ্গে তোর পরিচয় হবে। তার সাহায্য চাইবি।

বুঝব কী করে সে অতি বুদ্ধিমান?

তাকে ধাঁধা জিজ্ঞেস করবি। দেখবি ধাঁধার জবাব দিতে পারে কি না। প্রথম শুরু করবি সহজ ধাঁধা দিয়ে তারপর কঠিনের দিকে যাবি। আপা এই ধাঁধাটা দিয়ে শুরু কর—

কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে
নাই তাই খাচ্ছ
থাকলে কোথায় পেতে?

ইথেন হাসছে। সে আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। হাসিখুশি গল্পবাজ মেয়ে। সে শব্দ করেই হাসছে। পাশের ঘরে নিশ্চয়ই সেই হাসির শব্দ পৌঁছেছে। বাবা এবং তার পীর সাহেব কোরান পাঠ বন্ধ করেছেন। বাবা উঠে আসছেন। তাঁর পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ইথেন বলল, আপা যাই।

বাবা ঘরে ঢুকে ক্লান্ত গলায় বললেন, হাসছিস কেন মা? শরীর খারাপ লাগছে? মাথায় যন্ত্রণা? দুটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে থাক মা। তিনি আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। আমি কাঁদতে শুরু করেছি কিন্তু আমার কান্নার শব্দ হাসির মতো শুনাচ্ছে।

বাবা বিড়বিড় করে বললেন, তুই কাঁদছিলি? অথচ আমার কাছে মনে হচ্ছিল কেউ একজন হাসছে। বিপদে-আপদে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। কী শুনতে কী শোনে।

আমি বললাম, বাবা একটা কাজ করবে? আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাবে? আমি মর্গের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব।

বাবা বললেন, ঠিক হবে না রে মা।

আমি বললাম, কেন ঠিক হবে না? অবশ্যই ঠিক হবে। তোমার মেয়েটা একা পড়ে আছে। একা-একা ভয় পাচ্ছে।

বাবা বললেন, এত রাতে কীভাবে যাব?

আমি বললাম, রিকশা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আর যদি না পাওয়া যায় আমরা হেঁটে যাব।

বাবা বললেন, পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

আমি বললাম, ওনাকে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই বাবা। ওনার মেয়ে মর্গে পড়ে নেই। তোমার মেয়ে পড়ে আছে। বাবা তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর সে খুবই ভয় পাচ্ছে।

তুই ওখানে গিয়ে কী করবি?

আমি একটা জায়নামাজ নিয়ে যাব। মর্গের বারান্দায় জায়নামাজ বিছিয়ে সুরা ইয়াসিন পড়ব।

রাত তিনটায় আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে উপস্থিত হলাম। দারোয়ান গেট খুলে দিল। সে আমাদের দেখে মোটেই অবাক হল না। সে নিশ্চয়ই আমাদের মতো অনেককে এভাবে আসতে দেখেছে। সে সহজ স্বাভাবিক গলায় পশ্চিম কোনদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, অজুর পানি লাগব? আমি বললাম, আমার বোনের ডেডবডি মর্গে আছে। তাকে একনজর দেখা কি সম্ভব? দারোয়ান বলল, নিয়ম নাই। আমি বললাম, ভাই একটা খোঁজ নিয়ে দেখেন না সম্ভব কি না।

সুপারভাইজার সাব হুকুম দিলে তালা খুলতে পারি। কাছে যাইতে পারবেন না দূর থাইক্যা দেখবেন। তালা খুলনের জন্য খরচ দিবেন।

খরচ কত?

পাঁচ শ টেকা লাগব।

পাঁচ শ টাকা আমি দেব।

দেখি সুপারভাইজার সাব আছে কি না। উনার হুকুম বিনা পারব না। এক হাজার টাকা দিলেও পারব না। আমার চাকরি 'বিলা' হয়া যাইব।

বাবা জায়নামাজ বিছিয়ে সুরা ইয়াসিন পড়া শুরু করেছেন। তাঁর পীর সাহেব চোখ বন্ধ করে তসবি টানছেন। আমি অপেক্ষা করছি সুপারভাইজারের জন্য।

সুপারভাইজার সাহেবকে পাওয়া গেল। তিনি চাবি হাতে দরজা খুলে দিতে এলেন। আমি পাঁচ শ টাকার একটা নোট তাঁর হাতে দিলাম। তিনি বললেন, আরো দুই শ লাগবে। আমার পাঁচ শ দারোয়ানের দুই শ।

আমি আরো দু শ টাকা দিলাম। সুপারভাইজার সাহেবের সঙ্গে মর্গে ঢুকলাম। মর্গে এক শ পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। মর্গে তিনটা ডেডবডি। তিনটাই তিনটা আলাদা–আলাদা টেবিলের উপর। প্রতিটা ডেডবডি সাদা কাপড়ে ঢাকা। ইথেন বলেছিল তাকে রাখা হয়েছে একটা বাক্সের ভেতর এটা ঠিক না। ঘরের ভেতর ফিনাইলের কড়া গন্ধ।

সুপারভাইজার বললেন, ইথেন আছে মাঝখানের টেবিলে।

আমি চমকে সুপারভাইজারের দিকে তাকালাম। ইথেন নাম সুপারভাইজারের জানার কথা না। আমি চাপা গলায় বললাম, আপনি কে?

সুপারভাইজারের ঠোঁটের কোণে হাসি। আমি বললাম, আপনি কে?

বোনকে দেখতে আসছেন দেখেন। এত প্রশ্ন কী জন্য? তবে না দেখলে ভালো করবেন।

আপনি কে?

আমি তোমার স্যার। আমার নাম রকিব। আমি তোমার সঙ্গে ঘষাঘষি খেলা খেলতাম। এখন চিনেছ?

হ্যাঁ চিনেছি।

মরা মানুষের সাথে আমার কোনো ব্যবসা নাই। আমার ব্যবসা জীবিত মানুষের সাথে তারপরেও তোমার খাতিরে আসছি। বোনকে দেখার যখন এত শখ তখন দেখ।

এই সময় একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটল। সাদা চাদরের ভেতর থেকে ইথেন বলল, আপা খবরদার আমাকে দেখিস না। খবরদার না।

আমি অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি আমি ইথেনের বিছানায় শুয়ে আছি। আমার গায়ে চাদর। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। পাশের ঘর থেকে বাবার সুরা ইয়াসিন পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাবার পীর সাহেব একমনে জিগির করছেন। হাসপাতালের মর্গে আমার যাওয়া, ইবলিশের সঙ্গে দেখা হওয়া, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া, সবই আমার কল্পনা কিংবা স্বপ্ন।

এখানেও সামান্য সমস্যা আছে। সামান্য সমস্যা বলা ঠিক হবে না বেশ বড় সমস্যা। হাসপাতালের মর্গে আমি বাবাকে নিয়ে পরদিন ভোরে যাই। যে দারোয়ানকে রাতে দেখেছিলাম তাকেই দেখি। সে ঠিক রাতে যেরকম বলেছে সেইভাবে বলে—সুপারভাইজার সাব হুকুম দিলে তালা খুলতে পারি। কাছে যাইতে পারবেন না। দূর থাইকা দেখবেন। তালা খুলনের জন্য খরচ দিবেন।

আমি বললাম, খরচ কত?

সে বলল, পাঁচ শ টাকা।

সুপারভাইজারের সঙ্গে দেখা হল। রাতে আমি এই মানুষটাকেই দেখেছিলাম। তালা খোলার পর সে বাড়তি দু শ টাকা নিল।

রাতে আমি একা মর্গে ঢুকেছিলাম। দিনে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলাম। মর্গের দৃশ্যও রাতের দৃশ্যের মতো। ছোট-ছোট তিনটা টেবিলে তিনটা ডেডবডি পড়ে আছে। সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। বাবা চাপা গলায় বললেন, কোনটা আমার মেয়ে?

সুপারভাইজার বিরক্ত গলায় বলল, মাঝখানেরটা। আপনারা কাছে যাবেন না। যেখানে দাঁড়ায়ে আছেন সেখানে দাঁড়ায়ে থাকেন। আমি চাদর খুলে মুখ দেখায়ে দিতেছি। তাড়াতাড়ি বিদায় হন। রিপোর্টিং হয়ে গেলে চাকরি যাবে।

আগে একবার লিখেছি পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ইথেনের গর্ভে কোনো সন্তান ছিল এমন কিছুই পাওয়া যায় নি। শুধু লেখা ছিল—"উচ্চ স্থান হইতে পতন জনিত কারণে মৃত্যু।" কোথায় কোথায় আঘাত লেগেছে তার বর্ণনা। তা হলে ইথেন এই কাজটা কেন করল? কেন ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল? সে কি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল? সে কি ধরে নিয়েছিল সে প্রেগনেন্ট? মনোবিদ্যায় এরকম রোগের উল্লেখ আছে।

আমি ইথেনকে নিয়ে এরকম একটা ছবি দেখেছিলাম। ছবির নাম The Yellow Snake. সেই ছবিতে এক মহিলার হঠাৎ ধারণা হল তিনি প্রেগনেন্ট। তাঁর ভেতর প্রেগনেন্সির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হল। ডাক্তারের কাছে ইউরিন টেস্ট করালেন। সেই টেস্টেও পজিটিভ পাওয়া গেল। তখন মহিলা স্বপ্নে দেখলেন তাঁর পেটে যে সন্তান এসেছে সে কোনো মানবশিশু না। একটা সাপ। ভয়াবহ ছবি।

ইথেনের কি একই সমস্যা ছিল? তার পেটে সন্তান এই বিষয়ে সে যে নিশ্চিত ছিল তার একটা প্রমাণ আমার কাছে আছে। সে তার সন্তানকে একটি চিঠিও লিখে রেখে গিয়েছিল। চিঠিটা আমি হুবহু তুলে দিচ্ছি।

প্রিয় HCHO,

হ্যালো। তোমার নাম পছন্দ হয়েছে? ফরমালডিহাইড। আমি তোমার মা আমার নাম ইথেন। আমি সাধারণ হাইড্রোকার্বন। অথচ তুমি হলে সুপার রিঅ্যাকটিভ ফরমালডিহাইড। পানিতে যদি ইথেন ছেড়ে দাও পানির কিছুই হবে না। পানি পানির মতো থাকবে। ইথেন থাকবে ইথেনের মতো। আর যদি পানিতে ফরমালডিহাইড ছাড়—কত না কাণ্ড হবে।

তুমি পৃথিবীতে আসবে কত না কাণ্ড ঘটানোর জন্য। আফসোস তোমার এই কত না কাণ্ড দেখার সুযোগ আমার হবে না। কারণ আমি বেঁচে থাকব না।

ইতি তোমার মা।

মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত এগারোটা দশ।

তাঁর খাটের মাথায় নাসরিন বই-খাতা নিয়ে বসেছে। মিসির আলি যখন পড়েন সেও তখন পড়ে। মিসির আলি তাঁকে এর মধ্যেই বর্ণ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ছোট ছোট শব্দ সে এখন পড়তে পারে। লেখাপড়া শেখার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ মিসির আলিকে মুগ্ধ করেছে।

নাসরিন বলল, খালুজান চা খাবেন? চা বানাব?

মিসির আলি বললেন, চা এক কাপ খাওয়া যেতে পারে।

নাসরিনের চোখে-মুখে আনন্দের আভাস দেখা গেল। এই মানুষটার জন্য যে কোনো কাজ করতে পারলেই তার ভালো লাগে।

নাসরিন।

জি খালুজান।

তোমার বুদ্ধি কেমন নাসরিন?

বুদ্ধি ভালো খালুজান।

কেমন বুদ্ধি পরীক্ষা হয়ে যাক। একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করব দেখি জবাব দিতে পার কি না।

"কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে
নাই তাই খাচ্ছ
থাকলে কোথায় পেতে?"

পারব না খালুজান।

তা হলে তো বুদ্ধি কম। আমি নিজেও পারছি না। আমারও তোমার মতোই বুদ্ধি কম।

নাসরিন গম্ভীর গলায় বলল, বুদ্ধি কম থাকন ভালো খালুজান।

মিসির আলি বললেন, বুদ্ধি কম থাকা মোটেই ভালো না। মানুষের বুদ্ধি হওয়া উচিত ক্ষুরের মতো।

ক্ষুরের মতো বুদ্ধি কারে বলে?

ক্ষুরে যেমন ধার থাকে বুদ্ধিতেও থাকবে সেরকম ধার। যেমন সায়রা বানু। তোমার কি মনে হয় মেয়েটার বুদ্ধি বেশি না?

উনার বুদ্ধি খুবই ভালো কিন্তু উনার মাথাত গণ্ডগোল আছে। উনারে আমি বেজায় ভয় পাই।

কেন?

উনি রাইতে কেমন জানি করে। ঘুমায় না। কার সাথি যেন কথা কয়। পুরুষের মতো গলায় কথা কয়।

তুমি জান কীভাবে?

প্রথমে আমি উনার ঘরেই ঘুমাইতাম। আপা থাকে একা। উনার ঘরের মেঝেতে কম্বলের একটা বিছানা ছিল আমার জন্য। শেষে আপারে বলেছি আমি এইখানে থাকব না। আমার ভয় লাগে। তখন আপা আমারে অন্য ঘরে পাঠায়ে দিয়েছিল।

সায়রা মাঝে মাঝে পুরুষের গলায় কথা বলত?

জি।

কী বলত?

কী বলত জানি না। ইংরেজিতে কথা বলত। খালুজান আমারে ইংরেজি পড়া শিখাইবেন?

অবশ্যই শিখাব। তার আগে আস চেষ্টা করে দেখি দুজনে মিলে ধাঁধার অর্থ বের করতে পারি কি না। 'কহেন কবি কালিদাস' ... এই বাক্যটার কি কোনো রহস্য আছে? তিনটা শব্দই শুরু হয়েছে 'ক' দিয়ে। কয়ের অনুপ্রাস। তিনটা ক। অঙ্কের কোনো ধাঁধা না তো।

খালুজান কালিদাস কে?

কালিদাস ছিলেন বিরাট কবি। মেঘদূত, শকুন্তলা এই রকম ছয়টা অতি বিখ্যাত কবিতার বই লিখেছিলেন। উনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি। বিক্রমাদিত্যের আরেক নাম দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। বিক্রমাদিত্য নিজে ছিলেন পিশাচসিদ্ধ। একবার এক পিশাচ তাঁকে তিনটা প্রশ্ন করেছিল। পিশাচ বলেছিল এই তিনটা প্রশ্নের কোনো একটার জবাব ভুল দিলে আমি তোমাকে হত্যা করব। আর যদি তিনটা প্রশ্নেরই সঠিক জবাব দিতে পার আমি তোমাতে বশ হব। বিক্রমাদিত্য তিনটা প্রশ্নেরই জবাব দিতে পেরেছিলেন।

প্রশ্নগুলি কী খালুজান?

প্রশ্নগুলি এই মুহূর্তে মনে নাই। এইটুক মনে আছে প্রশ্নগুলি ছিল রহস্যময়। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের উত্তর ছিল সহজ–সরল।

নাসরিন গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, পিশাচ আপনেরে প্রশ্ন করলে পার পাইব না। আপনে পারবেন।

৬

সায়রা বানু এবং মিসির আলি মুখোমুখি বসেছেন। সায়রা বানু তার রকিং–চেয়ারে। একটু আগে সে দুলছিল এখন দুলছে না। তার চোখের দৃষ্টি স্থির। ভ্রূ সামান্য কুঁচকে আছে। তাকে কোনো একটা বিষয় নিয়ে চিন্তিত মনে হচ্ছে। আজ তাকে খানিকটা অসুস্থও মনে হচ্ছে। টেনে–টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এক ফাঁকে সে তার পাশে রাখা ব্যাগ থেকে ইনহেলারের শিশি হাতে নিল। দুবার পাফ নিল। মেয়েটির কি অ্যাজমা আছে? অ্যাজমা একটি সাইকো সমেটিক ব্যাধি। মনের ঝামেলা থেকে এই রোগ হয়। বেশ কষ্টকর ব্যাধি। মিসির আলি লক্ষ করলেন মেয়েটা দুলতে শুরু করেছে। সম্ভবত ইনহেলারে পাফ নেবার পর তার একটু ভালো লাগছে। সায়রা বলল, চাচা আজ যে বিশেষ একটা দিন সে বিষয়ে আপনি জানেন?

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, বিশেষ কী দিন বলো তো?

আপনি জানেন না?

জানি না।

আমার হাতে চায়ের কাপ দেখেও বুঝতে পারছেন না?

না।

আপনার কাজের মেয়ে যে নতুন শাড়ি পরেছে এটা চোখে পড়ে নি?

শাড়ি তো সে মাঝে মাঝে পরে। আজ নতুন শাড়ি পরেছে এটা খেয়াল করি নি।

সায়রা হাসিমুখে বলল, চাচা আজ ঈদ। ঈদ বলেই আপনার এখানে দিনের বেলা উপস্থিত হয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসেছি। রমজান মাসের সকালে নিশ্চয়ই চা খেতাম না। আজ আমি এসেছি আপনাকে সালাম করতে।

মিসির আলি বিব্রত গলায় বললেন, দীর্ঘদিন তেমনভাবে কোনো উৎসব পালন করা হয় না বলে বিষয়টা আমার মাথায় থাকে না।

ছোটবেলায় ঈদ করতেন না?

অবশ্যই করতাম। নতুন জামা, জুতা। ঈদের আগের রাতে নতুন জুতা বালিশের কাছে রেখে ঘুমাতাম। নাকে লাগত চামড়ার গন্ধ। এখনো আমার কাছে ঈদ মানে নাকে চামড়ার গন্ধ।

সায়রা বলল, আমি আপনার জন্য নতুন পাঞ্জাবি এনেছি। নাসরিনকে বলেছি পানি গরম করতে। আপনি গোসল করবেন। নতুন পায়জামা–পাঞ্জাবি পরবেন। ফিরনি খাবেন। আমি আপনাকে সালাম করে চলে যাব। একা যাব না আপনাকে সঙ্গে করেই যাব। আপনাকে ঈদগায় নামিয়ে দেব।

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, আমাকে ঈদের নামাজ পড়তে হবে?

হ্যাঁ হবে। আমার এই জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হচ্ছে ঈদের দিন জায়নামাজ বগলে নিয়ে বাবা ঈদের নামাজে যাচ্ছেন। আমরা দুই বোন তাড়াহুড়া করে সেমাই ফিরনি এইসব রাঁধছি। আমরা দুই দফা বাবাকে সালাম করতাম। একবার উনি যখন নামাজে যেতেন তখন। আরেকবার উনি যখন নামাজ থেকে ফিরে আসতেন তখন।

মিসির আলি বললেন, সালাম কি দুবার করতে হয়?

সায়রা বলল, একবারই করার নিয়ম। দুবার সালামের ব্যাপারটা ইথেন চালু করে। ওর অনেক পাগলামি ছিল। দুইবার সালামের সে নামও দিয়েছিল—যাওয়া সালাম, আসা সালাম। চাচা আপনি এখনো বসে আছেন। যান গোসল করতে যান।

মিসির আলি বললেন, গোসল, নতুন কাপড় পরা, ঈদগায়ে যাওয়া এই অংশগুলি বাদ দিলে কি হয় না?

সায়রা বলল, হয়। কেন হবে না! তবে আমার একটা ধারণা ছিল আপনি আমার কথা শুনবেন। আমি ঠিকমতো আপনাকে বলতে পারি নি। আরো আবেগ দিয়ে যদি অনুরোধটা করতাম তা হলে অবশ্যই আপনি শুনতেন।

মিসির আলি বললেন, তুমি তো যথেষ্ট আবেগ দিয়েই কথাটা বলেছ। এরচেয়ে বেশি আবেগ দিয়ে কীভাবে বলতে?

সায়রা বলল, শৈশবের ঈদের স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে যদি টপটপ করে চোখের পানি পড়ত তা হলে আপনি আমার কথায় রাজি হয়ে যেতেন। আপনি কাজ করেন লজিক নিয়ে কিন্তু আপনার মধ্যে আবেগ অনেক বেশি।

কথা বলতে-বলতে সায়রার হঠাৎ গলা ধরে গেল। সে তার মাথা সামান্য নিচু করল। মিসির আলি সায়রার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। সায়রার চোখভর্তি পানি টলমল করছে। বোরকার একটা অংশ সে দু চোখের উপর চেপে ধরল। তার শরীর সামান্য কাঁপল। মিসির আলি বললেন, তুমি আরেক কাপ চা খাও। চা খেতে খেতে আমি গোসল সেরে চলে আসব। আমার জন্য কী পাঞ্জাবি এনেছ দাও পরে ফেলি।

সায়রা চোখ থেকে কাপড় সরিয়ে হেসে ফেলে বলল, আমার যে চোখের পানি আপনি দেখেছেন সেটা আসল না, নকল। চোখের পানি দিয়ে যে আপনার সিদ্ধান্ত পাল্টানো যায় সেটা দেখাবার জন্য কাজটা করেছি। আমি আগেও আপনাকে একবার বলেছি যে আমি দ্রুত চোখের পানি আনতে পারি। বলি নি?

হুঁ বলেছ।

আমি যে একজন এক্সপার্ট অভিনেত্রী এটা বুঝতে পারছেন?

হুঁ।

ইথেন ছিল আমার চেয়েও এক্সপার্ট। সে যে কোনো মানুষের গলা নকল করতে পারত। তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে আপনি খুব মজা পেতেন।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। গোসল সারবেন ভেবেই উঠে দাঁড়ানো।

সায়রা বলল, আপনাকে গোসল করতে হবে না। নতুন পাঞ্জাবিও পরতে হবে না। আপনার অভ্যস্ত জীবন থেকে আমি আপনাকে সরাব না। তবে ঈদ উপলক্ষে আপনাকে নিয়ে চা অবশ্যই খাব। নাসরিনকে চা দিতে বলি?

বলো।

আমি আজ যাওয়ার সময় নাসরিনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ঈদ উপলক্ষে আমার বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণ হইচই করবে। দরিদ্র মানুষের জন্য ঈদের উৎসব অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। চাচা আমি কি ঠিক বলেছি?

বুঝতে পারছি না ঠিক কি না। তবে তোমার লজিক ভালো। তুমি যা বলবে ভেবেচিন্তেই বলবে এটা ধরে নেওয়া যায়।

নাসরিন চা নিয়ে এসেছে। সায়রা মাথা নিচু করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। মিসির আলি সিগারেট ধরিয়েছেন। একটা ছোট্ট প্রশ্ন তাঁর মাথায় এসেছে প্রশ্নটা করবেন কি না বুঝতে পারছেন না। আজকের উৎসবের দিন কঠিন প্রশ্নের জন্য হয়তো উপযুক্ত না। প্রশ্নটা দুই বোনের ইবলিশ শয়তান দেখা নিয়ে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে এরা ইবলিশকে দেখেছে। অথচ সময় মিলছে না। পুরো লেখাতেই সময়ের গণ্ডগোল থেকেই যাচ্ছে। সায়রা খাতায় লিখছে সে শ্রাবণ মাসের রাতে ইবলিশ শয়তানের দেখা পায় কিংবা স্বপ্নে দেখে। তার কয়েকদিন পরেই ছাদে দুই বোনের চা খাওয়ার বর্ণনা আছে। তখন বাগান বিলাসের রঙিন ঝলমলে পাতার কথা আছে। শ্রাবণ মাসে বাগান বিলাসের রঙিন পাতা থাকবে না। বেলি ফুলের গাছে বেলি ফুল থাকবে। অথচ সায়রা পরিষ্কার লিখল বেলি ফুলের সিজন না। ইবলিশ শয়তানের দেখা যদি তারা পেয়েও থাকে কে আগে পেয়েছে?

সায়রা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান। আপনার চোখে প্রশ্ন প্রশ্ন ভাব আছে। প্রশ্ন করতে চাইলে করতে পারেন।

কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি না।

আপনি আমার লেখা কতটুকু পড়েছেন?

সেকেন্ড চ্যাপ্টার শেষ করেছি।

প্রথম চ্যাপ্টার শেষ করার পরে আপনার মধ্যে অনেক খটকা তৈরি হয়েছিল। সেকেন্ড চ্যাপ্টারে হয় নি?

তেমন বড় কোনো খটকা তৈরি হয় নি। ছোটখাটো কিছু সমস্যা আছে সেগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না।

সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্যই পান নি?

মিসির আলি বললেন, একটা পেয়েছি তোমাদের ইবলিশ শয়তান বিরাট মিথ্যাবাদী। সে সত্যির সঙ্গে মিথ্যা মিশাচ্ছে না। মিথ্যার সঙ্গেই মিথ্যা মিশাচ্ছে। তোমার মা মোটেই হিন্দু মহিলা ছিলেন না। তাঁর নাম রহিমা বেগম। তোমার বাবা সংক্ষেপ করে রমা ডাকতেন।

সায়রা শান্ত গলায় বলল, এই তথ্য আমি আমার খাতার কোথাও লিখি নি। আপনি কোথায় পেয়েছেন?

মিসির আলি দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বললেন, আমার এক ছাত্র বগুড়া আযিযুল হক কলেজে অধ্যাপনা করে। তাকে চিঠি লিখে বিষয়টা জানাতে বলেছিলাম। সে চিঠিতে জানিয়েছে।

সায়রা বলল, আমি কি চিঠিটা পড়তে পারি?

মিসির আলি বললেন, অবশ্যই পার। তিনি চিঠি এনে দিলেন। চিঠিতে লেখা—

শ্রদ্ধেয় স্যার,
আসসালাম। আমি আপনার চিঠি পেয়ে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি। আপনি যে আমার নাম মনে রেখেছেন এই আনন্দই আমার রাখার জায়গা নাই। আমার কথাটা আপনি বাড়াবাড়ি হিসাবে নেবেন না। আপনার সকল ছাত্রছাত্রী যে আপনাকে কোন চোখে দেখে তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না।

যাই হোক এখন মূল প্রসঙ্গে আসি। আপনার চিঠি যেদিন পাই সেদিনই আমি সারিয়াকান্দি রওনা হই। বগুড়া জেলায় তিনটি সারিয়াকান্দি আছে। ভাগ্যগুণে প্রথম গ্রামটিতেই কেমিস্ট্রির টিচার হাবিবুর রহমান সাহেবের স্ত্রীর কবরের সন্ধান পাই। মহিলার নাম রহিমা বেগম। তাঁর পিতা সারিয়াকান্দি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এখন মৃত। মেয়ের কবরের পাশেই তাঁর কবর হয়েছে।

স্যার, এর বাইরেও যদি আপনি কিছু জানতে চান আমাকে জানাবেন। আমি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেব।

আপনার শরীরের যত্ন নেবেন। যদি অনুমতি পাই তা হলে ঢাকায় এসে আপনাকে কদমবুসি করে যাব।

ইতি
আপনার স্নেহধন্য
ফজলুল করিম
বগুড়া আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া।

সায়রা চিঠি ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, আপনার অনুসন্ধানের এই প্যাটার্নটা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না। আমি ভেবেছিলম আপনি আমার লেখা পড়ে চিন্তা করতে করতে মূল সমস্যার সমাধানে যাবেন। আপনি যে আবার চিঠিপত্র লিখে অন্যখান থেকেও তথ্য সংগ্রহ করবেন তা ভাবি নি।

মিসির আলি বললেন, তোমার নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি নেই?

সায়রা বলল, আপত্তি আছে। আপনার যা জানার আমার কাছে জানবেন। I will answer you truthfully. বাইরের কাউকে কিছু জানাতে পারবেন না।

ঠিক আছে।

সায়রা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি এখন চলে যাব। আপনি কি আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু জানতে চান?

মিসির আলি বললেন, তোমাদের বাড়ির ইলেকট্রিসিটি বিলগুলি দেখতে চাই। তুমি যেমন গোছানো মেয়ে আমার ধারণা পুরোনো সব ইলেকট্রিসিটি বিলই তোমাদের কাছে আছে।

আপনার কি সব বিল দরকার?

হ্যাঁ সবই দরকার।

আমি বিল পাঠিয়ে দেব।

সায়রা দ্রুত ঘর থেকে বের হল। নাসরিনকে তার সঙ্গে করে নিয়ে যাবার কথা। সে নিল না। মনে হয় ভুলে গেছে।

সে আরো একটা ব্যাপার ভুলে গেছে—মিসির আলিকে ঈদের সালাম। সে বলেছিল এ বাড়িতে তার আসার উদ্দেশ্য মিসির আলিকে সালাম করা। কোনো কারণে সায়রা অবশ্যই আপসেট। ফজলুল করিমের লেখা চিঠিটা কি কারণ হতে পারে? মিসির আলি ঠিক ধরতে পারছেন না।

ঈদের দিনটা নাসরিনের বৃথা গেল না। মিসির আলি তাকে নিয়ে বেড়াতে বের হলেন। বাচ্চা একটা মেয়ে নতুন শাড়ি পরে ঈদের দিনে ঘরে বসে থাকবে এটা কেমন কথা? তিনি তাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গেলেন। নাসরিন আগে কখনো চিড়িয়াখানায় আসে নি, সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। সে হাতিতে চড়ল। আইসক্রিম খেল চারটা। বানরের খাঁচার সামনে থেকে তাকে নড়ানোই যায় না। মিসির আলি বললেন, মজা পাচ্ছিস নাকিরে মা? নাসরিন বলল, হুঁ।

সন্ধ্যার দিকে তারা যখন ফিরছে বের হবার গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে তখন নাসরিন ফিসফিস করে জানাল সে আরেকবার জলহস্তী দেখতে চায়। মিসির আলি হাসিমুখে তাকে জলহস্তী দেখাতে নিয়ে গেলেন।

রাতে নাসরিনকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন হোটেলের মালিক হারুন বেপারীর বাসায়। হারুন বেপারী আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। সে চোখ কপালে তুলে বলল, আপনি আসছেন এটা কেমন কথা?

মিসির আলি বললেন, ঈদের দিন বেড়াতে আসব না!

হারুন বেপারী বলল, অবশ্যই আসবেন। আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন এটা যে আমার জন্য কত বড় ভাগ্যের ব্যাপার সেইটা আমি জানি। ঠিকানা পাইলেন কই?

আপনার হোটেলে গিয়েছিলাম সেখানে একটা ছেলের কাছ থেকে যোগাড় করেছি।

হারুন বেপারী খাওয়াদাওয়ার বিপুল আয়োজন করল। শুধু খাওয়াদাওয়া না রাতে তাদের সঙ্গে সেকেন্ড শো সিনেমা দেখতে যেতে হল। গত পাঁচ বছর থেকে নাকি সে প্রতি দুই ঈদের রাতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে।

মিসির আলি সিনেমা দেখার অংশ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। ক্ষীণ গলায় বলেছিলেন, ঈদের দিন সিনেমা দেখাটা আপনাদের পরিবারের ব্যাপার সেখানে আমি ঠিক...।

হারুন বেপারী কঠিন গলায় বলল, যে বলে আপনি আমার পরিবারের লোক না তার গালে যদি জুতা দিয়া দুই বাড়ি আমি না দিছি তা হলে আমার নাম হারুন বেপারী না।

ছবি দেখে মিসির আলি যথেষ্টই মজা পেলেন। ছবির নাম "জিদ্দি সন্ত্রাসী"। সেখানে একজন ভয়ংকর সন্ত্রাসীর প্রেম হয় কোটিপতির একমাত্র কন্যা চামেলীর সঙ্গে। খবর জানতে পেরে চামেলীর বাবা শিল্পপতি ওসমান সন্ত্রাসীকে জীবিত অথবা মৃত ধরার জন্য দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। চামেলী একদিন সন্ত্রাসীকে (নাম রাজা) বাবার সামনে উপস্থিত করে বলে—দাও এখন পুরস্কারের দশ লক্ষ টাকা। এই টাকা আমি দরিদ্র জনগণকে দান করব। এদিকে জানা যায় সন্ত্রাসীও আসলে সন্ত্রাসী না। সেও আরেক কোটিপতি এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির একমাত্র সন্তান। তাকে শিশু অবস্থায় চুরি করে নিয়ে যায় এক বেদের দল। সেই বেদের দলের এক ষোড়শী কন্যার সঙ্গে রাজার বিয়ে ঠিকঠাক হয়। বিয়ের রাতে জানা যায় এই বেদেনি কন্যা (তার নামও আবার কাকতালীয়ভাবে চামেলী) আসল মানুষ নয়, সে নাগিন। ইচ্ছামতো সে মানুষের বেশ ধরতে পারে আবার সাপও হয়ে যেতে পারে। নাগরাজের সঙ্গে তার বিরোধ বলেই সে লুকিয়ে বেদেনি কন্যা সেজে মনুষ্য সমাজে বাস করে।

মিসির আলির পুরো সময়টা কাটল কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক এটা চিন্তা করে বের করতে। কোন চামেলী আসলে নাগিন কন্যা এটা নিয়ে তিনি খুবই ঝামেলায় পড়লেন। নাসরিনকে বারবার জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে, এই চামেলী কি আসলে নাগিন নাকি সে আসল মানুষ? বেদে দলের সর্দার এবং নাগরাজ কি একই ব্যক্তি নাকি আলাদা।

শেষ দৃশ্যে নাগরাজ এবং নাগিন কন্যার একই সময়ে মৃত্যু হল। দুজনই সাপ হয়ে একজন আরেকজনকে দংশন করল। ভয়াবহ জটিলতা।

ছবি দেখে ফেরার পথে নাসরিন ঘোষণা করল সে তার সমগ্র জীবনে দুজন সত্যিকার ভালোমানুষ দেখেছে। দুজনকেই সে খালুজান ডাকে।

মিসির আলি বললেন, একজন যে আমি এটা বুঝতে পারছি। আরেকজন কে?

নাসরিন বলল, আরেকজন সায়রা আপামণির বাবা। উনার নাম হাবিবুর রহমান।

মিসির আলি বললেন দু জনের মধ্যে কে বেশি ভালো? ফার্ষ্ট কে সেকেন্ড কে?

নাসরিন গাঢ় গলায় বলল, উনি ফার্ষ্ট।

মিসির আলি বাসায় ফিরলেন রাত বারোটায়।

তাঁর বাসার কাছে গলির মোড়ে সায়রার বিশাল পাজেরো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ড্রাইভার বিরক্ত গলায় বলল, আপনি কই ছিলেন? রাত নটার সময় এসেছি এখন বাজে বারোটা।

বড়লোকদের ড্রাইভারের মেজাজ থাকে এমনিতেই চড়া। ঈদের দিনে সেই চড়াভাব হয় তুঙ্গস্পর্শী। মিসির আলি বললেন, কোনো সমস্যা?

ড্রাইভার বলল, সমস্যাটমস্যা জানি না। আপনের জন্য খাবার পাঠিয়েছে। নিয়ে যান।

ড্রাইভার বিশাল সাইজের দুটা টিফিন কেরিয়ার বের করল।

মিসির আলি বললেন, আমরা খাওয়াদাওয়া করে ফেলেছি। খাবার দিতে হবে না।

ড্রাইভার বলল, খাবার প্রয়োজন হলে নর্দমায় ফেলে দেন আমি এইগুলা নিয়ে ফিরত যাব না। আপনার জন্য ম্যাডাম একটা চিঠিও পাঠিয়েছেন।

মিসির আলি চিঠি এবং খাবার নিয়ে বাসায় ফিরলেন। চিঠিতে সায়রা লিখেছে (বাংলায় লেখা চিঠি)।

চাচা,

এই চিঠি ক্ষমাপ্রার্থনা মূলক। আমি আজ ঈদের দিনে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। ঈদের সালাম করতে গিয়ে হঠাৎ রাগ দেখিয়ে চলে এসেছি। সালামও করা হয় নি।

আমার রাগের কারণটা অবশ্যই আপনার কাছে পরিষ্কার। আমি চাচ্ছিলাম না আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয়ের কোনো একটি বাইরের কেউ জানুক। আমার রাগ করাটা ঠিক হয় নি কারণ আপনাকে আমি একটি সমস্যা সমাধানের জন্য কমিশন করেছি। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আপনি যা যা করার সব করবেন এটাই তো স্বাভাবিক। তা ছাড়া আমি তো আগেভাগে আপনাকে বলি নি যে আপনি বাইরের কাউকে যুক্ত করতে পারবেন না।

চাচা আপনি যাকে ইচ্ছা যা কিছু ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পারেন। আপনাকে ফ্রি পাস দেওয়া হল।

আপনার জন্য কিছু খাবার পাঠালাম। কোনো রান্নাই আমার না। বাবুর্চি রান্না করেছে। কোনো একদিন আমি নিজে রান্না করব এবং আপনাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াব। আমি কেমিস্ট্রির ছাত্রী। কেমিস্ট্রির ছাত্রছাত্রীরা ভালো রাঁধুনি হয় এটা কি জানেন? কারো রান্না ভালো হয়। কারো রান্না খারাপ হয়। কেন হয় সেটা কেমিস্ট্রির পয়েন্ট অব ভিউ থেকে আপনাকে বুঝিয়ে বলব। আমার ধারণা আপনার ভালো লাগবে।

আমার বাবা কেমিস্ট্রির শিক্ষক বলেই বোধ হয় ওনার রান্নার হাত অসাধারণ। মার মৃত্যুর পর প্রায়ই এমন হয়েছে যে ঘরে কাজের লোক নেই। রান্না করতে হচ্ছে তাও একদিন দুদিন না। দিনের–পর–দিন। বাবা সবচেয়ে ভালো রাঁধেন মটরশুঁটি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল এবং করলা দিয়ে চিংড়ি মাছ।

আপনি একদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আমি ব্যবস্থা করব যেদিন আসবেন বাবার হাতের রান্না খাবেন।

চিঠিটা দীর্ঘ হয়ে গেল। কেন দীর্ঘ হল শুনলে আপনার হয়তোবা সামান্য মন খারাপ হবে। আমার অ্যাজমার টান উঠেছে। কিছুক্ষণ আগে নেবুলাইজার ব্যবহার করেছি তাতে লাভ হয় নি। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। যখন শ্বাসকষ্ট হয় তখন যদি প্রিয় কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখি তা হলে কষ্টটা কম হয়। আপনার কাছে চিঠি লেখার ব্যাপারটা যতক্ষণ ততক্ষণ শ্বাসকষ্ট টের পাচ্ছি না।

চাচা আপনি ভালো থাকবেন। ও আচ্ছা আপনাকে একটি বিশেষ থ্যাংকস চিঠির শুরুতেই দিতে চেয়েছিলাম ভুলে গেছি। এখন দিয়ে দেই আপনি যে কাজের মেয়েটাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এটা আমার ভালো লেগেছে।

মেয়েটি অতি ভালো। তাকে রাখা হয়েছিল বাবার সেবার জন্য বাবাও মেয়েটিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কিন্তু আমাদের কারোরই মনে হয় নি এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শেখানো যায়। আপনার মনে হয়েছে। এই সব আপাত তুচ্ছ কর্মকাণ্ড দিয়েই কিন্তু একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

বিনীত
সায়রা বানু

৭

স্কটল্যান্ডের এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজির ফুল প্রফেসর সরদার আমির হোসেন মিসির আলিকে একটি চিঠি কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়েছেন। চিঠিটা এরকম।

শ্রদ্ধেয় স্যার,
আমার সালাম নিন। আপনার চিঠির জবাব দিতে কিছু দেরি করে ফেললাম। তার জন্য শুরুতেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মনোবিদ্যার একটি কনফারেন্স চলছিল। আমি ছিলাম প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরদের একজন।

স্যার আপনার চিঠি পড়ে মন সামান্য খারাপ হয়েছে। আপনি আবারো কোনো রহস্য সমাধানে নেমেছেন বলে মনে হয়েছে। আপনি আপনার ক্ষমতার কোনো ব্যবহারই করলেন না। ক্ষমতা নষ্ট করলেন তৃতীয় শ্রেণীর সব রহস্য সমাধান করতে গিয়ে। রহস্য সমাধান করবে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ। আপনি না। আপনি আপনার মূল কাজটা করবেন। আমরা যারা আপনার ছাত্র তারা সবাই আপনার কথা ভেবে দুঃখ পাই। মানসিক চিন্তার ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত। এই ক্ষমতার হাস্যকর ব্যবহার অপরাধের মধ্যে পড়ে।

স্যার আমার কঠিন কথাগুলি ক্ষমা করবেন। এখন আপনি যা জানতে চাচ্ছেন জানাচ্ছি।

সায়রা বানু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই রসায়নশাস্ত্রে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি নিয়েছে। তার থিসিসের বিষয় ছিল—কলয়েড সায়েন্স। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি সে ছাত্রী হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিল। ডিগ্রি প্রাপ্তির পরপরই তাকে এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারারশিপের অফার দেওয়া হয়েছিল। সে সেই অফার গ্রহণ করে নি।

আপনি মেয়েটির মানসিক অবস্থা কেমন ছিল জানতে চেয়েছেন। আমি তার সুপারভাইজার ড. জন গ্রিনের সঙ্গে কথা বলেছি। ড. জন গ্রিন জানিয়েছেন তাঁর এই ছাত্রীর মধ্যে তিনি কখনো মানসিক কোনো সমস্যা দেখেন নি।

সায়রা বানু ক্যাম্পাসে থাকত না। সে ক্যাম্পাসের বাইরে একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকত। পড়াশোনার শেষের দিকে সে তার বাবাকে নিয়ে আসে। তার বাবার নাম হাবিবুর রহমান। তিনিও একসময় রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনা করতেন। তারা যে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে থাকত তার বাড়িওয়ালী মিসেস স্টোনের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। ইউরোপ আমেরিকার বৃদ্ধা বাড়িওয়ালীদের কোনো কথাই গুরুত্বের সঙ্গে ধরা ঠিক না। এরা কর্মহীন জীবনযাপন করে এবং তাদের টেনেন্টদের সম্পর্কে নানাবিধ গল্পগাথা তৈরি করতে পছন্দ করে। এ বিষয়ে আমার নিজেরই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

যাই হোক বুড়ি মিসেস স্টোন আমাকে জানিয়েছে সায়রা বানু এবং তার বাবা দুজনের কেউই রাতে ঘুমাত না। সারা রাত গুনগুন করে গান করত। হাবিবুর রহমান ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। আমার ধারণা তিনি কোরান পাঠ করতেন। বুড়ি এটাকেই ‘গান’ বলছে। এরা দুজন রাতে ঘুমাত না কথাটাও হাস্যকর। এই ধরনের বৃদ্ধারা সন্ধ্যারাতেই মদটদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। অন্যরা জেগে আছে না ঘুমাচ্ছে তা তাদের জানার কথা না। যে মেয়ে রসায়নশাস্ত্রের মতো একটি জটিল বিষয়ে Ph. D. থিসিস তৈরি করতে গিয়ে সারা দিন অমানুষিক পরিশ্রম করছে সে সারা রাত জেগে থাকবে কীভাবে।

সায়রা বানু সম্পর্কে আপনাকে আরেকটি তথ্য দিতে পারি। এই তথ্য আপনার কাজে লাগতে পারে। নাট্যকলা বিষয়ে এই মেয়ের প্রবল আগ্রহ ছিল। সে পিএইচ. ডি. করার ফাঁকে–ফাঁকে অভিনয়ের ওপর দুটি কোর্স করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রামা ক্লাব শেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট নাটকটি মঞ্চায়ন করেছিল। টেম্পেস্টের মূল চরিত্র মিরান্ডার ভূমিকা তার করার কথা ছিল। দীর্ঘদিন সে মিরান্ডা চরিত্রের জন্য রিহার্সেল করেছে। শেষ মুহূর্তে শারীরিক অসুস্থতার জন্য নাটকটি করতে পারে নি। তবে ব্রিটিশ ফিল্ম মেকার সিবেস্টিন জুনিয়ারের পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি The Ornet–এ ভারতীর মেয়ের একটি ছোট্ট ভূমিকায় সে অভিনয় করেছে। ছবিটি আমি দেখি নি। আমি ছবিটির একটি ডিভিডি কপি আপনার জন্য পাঠালাম। আমি জানি এই ডিভিডি দেখার জন্য প্রয়োজনীয় ডিভিডি প্লেয়ার আপনার নেই। একটি ডিভিডি প্লেয়ারও পাঠালাম। প্রাক্তন ছাত্রের এই উপহার আপনি গ্রহণ করবেন এই আশা অবশ্যই করতে পারি।

আপনি বিশেষভাবে জানতে চেয়েছিলেন সায়রা বানু কোনো মানসিক রোগের ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল কি না। এই বিষয়ে আমি কোনো তথ্য বের করতে পারি নি। মানসিক রোগের ডাক্তাররা রোগীদের কোনো তথ্য বাইরে প্রকাশ করেন না। তার জন্য কোর্টের নির্দেশ প্রয়োজন হয়।

স্যার আপনি যদি আরো কিছু জানতে চান আমি আমার ই–মেইল নাম্বার দিচ্ছি। চিঠি চালাচালির চেয়ে ই–মেইলে যোগাযোগ সহজ হবে।

বিনীত
সরদার আমির হোসেন

২

কেমন আছ সায়রা?

চাচা আমি ভালো আছি।

খুব ভালো আছ সেরকম মনে হচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যে দুবার ইনহেলার নিলে।

আমার মন ভালো না। যখন আমার মন খারাপ থাকে তখন শ্বাসের সমস্যা হয়।

মন খারাপ কেন?

আমার হাসবেন্ডের শরীর হঠাৎ বেশি খারাপ করেছে। কাল রাতে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে চেয়েছিলাম। সে রাজি হয় নি। সে বলেছে জীবনের শেষ কিছুদিন সে তার নিজের বাড়িতে কাটাতে চায়।

উনি কি নিশ্চিত যে তাঁর জীবনের শেষ সময় এসে গেছে?

উনি নিশ্চিত না হলেও আমি নিশ্চিত।

এত নিশ্চিত কীভাবে হচ্ছ? ইবলিশ শয়তান এসে তোমাকে বলেছে যে তিনি মারা যাচ্ছেন?

আমাকে বলে নি। বাবাকে এসে বলেছে।

সায়রা চা খাবে?

না।

চা খাও। তোমার সঙ্গে আমিও খাব। এস কিছুক্ষণ মন খুলে গল্প করি। আমার ধারণা তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

দেখা হবে না কেন?

দেখা হবে না কারণ দেখা হবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি ইবলিশ শয়তান-ঘটিত যে-সমস্যা তার সমাধান করেছি। সমাধান জানার পর তুমি যে আমার কাছে আসবে তা মনে হয় না।

সমাধান করে ফেলেছেন?

হ্যাঁ করেছি।

আপনি কি আমার লেখা পুরোটা পড়েছেন?

আমি থার্ড চ্যাপ্টার পর্যন্ত পড়েছি।

আরো দুটা চ্যাপ্টার আছে সেই দুই চ্যাপ্টার পড়বেন না?

না।

না কেন?

তুমি লেখাটা মূলত লিখেছ আমাকে কনফিউজ করার জন্য। আমি যতই পড়ছি ততই কনফিউজ হচ্ছি। ইবলিশ যেমন করে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশায় তুমি নিজেই তা করেছ। অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য গোপন করেছ আবার অতি তুচ্ছ তথ্য খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করেছ।

সায়রা বানু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনার সমাধানটা কী বলুন।

মিসির আলি বললেন, সমাধান তুমি নিজেও করেছ। অনেক আগেই করেছ। তাই না?

হ্যাঁ।

তা হলে আমার কাছে এসেছ কেন?

কনফারমেশনের জন্য। আপনার যতটা আস্থা আপনার বুদ্ধির ওপর আছে আমার ততটা নেই।

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে–দাঁড়াতে বললেন, চা নিয়ে আসি। চা খেতে খেতে কথা বলি।

সায়রা বলল, আগে কথা শেষ হোক তারপর চা খাবেন।

মিসির আলি বসে পড়লেন। সায়রা বলল, চা এখন খেতে চাচ্ছি না কেন আপনাকে বলি। চা খেলেই আপনি সিগারেট ধরাবেন। এমনিতেই আমার শ্বাসকষ্ট। সিগারেটের ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টটা বাড়বে। এখন বলুন আপনার সমাধান।

মিসির আলি বললেন, তুমি তোমার গলার স্বর পুরুষদের মতো করতে পার তাই না?

সায়রা বানু চমকাল না। সহজ গলায় বলল, হ্যাঁ।

মিসির আলি বললেন, তোমার বোন যখন আলাদা ঘরে থাকা শুরু করল তুমি তখন জানালার বাইরে থেকে পুরুষের মতো গলা করে কথা বলতে। ইবলিশ শয়তান সেজে কথা বলা।

সায়রা বলল, হ্যাঁ। ও আলাদা থাকতে গেল তখন আমার খুব রাগ লাগল। আমি তাকে ভয় দেখিয়েছিলাম যাতে সে আবার আমার সঙ্গে থাকতে শুরু করে।

ইবলিশ শয়তান সেজে তুমি তোমার বাবার সঙ্গেও কথা বলেছ?

হ্যাঁ বলেছি।

ওনাকে ভয় দেখাতে চেয়েছ?

হ্যাঁ। বাবাকে ভয় দেখানো জরুরি ছিল।

তুমি তোমার মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে যে–বর্ণনা দিয়েছ সে বর্ণনাটা ভুল। তুমি লিখেছ ছাদের ঠিক যে–জায়গা থেকে পড়ে গিয়ে ইথেনের মৃত্যু হয়েছে তোমার মার মৃত্যুও সেখান থেকে পড়েই হয়েছে। অথচ তোমার মার মৃত্যু এ বাড়িতে হয় নি।

সায়রা বলল, এ বাড়িতে হয় নি এটা ঠিক তবে তাঁর মৃত্যু ছাদ থেকে পড়েই হয়েছিল।

মিসির আলি বললেন, তোমাদের বাড়ির পুরোনো ইলেকট্রিসিটি বিলগুলি ঘেঁটে আমি একটা মজার তথ্য পেয়েছি। দেখলাম পাঁচ মাস তোমরা এই বাড়িতে ছিলে না।

সায়রা বলল, এই তথ্যটা মজার কেন?

এই তথ্যটা মজার কারণ তখন প্রশ্ন আসে এই পাঁচ মাস তোমরা কোথায় ছিলে। হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে কেন?

সায়রা বলল, আপনি ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছেন যে আমরা ইথেনের বাচ্চা ডেলিভারির জন্য বাইরে গিয়েছি। কিন্তু আমি তো খাতায় লিখেছি ইথেনের পোস্টমর্টেম করা হয়। তার পেটে কোনো বাচ্চা পাওয়া যায় নি।

মিসির আলি বললেন, এমন কি হতে পারে না যে ঐ পাঁচ মাস তোমরা গোপনে কোথাও ছিলে। ইথেনের বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাটাকে কোথাও দত্তক দিয়ে তোমরা চলে এসেছ।

সায়রা বলল, চাচা আপনি চা খেতে চেয়েছিলেন চা খান। মেয়েটা কোথায় ওকে বলুন চা দিতে।

মিসির আলি বললেন, মেয়েটিকে আমি ইচ্ছা করেই আজ বাসায় রাখি নি। আমি চাচ্ছিলাম না আমাদের কথাবার্তার সময় সে থাকুক। আমার এক বন্ধু আছে নাম হারুন বেপারী। নাসরিনকে পাঠিয়েছি ঐ বাড়িতে। আজ সারা দিন সে ঐ বাড়িতে থাকবে। চা আমাকেই বানাতে হবে। সায়রা তোমার জন্য কি বানাব?

হ্যাঁ।

মিসির আলি চা এনে দেখেন সায়রা কাঁদছে। নিঃশব্দ কান্না। তিনি সায়রার দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন। সায়রা নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিল। ক্ষীণ গলায় বলল, আপনি ইচ্ছা করলে সিগারেট ধরাতে পারেন।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন।

সায়রা বলল, কথা শেষ করুন।

মিসির আলি বললেন, ইথেনের মৃত্যুর পর রমনা থানায় একজন মহিলা এবং একজন পুরুষের টেলিফোন কলটা খুবই রহস্যজনক। আমি তোমাদের ঐ বাড়িটি দেখতে গিয়েছি। গাছগাছালিতে ঢাকা বাড়ি। এই বাড়ির ছাদে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা দূরের অ্যাপার্টমেন্ট হাউস থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। অথচ এর মধ্যে একজন দেখে ফেলল ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি। অন্ধকারে কোনো রঙ দেখা যায় না। কাজেই যে-বলেছে ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি তাকে দেখতে হয়েছে খুব কাছ থেকে। কিংবা সে জানে যে হত্যাকাণ্ডটি করেছে তার গায়ে ছিল ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি। ঐ ভয়াবহ দিনে তোমার বাবার গায়ে ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি ছিল?

হ্যাঁ।

মিসির আলি সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, টেলিফোন দুটা আমার ধারণা তুমি করেছ প্রথমে মেয়ের গলায় তার পরপরই পুরুষের গলায়।

আমি টেলিফোন করব কেন?

দুটা কারণে করবে। যাতে তোমার বাবা তোমাকে সন্দেহ না করেন। যাতে তোমার বাবার ধারণা হয় কাজটা ইবলিশ শয়তান করেছে।

তোমার বাবার রূপ ধরে সে ছাদে গেছে। তোমার বোনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে।

সায়রা বলল, আপনার ধারণা ইথেনকে আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলেছি? মিসির আলি বললেন, আমি এই বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত।

সায়রা বলল, হত্যাকারীর মোটিভ থাকে। আমার মোটিভ কী?

মিসির আলি বললেন, পুরো ঘটনা আমি যদি অন্যভাবে সাজাই তা হলে তোমার একটা মোটিভ বের হয়ে আসে। সাজাব?

সাজান। তার আগে আমার একটা প্রশ্ন, আপনার ধারণা আমি একজন ভয়ংকর হত্যাকারী। মোটামুটি ইবলিশ শয়তানের কাছাকাছি। তাই যদি হয় আমি আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আসব কেন? আপনাকে তা হলে আমার প্রয়োজন কেন?

মিসির আলি বললেন, আমাকে তোমার কেন প্রয়োজন সেটা পরে বলি? আগে পুরো ঘটনা অন্যভাবে সাজাই?

হ্যাঁ সাজান।

তুমি লিখেছ ইথেনের মৃত্যু যেভাবে হয়েছে তোমার মার মৃত্যুও সেভাবে হয়েছে। তা হলে ধরে নেই তুমি নিজেই তোমার মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছ। কেন ফেলেছ আমি জানি না। এই অংশটি আমার কাছে পরিষ্কার না। আমার ধারণা এই মৃত্যু বিষয়ে তোমার বাবার মনে কিছু খটকা ছিল। খটকা দূর করার জন্য ইবলিশ শয়তানের উপস্থিতি তুমি কাজে লাগালে। সায়রা তুমি কি আরেক কাপ চা খাবে?

না।

তুমি চাইলে আমি আলোচনা বন্ধ রাখতে পারি।

আপনার যা বলার বলুন আমি শুনছি।

মিসির আলি বললেন, ইথেনের পেটে সন্তান আসার অংশটিকেও আমি সম্পূর্ণ অন্যভাবে সাজাব। যেভাবে সাজাব তাতে জিগ-স পাজল খাপে-খাপে মেলে। সন্তানটি আসলে এসেছিল তোমার পেটে। সন্তানটি তুমি নষ্ট কর নি। যে পাঁচ মাস তোমরা বাইরে ছিলে সেই পাঁচ মাসে সন্তানটি পৃথিবীতে আসে এবং তাকে কোথাও দত্তক দেওয়া হয়। ইথেন পুরো বিষয়টি জানে। তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া তোমার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইথেন নামের মেয়েটা পেটে কথা রাখা টাইপ মেয়ে না। তাকে বিশ্বাস করা যায় না। ঠিক বলেছি?

হ্যাঁ ঠিক বলেছেন।

তোমার লেখা তিনটা চ্যাপ্টার আমি পড়ে ফেলেছি। এই তিন চ্যাপ্টারে তুমি তোমার স্বামীর কথা কিছুই লেখ নি। আমি তাঁর সম্পর্কে সামান্যই জানি। শুধু এইটুকু জানি যে তিনি অসুস্থ। তাঁর সম্পর্কে আমরা কম জানি কারণ তুমি জানাতে চাচ্ছ না। তাঁর অসুখটা কী?

ডাক্তার ধরতে পারছে না। দেশের ডাক্তাররা দেখেছে। বাইরের ডাক্তাররাও দেখেছে। শুরুতে ক্যানসার ভাবা হয়েছিল। এখন ভাবা হচ্ছে না। যতই দিন যাচ্ছে সে দুর্বল হয়ে পড়ছে। কোনো কিছু খেতে পারে না। হজম করতে পারে না।

মিসির আলি বললেন, মাথার চুল উঠে যাচ্ছে?

সায়রা সামান্য চমকাল। তবে সহজ গলায় বলল, হ্যাঁ।

মিসির আলি বললেন, আর্সেনিক পয়েজনিং বলে একটা বিষয় আছে। খাবারের সঙ্গে যদি অতি সামান্য পরিমাণ হেভি মেটাল যেমন আর্সেনিক, এন্টিমনি কিংবা লেড দেওয়া হয় তা হলে শরীরের কলকবজা এমনভাবে নষ্ট হবে যে ডাক্তাররা তার কারণ ধরতে পারবে না। হেভি মেটাল জড়ো হবে চুলের গোড়ায়। চুল পড়তে শুরু করবে। হেভি মেটালের সাহায্যে মানুষ খুন করার সহজ বুদ্ধির জন্য একজন রসায়নবিদ দরকার। বুঝতে পারছ?

পারছি।

এই মানুষটাকে সরিয়ে দেবার চিন্তা তোমার মাথায় এসেছে কারণ তোমার মনে ভয় ঢুকে গেছে যে এই মানুষটা তোমার অতীত ইতিহাস জেনে ফেলবে। তুমি তোমার

সন্তানকে প্রটেক্ট করতে চেয়েছ। ভালো কথা তোমার এই সন্তানের বাবা কি তোমার প্রাইভেট টিচার রকিব সাহেব?

হ্যাঁ।

উনি কোথায়?

জানি না কোথায়। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।

মিসির আলি বললেন, এখন আমি বলি তুমি আমার কাছে কেন এসেছ?

সায়রা বলল বলুন।

সিরিয়েল কিলাররা অহংকারী হয়। তাদের ধারণা জন্মে যায় কারোরই সাধ্য নেই তাদের অপরাধ ধরার। তারা বুদ্ধির খেলা খেলতে পছন্দ করে। অন্যকে বুদ্ধিতে হারাতে পছন্দ করে। তুমি আমার কাছে বুদ্ধির খেলা খেলতে এসেছ। এটা ছাড়াও তুমি তোমার মেয়ের জন্য একটি ভালো আশ্রয়ও চাচ্ছিলে। তোমার কাছে মনে হয়েছিল আমি একটা ভালো আশ্রয়। নাসরিন কি তোমার মেয়ে না?

হ্যাঁ।

ইথেন যে চিঠি তার মেয়েকে লিখেছিল বলে তুমি উল্লেখ করেছ সেই চিঠি আসলে তোমার লেখা। তুমি তোমার মেয়েকে লিখেছ। ইথেন আর্টসের ছাত্রী। ফরমালডিহাইড কী তা সে জানে না। তুমি জান। তোমার ব্যাপারটা আমি ধরতে পারি এই চিঠি পড়ে। তোমার খাতায় এই চিঠিটা যদি না থাকত তা হলে আমি মনে হয় না তোমাকে ধরতে পারতাম।

সায়রা কাঁদছে। মিসির আলি কঠিন গলায় বললেন, শেক্‌সপিয়ারের টেম্পেস্ট থেকে কয়েকটা লাইন বলি। লাইনগুলি নিশ্চয়ই তোমার পরিচিত।

তুমি শেক্‌সপিয়ারের এই নাটকে অভিনয় করতে চেয়েছিলে—

And my ending is despair
Unless I be relieved by prayer,
As you from crimes would pardoned be,

সায়রা চোখ মুছতে মুছতে বলল,

But release me from my bands
With the help of your good hands.

মিসির আলি বললেন, পুলিশকে সবকিছু খুলে বললে কেমন হয় সায়রা?

সায়রা বলল, আপনি বলতে বললে আমি অবশ্যই বলব।

মিসির আলি বললেন, তুমি কী করবে বা করবে না সেটা তোমার ব্যাপার। আমি কাউকে উপদেশ দেই না। ভালো কথা তুমি একবার বলেছিলে তোমার বাবার হাতের রান্না খাওয়াবে। মনে আছে? ওনার সঙ্গে আমার দেখা করার শখ আছে। একজন পুণ্যবান মানুষ কী করেন জান? তিনি যখন কাউকে হাত দিয়ে স্পর্শ করেন তখন তাঁর অন্ধকার নিজের ভেতর নিয়ে নেন।

সায়রা বলল, চাচা আপনি কি আমাকে একটু হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেবেন?

মিসির আলি বললেন, না। কিন্তু তার পরেও হাত বাড়িয়ে দিলেন।